বিশ্ব-রহস্য

সূচী

অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

শনিবারের চিঠির অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸৹ ও ষাণ্মাসিক ২।৵৹ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৶৹ ও ২।৶৹ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩।৹ । প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১৹ ; ভি. পি.তে ।৵৹ । বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

অচিন্ত্যকুমারের নিপুণ লেখনীতে অমর হয়ে আছে

একটি যুবক, একটি যুবতী, আর এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবী। তবু যৌবনের সমাগমে এমন এক দিন আসে যেদিন পৃথিবীকে স্বর্গ বলে মনে হয়, দেহকে মনে হয় দেবতার আয়তন, জীবনধারণকে মনে হয় সুধাসৌন্দর্যের ইতিহাস। দুর্গমের পথে দুর্লভের জন্য সুদূর তীর্থযাত্রা। সেই হচ্ছে প্রথম প্রেম। নারী তখন নারীর অধিক, পুরুষ তখন পুরুষের উপরে। এ সেই প্রেম, যার শোক নেই, গ্লানি নেই, পিপাসা নেই। জীবনে নারী আসে হয়তো বহুবার, কিন্তু প্রেম শুধু একবারই আসে, আর সে-প্রেম প্রথম প্রেম। একটি আনন্দ-অশ্রু-উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন কাহিনী অচিন্ত্যকুমারের নিপুণ লেখনীতে অমর হয়ে আছে। সুন্দর ছাপা ও প্রচ্ছদপট, ৩৲

রেন্সের গল্প

রাজী সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্সের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। ইংলণ্ডের বনেদী লের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গেছেন। লরেন্সের সাহিত্য-তিভার উৎকৃষ্ট পরিচয় এই বইয়ের অনূদিত গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। সম্পাদনা করেছেন মেন্দ্র মিত্র। অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু, ক্ষিতীশ রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। দাম ৩।০

লেডি চ্যাটার্লির প্রেম

রোপীয় সাহিত্য-জগতে এর মতো ইদানীং আর কোনো উপন্যাস এতোখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি রেনি। নীতিবাদীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও ডি. এইচ. লরেন্সের এই বই আজো জীবন্ত হয়ে তার কারণ লরেন্সের অসামান্য প্রতিভা। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনিন্দ্য অনুবাদ। দাম ৪৲

াধুনিক সোভিয়েট গল্প

তীয় সংস্করণে পাঁচটি নতুন গল্প সংযোজিত করা হয়েছে—আধুনিকতম লেখকের পাঁচটি যুদ্ধ-লীন গল্প। এতে [illegible]

স্নিগ্ধতায়...
কেশবর্দ্ধনে...
সংরক্ষণে...
প্রসাধনে...

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস

তরুণের স্বপ্ন (২য় পর্ব্ব ২৸৹

কণ্ট্রোলের শাড়ী ২৲ তাসের ঘর ২॥

তরুণের স্বপ্ন (১ম পর্ব্ব) ৩॥৹

চলন্তিকা নাটক-নভেল এজেন্সি
১৬৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত

স প্ত র্ষি

"বনফুল" রচিত বিচিত্র উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের উপন্যাস বিরল।
সুন্দর প্রচ্ছদপট। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন?
Saridon
সারিডন
মাত্র দশ মিনিটেই
সমস্ত বেদনা দূর করে

তন্বী তরুণীর
তনুর তনিমা অতুলন করে
ক্যালকেমিকোর
রেণুকা
নিমের টয়লেট পাউডার
লাবনী
স্নো এবং ক্রীম
তুহিনা
কোমল অঙ্গের বিউটি মিল্ক

COCOLA
KALYANI
ত্রিগুণ
চারিটি
মুকুট-মণি
কোকোলা
কল্যানী
ত্রিগুণ
জুয়েল আমলা
কেশ তৈল
জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

বরোদকার
"সুরশিল্পীদের মনে চা প্রেরণা জোগায় বলেই তাঁদের কাছে এই পানীয়টির এত সমাদর। আমিও সেই জন্যেই চায়ের এত অনুরাগী।"—এই অভিমতটি প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদকার। পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পীরা হীরাবাঈর মতোই একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্রেরণা জোগাতে সত্যি চায়ের জুড়ি নেই।
প্রেরণার উৎস...
চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IR 764

সুপ্রভাত

সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে ইংরেজী ১৯০৯ সনে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ অন্ধকারের মধ্যেই সুপ্রভাতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, রুদ্রের আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছিলেন।—

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কি না ছুটি,
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে, গরজি বাজে রে,
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন-মাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন
রক্তবদন লাজে রে॥

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী।

মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে।
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া ;
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া !
ব্যথায় ভুবন ভরিছে ;
ঝরঝর করি রক্ত-আলোক
গগনে গগনে ঝরিছে ;
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
কেহ বা স্বপনে ডরিছে ॥

তোমার শ্মশানকিঙ্করদল
দীর্ঘ নিশায় ভুখারী
শুষ্ক অধর লেহিয়া লেহিয়া
উঠিছে ফুকারি ফুকারি।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে,
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-'পরে,
খোল খোল দ্বার ওগো গৃহস্থ,
থেকো না থেকো না লুকায়ে—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
সব দিতে হবে চুকায়ে।
ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহো রে।
ওরে দীনপ্রাণ, কী মোহের লাগি
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে ॥

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী,
মরণনৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয়-ডমরু বাজাব।
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে।
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে—
মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে,—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে ॥

কবির সেই স্বপ্ন আজ সফল হইতে চলিয়াছে। ভারতের পূর্বপ্রান্তে আমাদের দুয়ার ভেদ করিয়া তাঁহার দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। আঁধার-মহিষাসুর তাঁহার শাণিত খড়্গে দ্বিখণ্ডিত, সুপ্রভাত আসন্ন। নিদারুণ জড়তার মধ্যে তাঁহার মাভৈঃ বাণীর আভাস পাইতেছি। ক্ষয়হীন মৃত্যুর মধ্যে ক্ষয়শীল দেহ বিসর্জন দিবার আহ্বান কানে আসিতেছে, তন্দ্রাজড়িমা ত্যাগ করিয়া উঠিব, কি উঠিব না, তাহার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ঈশান তাঁহার বিষাণ বাজাইতেছেন, ওরে ভয়ভীত ভারতের মানুষ, সুপ্রভাতকে বন্দনা কর, ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠকে বরণ করিয়া উদ্বুদ্ধ হও। তারপর—

"তার পরে তাঁরে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয়-অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টককান্তারে
রিক্তহস্তে শত্রু-মাঝে রাত্রি-অন্ধকারে ;
যিনি নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়,
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার ;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির'।"

১ ডিসেম্বর ১৯৪৬

পূর্বাভাষ

সারাদেশ জুড়ি এই যে রক্তরাগ
কোন্ অরুণের দেয় রে পূর্বাভাষ ?
কিসের লাগিয়া এই নরমেধযাগ
এ শবসাধনে সিদ্ধির আশ্বাস ?

চারিদিকে এই চিতাভস্মের রাশি—
দগ্ধ অস্থি, পরশ মাগিছে কার ?
স্বরগ হইতে কোন্ সে গঙ্গা আসি
অভিশপ্তের করিবে রে উদ্ধার ?

এই হানাহানি, নগ্ন বর্বরতা,
রক্তপাগল রক্তলোলুপ মন,
খরকরবালে বিনাশের উগ্রতা
কোন্ কল্কির করিছে উদ্বোধন ?

উড়ে ঝঞ্ঝায় উদ্ধত জটাজাল,
ও কার বিষাণ বাজিছে নিরন্তর ?
খণ্ড-চন্দ্রে ঝলমল করে ভাল
সত্য কি আজ আসে প্রলয়ঙ্কর ?

এত হলাহল, এত কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠকে দিতেছে কি পুনঃ ডাক ?
সমরে কাহারে ডাকিছে অহর্নিশ
ব্যথিত বুকের পাঞ্চজন্য শাঁখ ?

প্রসববেদনা পরাধীনা দেবকীর
দেখি শঙ্কিত হয়ো না হে ভীরু তুমি,
নাশিতে ও ভালবাসিতে আসিছে বীর—
নব কেশবের আজি জন্মাষ্টমী।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কেন এসব করছি ?

মাটির উঠোনের একপাশ গোবর দিয়ে নিকিয়ে কয়েকখানা কুশাসন পেতে রাখা হয়েছে। সামনে কোশাকুশি, গঙ্গাজল, গোবর, ফুলপাতা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক। বিব্রতভাবে পুরোহিত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য একখানা পুঁথি খুলে কুঞ্চিত নয়নে মন্ত্রতন্ত্র শানিয়ে নিচ্ছেন। বিষণ্ণ মুখে মাথায় বাঁ হাত দিয়ে রমার স্বামী হৃষিকেশ ডান হাতে মুহুর্মুহু তালপাখা নেড়ে বাতাস দিচ্ছে। কাছে দাঁড়িয়ে বড় ভাসুর, প্রতিবেশী নারায়ণকাকা, রমার বড় ভাই গৃহস্বামী দুলাল চক্রবর্তী।

রমার পিতৃগৃহে তার শ্বশুরবাড়ির গোটা পরিবার দাঙ্গার পরে-পরেই নিজগ্রাম থেকে বিশিকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দুলাল চক্রবর্তী সম্পন্ন গৃহস্থ, অন্নবস্ত্রের অভাব হয় নি, বিশেষত যখন রমার বিধবা মাতা এখনও বর্তমান সংসারে এবং তাঁর হাতে টাকাও আছে কিছু।

রমাদের প্রাণ বেঁচেছে সকলের, কিন্তু সব থেকে বড় ক্ষতি হয়েছে, মান গেছে। বাড়ির মেজোবউ রূপসী রমাকেই ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল দুর্বৃত্তেরা। চারদিন পরে তাদের ঘর থেকে সে উদ্ধার পেয়েছে। আজ এই আয়োজন তারই শুদ্ধি এবং প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন।

বড় ভাই উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা করেছেন। পুরোহিতের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না এ ব্যাপারে মন্ত্র পড়ানো। কিন্তু দুলাল চক্রবর্তীর গৃহে বারো মাসে তেরো পার্বণ, তাতে মোটা দাগে দক্ষিণা পাওয়া যায়। কাশী-ভাটপাড়ার পণ্ডিত-মণ্ডলী এক্ষেত্রে শুদ্ধির বিধানও দিয়েছেন। সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। অস্বীকার করলে, অখ্যাতিতে বাস করা দায় হবে। গরম খুন তরুণের আগুন হয়ে উঠেছে। মাথাখানাও দু-ফাঁক হয়ে যেতে পারে।

নারায়ণকাকা এসেছেন উদারতা দেখিয়ে যোগ দিতে। সাময়িকপত্রে বহু নারী জাগরণ সম্পর্কে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই শারদীয় ঘটনার পর থেকেই তিনি প্রগতিশীল। মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করছেন, আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি কৃপাণ ধর গো।

বড় ভাসুর হ্যাঁ-না কিছুই বলছেন না। যাঁদের দয়ায় আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁদের মেয়েকে গ্রহণ না করার কথা ওঠে না। বিশেষত ব্যাপকভাবে এই নারীহরণ সংঘটিত হয়েছে। সবাই ফিরে নিচ্ছে, তিনিও নেবেন। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"—এই পংক্তিটিতেই তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট।

হৃষিকেশব এ পর্যন্ত নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখে নি। হয়তো দেখতে ভয় পাচ্ছে। বাইরের কাজকর্মে অনর্থক ব্যস্ততা দেখিয়ে, ছোটাছুটি ক'রে সে নিজের কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করছে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে। রমার রূপে তার আসক্তি আছে, রমার গুণে তার শ্রদ্ধা আছে। অমন পত্নীকে ক'রে পেয়ে সে বেঁচে গেছে। কিন্তু তবু, কি অস্বস্তি, অজানা আশঙ্কা।—থাক্, হৃষিকেশব তাড়াতাড়ি দূর্বাগুলো গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত হ'ল।

রমার তেরো বছর বিবাহ হয়েছে। এক কন্যা, দুই পুত্র। বারো বছরের মেয়ে মার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এ মা যেন আর মিনির মা নেই, কেমন ক'রে পর হয়ে গেছে। প্রতিবেশী বন্ধু ডাক্তারের মা দয়াপরবশ হয়ে বাড়ির ছোট ছেলেপিলেদের তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে রেখেছেন। চোখের ওপরে ওসব প্রায়শ্চিত্তির দেখে বাচ্চাদের মন টন কেমন করবে, তাই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রমার ধার্মিকা মা বাসন-কোসন রাখবার চোরা-কুঠুরির মেঝেতে একখানা কম্বল বিছিয়ে প'ড়ে আছেন। শিয়রে হরিনামের ঝোলা।

রমার বড় ভাই অতি যত্নে, মমতায় বিগলিত হয়ে রমার বাপের বাড়ির সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছোট ভাকে আদর করছেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, মন খারাপ ক'রো না। তোমার দোষ কি বল? আমরাই তো তোমাকে রক্ষে করতে পারি নি।

ছোট দেওর তরুণ, সুতরাং স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লেখানো আছে। মেজো বউদির এই অঘটনে তার উৎসাহের সীমা নেই। এইবার ঘটা ক'রে বউদিকে ঘরে নিয়ে বন্ধুদের কাছে উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখানো যাবে। ভালই হয়েছে, এ একটা গৌরব যেন তার। চেনার মধ্যে একমাত্র তারই পরিবারে নারী অপহৃতা হয়েছে। তা হ'লে তো নির্যাতনের গুরুত্বে সে মহনীয়। তবে বউদির মুখ থেকে যে কিছুতেই কোন কথা বার করা যাচ্ছে না! বিশদ বর্ণনাটা শোনবার লোভ সংবরণ করা যায় না। কাগজে আজন্ম অদম্য আগ্রহে নারীহরণ পড়া দেওরের অভ্যাস। ছটফট ক'রে সে একবার বাইরে হলে, একবার ঘরে বউদির কাছে যাতায়াত করছে।

রমার ভাজদের নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই বাড়ির অভ্যাগত-বাহুল্যে। রমার কথা যখনই মনে হচ্ছে, বুক কেঁপে উঠছে তাদের। যদি ওই দশা তাদের হ'ত? ও বাবাঃ, গোবিন্দ, গোবিন্দ!

রমা! ছোট্ট নাম, ছোট্ট মানুষটি, ছোট্ট জগৎ তার নিয়ে সুখেই তো ছিল। সহসা ওই রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ঝড়ে সে গৃহছাড়া হয়ে উড়ে পড়ল জনতার মুক্ত প্রাঙ্গণে। সকল দৃষ্টি তাঁর দিকে। বুকভরা-মধু-পেলব-কোমলা বাংলার বধূ বাঁচে কি ক'রে?

স্নান করিয়ে কোরা লালপাড় শাড়ি তাকে পরানো হ'ল। এক দুই ক'রে বাড়ির উঠোনে লোকজন জমা হচ্ছে। নিষেধ করা যায় না। জনমতের প্রসন্নতার ওপরেই তো রমার প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। সিঁথির সিঁদুর, হাতের লোহা, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা, অবিচলকুলের কন্যা—কিছুই, কিছুই আজ তাকে বাঁচাতে পারবে না। তার কল্যাণময় অতীত ছাই হয়ে গেছে, তার ভবিষ্যৎ বাঁধা হবে ওই লৌকিক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে মামা-শ্বশুর-বন্ধু-বন্ধুর অনুমতিতে। সুতরাং তৃণাদপি ক্ষুদ্র হও রমা।

কেন এসব করছি? আমার কি দোষ? পাপ করি নি, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শুদ্ধি? কার? আমার? না, আমার না, সেই নদীর পারে শহরের অসংখ্য বড়লোকদের, যাদের লোভ আর বিদ্বেষের ঝড় ব'য়ে গেল আমার ওপরে।

প্রায়শ্চিত্ত আমি করব কেন? আমার স্বামী করুক, সপ্তপদীর সুমধুর মন্ত্রের পাকে পাকে আমার রক্ষার ভার যার সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে। চন্দন-টোপর প'রে স্ত্রীর অগ্রে পদক্ষেপ করলেই বিষ্ণু হওয়া যায় না। প্রায়শ্চিত্ত করুক সেই পুরুষ, যে নারীকে রক্ষা করতে পারে না। করুক সেই তরুণেরা, এখনও সিগারেট-অধরে যাদের পরচর্চার প্রয়োজন আছে।

কুশাসনে রমাকে বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল। ঘরে ঘরে মাটির হাঁড়ি অশুদ্ধ হয়েছে, ফেলে দিলে আর চলে না। সুতরাং গোবর-গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নাও। অন্তত মোটা রান্নাটাও তো চলবে।

ছোট নামের ছোট মানুষ ছোট ঘরের কোণে বেশ ছিল। বড় মাথার বড় বুদ্ধি আজ ছোটকে খড়কুটো জানিয়ে বড় আগুন প্রস্তুত করছে।

এসব কেন করছি? কি নির্বোধ রমা! যুগ যুগ ধ'রে তো তুমি এই করেছ। রামের সীতা, সীতারামের রমা রূপে তুমি তো চিরকাল এই করেছ। অক্ষম পুরুষের অক্ষমতার জের টেনেছ তুমি। তোমার বিচার করেছে সেই অক্ষম পুরুষ। চাতুর্যের ভাবে তোমার শুদ্ধির বিধান দিয়েছে সেই পুরুষ দয়ার্দ্র চিত্তে। তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার যশোগান গেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তোমাকে প্রগতিশীলা দেখলে নিন্দা করেছে, বিবাহ ক'রে সমান অধিকার দিতে চায় নি। অবলা তুমি, স্বেচ্ছায় রক্ষার ভার সবলের হাতে তুলে দিয়ে পরাধীনতার আরামে নিমগ্ন ছিলে। আজ আশ্চর্য হচ্ছ কেন? তোমার মাথায় নেতাদের মাথা ধ'রে উঠেছে। যে যা বলে, ক'রে যাও। তোমার আগে অনেকে করেছে, তুমিও কর। কিন্তু রমা, তোমার পরে কেউ করবে কি না জানি না।

রাত্রির অন্ধকার গাছের ছায়ায় ছায়ায়। পাতায় পাতায় জোনাকি জ্বলছে। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুরের ধারে গালে হাত দিয়ে রমা একা ব'সে আছে। রাত একটা হবে।

চারিপাশে স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রায় রক্ষা করছে। তাদের চলাফেরা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। অপহৃতা রমার দ্বিতীয়বার অপহৃত হবার ভয় নেই। তবু তো লোকে বলে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায়। কিন্তু রমার কোন ভয় নেই। শুদ্ধির ব্যবস্থা তো হাতেই আছে।

সত্যি, ভয় গেল কোথায়? রাত একটার সময়ে নির্জন পুকুরপাড়ে একা ব'সে থাকবার মত সাহস কোনদিনও রমার ছিল না। আজ তার ভয় নেই। যে মাধুর্য-সঙ্কোচের আবরণ রমাকে জগতের উগ্র বাস্তবতা থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিল, রাত্রে সে আবরণ খ'সে গেছে। চরম যা দেখবার, চরম যা হবার সবই রমার হয়ে গেছে, শেষ দেখে ফিরে এসেছে রমা। জগতের দীর্ঘ রাজপথের মিছিল আর রমার মধ্যে পার্থক্য নেই আর। অজানার ভয় নেই রমার।

আজকের অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু, রমা তাঁর নূতন দৃষ্টিতে বুঝতে পারলে। আজ সহৃদয়তার তুফানে যেসব সংকীর্ণ হৃদয়-যমুনায় মরা জলে জোয়ার এসেছে, সে জোয়ার চ'লে যাবে। অপহৃতা রমার নামের সঙ্গে কলঙ্কচিহ্ন চিরদিন লেগে থাকবে। আজ বড় মা 'লক্ষ্মী' ব'লে ডেকে তাকে নামের মর্যাদা দিয়েছেন, কাল তাঁর বয়স্থা কন্যার বিবাহের সময়ে তিনি লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী জ্ঞান ক'রে বিচলিত হবেন। আত্মীয়স্বজনেরা মনে মনে জানবেন, একদিন অভাবনীয় কিছু ঘটেছিল এই অতিসাধারণ মেয়েটির জীবনে। তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে সেই জ্বালা ফুটে উঠবে; যদি নাও ফুটে ওঠে, রমার চক্ষের বিশেষ লক্ষ্যে উঠবে। রমা কি আর তাঁদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে?

আজ প্রথম স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় রমা শয়ন করেছিল এই ব্যাপারের পরে। ছেলেমেয়েদের বাড়ির অন্যান্য মহিলারা সকলে ভাগাভাগি ক'রে কাছে রেখেছে রমার ঘরে না দিয়ে। বিছানাপত্রও একটু প্রথমরূপে পরিপাটি। তেরো বছর পরে প্রায় বাসরশয়নের অবস্থা আর কি।

বাড়ির থমথমে বিষণ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে শিথিল চরণে রমা স্বামীর ঘরে নিজের অধিকার বুঝে নিতে ঢুকল। স্বামী ঘুমন্ত। পায়ের কাছে ধীরে ধীরে মাথা নামাল রমা। শুদ্ধির পরে স্বামী ছাড়া সবাইকে প্রণাম করা হয়েছে। স্বামী তখন কি একটা কাজে বাইরে চ'লে গিয়েছিলেন।

মনে হ'ল, হৃষিকেশবের নিস্পন্দ শরীরে একটা স্পন্দন কেঁপে উঠল। বহুদিনের অভ্যাসক্রমে রমা অনুভব করলে, স্বামীর শোণিতে পত্নীর স্পর্শ চিরাভ্যস্ত সাড়া তুলেছে। দীর্ঘদিনের দৈহিক বিরহের পরে প্রকৃতির নির্মম ইঙ্গিতে পুরুষের দেহে আহ্বান জাগ্রত হয়েছে নারীর সুকোমল আত্মনিবেদনে। কিন্তু মানুষের জটিল বুদ্ধিবৃত্তির কাছে প্রকৃতির সহজ আবেদন প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। হৃষিকেশব নিজেকে সংযত ক'রে

ঘুমের মুখোসে স্ত্রীর কাছ থেকে আত্মগোপন করাটাই আপাততঃ জটিলতার শ্রেষ্ঠ মীমাংসা মনে করল। মনের অপরাধবোধ ও দ্বিধা দূর হচ্ছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে, তেরো বছরের ঘর-করা সহধর্মিণী এ রমা নয়। নিদারুণ অভিজ্ঞতার বিকৃত করলে হৃষিকেশবের রমাও বোধ হয় বিকৃত হয়ে গেছে।

রমা চুপ ক'রে নিজের জায়গায় শুয়ে রইল। সে বুঝেছে হৃষিকেশব ঘুমোয় নি। আজকের রাত্রে তার চোখে এত সহজে ঘুম আসবে না। একটা কঠিন অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার লোভে এই কপট নিদ্রা। দৈব প্রয়োজনে স্বাভাবিক ভাবে এক নিমেষে যে মিলন বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে সংঘটিত হতে পারত, মানুষের তর্কশাস্ত্র তাকে দূরে ঠেলে দিলে।

কিন্তু গলদ তো সেইখানেই। আত্মীয়স্বজনের নির্লিপ্ত ঔদার্য স্বামীর পক্ষে অসম্ভব। দৈহিক আকর্ষণ বিবাহের ভিত্তি, সেই দেহ-মিলনের মূলেই আঘাত লেগেছে। চারটি রজনী কেটেছে রমার—কুমারীর নিঃসঙ্গতায় নয়, বিবাহিতা রমণীর ভোগসঙ্কুলতায়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে নয়। এ কথা সবাই ভুলবে, স্বামী ভোলে কি ক'রে! দিনের পর দিন কাটবে। ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মানুষও একদিন ঈশ্বরের করুণায় চণ্ডালিনীকে বক্ষে স্থান দেবে। একদিন না একদিন প্রকৃত জয়ী হবে, মিলনে ছেদ থাকবে না। তবু সেই মিলনে কাঁটা হয়ে প্রহরা দেবে ছোট ছোট দ্বিধা, সন্দেহ, কীট।

রমা শুয়ে থাকতে পারলে না। পুকুরঘাটে গিয়ে বসল, অত নির্জনতা নেই অন্য কোথাও। ভয় কি তার? আর তার ভয় নেই। সমস্ত জগতের বিশালতায়, জনতার পদচারণে রমা একা। তার কেউ নেই। তার দেশ নেই, দেশবাসী নেই। রমার কথা কেউ ভেবে নিদ্রা ব্যাহত করবে না। রমার সাক্ষী নেই, জজ্জহলাদ নেই। রমা বড় একা।

পুকুরে অনেক জল, সে জল শীতল, এ জানা কথা। কিন্তু নির্বোধ রমার নিস্তব্ধ চিত্তে অতবড় কামনা, অতবড় বেপরোয়া সাহস উদয় হ'ল না। রমা যে ইচ্ছাধীন, সে কথা রমা কোনদিন ভেবে দেখে নি। অপরাধ না করলেও অপরাধী প্রথায় চোরের মত বিষপান ক'রে জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া একটা সর্বজন-সমর্থিত প্রথা হতে পারে, সাদাসিধে রমা তা জানে না। পশু যেমন ক'রে আবহাওয়া বোঝে, তেমনই ক'রেই রমা শুধু বুঝেছে, এ লজ্জা তার লজ্জা নয়, এ লজ্জা বিশ্বজনিসম্ভবাশী। অনেকদিন ধ'রে এ লজ্জা অনেকেরই বুঝতে হবে অনেক কষ্ট ক'রে। সুতরাং বাংলা উপন্যাসের নায়িকার মত রমা জলে নামতে উদ্যোগী হ'ল না।

সে তো অনায়াসে মরতে পারত। ছোট জায়গা তার পূরণ হয়ে যেত। ছোট মানুষ সে বড় হয়ে গেছে আজ, এই তো সমস্যা। এ সমস্যার দিব্য সমাধান হ'ত দীঘির

জলে, কোন প্রয়াস করতে হ'ত না। দড়ি-কলসী লাগত না পর্যন্ত। বাজারের যত দড়ি-কলসী নেতা ও মহাজনদের জন্য সঞ্চিত রেখে রমা মরতে পারত বিনা আড়ম্বরে।

পেছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ব্যাকুল স্বামী নয়, সামনের চালাঘরের দুলে-বউ এসেছে। পায়ের কাছে সিঁড়িতে বসল দুলে-বউ, দুই-একবার রমার আনত মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, এত রাত্তিরে একা ব'সে আছেন কেন দিদিঠাকরুণ? সময় ভাল না। আমার ঘর থেকে দেখে দেখে আসলাম যেয়ে। ভাবলাম যদি কোন দরকার থাকে। কর্তাকে ডাক দিয়ে জাগিয়ে এসেছি। ঘরে যাবেন না?

রমার অবশ শরীরে দক্ষিণের হাওয়া লাগল। আর তো সে একা নয়। হাত বাড়িয়ে রমা দুলে-বউয়ের হাত ধরলে।

জিভ কেটে হাত ছাড়িয়ে দুলে-বউ পায়ের ধুলো নিলে, ও দিদিঠাকরুণ, ছুঁলেন যে আমাকে! ছোঁয়া প'ড়ে গেল। এত রাত্তিরে আর কি করবেন? কাপড়খান ছাড়েন গা ঘরে যেয়ে।

রমা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সে সম্মান অন্তত একজনও ভোলে নি। অন্তত একজনও মনে করেছে, রমা রমাই আছে। সে একজন সবল নয়, সেও রমারই মত অবলা। হাত বাড়িয়ে রমা দুলে-বউয়ের হাত আবার ধরলে। এমনই অনেক দুর্বল হাত পরস্পরকে আশ্রয় দিলে বল আপনি আসবে। বহুদিন চ'লে গেছে পুরুষের মুখ চেয়ে। আজ এমনই কোমল হাতের শক্তিই প্রয়োজন। রমা তো আর একা নয়।

অস্পৃশ্যা দুলে-বউয়ের হাত ধ'রেই রমা উঠে দাঁড়াল, সহজ গলায় বললে, ঘরেই যাচ্ছি। আমাকে একটু এগিয়ে দেবে চল।

শ্রীমতী বাণী রায়

ভারতীয় নারীত্বের একদিক

আজ আমরা এমন এক সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি—বহু জটিল সমস্যা যেখানে কালের কূটচক্রকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। তাই আজ আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অনেক কিছু নতুন ক'রে ভাববার—দৃষ্টিকে সুদূরে প্রসারিত ক'রে মনকে মিথ্যে সব সংস্কারের নাগপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে উদার প্রাণ নিয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে বিচার ও উপলব্ধি করবার। আজ সময় এসেছে মধ্যযুগীয় আবর্জনার স্তূপকে সরিয়ে ফেলে সমাজকে, দেশকে, জাতিকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলবার। তাই একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ মাতৃকুল নারীজাতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া। নারীজাতি মানবকুলের মূলশিকড়। এদের প্রাণরস সমাজের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে মানবজাতিকে। মধ্যযুগে সমাজের

প্রভুত্বকামী কতকগুলো তথাকথিত সমাজকুলপতি সুপ্রাচীনকাল থেকে দেওয়া মর্যাদায় ঘা দিয়ে যে অবিচার করেছে নারীজাতির প্রতি, তার বিষফল ভোগ করতে হচ্ছে আজ সমগ্র জাতিকে। দিন দিন জাতি আজ তারই বিষক্রিয়ার ফলে ক্ষীণশক্তি হীনমর্যাদ। আমাদের আবার পূর্বশক্তি ফিরিয়ে পেতে হ'লে, মেরুদণ্ডকে সোজা ক'রে পৃথিবীর বুকে দাঁড়াতে হ'লে আবার প্রয়োজন নারীজাতিকে তাদের সেই পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নেওয়া, আবার পূর্ব অধিকারে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা।

সতীত্ব-অসতীত্বের ভুয়ো ভ্রান্ত সংস্কার নিয়ে নারীদের অমর্যাদা ক'রে জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি তদানীন্তন সমাজপতিরা ক'রে গেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে আজ আমাদের। যে সতীত্ব-অসতীত্বের চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে সমাজকে ধ্বংসের পথে তারা দিয়ে গেছে ঠেলে, পূর্বাচার্য মহাজ্ঞানী উদারবুদ্ধিসম্পন্ন ঋষিরা তাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তারই খানিকটা নজির শুধু আজকের অর্থহীন সংস্কারান্ধ মানবসমাজের সামনে আমি উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রবন্ধের অবতারণামুখেই মহামতি অর্জুনোক্ত ভগবদ্গীতার ১ম অধ্যায়ের ৪০--৪৩ সংখ্যক শ্লোক কটির উল্লেখই যুক্তিসঙ্গত ভেবে তারই মর্ম উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাব। অন্য সব ছেড়ে দিয়ে শুধু অর্জুনের কথা কটির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও আমাদের মোহ অনেকটা কেটে যাবে ব'লে আশা করি।

তিনি বলছেন, হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে সব লোক যদি ম'রে যায়, তাতে কুলক্ষয় অনিবার্য। কুলক্ষয় হ'লে সমাজে শাসক এবং রক্ষকের অস্তিত্বও লোপ পেয়ে যাবে। এ কুলক্ষয়-জনিত পাপের ফলস্বরূপ কুলনারীরা হয়ে যাবে ব্যভিচারদোষদুষ্ট। কারণ তখন আর তাদের রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। সুযোগ পেয়ে দস্যু-তস্করের হবে প্রবল প্রাদুর্ভাব। তারা নারীদের ওপর করবে অত্যাচার। তারই ফলে উৎপত্তি হবে সব বর্ণসংকরের, এককালে সমাজের হবে শোচনীয় অধঃপতন।

আমাদের সমাজে সতীত্বের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়—একপতিপরায়ণতা বা পুরুষান্তর-সঙ্গহীনতা, সতীত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা যদি তাই হয়, অর্জুনের মুখে অন্তত উক্ত প্রকার মন্তব্য শোভা পাওয়া উচিত নয়। কেন না, এ জাতীয় ব্যভিচারে, প্রধান দৃষ্টান্তস্থল যদি থাকে তবে তাঁদেরই বংশ একমাত্র।

তাঁর প্রপিতামহ শান্তনু যাঁকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে ঘরে তুললেন তিনি সত্যবতী, পূর্বনাম মৎস্যগন্ধা, তিনি কুমারী বয়সেই পরাশর-সংযোগে মহর্ষি বেদব্যাসের জননী হয়েছিলেন।

শান্তনুর ঔরসজাত সত্যবতীর পরবর্তী সন্তান বিচিত্রবীর্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাঁরই দুই বিধবা পত্নীর গর্ভে জন্ম নিলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্যাসদেবের ঔরসে, এবং বিদুর দাসীর গর্ভে।

অর্জুনেরা ছ ভাইও ঠিক অনুরূপ উপায়ে মায়ের গর্ভে স্থান পেয়েছিলেন। একজনও তাঁদের মধ্যে পিতা পাণ্ডুর বীর্যে জন্মান নি। তাঁরা পাঁচজনও আবার ক'রে বসলেন একমাত্র দ্রৌপদীকে বিয়ে!

পুরুষান্তরসম্ভূত যদি ব্যভিচার হয় এবং অসতীত্বের কারণ হয়, তা হ'লে সমগ্র কুরুবংশটাই একদম কলুষিত ও সমাজে পতিত। কিন্তু তা তো হয় নি। বরং যে কজন কথাকথিত ব্যভিচারক্রমে জাত, তাঁরাই করলেন সকলের শীর্ষস্থান অধিকার।

তা হ'লে বুঝতে হবে অর্জুন এখানে নারীত্বের যে দোষের কথা বলেছেন, সে হ'ল দস্যুকর্তৃক ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা নারীর মর্যাদাহানিকর ব্যাপার। এবং ওই কারণে যেসব সন্তান হবে, তারাই হবে সংকর জাতি, সমাজের অকল্যাণের কারণ।

আজ আমাদের যা হতে চলেছে। খুব তৎপরতার সঙ্গে আজকের অপহৃতা হিন্দু-নারীদের যদি উদ্ধার করা না যায়, তা হ'লে দেখা যাবে, কয়েক বছর পরে সমাজের আনাচকানাচ ছেয়ে গেছে সংকর জাতিতে, যারা ভাবীকালে হয়ে উঠবে মানবসমাজের ঘোরতর অভিশাপস্বরূপ।

আরও সব নজির দেখলে অতি সহজে বুঝতে পারা যাবে, একই মেয়ে বহুবারই বিভিন্ন পুরুষ সংসর্গ করুক, সে সংসর্গ যদি পরস্পরের মিলনের আকুলতা নিয়ে হয়, তা হ'লে মিলনপ্রয়াসী দুটো প্রণয়ীর প্রাণরসপ্রাচুর্যে যে সন্তান জন্মলাভ করবে, সে কোনদিন প্রতিভা-বর্জিত বা সমাজের অকল্যাণের কারণ হতে পারে না।

প্রথমেই কৌরববংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এখন আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নজির-স্বরূপ আমি সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করছি।

দেবর্ষি নারদ—ত্রিলোক যার পূজা করে। তাঁর জননী ছিলেন একজন পরগৃহবাসিনী দাসী; জনক যে তাঁর কে, তার কোন পরিচয় নেই। ভাগবতের ১ম স্কন্ধেই দেবর্ষি নিজের মুখে এ কথা ব্যক্ত করেছেন।

ঋষি ভরদ্বাজ বৃহস্পতির কামজ সন্তান। আপন রূপসী ভ্রাতৃজায়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁতে রমণ করতে ইচ্ছা করলে, তিনি বললেন, আমার গর্ভে একজন রয়েছে, আর একজনের স্থান সেখানে হবে না।

তবু তিনি কামমোহিত হয়ে রিরংসা প্রকাশ করলে গর্ভস্থ শিশু বার বার বারণ করলেন। বৃহস্পতি কোন কথাই কানে না নিয়ে সে অবস্থায় ভ্রাতৃজায়াতে রমণ করেন। গর্ভস্থ শিশু তখন দুটো পা দিয়ে গর্ভদ্বার রোধ ক'রে থাকেন। বৃহস্পতির বীর্য পতিত হ'ল ভূমিতে, এবং তাতে জন্ম হ'ল ভরদ্বাজ ঋষির।

সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে গুরুদেব কি করবেন! তখন তিনি ভ্রাতৃজায়াকে বললেন

যে, "ভাজং ভর" অর্থাৎ এ দুজন থেকে জাত শিশুকে তুমি পালন কর। দুজন থেকে জাত মানে হ'ল, বাস্তুক্ষেত্রে অর্থাৎ পত্নীতে জন্মায় সন্তানে তাঁরও স্বত্ব থাকে।

বৃহস্পতির নিজের পত্নীকেই তো তাঁর শিষ্য চন্দ্র হরণ ক'রে নিয়ে বহুদিন কাছে রেখেছিলেন এবং তাঁরই গর্ভে বুধের জন্মও দিয়েছিলেন। কই, বৃহস্পতি সে পত্নী নিয়ে ঘর করতে কোন আপত্তি তো করেন নি! বরং উতলা হয়েছিলেন পত্নীর বিরহে।

শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত তো শিক্ষিত-সমাজমাত্রেরই অবিদিত থাকবার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের সত্যকাম সম্বন্ধীয় কবিতা যাঁরা পড়েছেন, জানতে পেরেছেন তারও জনকের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

যে শ্বেতকেতু একজন মস্ত বড় ব্রহ্মজ্ঞানী, মহাভারতে ও উপনিষদে যাঁর অশেষ প্রতিভার কথা উল্লিখিত আছে, তাঁর জন্ম হয় তাঁরই পিতা ঋষি উদ্দালকের আদেশক্রমে উদ্দালকের শিষ্যের ঔরসে। (ম-ভা, শা, ৩৪ অঃ) আদেশক্রমে গুরুপত্নী গমনেও পাপ হয় না।

এই শ্বেতকেতুরই পিতা একদিন আশ্রমে পত্নীপুত্রসহ ব'সে, এমন সময় শ্বেতকেতু দেখলেন কোন এক পথচারীর ইচ্ছাতে তাঁর গর্ভধারিণী চ'লে যাচ্ছেন তার সঙ্গে। ব্যাপার কি? শ্বেতকেতু প্রশ্ন করলেন পিতা উদ্দালককে।

মুনি বললেন, তোমার জননী ওই লোকটির কামনা পূরণার্থ চ'লে গেল। তুমি তাতে বিচলিত হ'য়ো না। ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীরা স্বেচ্ছা ব্যবহারেও দোষভাগিনী হয় না। তুমি জান না, মহর্ষি বশিষ্ঠও কল্মাষপাদপত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেছিলেন। (ম-ভা, আ ১২২ অঃ)

দীর্ঘতমা অন্ধ হ'য়ে ছিলেন ব'লে তাঁর পত্নী সব সময় তাঁকে গঞ্জনা দিতেন। অবশেষে একদিন পুত্রদের আদেশ দিলেন যে, তোমাদের পিতাকে বেঁধে নদীর জলে নিক্ষেপ কর।

অন্ধ দীর্ঘতমা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে ভেসে গিয়ে উঠলেন অন্য এক রাজার অধিকারে। সেখানকার রাজা বলিরাজ ঋষিকে সাদর-অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যান নিজের ঘরে এবং অনুরোধ করেন তাঁর পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্ম দিয়ে যেন তাঁর অপুত্রকত্ব ঘোচান।

প্রথমে রাজপত্নী স্বয়ং না এসে মুনির কাছে পাঠিয়ে দিলেন নিজের দাসীকে। মুনির ঔরসে দাসীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে এগারোটি ছেলে হয়। পরে আবার রাজমহিষীও এই মুনির কাছ থেকে পাঁচজন সন্তান লাভ করেন। (ম-ভা, আ, ১০৪ অঃ)

পরশুরাম যখন পৃথিবী একরূপ ক্ষত্রশূন্য ক'রে ফেললেন, ক্ষত্রিয়-রমণীরা তখন

আশ্রমে গিয়ে ঋষিদের কাছ থেকে ঋতু রক্ষা ক'রে আসতেন। তাঁর ফলে আবার কালে ক্ষত্রিয় জাতি উঠল গ'ড়ে। (ম-ভা, আঃ, ৬৪ অঃ)

পাণ্ডু যখন কুন্তীকে অনুরোধ করলেন অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদনের জন্য, কুন্তী তখন নারাজ হন। পাণ্ডু তখন বুঝিয়ে বললেন যে, ভীত হচ্ছ কেন? মেয়েরা শতপুরুষ-সংসর্গেও পাপলিপ্ত হয় না। তারা চির-পবিত্রা। তোমার ভয় করবার কিছু নেই।

প্রমাণস্বরূপ বললেন, শরদণ্ডায়ন-পত্নীও পুত্রের জন্য অন্য ব্রাহ্মণের সহযোগ করেছিলেন। (ম-ভা, আ, ১২০ অঃ)

সেই কুন্তীই আবার কুমারী অবস্থায় যখন দুর্বাসা-প্রদত্ত মন্ত্রের পরীক্ষা করতে গিয়ে সূর্যের সম্মুখীন হন, সূর্যদেব বার বার তাঁর সঙ্গ কামনা করলে কুন্তী অপবাদ ও পাপ-ভয়ে বার বার সূর্যদেবকে নিবারিত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। সূর্যদেব তখন অভয় দিয়ে বললেন, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, মেয়েরা যতদিন কন্যা অবস্থায় থাকে ততদিন তারা স্বতন্ত্রা। যথাভিলষিত পুরুষকে তারা দেহ দান করতে পারে। তাতে তাদের কন্যাত্ব নষ্ট হয় না। কারুর অনুমতিরও এখানে প্রয়োজন নেই। (ম-ভা, বন, ৩০৬ অঃ)

মহাভারতের আদিপর্বের ১৯৬ অধ্যায়ে দেখা যায়, জটিলা নাম্নী গৌতমবংশীয়া এক কন্যা সাতজন ঋষিকে পর পর বিয়ে করেন। এবং বার্ক্ষি নামে মুনি-কন্যা বিয়ে করেন দশজন প্রচেতাকে এককালে।

এমনি কত দৃষ্টান্ত যে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। যদিও কালের ডাকে যখন মানবতা এমনিতেই জেগে ওঠে, কোন প্রমাণ বা নজিরের অপেক্ষা তখন করে না। তবু যারা একান্ত ভ্রান্ত সংস্কারের ঘোঁয়াটে আবহাওয়ার মধ্যে পথ খুঁজে পায় না, বুঝতে পারে না, কি সত্য কি মিথ্যে, মিথ্যে পাপ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে সত্যের অপলাপ করে, তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্যে এ সবের দরকার হয়। তারা বুঝুক, যাঁদের রচিত ও প্রবর্তিত শাস্ত্র আচার ও ধর্মের দোহাই তারা দেয়, তাঁরা কি করেছেন।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা আচরণ করেন, সাধারণও তার অনুসরণ করে—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি (গীতা)। যা শিষ্টজন-গর্হিত নয় তাই যখন আচার ও ধর্ম, তখন সাধারণ লোকের এসব নজির দেখলেই সহজে তাদের ভ্রমনিরসন সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। মিথ্যে পাপের ভয় আর তাদের থাকে না।

আমার এসব নজির খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে কেউ যেন ভুল ধারণা পোষণ না করেন। আমার এ সকল নজির দেওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমাদের সব মেয়েরা স্বেচ্ছাচারকে বাধ্যতামূলকভাবে বরণ ক'রে নিক। আর আমার নজিরগুলির মধ্যে স্বৈরাচারের প্রমাণও কিছু পাওয়া যাবে না; এখানে পাওয়া যাবে, সমাজ, দেশ বা জাতির

কল্যাণার্থে প্রয়োজন হ'লে নারীরা যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, তাতে দোষে লিপ্ত হতে হয় না।

আজ আমাদের নারীকুলের যে শোচনীয় লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় নিয়ে অপমানের দুর্বহ বেদনাকে বুকে বহন ক'রে ম্রিয়মাণা হতে হয়েছে, তাদের আমাদের সাদরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আমাদের মধ্যে। আবার দিতে হবে তাদের স্ব স্ব অধিকার সমাজের মধ্যিখানে। যদি কেউ মনে করেন যে, তথাকথিত ব্যভিচারদোষদুষ্টা, অতএব পতিতাদের নিয়ে ঘর করলে নিজেকে নরকে যেতে হবে, পবিত্রকুলের মুখে কালিমা লাগবে, ইহকাল-পরকাল নষ্ট হবে, তাঁরা যেন সে ভ্রান্ত ধারণাকে একদম ধুয়ে মুছে ফেলে দেন অন্তর থেকে। স্বেচ্ছায় পুরুষান্তরসংসর্গেও যদি দোষ না বর্তে, নিরপরাধ দস্যু কর্তৃক বলপূর্বক অপহৃতা বা ধর্ষিতা বেচারী মেয়েরা কেন দোষে লিপ্ত হবে— এ কথাটুকুও কি কাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী

মহারাজ

"তখনো রাত আঁধার আছে, বেজে উঠল ভেরি,
কে ফুকারে, 'জাগো সবাই, আর কোরো না দেরি।'
বক্ষ-'পরে দুহাত চেপে আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে, 'রাজার ধ্বজা হেরি।'
আমরা জেগে উঠে ব'লি, 'আর তবে নয় দেরি।'

কোথায় আলো, কোথায় মালা, কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল, কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দুয়েকজনে কহে কানে, 'বৃথা এ ক্রন্দন,
রিক্তকরে শূন্য ঘরে করো অভ্যর্থন।'

ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা।
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে, বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,—
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা।"

—রবীন্দ্রনাথ

অগ্নি

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭

সি. আই. ডি. দারোগা আবার এলেন।

আর বোধ হয় আপনাকে বাঁচাতে পারলাম না মশায়।

অংশুমান রোজ যেমন থাকে, আজও তেমনই চুপ ক'রে রইল।

আপনি চুপ ক'রে আছেন, কিন্তু আর কেউ চুপ ক'রে নেই। সবাই আপনার নাম বলছে।

আড়চোখে চাইলেন একবার অংশুমানের দিকে, তারপর পানের ডিবে বার ক'রে চার-পাঁচ খিলি পান কুপকুপ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

আসুন।

আমি তো খাই না জানেন।

আরে, নিন না মশাই, এক খিলি খেয়েই দেখুন না। চমৎকার মিঠে পান, খাসা লাগবে। নিন, লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, আপনি এক খিলি পান খেতে পারছেন না?

অংশুমান চুপ ক'রে রইল।

আচ্ছা, পান না নিলেন, আসল কথাটা ব'লে ফেলুন দিকি। আমার কথাটি শুনুন, যা জানেন ব'লে ফেলুন সব। ব'লে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ ঢেকে রাখতে পারবেন না তো কিছু। আপনার বন্ধুরাই ব'লে দেবে সব। দিচ্ছেও। ধরাও পড়েছে অনেকে।

অংশুমান নীরব।

বলবেন না কিছু?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

দারোগা সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবার একটু।

আপনি মনে করছেন, আপনি খুব দেশের কাজ করছেন। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানেন? দেশই আপনার উচ্ছন্ন যাবে। গবর্মেণ্টের সঙ্গে বেশি চালাকি চলে না। রেল-লাইন উপড়ে, টেলিগ্রাফের তার কেটে, পোস্টাফিস পুড়িয়ে কতক্ষণ জব্দ করবেন আপনি গবর্মেণ্টকে, যখন তাদের হাতে হাজার হাজার এরোপ্লেন আর বোমা রয়েছে? মেরে ধুনে দেবে সব। অতও করতে হবে না, চাবুকের চোটেই সিধে হয়ে যাবে। প্রতি গ্রাম থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স

আদায় হচ্ছে, গোরা সোল্‌জার দেখেই পেচ্ছাপ ক'রে ফেলছে অধিকাংশ লোক, আপামরভদ্র হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পায়ের তলায়। তারপর কন্ট্রোলের যে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে শুনলাম, তাতে একটি লোক খেতে পাবে না, পরতে পাবে না, প্রয়োজনীয় কোন জিনিস পাবে না আর। এক মুঠো চালের জন্তে, এক টুকরো কাপড়ের জন্তে হন্তে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হবে সবাইকে এই গর্বমেণ্টেরই দ্বারে দ্বারে। আর এসব কেন হবে জানেন? আপনাদের মত ত্যাঁদড় লোকেদের একগুঁয়েমির জন্তে। আপনাদের কি ক'রে শায়েস্তা করতে হয় তা গর্বমেণ্ট জানে, মাঝ থেকে কতকগুলো নিরীহ লোক মারা যাবে।

উঠে গিয়ে একবার পিক ফেললেন। তারপর অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে ব'লে ফেলুন যে, হীট অব দি মোমেণ্টে ক'রে ফেলেছিলাম, মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সামলে-সুমলে নেব সব। ছাড়া পেয়ে যাবেন। সব্‌ছিটা নিন দয়া ক'রে।

আর এক খিলি পান খেলেন।

অংশুমান নীরব।

যা জানেন, অকপটে ব'লে ফেলুন সব। কেন কচলাচ্ছেন মিছে?

আমি কিছু জানি না।

আচ্ছা লোক আপনি মশাই। ধন্ত! ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমনটি আর দেখি নি। মিছিমিছি কত লোককে কষ্ট দিচ্ছেন বলুন তো! আপনার বুড়ো বাবাকে পর্যন্ত ধ'রে নিয়ে গেছে, জানেন? মারধোর পর্যন্ত করছে নাকি।

অংশুমান চমকে উঠল।

বাবাকে ধরবার মানে?

মানে আপনিই।

আর একটু থেমে হেসে বললেন, আর আপনিই এর প্রতিকার করতে পারেন। সত্যি কথাটা বলতে দোষ কি?

অংশুমান নীরব। বাবার শীর্ণ মুখখানা চোখের উপর ভাসছিল তার। সত্যিই নিরীহ লোক। সারাজীবন কেরানীগিরি ক'রে সসংকোচে কাটিয়েছেন। চারটে মেয়ের বিয়ে দিতে আর অংশুমানকে পড়াতেই যথাসর্বস্ব গেছে। ধার

হয়েছে কিছু। আশা ছিল, অংশুমান এম. এস-সি. পাস ক'রে সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এম. এস-সি. সে পাস করেছে। কিন্তু সংসারের দুঃখ ঘুচল কি?

কি ঠিক করলেন?

বলেছি তো, আমি কিছু জানি না।

উঃ, সাংঘাতিক লোক আপনি! ডেন্‌জারাস। নিজেই কষ্ট পাবেন। আচ্ছা, এখন উঠি তবে। আবার আসব। সহজে হাল ছাড়বার লোক আমি নই। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। সংসারটাকে এমন ক'রে ডুবিয়ে দেবেন না, বুঝলেন, ভেবে দেখুন।

চ'লে গেলেন।

নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল অংশুমান।

৮

কখনও ফুলের উপর বসছে, কখনও পাতার উপর, কখনও বেড়ার শুকনো কঞ্চির ডগায়। ব'সেই উড়ছে আবার। চঞ্চল একদল প্রজাপতি। এক মুহূর্ত স্থির নয়, পাগলের মত উড়ে বেড়াচ্ছে খালি। নানা রঙের। সূর্যালোকের রঙগুলো হঠাৎ যেন স্বাতন্ত্র্য-লাভ করেছে এই নির্জন প্রান্তরে। স্পর্শ ক'রে বেড়াচ্ছে সব-কিছু মনের আনন্দে। শিয়ালকাঁটার কণ্টকপল্লবকে মহিমান্বিত ক'রে সোনার বরণ যে ফুলগুলি ফুটেছে, তারা যেন উপভোগ করছে খামখেয়ালী প্রজাপতিদের এই হুড়োহুড়ি। অপরূপ হাসি ফুটেছে তাদের মুখে। কুহু-কুহু কুহু-কুহু কলকণ্ঠে বাহবা দিয়ে উঠল যেন কোকিলটা। বসছে উড়ছে, বসছে উড়ছে—বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। বিচিত্রপক্ষ কতকগুলো খেয়াল মাতামাতি ক'রে বেড়াচ্ছে দুপুরের রোদে।···

চিরকালই করে।

৯

অন্ধকার।

অসংখ্য ক্ষুধিত পীড়িত অশিক্ষিত স্বার্থপর ধূর্ত মিথ্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বিলাস-লোলুপ, কামনা-ক্লিষ্ট আতুর জনতা···হিমালয় থেকে কুমারীকা, গুজরাট থেকে আসাম,···কোথাও বাদ নেই। অথচ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই দেশ, রামায়ণ মহাভারত জাতক গীতা এই দেশেরই কাব্য, মহত্ত্বই এ দেশের মেরুদণ্ড, পরার্থপরতাই জীবন-মন্ত্র। সেই দেশের এ কি দুর্দশা! আকাশচারী বিহঙ্গম আফিঙের নেশায় অভিভূত, পিঞ্জর-বন্দনা করছে মধুরকণ্ঠে। নাদিরশাহ

তৈমুরলঙ বহু ভারতবাসীকে হত্যা করেছিল, বহু বিদেশী দস্যু বহুবার লুণ্ঠন ক'রে গেছে ভারতকে, কিন্তু এমন নিঃস্ব আমরা কখনও হই নি। আজ আমাদের মনুষ্যত্ব নেই, আদর্শ লাঞ্ছিত, বিবেক মোহগ্রস্ত। যে পদাঘাতে আমাদের সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, সেই পদই লেহন ক'রে চলেছি সগৌরবে ওই দারোগাটাও আমাদের দেশের লোক!...

উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উঠে বসল অংশুমান। মনে হ'ল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে বাবার মুখটা মনে পড়ল আবার। মারধোর করছে? ওই নিরীহ বৃদ্ধকে মারতে হাত উঠছে কার? আমাদেরই দেশের লোকের, আবার কার? পাঞ্জাবে জালিওয়ানবালাবাগ হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবীরাই সবচেয়ে বেশি রাজভক্ত। বাংলা দেশ শ্মশান হয়ে গেল, কিন্তু বাঙালীরাই গোয়েন্দাগিরিতে আজও সবচেয়ে বেশি দক্ষ। ঘরে ঘরে বিশ্বাসঘাতক, কাউকে বিশ্বাস নেই। না, কাউকে না। কিন্তু সত্যি কি কোনও উপায় নেই? আছে, নিশ্চয় আছে। কোথায় ত্রাণকর্তা, কোথায় তুমি?—আর্তনাদ ক'রে উঠল অংশুমান।

ধীরে ধীরে কারা-প্রাচীরে মূর্ত হয়ে উঠল এক অশ্বারোহী-মূর্তি; কৃপাণধারী দিব্যকান্তি পুরুষ। অশ্বটি বড় জীর্ণশীর্ণ। কৃপাণটিও মরচে-ধরা। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন অংশুমানের দিকে। প্রত্যাশা-ভরা প্রদীপ্ত দৃষ্টি। অংশুমানের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। মুখে ভাষা ফুটল অনেকক্ষণ পরে।

আপনি কে?

আমি? চিনতে পারছ না?

অংশুমান চেনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অথচ অচেনাও নয়, কোথায় যেন...

তোমাদেরই সৃষ্টি আমি। যুগে যুগে তোমরাই সৃষ্টি করেছ আমাকে নানা রূপে। তোমাদের সৃজনীশক্তির মধ্যেই আমার অস্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে কূর্ম মৎস্য বরাহ অবতারে। নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছি, বলির গর্ব আমিই চূর্ণ করেছি একদিন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলকে আমারই পরশু নির্মূল করেছিল, দশমুণ্ড রাবণকে আমিই সংহার করেছি একদা, কুরুক্ষেত্র প্রকম্পিত হয়েছিল একদা আমারই পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে, কংস-জরাসন্ধকে আমিই বধ করেছি, আবার অহিংসার বাণী আমিই প্রচার করেছি

বৃদ্ধরূপে। আমারই চিরন্তন আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়েছে তোমাদের কবির রচনায়।—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কিন্তু তোমাদের পুরুষকারই আমাকে সম্ভব করে। আমি আজও তোমাদের কাছে কল্পনামাত্র, তাই আমার অশ্ব:জীর্ণশীর্ণ, কৃপাণ তীক্ষ্ণতাহীন।

অংশুমান সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অশ্বটির দিকে। সত্যিই বড় রুগ্ন। তার মনের কথা টের পেয়ে সেই দিব্যকান্তি পুরুষ আবার বললেন, আমার অশ্ব রুগ্ন নয়, ক্ষুধিত। সামান্য ভূমির শস্যে এর পুষ্টি হয় না।

কোন ভূমির শস্য চাই তা হ'লে?

তাজা প্রাণের রক্ত যে ভূমিতে সার সিঞ্চন করেছে, সেই ভূমির শস্য চাই এই দেবদত্ত অশ্বকে সঞ্জীবিত রাখবার জন্যে। বিদেশীর চর্বিত নানা ইজম্ গলাধঃকরণ ক'রে যে পুরীষ তোমরা সৃষ্টি করছ, তাও একপ্রকার সার বটে, কিন্তু সে সারে উৎপন্ন ফসল আমার অশ্ব স্পর্শ করে না, তাই সে দুর্বল। আমার কৃপাণও তাই অতীক্ষ্ণ। ধৈর্যের কঠিন প্রস্তরে সবল হস্তে শান দিয়ে আমার হস্তে এ কৃপাণ তুলে দেবে যে, কোথায় সেই বীরপুরুষ? তাকেই অন্বেষণ করছি। তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি কারা থেকে কারান্তরে। আমি জানি, কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই তার তপস্যা,…বন্দিনী জননীর কোলে আমিও জন্মলাভ করেছিলাম একদিন এই কারাগারেই।

বলুন, কে আপনি?

আমি তোমাদের অসমাপ্ত কল্কি অবতারের কল্পনা।—মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

আবার অন্ধকার।…

তোমাদেরই পুরুষকার আমাকে সম্ভব করে—ধীরে ধীরে এই কথাগুলো মূর্ত হয়ে সকৌতুকে চেয়ে রইল যেন তার দিকে। কি রকম পুরুষকার চাই? জ্ঞান হয়ে থেকে একদিনও তো অলস হয়ে ব'সে থাকে নি সে। ভাল হব, বড় হব, দেশকে ভাল করব, বড় করব—এই সাধনাই তো করেছে অহরহ। তবু কিছু হবে না?

হবেই। নিশ্চয় হবে। সমস্ত জীবনকে ইন্ধন করেছে, আগুন জ্বলবে না তা কি হতে পারে কখনও? জ্বলবেই।

সবিস্ময়ে অংশুমান চেয়ে রইল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্বয়ং বিবেকানন্দ সামনে দাঁড়িয়ে।

এক টুকরো চকমকির মধ্যেও আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে; আঘাত করলেই তা ছিটকে বেরিয়ে আসে। আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'য়ো না।

সহসা অন্তর্ধান করলেন।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার।

অংশুমানের সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হ'ল, বিবেকানন্দের এই বাণী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে প্রচার করা উচিত তারস্বরে "আঘাত কর, আঘাত কর, ক্রমাগত আঘাত ক'রে যাও, ব্যর্থতায় হতাশ হ'য়ো না।"

সহসা উঠে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল সে, বন্ধ দরজায় প্রত্যাহত হয়ে নতুন ক'রে আবার মনে পড়ল যে, সে বন্দী। বন্দী! তা হ'লে? মনের মধ্যে যত কথা জ'মে উঠেছে, তা কি কোন দিন বলা হবে না কাউকে? এই চারটে দেওয়ালের মাঝখানে তা চাপা থেকে যাবে চিরকাল? সমস্ত ছাপিয়ে এই দুঃখটাই তার মনে বড় হয়ে উঠল, চাপা থেকে যাবে সব। যা ভাবলাম, যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা বাইরে আর প্রকাশ করতে পারব না হয়তো জীবনে। বাইরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে চিরকালের মত।

একটা কথা শুনলে বোধহয় আশ্বস্ত হবে—যোগসূত্র কখনও ছিন্ন হয় না, ছিন্ন করা যায় না। আমরাই প্রথমে এর আভাস পেয়ে প্রমাণ করেছিলাম। তারপর আরও অনেকে করেছেন পরে আরও ভালভাবে।

অংশুমান দেখলে, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। সকলেরই ছবি দেখেছিল, সককেই চিনতে পারলে সে। ওয়াট্‌সন, সাল্‌ভা, সোমেরিং, ষ্টিন্‌হীল, মর্স, লিওসে, হাইটন···। সবাই স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে।

"আগে সকলের ধারণা ছিল যে, তার না থাকলে বুঝি বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে না। আমরা কিন্তু হাতে কলমে প্রমাণ করেছিলাম যে, মাটি এবং জলও বিদ্যুৎতরঙ্গ বহন করতে পারে। এরই জোরে টেলিগ্রাফ তৈরি করেছিলাম আমরা সেকালে। সফলও যে হয়েছিলাম, তা তো

পড়েছ। তারের অভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি যেমন আটকায় না, প্রচার করবার মত সত্যি যদি কোনও জোরালো বাণী থাকে তোমার, জেলের দেওয়ালও তা আটকাতে পারবে না। অদ্ভুত উপায়ে অদৃশ্য পথে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনে গিয়ে পৌঁছবেই।"

একটু হেসে ওয়াট্সন চ'লে গেলেন। যাবার সময় হাইটনকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে গেলেন। ভাবটা তোমার বক্তব্যটা এইবার ব'লে ফেল। হাইটন এগিয়ে এসে একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, যখন অক্ষর সৃষ্টি হয় নি, তখনও মানুষ জ্ঞানের চর্চা করত। তাদের জ্ঞানের ধারা কি অবলুপ্ত হয়েছে? তোমাদের বেদ উপনিষদ বেঁচে রইল কি ক'রে?

সান্‌ভা বললেন, অম্বরা তোমার মনের কথা টের পেয়েছিল কি ক'রে? মুখ ফুটে তাকে বল নি তো কোনদিন কিছু!

পেয়েছিল নাকি?—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল অংশুমানের।

সমস্বরে হেসে উঠলেন সবাই। তারপর চ'লে গেলেন সবাই একযোগে।

অন্ধকার······

বিনা তারে বার্তাবহনের আকাঙ্ক্ষা বৈজ্ঞানিকের মনে জেগেছিল তারের অযোগ্যতা দেখে। মানুষ দ্রুত সুনিশ্চিত-ভাবে বার্তা পাঠাতে চায়, অব্যাহত হবে তার গতি···তারের সে ক্ষমতা ছিল না।

মনে ছবির পর ছবি ফুটতে লাগল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। রাত্রিকাল। মর্স নদীর ভিতর এক মাইল লম্বা মোটা একটা ইন্‌স্যুলেটেড তার ফেলেছেন এই প্রমাণ করবার জন্যে যে, জলের ভিতরও তারযোগে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করা সম্ভব। রাত্রে তারটা জলে ফেলে এলেন, সকালে দেখাবেন সকলকে। পরদিন বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নদীর ধারে মর্সের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দেখবার জন্যে। জলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আসবে! রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। বিদ্যুৎতরঙ্গ একবার একটু এল, তারপর আর এল না। অনেক চেষ্টা করলেন মর্স, কিন্তু আর সাড়া পাওয়া গেল না। হো-হো ক'রে হেসে উঠল সবাই। যত সব আজগুবি কাণ্ড! এই পাগলটার পাল্লায় প'ড়ে সমস্ত সকলটাই মাটি। ঠাট্টায় বিদ্রূপে হাসিতে কলরবে পূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। মুখ কালো ক'রে ব'সে রইলেন মর্স যন্ত্রটার দিকে চেয়ে। কি হ'ল? এল না কেন? হৈ-হৈ করতে করতে জনতা ছত্রভঙ্গ

হ'ল। মর্স বেরুলেন কারণ অনুসন্ধান করতে। কারণ পাওয়া গেল কিছুদূর গিয়েই। একটা নৌকা নঙর তোলবার সময় তারটাকে টেনে তুলেছিল, তারপর সেটার আদি-অন্ত না পেয়ে তা থেকে প্রায় দুশো ফিট কেটে নিয়ে স'রে পড়েছিল। মর্স ভাবলেন, এত বড় লম্বা তার জলের তলায় রাখলে এ রকম নানা দুর্ঘটনা অহরহই ঘটবে। তার সুতরাং চলবে না। জলকেই করতে হবে বৈদ্যুতিক বাণীর বাহক। মর্সের জীবন-কাহিনী মনে পড়ল অংশুমানের। কিছুতেই নিরস্ত হন নি। প্রথম জীবনে হতে চেয়েছিলেন চিত্রকর। ওয়াড্স্ওয়ার্থ-সাদে-ল্যাম্বের বন্ধু বিখ্যাত মার্কিন চিত্রশিল্পী অ্যাল্স্টনের শিষ্য ছিলেন তিনি। ডেথ অব হার্কিউলিস ছবিখানা এঁকে নামও হয়েছিল। কিন্তু পেট ভরল না তাতে। 'দি জাজমেণ্ট অব জুপিটার' ছবিখানার ক্রেতাই জোটে নি এক বছর। সক্রিয় মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। বিজ্ঞানচর্চায় মেতে উঠলেন। নূতন ধরনের পাম্প ক'রে ফেললেন একটা, মিনিটে ৩৬০ গ্যালন জল তুলতে পারে। পেটেণ্ট করলেন সেটা। পেট ভরল। তারপর আকৃষ্ট হলেন ইলেক্‌ট্রিসিটির দিকে। অবাক হয়ে গেলেন এর বিচিত্র সম্ভাবনায়। একবার এক জাহাজে আসতে আসতে একজন আরোহীর মুখে শুনলেন যে, যতদূরই হোক না কেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিমেষেই নীত হয়, তখনই তাঁর মনে হ'ল, তা হ'লে এই তরঙ্গযোগে নিমেষের মধ্যে খবরই বা পাঠানো যাবে না কেন? সাঙ্কেতিক শব্দ সৃষ্টি করলেই যাবে। জাহাজেই তাঁর মাথায় এল ডট্ আর ড্যাসের কথা।...মর্সের টেলিগ্রাফিক কোড আজ বিশ্ববিখ্যাত। যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর হতে পারতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁকে হতে হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। মানুষ যা হতে চায়, তা হতে পারে না। অংশুমান আশ্বস্ত হ'ল যেন একটু। মনের মধ্যে একটা সংশয় কাঁটার মত খচখচ করছিল। বারম্বার মনে হচ্ছিল, সামান্য কেরানীর ছেলে আমি, আমার কি উচিত ছিল না লেখাপড়া শেষ ক'রে সংসারের ভার নেওয়া? বাবার বুকের-রক্ত-জল-করা পয়সায় লেখাপড়া শিখেছি, কি প্রতিদান দিলাম তাঁকে? পুলিসের হাতে মার খাচ্ছেন আমার জন্যে...পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ?... হঠাৎ মর্সের মুখখানা ফুটে উঠল চোখের সামনে। মুখময় বলি-রেখা, অধরে বিষণ্ণ হাসি।

হ্যাঁ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ। গাছের ফল যখন স্বপ্ন দেখে যে আকাশে

উড়ে যাব, তখন মাধ্যাকর্ষণের কথাটা সে ভুলে যায়। এ ছাড়া তোমার অন্য গতি ছিল না।

মিলিয়ে গেল মুখখানা।

অংশুমানের মনে প্রশ্ন জাগছিল একটা। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে ফল মাটিতে নেমে আসে, তার ভবিষ্যৎ সার্থক হয় ওই মাটিতেই, অঙ্কুরিত বীজের নব নব উন্মেষে। আমার এই অসমসাহসিকতার কি ভবিষ্যৎ আছে কোনও? এই স্বেচ্ছাবৃত কৃচ্ছ্রসাধন···। আবার ছবি ফুটে উঠল একটা। পিঠে কাপড়ের বোঝা, হাতে বই—চলেছে বালক লিণ্ড্‌সে। গরিব চাষার ছেলে, তাঁতীর কাজ শিখছে। তাঁত-বোনা শেখে, কাপড়ের বোঝা পিঠে ক'রে দোকানে দিয়ে আসে। স্কুলে যাবার সঙ্গতি নেই। অধ্যয়নস্পৃহা কিন্তু প্রবল। পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতে বই পড়ছে···গ্রাম্য মেঠো পথ বেয়ে তন্ময় হয়ে চলেছে লিণ্ড্‌সে। কিছুতেই দমবে না। ছুটিতে কাজ ক'রে, ট্যুশনি ক'রে কত কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলে বাইশ বছর বয়সে। শেষ করলে আর্ট কোর্স—তারপর থিয়োলজি পড়লে—তারপর বিজ্ঞান। কখনও থামে নি, দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি···।

লিণ্ড্‌সে সশরীরে এসে সামনে দাঁড়ালেন। চোখ মুখ দেখে মনে হয় না যে, অতবড় বিদ্বান। সর্বদাই যেন ভীত সঙ্কুচিত হয়ে আছেন, যেন কিছু জানেন না। কথা বলতেও ইতস্তত করছেন, পাছে বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলেন এই ভয়। অংশুমানের দিকে চকিতে একবার চেয়ে দেখলেন, ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ল কয়েকবার, তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, তোমার মত আমিও একদিন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। দ্বিধা নয়, ত্রিধাই বলতে পার। ইলেকট্রিসিটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম যে, এর তিনটে সম্ভাবনা আছে। প্রথম, এর শক্তি দিয়ে নানারকম কাজ করানো সম্ভব—এ চাকা ঘোরাতে পারে, ভারী জিনিস তুলতে পারে। দ্বিতীয়, সংবাদ বহন করতে পারে। তৃতীয়, আলো দিতে পারে। আমি কোন্‌টা নিয়ে গবেষণা শুরু করব, তা ঠিক করতে পারি নি প্রথমে। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে ঠিক করলাম—আলো। যে আলো হাওয়ায় নিববে না, ঝড়ে কাঁপবে না, তারই সন্ধান করতে হবে সকলের আগে। কেন আমার এ ইচ্ছে হয়েছিল জানি না। আলোক-প্রবণতা বোধ হয় মানব-মনের আদিমতম এবং আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য···।

চুপ করলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটু। ভাণ্ডি জেলের কয়েদীদের পড়াতাম। অনেক কাল পড়িয়েছি। সেখানেও দেখেছি, মানুষের মন আলোর সন্ধান করছে কেবল। আমার একটি ছাত্র বেশ কৃতী হয়েছিল। তারও ঝোঁক হ'ল আলোর দিকে। জ্যোতিষ-বিস্তায়। অন্ধকার জেলে বছরের পর বছর কাটিয়েছে যে, সে তন্ময় হয়ে গেল আকাশের সূর্য-তারার স্বপ্নে। তুমিও বোধ হয় আলোর স্বপ্ন দেখছ। এই ব'লে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন লিওসে।

আলো!

লক্ষ কোটি সূর্য-তারকা-বিদ্যুৎ-বিস্ফুরিত এক মহাকাশ ধীরে ধীরে মূর্ত হয়ে উঠল অংশুমানের মানসদৃষ্টির সম্মুখে।

আলোর অর্থ অন্ধকারও হতে পারে: অত্যুগ্র-আলোক-বিভ্রান্ত যে মন অন্ধকার-কামনায় আলো নিবিয়ে দিতে চাইছে, সেও এক হিসাবে আলোরই উপাসক। আলো মানে বিদ্রোহ···। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ঘুঁড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে পৃথিবীর বিদ্যুতের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করছিলাম, তখন আসলে আমি দূরত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলাম। মানুষ বিদ্রোহী জীব···সে ওলটাতে চায় এবং ওলটাতে পারে।

নুমিস এসে এই কথাগুলো ব'লে দাঁড়িয়ে রইলেন উদ্ধত ভঙ্গীতে একটা প্রত্যুত্তরের আশায়। অংশুমান কিছু বলবার পূর্বেই আবার বললেন, তুমিও পারবে। চিন্নার আপ,—ব'লেই মিলিয়ে গেলেন।

১০

কমরেড মীনা দত্ত

সুচরিতাসু,

ভাই মীনু, এতদিন আমার চিঠি না পেয়ে আশ্চর্য হচ্ছ হয়তো। অনেক আগেই আমার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, সময় ক'রে উঠতে পারি নি। ঘণ্টা মিনিট যে সময়ের মাপকাঠি, সে সময় আমার প্রচুর ছিল, আমি ডেপুটি-গৃহিণী, ছেলে-পিলে হয় নি, চাকর বামুন আছে, স্বামী টুরে টুরে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং সময় বলতে সাধারণত যা বোঝায়, তা আমার যথেষ্ট। সময় ছিল না মনের, যে মন তোমার চিঠির জবাব দেবে। আগস্ট-ডিসেম্বরের তুমুল তুফানে সমস্ত মন এমন বিপর্যস্ত হয়েছিল যে, চুল বাঁধবার অবসর পর্যন্ত ছিল না। অথচ

আমি প্রত্যক্ষভাবে ওতে যোগ দিই নি। ডেপুটি গৃহিণীর ওসবে যোগ দেবার উপায় নেই। আমাদের প্রতিবেশী অংশুমানবাবুর সঙ্গে ভাসা-ভাসা আলাপ করেছি খালি সংযত ভাষায়, কিন্তু পরোক্ষলোকে আমার মন অলস হয়ে ব'সে থাকে নি। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করছিল, ওই অংশুমানবাবুরই কার্যকলাপ। মুগ্ধ হয়ে গেছি তার বীরত্ব দেখে, মনে মনে প্রণাম করেছি তাকে শতবার। এখন সে জেলে। সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেবার অবসর হয়েছে। অবসর পেলেও এর আগে এমন ক'রে জবাব দিতে পারতাম না, কারণ জবাবটা নিজের কাছে এখন যতটা স্পষ্ট হয়েছে, আগে ততটা ছিল না। সুতরাং আশা করছি, তোমাকে বোঝাতে পারব।

তোমাদের দলে যতদিন ছিলাম, ততদিন বুঝি নি, এখন কিন্তু ভাল ক'রে বুঝতে পারছি যে, আমার অন্তত কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা ছিল দেশ-প্রেম নয়, আত্ম-প্রেম। ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করার যে মুখস্থ বুলি আওড়াতাম, তা পরশ্রীকাতরতার তাড়নায় প্রোলিটারিয়েটদের প্রতি বেদনা-বোধের তীব্রতায় নয়। 'মাদার রাশিয়া'তে যেসব আত্মত্যাগী যুবক-যুবতী কিশোর-কিশোরীদের কথা পড়েছি, আমাদের মধ্যে তাদের মত যারা আছে (আছে নিশ্চয়ই, যদিও আমার চোখে পড়ে নি), তারা কই আমাদের দলে যোগ দেয় নি তো! আমার বিশ্বাস, আজকাল এই যে দলে দলে ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা, কমিউনিস্ট হচ্ছে, ওটা ফ্যাশানের খাতিরে, কমিউনিজ্‌মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ততটা নয়। এটা বর্তমান যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা অনিবার্য ফল বলতে পার। আমাদের ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, মেয়েরা অবিবাহিত। অথচ তারা বুলি কপচাতে শিখেছে। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাই না। আমরা ডিগ্রী লাভ ক'রেই কুলীন। আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির তোয়াক্কা রাখি না। উদর-সর্বস্ব স্বার্থপর বণিক-সভ্যতার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাদের কাছে আত্মবিক্রয় ক'রে যে পাঠ নিয়েছি, তার মূলমন্ত্র স্বার্থপরতা। আমাদের ঘরে ঘরে বেকার ছেলে আর অবিবাহিত মেয়ের দল এই শিক্ষা পেয়ে অসন্তুষ্টির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এতদিন। কারণ এই শিক্ষার ফলে বেচারাদের লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে ষোল আনা, অথচ তা চরিতার্থ করবার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গুণে ছেলেরা উপার্জন করতে পারে না, সমাজ-ব্যবস্থার গুণে মেয়েদের বর জোটে না। দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তবু

যেসব ছেলে উপার্জন করতে পেরেছে বা যেসব মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাদের সৌভাগ্যে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া অধিকাংশ বঞ্চিতদের অন্য কোন উপায় ছিল না এতদিন। বিদ্রোহী রাশিয়ার জলন্ত দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে এখন তারা সেই পরশ্রীকাতরতার গায়ে লেনিন-স্টালিনের বড় বড় নাম জুড়ে দিয়েছে। জোর-গলায় ব'লে বেড়াচ্ছে, যাদের তোমরা এতদিন বড়লোক ব'লে এসেছ, আমরা ধ'রে ফেলেছি, আসলে তারা ছোটলোক, তারা পুঁজিবাদী, এই দেখ কার্ল মার্ক্‌স্ ··

যে পরশ্রীকাতরতাটা প্রকাশ করতে আগে লোকে লজ্জিত হ'ত, একটা বড় নামের মুখোশ প'রে তাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করাটা গৌরবজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। কিন্তু ভেবে দেখ, ধনীমাত্রেই পাজি, শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই জুয়াচোর—এই নীতি প্রচার করা অন্য যে কোন দেশের পক্ষে শোভন হোক, ভারতবর্ষের পক্ষে নয়। যে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের গৌরব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, সেই ভারতবর্ষে ধনীমাত্রেই পাজি—এই মত প্রচার করতে যাওয়া কি লজ্জাকর! একটু যদি ভাল ক'রে ভেবে দেখ, হিন্দুধর্মই প্রকৃত স্বাধীনতার ধর্ম। প্রকৃত সাম্যবোধ আত্মাতুসন্ধী হিন্দুধর্মেই আছে, অন্য কোন ধর্মে নেই, কারণ সাম্যবোধ জিনিসটা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক পশু-জগতে ওর স্থান নেই। হিন্দুধর্মই একমাত্র ধর্ম, যে প্রত্যেক নরনারীর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রেরণাকে শ্রদ্ধা করেছে, বেয়নেট উঁচিয়ে বলে নি, তুমি এই ইজ্‌মে বিশ্বাস করবে কি না, যদি না কর, তা হ'লে তোমার বাঁচবার অধিকার নেই। এই সাম্যবোধই হিন্দু-ভারতবর্ষকে আধিভৌতিক জগতে দুর্বল করেছে হয়তো, সে নির্বিচারে ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হত্যা করতে পারে নি ব'লেই এদেশে এত ধর্ম-বৈচিত্র্য, এত মতানৈক্য। ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক একতা নেই, কারণ ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বহুর মধ্যে একতে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছে এবং তা করতে গিয়ে আধিভৌতিক জগতে জাতিহিসাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ আধিভৌতিক জগৎটা পশুর জগৎ। মানুষ যেখানে পশু, সেখানেই সে আধিভৌতিক জগতে বিচরণ করে, দেহের ক্ষুধা পাশবিক বাসনা মেটাবার জন্যে মারামারি কাটাকাটি করে, সাম্য-অসাম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, প্রয়োজনের তাগিদে শক্তির শরণাপন্ন হয়, কেড়ে খায়, দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করে। তুমি হয়তো বলবে, আধিভৌতিক জগৎটাও তো

আছে, ওটাকে তো অস্বীকার করলে চলবে না, বহু লোক দারিদ্র্যের চাপে ম'রে যাবে আর জনকতক ঐশ্বর্য ভোগ করবে, এ রকম সমাজব্যবস্থাই কি ভাল? কে বলছে, ভাল? আধিভৌতিক জগৎটা যে আছে, তা তো প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, অস্বীকার করব কি ক'রে? আমার আপত্তি ভণ্ডামিতে। ক্ষুধার আহার কামনার ইন্ধন সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি যখন, তখন আবার সাম্যের মুখোশ কেন? বিদ্যুতালোকিত সুসজ্জিত ঘরে ফ্যানের তলায় ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কিষাণদের দুঃখ, শ্রমিকদের কষ্ট নিয়ে অমুক দাদার সঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার ছবিটা যে আধুনিক পরিবেশে দুষ্মন্ত-শকুন্তলারই সাবেক ছবি, তা অস্বীকার ক'রে যে ভণ্ডামিটাকে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি, তাতেই আমার আপত্তি। মাছের লোভে ছিপ ঘাড়ে ক'রে টোপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে আবার সাম্যের আস্ফালন কেন? দীনের দুঃখে সত্যিই যারা বিচলিত হয়, তারা অত স্বার্থপর হয় না, হতে পারে না। নিঃস্বার্থপর ত্যাগী কমিউনিস্ট যে নেই তা আমি বলছি না, অনেক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের দলটির যে ছবি দেখেছি তা শ্রদ্ধেয় সাম্যবাদীর ছবি নয়। কমিউনিজ্‌ম জিনিসটা যে খারাপ, তাও আমার বক্তব্য নয়। সাময়িক প্রয়োজনে যুগে যুগে ওর উদ্ভব হয়েছে নানা রূপে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশ অনুসারে ওর চেহারাও হয়েছে নানা রকম। বঙ্গদেশে গোপালদেবের আমলে কিংবা আরও পূর্বে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, তার পরবর্তী যুগেও যে দীর্ঘকালব্যাপী কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়েছিল, তা মূলত বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান বিদ্রোহেরই পূর্বসংস্করণ। যা একটু তফাত, তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য। কমিউনিজ্‌ম যে অতি-আধুনিক অভূতপূর্ব একটা কিছু, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। মানবের ইতিহাসে এ জিনিস বার বার ঘটেছে ও ঘটবে। সুতরাং কেউ তোমাদের পার্টি পরিত্যাগ করলে বা তোমাদের কথায় সায় না দিলেই তোমরা যে তাকে প্রগতি-বিরোধী সেকেলে রিঅ্যাকশনারি প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর, সেটা যুক্তি-সহ আচরণ নয়। তা ছাড়া আর একটা কথাও তোমরা ভুলে যাও, সেকেলে হতেই বা দোষ কি, যখন মনুষ্যত্বের দিকে দিয়ে একাল সেকালের চেয়ে এক পাও এগোয় নি।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। সে দুর্দশা ঘোচাবার

চালাচ্ছে ওই শ্রমিকদেরই উপর, কিষাণদের কাছ থেকে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করছেন তিনি। গুজব—শীঘ্রই রায় সাহেব হবেন নাকি কর্মপটুতার জন্য। তুমিও তাঁর ভক্ত ছিলে একজন, সেদিন তোমার এক তাড়া চিঠি আবিষ্কার করলাম তাঁর ড্রয়ার থেকে। এখনও তুমি তাঁকে ভক্তি করতে পারছ কি না জানি না (শুনেছি, ভক্তির বিশুদ্ধতা নির্ভর করে ভক্তের একনিষ্ঠার উপর, ভক্তিভাজনের গুণাগুণের উপর নয়), আমি কিন্তু আর পারছি না। আত্ম-আবিষ্কার ক'রে নিজেরই উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। ছি ছি, কি লজ্জা! এতদিন যেটাকে তরবারি ব'লে আস্ফালন করেছিলাম, দেখছি, তাতে খাঁটি ইস্পাতের নাম-গন্ধ নেই, ঝুটো বীরত্বের রাঙতা দিয়ে মোড়া বাঁখারি সেটা! অশ্রদ্ধায় আত্মগ্লানিতে ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।

...আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। মানুষের মন শ্রদ্ধা করবার জন্যে সতত উন্মুখ। দেহের ক্ষুধার মত এটিও একটা ক্ষুধা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে শ্রদ্ধেয়কে খুঁজে বেড়ায়। সমাজ বা শাস্ত্র যাদের শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যেমন পিতা মাতা বা স্বামী তাঁরা সত্যিই যদি শ্রদ্ধাস্পদ হন, তা হ'লে জীবন চরিতার্থ হয়ে যায়; কিন্তু যদি না হন, তা হ'লে মন ভুল করে না। সমাজ বা শাস্ত্রের শাসন মেনে আমরা লেবেল-মারা পূজনীয়দের প্রতি মৌখিক একটা শিষ্টাচার করি বটে, কিন্তু মনে মনে আমরা সন্ধান ক'রে বেড়াই সত্যিকার শ্রদ্ধেয়কে। নিরন্তর এই সন্ধান চলেছে। দেহের ক্ষুধার মত এও অনিবার্য। এর প্রেরণায় মন ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে, পুস্তক থেকে পুস্তকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরেও হয়তো।

অংশুমানবাবুকে দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ হবার কারণ আমার নিজের মধ্যেই ছিল। যে নিজে ভণ্ড, সে সত্যিকার ধার্মিককে প্রথমে চিনতে পারে না, ভণ্ড ব'লে মনে করে। তার নিজের দৃষ্টিই বক্র, মন স্বচ্ছ নয়, সে সহজে প্রসন্ন মনে কারও মহত্ত্ব স্বীকার করতে পারে না, নিজের ক্ষুদ্র চরিত্রের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে গিয়ে সকলকেই সে ছোট ক'রে ফেলে। অহঙ্কার-বশে ভাবতেই পারে না যে, কেউ তার চেয়ে বেশি ভাল হতে পারে। সত্য কিন্তু চাপা থাকে না বেশিদিন। অন্ধকারবিলাসী পেচককেও শেষ পর্যন্ত সূর্যের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। পেচক বিস্মিত হয় কি না জানি না, আমি কিন্তু হয়েছিলাম, ওইখানেই বোধ হয় আমি পেচকের চেয়ে বড়। পরে ভেবে

দেখলাম, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এরাই তো চিরন্তন অগ্রণী, সর্বকালে সর্বদেশে এরাই তো আদর্শের পতাকা বহন করেছে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সমস্ত সত্তা দিয়ে, আষাঢ়ের নবোদিত জলধরের মত আত্ম-বিসর্জন দিয়ে ধন্য করেছে পিপাসিত পৃথিবীকে। এরা বিশেষ কোন দেশেরও নয়। এরা কংগ্রেসে আছে, কমিউনিস্ট পার্টিতে আছে, হিন্দু-মহাসভায় আছে। প্রাণের আবেগটাই এদের কাছে মুখ্য, দলটা নয়। প্রাণের আবেগে যে কোনও একটা দলে নাম লিখিয়ে এরা প্রাণ পণ করে আদর্শ পালন করবার জন্য। আদর্শই এদের লক্ষ্য, দলটা উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক সময় কোনও দলে নাম লেখাবার প্রয়োজনও হয় না এদের। এ সবই জানতাম। তবু যখন আগস্ট-আন্দোলনের ঢেউ আলোড়িত ক'রে তুলল চতুর্দিক, বিক্ষুব্ধ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আক্ষেপে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল, দোষী নির্দোষ বিচার না ক'রে বেপরোয়া মিলিটারি গুলি যখন রক্তস্রোত বইয়ে দিলে দেশের বুকে, ইতরভদ্র সবাই যখন সন্ত্রস্ত—কখন কি হয়, আমাদেরই এই শহরে ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে পুলিস ঢুকে থামে-বাঁধা স্বামীর সামনে ধর্ষণ ক'রে গেল যখন তার স্ত্রীকে, বৃদ্ধ বাপকে মারতে মারতে অজ্ঞান ক'রে দিলে, লোকের ঘর-বাড়ি নীলাম ক'রে পিউনিটিভ ট্যাক্স আদায় করতে লাগল, তখন আমরা ঘরে খিল দিয়ে আরাম-কেদারায় ব'সে ব'সে 'রেন্‌বো' উপন্যাসে নাৎসি জার্মানির অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করতে করতে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, আর কিছু করি নি। যদিও আমাদের দলের অনেকে বড়াই ক'রে বেড়াচ্ছেন, 'অন প্রিন্সিপ্‌ল্‌' করি নি, আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করছি, করবার সাহস হয় নি। এসব নিয়ে বৈঠকখানায় ব'সে আলাপ করবার সাহস পর্যন্ত হয় নি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে। অন্তরঙ্গদের কাছে নিম্নকণ্ঠে আলাপ করবার আগেও বাইরে গিয়ে দেখে এসেছি, আশেপাশে কেউ আছে কি না। কলেজ-জীবনে যাঁর শ্রমিকদুঃখকাতরতার অন্ত ছিল না, প্রাক্তন কম্‌রেড আমার সেই স্বামী যখন সশস্ত্র মিলিটারি বাহিনী নিয়ে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত এবং আমি যখন ব্যস্ত সেই স্বামীর পরিচর্যায়, তখন বিস্মিত হলাম অংশুমানবাবুর কাণ্ড দেখে। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ব'লে মনে হ'ল ঘটনাটা। আমাদের বাড়ির সামনের মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে সভা ক'রে ওই মুখ-চোরা ছেলেটি ঘোষণা করলে—এর প্রতিশোধ আমরা নেব। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, এই হীন অপমান কিছুতেই সহ্য করব

না, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ করব যে, প্রাণের চেয়েও মান আমাদের কাছে বড়।

…আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখলাম—ওর চোখে মুখে অপূর্ব দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠেছে। কেন জানি না, হঠাৎ রাণা প্রতাপসিংহের কথা মনে প'ড়ে গেল। অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল নিজেকে।…

ওই একমাত্র লোক যার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতি নিয়ে চর্চা হ'ত, দেশের দুঃখ কষ্ট নিয়ে আলোচনা করতাম। আমাদের এ ধরনের আলোচনা যে কি রকম হয়, তা তোমার অজানা নেই নিশ্চয়। নিজেকে জাহির করবার আবেগে আত্মপ্রশংসার ফুলঝুরি কাটতে কাটিতে এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে, ওর নীরবতটা প্রথম প্রথম চোখেই পড়ত না। ও নীরবে ব'সে শুনত খালি। অমন একটা বিদ্বান ছেলে নীরবে আমার কথা শুনে যাচ্ছে বিনা প্রতিবাদে—যদিও এমন ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটে নি, কারণ ইতিপূর্বে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাদের মধ্যে শ্রোতা ছিল না, বক্তা ছিল সবাই—তবু ওর নীরবতা বিস্মিত করে নি আমাকে। মনে হ'ত, ওটা আমার প্রাপ্য। সূক্ষ্ম একটা গর্বও অনুভব করতাম। ওর সশ্রদ্ধ নীরবতার এ অর্থও আমি করেছিলাম, আহা, বেচারা বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষাই পাস করেছে খালি, দেশের কোনও খবর রাখে না, দেশের সম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করে নি বোধ হয়। দরিদ্র মজুর অসহায় কৃষকদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা হয় নি বেচারার, তাই আমার কথা শুনে তাক লেগে গেছে। ডেপুটি-গৃহিণী আমি, মনোহর শাড়ি ব্লাউজে সজ্জিত হয়ে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝনৎকার তুলে গদি-আঁটা সোফায় ব'সে বিলিতি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেশের দরিদ্র মজুর ও কৃষকদের মর্মস্পর্শী আলোচনা করতাম। ও চুপ ক'রে শুনত।

…তারপর এল আগস্ট-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পটভূমিকায় অংশুমানবাবুর স্বরূপ দেখে লজ্জায় ম'রে গেলাম। নিমেষে বুঝতে পারলাম, আমি চালিয়াৎ, ও কর্মী; আমি ভীরু, ও বীর; যে পুলিসের সম্বন্ধে কথা কইতে আমার গলার স্বর স্বতই খাটো হয়ে পড়ে, ও এগিয়ে যেতে পারে সেই পুলিসের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্য। ওতে আর আমাতে কত তফাত! মনে হ'ল, এ কথা ওরও নিশ্চয় অবিদিত নেই। না জানি মনে মনে কত হেসেছে

আমার লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনে! ওর সামনে দাঁড়াব কি ক'রে, এই সমস্যায় যখন আমি আকুল, ওই তখন একদিন এসে তার সমাধান ক'রে দিয়ে গেল।

...অন্ধকার রাত্রি। স্বামী টুরে বেরিয়ে গেছেন। কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। বন্দুক ঘাড়ে ক'রে মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিঃশব্দচরণে অংশুমান এসে দাঁড়াল। ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল, সেই ক্ষণনিবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে কি যে দেখলাম আমি, আমার সমস্ত চিত্ত বিকশিত হয়ে উঠল, মনে হ'ল, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, চরিতার্থ হয়েছি। তারপর স-সঙ্কোচে সে বললে, তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছি...। আমার এক দূরসম্পর্কের দাদা ওর সহপাঠী ছিল, তাই ও আমাকে 'তুমি' বলত। সেই সূত্রেই আলাপও হয়েছিল।

আমার কাছে? কি দরকার?

সত্যিই অবাক লাগছিল, ভয়ও হচ্ছিল একটু একটু।

যে কাজে নেবেছি, তাতে টাকার দরকার। কিছু দিতে পারবে তুমি? আমাদের অবস্থা তো জানই, কিছু টাকা পেলে সুবিধে হ'ত। পারবে দিতে?

সংসার-খরচের কয়েকটা টাকা মাত্র হাতে ছিল। টাকা কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়। সে টাকা কটা হাতছাড়া করবারও উপায় ছিল না, কারণ স্বামী টুরে, ব্যাঙ্ক বন্ধ। সংসার অচল হয়ে পড়বে। তবু কিন্তু এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছে হ'ল না। মনে হ'ল, হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের এই একমাত্র উপায়। উঠে গিয়ে দেরাজটা খুললাম। যে জড়োয়া গয়নাগুলো আমার প্রিয়তম সম্পত্তি ছিল, তার বাক্সটা বার ক'রে এনে দিলাম তার হাতে।

"টাকা নেই। এইগুলো নিলে যদি হয়, নিয়ে যাও।"

সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে আমার মুখের দিকে। তারপর বেরিয়ে চ'লে গেল। আর ফেরে নি।

এই ঘটনাটুকুর যে বৈজ্ঞানিক নির্যাস তুমি বার করবে তা আমি জানি, তবু তোমাকে সব কথা খুলে লিখলাম কেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি, তা হয়তো আমার পক্ষে অপমানজনক (মান-অপমানের প্রচলিত মানদণ্ড অনুসারে); তা হোক, তবু কোদালকে কোদাল বলতে আমি বাধ্য। নিজের এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না ভাই কিছুতেই। মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় আমার জীবনের

শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মনে হচ্ছে, এতদিনে নিজেকে ভারতবর্ষীয় নারী ব'লে পরিচয় দেবার সামান্য যোগ্যতা বোধ হয় অর্জন করলাম। তোমরা ইচ্ছে কর তো কম্‌রেড অন্তরার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পার।

...কিন্তু ভুল বুঝো না আমাকে। মনে ক'রো না যে, আমি কমিউনিজ্‌মের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন। যে সাম্যের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম, তোমাদের দলে তার অভাব দেখে সে দলের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছি, কিন্তু সাম্যের আদর্শ আমার ঠিক আছে। ওইটেই তো মানুষের চিরন্তন আদর্শ। তা ছাড়া কোন ইজ্‌মের উপরই আমার রাগ নেই, কারণ এটা বুঝেছি যে, সব নদীই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে মিশবে যদি তার গতি অব্যাহত থাকে। ইজ্‌মটা বাইরের জিনিস, আসল জিনিস মনুষ্যত্ব। আমরা অনেকেই বাইরের খোসাটার নকল ক'রে মরছি, অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের সাধনা করবার ধৈর্য আমাদের নেই—এইটেই আমার দুঃখ। চিরকালই আমরা এই ক'রে এসেছি। আর্যঋষিদের যজ্ঞক্রিয়া পাঁঠা-খাওয়া উৎসবে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধসঙ্ঘ পরিপূর্ণ করেছে অনাচারী শ্রমণ-শ্রমণীর দল, চৈতন্যের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ব্যভিচার হয়ে দাঁড়াল, মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনকে মূলধন ক'রে কতকগুলো খদ্দরধারী গুণ্ডা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে বেড়াচ্ছে। কমিউনিজ্‌মের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কাস্তে-হাতুড়ির লেবেল মেরে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা মনুষ্যত্ব-চর্চা নয়, আত্মবিনোদন। জীবনের বাঁধা-ধরা পথে চলবার সুযোগ কিংবা সামর্থ্য এদের অনেকের নেই, অধিকাংশই জীবনযুদ্ধে অকৃতী। বিয়ে করে নি, নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। বাবা, দাদা বা ওই জাতীয় কারও ঘাড়ে চ'ড়ে পরশ্রীকাতরতার বিষোদ্গীরণ ক'রে বেড়াচ্ছে কেবল এবং নিজেদের অক্ষমতার দৈন্যটাকে ঢাকতে চেষ্টা করছে কমিউনিজ্‌মের ঢক্কানিনাদে। বোঝে না যে, অশক্ত অসংযত ভণ্ড বা স্বার্থপর লোক গায়ে একটা লেবেল আঁটলেই লেনিন স্টালিন হয়ে ওঠে না। তার জন্যে সাধনা চাই, চরিত্রবল চাই। যে কোন একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া ফড়ফড় ক'রে কমিউনিজ্‌মের বুলি আওড়ায় যখন, তখন লজ্জা হয় আমার। কবে আমরা বুঝতে শিখব যে, শুধু বুলি আওড়ালেই সিদ্ধি হয় না। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকরণে অনেকেই এদেশে দাড়ি রেখে উপনিষদের বুলি আওড়ালে, কিন্তু তার ফল কি হয়েছে?...

এত দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা পেয়েছি একটি কথা ভেবে যে, অধিকাংশই মেকি হ'তে পারে; কিন্তু খাঁটি লোকও আছে। এরা আছে ব'লেই আশা আছে। ইতিহাসে এদের কাহিনী পড়েছি, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবে দেখেছি এদের দ্যুতিমান আবির্ভাব। এরা সংখ্যায় কম। তাতে ক্ষতি নেই, একটি সূর্যই অন্ধকার ধ্বংস করে। আর আমার বেশি কিছু বক্তব্য নেই। আশা করি, যা বললাম তার মধ্যেই তোমার চিঠির উত্তর পেয়েছ। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি তোমারই

অম্বরা

ক্রমশ

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

চৌকের এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিদিমণি আমাকে দূর থেকে ভাঙের দোকানটা দেখিয়ে বললে, চার পয়সা দিয়ে আমার জন্যে দু ভাঁড় শরবৎ কিনে নিয়ে আয় তো।

চার পয়সা দিয়ে দু ভাঁড় ভাঙের শরবৎ কিনে নিয়ে এলুম। দিদিমণি চোঁ-চোঁ ক'রে ভাঁড় দুটো নিঃশেষ ক'রে টপটপ ক'রে জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, আর দু ভাঁড় কিনে নিয়ে আয়।

আবার দু ভাঁড় শরবৎ কিনে নিয়ে এলুম। দিদিমণি আমাকে গাড়ির মধ্যে উঠে আসতে ব'লে গাড়োয়ানকে বললে, চল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। দিদিমণি একটা ভাঁড় আমাকে দিয়ে বললে, নে, খেয়ে ফেল্, কিচ্ছু হবে না।

এক চুমুকে শেষ ক'রে দিয়ে ভাঁড় বাইরে ফেলে দেওয়া গেল।

গাড়ি চলতে লাগল বড় গৈবির দিকে। কাশীতে এতদিন কাটিয়েছি, [illegible] রাজকুমারী, জয়া অথবা বাঙাল-মার কাছে কোনদিনই গৈবির নাম বা [illegible]র মাহাত্ম্য শুনি নি। দিদিমণির মুখেই প্রথম শুনলুম বড় গৈবি, ছোট [illegible]বির কথা। শুনলুম, বড় গৈবি অর্থাৎ আমরা যেখানে যাচ্ছি, সে স্থান নাকি [illegible]ন্যাসীদের মঠ। সেখানকার ইঁদারার জল নাকি খুবই উপকারী। ভরপেট

খাওয়ার পর এক গ্লাস সেই জল খেলে আধ-ঘণ্টার মধ্যে আবার খিদেয় পেট চনচন করতে থাকবে। নেশা করতে শেখার প্রথম অবস্থায় পেটে 'নৈশিয়' দ্রব্য পড়লেই বুদ্ধিটা প্রখর হয়ে ওঠে। সেই প্রাখর্যের প্রেরণায় আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে লাগল, সন্ন্যাসীদের আশ্রমে এমন হজমী পানির অস্তিত্ব গৃহীজনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক কিনা? কারণ গৃহস্থজনের ট্যাক শোষণ ক'রেই তো সন্ন্যাসীদের মঠাশ্রম পোষিত হয়।

দিদিমণি ব'লে চলল, কাশীর বড় বড় লোকেরা প্রতিদিন গাড়ি পাঠিয়ে এখান থেকে ঘড়া ঘড়া, জালা জালা জল নিয়ে যায়।

গাড়ি চলেছে আর সেই সঙ্গে দিদিমণি অনর্গল ব'কে চলেছে। দেখতে দেখতে তার চক্ষু দুটি ভাঙের প্রভাবে ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। এমনিতে সে একটু গম্ভীরাই ছিল, কিন্তু দেখলুম, সামান্য সামান্য কথায় সে খিলখিল ক'রে চেঁচিয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে, হাসি আর থামে না।

আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে হঠাৎ হাসি থামিয়ে নিজের জায়গা থেকে উঠে আমার পাশে ব'সে বললে, তুই বোধ হয় মনে করছিস, আমার নেশা হয়েছে! কিন্তু সত্যি বলছি তোকে, আমার কিচ্ছু হয় নি। আরে দূর, দু ভাঁড় ঐ বাজারের শরবৎ খেয়ে কি নেশা হয়! একদিন বাড়িতে দুধ দিয়ে বানাব 'খন। আরও এক ভাঁড় খেলে হ'ত।

পরবর্তী জীবনে অনেক পাকা নেশাখোরের মুখে এই উক্তি শুনেছি, এবং জেনেছি যে, নেশা হওয়ার এমন স্পষ্ট প্রমাণ আর নেই।

দিদিমণির কথার উত্তরে বললুম, না, আমি অন্য কথা ভাবছি।

কি ভাবছিস?

না, কিছু ভাবছি না।

এই যে বললি, অন্য কথা ভাবছিস!

এমনি বললুম।

দূর, তোরও নেশা হয়েছে।—ব'লে আমার পিঠে একটা কিল মেরে সে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

গাড়ি চলেছে, তারই তালে তালে অশ্বিনীতনয়যুগলের গলার ঘণ্টা ঝমঝম ক'রে বাজছে। শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে আমরা মাঠের রাস্তায় পড়েছি। দু ধারে জোয়ার, ভুট্টা কি আখের ক্ষেত জানি না, মাথা সমান উঁচু উঁচু গাছ

যতদূর চোখ যায় বিস্তৃত। তারই মধ্য দিয়ে সরু সর্পিল পথ বেয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। রাস্তায় বোধ হয় একহাত পুরু ধুলোর বিছানা। তার ফলে ভাড়াটে গাড়ির চক্রমুখরতা অনেক পরিমাণে সংযত হওয়ায় চোখে একটু তন্দ্রার ঘোরে এসে লাগতে লাগল।

গৈবিতে এসে গাড়ি দাঁড়াল। আমরা নেমে আশ্রমের ভেতরে ঢুকলুম। একটুখানি জায়গা গাছের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। সামান্ত দু-একটা চালাঘর কি কোঠাঘর, তা আজ ঠিক মনে পড়ছে না। সুন্দর শান্ত নির্জন পরিবেশ, কোনও গোলমাল নেই।

দিদিমণি অগ্রসর হতে হতে আবার বললে, এটা একটা মঠ, সন্ন্যাসীরা থাকে এখানে।

দিদিমণির পেছন পেছন একটা ইঁদারার ধারে গিয়ে পৌঁছলুম। দেখলুম, ইঁদারার বাঁধানো পাড়ে বোধ হয় দশ-বারোটা ইয়া-ইয়া জোয়ান ল্যাঙট প'রে ব'সে আছে। সেখানকার জল যে কি ভয়ঙ্কর রকমের হজমী, এদের চেহারা দেখলে সে সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দিদিমণিকে দেখবামাত্র তারা সকলেই উল্লসিত হয়ে সমস্বরে অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী সন্ন্যাসী অথবা পালোয়ান তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, আজ মনো-মায়ী এসেছে, আজ পেট ভ'রে মিঠাই খাব, আজ বরাত ভাল, ইত্যাদি।

লোকগুলোর চেহারা ও হালচাল দেখে জায়গাটাকে একটা কুস্তির আখড়া ব'লে মনে হতে লাগল।

দিদিমণি ইঁদারার পাড়ে বসতে বসতে বললে, বেশ তো, মিঠাই আনাও।

আমার কাছ থেকে হাতবাক্সটা নিয়ে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে সেই লোকটার হাতে দিয়ে দিদিমণি বললে, আর একদিন এসে তোমাদের ভরপেট মিঠাই খাওয়াব, আজ এতেই চালিয়ে নাও।

পরে শুনেছিলুম, তাঁদের এক-একজনেই দশ টাকার মেঠাই আড়ে মেরে দিতে পারেন।

যা হোক, লোকটা নোট হাতে পেয়ে সেই ল্যাঙট-পরা অবস্থাতেই শহরের দিকে ছুটল মিঠাইয়ের উদ্দেশে। নিকটবর্তী মেঠাইয়ের দোকান সেখান থেকে অন্তত চার মাইল দূর হবে।

আলাপচারী হতে লাগল, ও কেমন আছে, সে কেমন আছে? অমুককে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে এখন হরিদ্বারে আছে, অমুক নাসিকে গিয়েছে, ইত্যাদি।

একবার দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, বুটিটুটি ছানা হয়ে গিয়েছে বোধ হয়?

এক বৃদ্ধ বললে, হ্যাঁ, খাবি তুই?

দিদিমণি বললে, থাকলে একটু দিতে পার। না থাকলে নতুন ক'রে করবার দরকার নেই, চৌক থেকে আমি খেয়ে এসেছি।

লোকটা চেঁচিয়ে হুকুম করতেই বোধ হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস ভর্তি ভাঙের শরবৎ এসে উপস্থিত হ'ল। দিদিমণি একটি চুমুকে গেলাস নিঃশেষ ক'রে বললে, জল খাওয়াও।

আমার জীবনে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। যদিও পরে দেখেছি, বিশেষ দিনে ঘরে ঘরে মেয়েরা ভাঙ খেয়ে হুল্লোড় করছে। অবিশ্যি আধুনিক বাত্যায় পুরাকালের ভাঙ আর তেমন প্রশ্রয় পায় না। সেখানে এসে জুটেছেন বিলিতী মাল। সমস্ত ইন্দ্রিয় বজায় রেখে কর্তা যদি আরও কিছুদিন জীইয়ে রাখেন তো হয়তো অনেক কিছুই দেখতে হবে। তবে দুঃখ এই যে, শুধু এই নেশা করবার অপরাধেই মেয়েদের কাছে চিরজীবন অপরাধীই র'য়ে গেলুম।

একজন অল্পবয়সী সাধু ইঁদারা থেকে জল তুলে আমাদের খাওয়ালে। দিদিমণি বললে, পেট পুরে জল খা, এখানকার জল ভা'রি উপকারী।

জল পান করার পর আমার নেশাটা যেন আরও চ'ড়ে গেল। দিদিমণির কিন্তু কিছুই হ'ল না, সে সেই ন্যাঙট-পরা কুস্তিগীর অথবা সাধুদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে লাগল, আর আমি গুম হয়ে ব'সে তার রসাস্বাদন করতে লাগলুম।

কথাবার্তার মাঝখানে হঠাৎ সেই বৃদ্ধ একবার ব'লে উঠল, বাবাকে প্রণাম করবি নে?

নিশ্চয়ই।—ব'লে দিদিমণি উঠে তার সঙ্গে চ'লে গেল মঠের এক দিকে।

প্রায় দশ-পনেরো মিনিট বাদে দিদিমণি ফিরে আমার পাশে এসে বসল।

আবার কথাবার্তা গল্পগুজব শুরু হ'ল বটে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলুম, যেন তার কথাবার্তা অনেক পরিমাণে সংযত হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত ধীর ও সংযত ভাবে সে তাদের কথার উত্তর দিতে লাগল। নিজের দিক থেকে তার আর

কোনও প্রশ্নই নেই, দেবদর্শনে যেন তার অন্তরের সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গিয়েছে।

বেলা প'ড়ে এল। দিদিমণি বললে, এবার উঠি। আর একদিন তাড়াতাড়ি এসে অনেকক্ষণ থাকব।

কথাবার্তা অবিশ্যি বিশুদ্ধ হিন্দী-উর্দুতেই চলছিল। এরই মধ্যে একজন যুবক বললে, মনো-মায়ী কতদিন তোর ছেলেকে খাওয়াস নি মনে আছে?

দিদিমণি বললে, তুই তো আমার ছেলে ন'স, তুই হচ্ছিস আমার সতীনের ছেলে। তা না হ'লে, মা ম'লো কি বাঁচল তা আজ ছ মাসের মধ্যে একবার খোঁজ নিলি নে!

লোকটা বিমর্ষ হয়ে বললে, ছেলে কুপুত্র হ'লে মাতা কখনও কুমাতা হয় না। মাপ কর্ মনো-মায়া, এবারে তোর ঘরে গিয়ে ছ মাস থাকব।

দিদিমণি বললে, ছোটুকার ভারি ব্যারাম, তার খোঁজ রাখিস? সে বোধ হয় বাঁচবে না, তার সঙ্গেও তো একবার দেখা করা উচিত।

সে ব্যক্তি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে, কি করব মনো-মায়ী, মঠ ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় এ সময়ে একেবারেই নেই। পনেরো দিন বাদেই অমুক নাসিক থেকে ফিরে আসবে, সে এলেই তোর ওখানে চ'লে যাব।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমরা উঠি উঠি করছি, এমন সময় আমাদের গাড়োয়ান এসে বললে, সরু গলিতে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে তার গাড়ির একখানা চাকা ভেঙে গিয়েছে।

কি সর্বনাশ! তা হ'লে উপায় কি হবে? এখান থেকে লোকালয় যে পাঁচ মাইল দূরে!

গাড়োয়ান প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, আপনার যা খুশি করুন।

দিদিমণি তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। ঠিক হ'ল, সে ভাঙা গাড়িখানা এখানেই রেখে ঘোড়া দুটো নিয়ে চ'লে যাবে। কাল এসে গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে কিংবা এখানেই মেরামত ক'রে নেবে।

গাড়োয়ান তো ভাড়া নিয়ে চ'লে গেল। আমাদের আর ব'সে থাকা চলে না, বেরিয়ে পড়া গেল। মঠের সাধুরা কিছুদূর অবধি আমাদের এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল নিজেদের আস্তানায়।

সেদিন কি তিথি ছিল জানি না। কিছুক্ষণ ঘুটঘুটে অন্ধকারের পর আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা দিলে।

দিদিমণি চলেছে আগে স্থির মন্থর পদক্ষেপে। তার মাথা থেকে পা অবধি একখানা শাদা সালে আবৃত, সে চলেছে আগে, আমি হাত-বাক্স নিয়ে চলেছি তার পিছু পিছু। আমি লক্ষ্য করেছি, গৈবিতে সেই ঠাকুর প্রণাম ক'রে আসবার পর থেকে সে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে পড়েছে। আমার মনে হতে লাগল, তার সিদ্ধির নেশা বোধ হয় বেশ জমেছে। কারণ সিদ্ধি আমার দুশমন হ'লেও তার স্বভাব আমার অজ্ঞাত নয়। সে সময় সিদ্ধির নেশা সম্বন্ধে আমাদের মহলে একটা ছড়া প্রচলিত ছিল। ছড়াটা আজ সম্পূর্ণ মনে নেই, তবে তার ভাবটা ছিল এই যে, সিদ্ধির নেশার প্রথম অবস্থায় লোকে টিয়ে-পাখির মতন মুখর হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থায় প্যাঁচার মতন গম্ভীর হয়ে পড়ে।

দিদিমণির ওই গাম্ভীর্য দেখে সেই ছড়াটা মনে প'ড়ে আমার ভয়ানক হাসি পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট্ সরস্বতী চেপে বসলেন মাথায়। একটা রসিকতা করতে যাচ্ছি, এমন সময় কোথা থেকে একটা দমকা বাতাস এসে দু পাশের সেই ক্ষেতকে তোলপাড় করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হঠাৎ সেই নীরব, নিথর, নুয়ে-পড়া গাছগুলো সহস্র হাতে হাত-তালি দিয়ে হৈ-হৈ ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে একটা মধুর শিহরণ জাগিয়ে আমার সমস্ত প্রগল্‌ভতাকে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লে গেল, তারপরে সব স্থির।

দিদিমণি আগে চলেছে, সেই ধীর মন্থর পদবিক্ষেপে। ডান হাতে টিনের বাক্স ঝুলিয়ে নিয়ে আমি চলেছি পশ্চাতে, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে গিয়েছে। সেই স্তিমিত চন্দ্রালোকের আলো-আঁধারি আমার কাছে এক রহস্য ব'লে মনে হতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, ওই যে অবগুণ্ঠনবতী নারী চলেছে আমার সম্মুখে, সে রহস্যময়ী। দু পাশে এই যে ক্ষেতের গাছগুলো, যারা হঠাৎ অধীর হয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে উল্লাসে চীৎকার ক'রে আবার ধরণীর দিকে নুয়ে পড়ল, তারাও রহস্যময়। এই যে চন্দ্রালোক, এও এক রহস্য। আমি কে? কোথায় ছিলুম আমি? আমার জীবনের যে ধ্রুবতারা, হঠাৎ অন্য এক ব্যক্তির জীবনের সর্বস্ব হয়ে সে চ'লে গেল, সেও এক রহস্য। আমার মনে হতে লাগল, আমি যেন এই রহস্যের গভীরতম গভীরে ধীরে

ধীরে প্রবেশ করছি, নিজের ইচ্ছায় নয়, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কাজ শুধু টেনে নিয়ে যাওয়া আর আমার কাজ শুধু বিস্মিত হওয়া। বিস্ময়রসই জগতের একমাত্র রস। সমস্ত রসেরই অন্তরতম প্রদেশে আছে বিস্ময়। যে বিস্মিত হয় না, সেই অন্য রসে মজতে পারে।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেকেরও ওপর পথ চ'লে আমরা লোকালয়ে এসে পৌঁছলুম। সেখান থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ি ক'রে আমরা স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম।

বাড়ি যখন ফিরলুম, তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে একটু অগ্রসর হওয়ামাত্র আহিয়ার সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখামাত্র আহিয়া চীৎকার ক'রে এক অদ্ভুত ভাষায় কি বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আহিয়ার কথা শুনে দিদিমণি আঁতকে উঠে সেই ভাষাতেই তাকে কি বললে। দুজনের একজনের কথাও কিছুমাত্র বোধগম্য হ'ল না বটে, তবে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও সুরে বোধ হ'ল, বাড়িতে নিশ্চয় কিছু একটা হাঙ্গামা হয়েছে।

দিদিমণি আর বাক্যব্যয় না ক'রে শালখানা আহিয়ার গায়ে এক রকম ছুঁড়ে দিয়ে ছুটল বাড়ির ভেতর দিকে। আমিও ছুটলুম তার পেছনে। আহিয়া শাল সামলাতে সামলাতে তার সাধ্যমত দ্রুতপদে আসতে লাগল আমাদের পশ্চাতে।

আমার মনে হতে লাগল, নিশ্চয় বিশুদার কিছু হয়েছে। দিদিমণিও বিশুদার ঘরের দিকেই ছুটতে লাগল—কিন্তু আমাদের ঘরের কাছাকাছি এসেই বড়কর্তার গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম, হাঙ্গামাটা কি, ও হচ্ছে কোথায়। বুকের মধ্যে ধড়ফড় ক'রে উঠল, পরিতোষের কিছু হয় নি তো? হয়তো এতদিনের পরিকল্পিত 'জিন্দা গেড়ে' দেবার শুভকর্মটি আমাদের অনুপস্থিতিতে বড়কর্তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, খাটের বিছানাপত্র তছনছ হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এক ধারে বড়কর্তা পরিতোষের বুকে ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে তাকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে, তার হাতে উদ্যত বিছুয়া আর মুখ থেকে ছুটছে অশ্লীল গালাগালি ও থুতুর অবিশ্রান্ত নির্ঝর। আমরা যে তিনটে লোক হুমদাম ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম, সে জ্ঞান পর্যন্ত তার নেই।

দিদিমণি সেই অদ্ভুত ভাষায় চীৎকার ক'রে উঠতেই বড়কর্তা চমকে পরিতোষের বুক থেকে পা নামিয়ে আমাদের দিকে ফিরে চাইলে।

তারপরে উঠল কথার ঝড়। দুই পক্ষে সেই ভাষায় তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। আমি পরিতোষের কাছে যেতেই সে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। দেখলুম, তার কনুইয়ের কাছে ছোরার একটা খোঁচা লেগে দরদর ক'রে রক্ত ঝরছে।

ওদিকে দিদিমণি ও বড়কর্তার চীৎকার চলতে লাগল। তার সঙ্গে আহিম্নাও রীতিমত যোগ দিলে। চারদিক থেকে ঝি-চাকর ও পাহারাদারদের দল ছুটে এসে জমা হতে লাগল দরজার সুমুখে

সেই ঝগড়ার মধ্যেই আমি পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছিল রে?

পরিতোষ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, কি আবার হবে? ঘরে এসে গালাগালি দিতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বললে, ছোট্কার সঙ্গে তোর অত ভাব কিসের? ভালমানুষ পেয়ে বেশ দু-পয়সা হাতাচ্ছিস তো ওর কাছ থেকে?

আমার দোষের মধ্যে আমি বলেছিলুম, হ্যাঁ, পয়সা হাতিয়ে এবার এখানে একটা বাড়ি কিনব ঠিক করেছি

আর যায় কোথায়! ছোরা বের ক'রে বললে, আজ তোর শেষ দিন।

তোরা না এসে পড়লে ঠিক ছুরি বসিয়ে দিত।

পরিতোষ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, বাপ-মাকে দুঃখ দিয়ে চ'লে এসেছি, এসব তো হবেই।

কান্নার বেগ একটু সামলে পরিতোষ বলতে লাগল, রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খাব, কিন্তু এখানে আর নয়। তুই এখানে থাক্।

পরিতোষের মুখে সেই সব মর্মান্তিক কথা শুনে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। মনে হ'ল, সত্যিই তো! তার তো জীবনে কোনও দুঃখই ছিল না। বাপ-মা, ভাইবোন নিয়ে আনন্দেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল। এই অভাগ্যের জন্যই তো সে গৃহত্যাগ ক'রে অনিশ্চিত অদৃষ্টসাগরে জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছে!

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ঠিক বলেছিস। কালই আমরা এখান থেকে চ'লে যাব—দেখি, অদৃষ্টে আর কত দুঃখ লেখা আছে।

ওদিকে তখন বড়ে সাহেব ও দিদিমণি সেই অদ্ভুত ভাষা ছেড়ে আভিধানিক হিন্দীতে ঝগড়া শুরু করেছে। মাঝে মাঝে 'সড়া অণ্ডা'র মতন মাতৃভাষাতেও দু-চারটে বুকনি বেরিয়ে পড়ছে।

ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ একবার ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিদিমণি আমার দিকে তাকালে। বুঝতে পারলুম, ওই হাঙ্গামার মধ্যেও আমাদের কথাবার্তার অনেকখানিই তার শ্রুতিগোচর হয়েছে।

বড়কর্তা তখনও বকবক ক'রে ব'কে চলেছিল। আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিদিমণি বড়ে সাহেবকে হুকুম করলে, বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।

কথাটা শুনে বড়কর্তা এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষ বললে, এ কি তোর বাপের বাড়ি রে শালী যে, বেরিয়ে যেতে বলছিস?

একটা জিনিস আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য ক'রে আসছি যে, বাঙালী পুরুষ প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অবিশ্যি এজন্যে তাদের আমি দোষ দিই না। কারণ, সম্পর্কের তাল বজায় রেখে নারীজাতিকে মোক্ষমরূপে আহত করবার মতন বাক্যবাণ আমাদের মাতৃভাষায় নেই। মা, মাসী, পিসী, বোন, স্ত্রী, কন্যা, ভাগ্নীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এই অভাব বার বার অনুভব ক'রে কতবার যে ধর্মযুদ্ধে পরাভূত হয়েছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

বড়কর্তার কথা শুনে দিদিমণি একেবারে স্থির কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল। আহিয়া চেঁচিয়ে বড়কর্তাকে কি সব বলতে লাগল, কিন্তু সে তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। হঠাৎ দৃপ্ত ভঙ্গীতে স্থির, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে দিদিমণি বললে, আমার বাপের বাড়ি হ'লে এটা তোমারও বাপের বাড়ি হ'ত। কিন্তু এটা আমার নিজের বাড়ি—আমার পয়সায় আমার নামে এ বাড়ি কেনা হয়েছে। এঁখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে পাহারাদারদের দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় বের ক'রে দেব। খবরদার, আর এখানে কখনও আসবে না। শয়তান! ছোটলোক!

দিদিমণির কথা শুনে বড়কর্তা একেবারে দ'মে গেল। হাতে খোলা বিছুয়া, ঘাড় নীচু ক'রে ধীর পদক্ষেপে দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ ফিরে বললে, যাদের জন্যে তুই আমাকে এতখানি অপমান করলি, তাদের একটাকে আজ শেষ ক'রে দিয়ে যাব।

কি সর্বনাশ! জয় বাবা বিশ্বনাথ!

বড়কর্তা ছোরা তুলে আমাদের দিকে তেড়ে আসতেই দিদিমণি দু হাত তুলে বিকট চীৎকার ক'রে মাঝখানে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বড়কর্তার বিছুয়া তার বাঁ হাতের তর্জনীটা প্রায় দুখানা ক'রে দিলে।

ইত্যবসরে আমরা ছুটে ছাতে বেরিয়ে গিয়ে পাহারাদারদের হাত থেকে লম্বা লাঠিঠা কেড়ে নিয়ে দাঁড়ালুম। উদ্দেশ্য, ঘর থেকে বেরুলেই এক লাঠিতে বড়কর্তার মাথাটি দু ফাঁক ক'রে দেব।

আহত হয়ে দিদিমণি চীৎকার ক'রে ঘুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আহিয়ার মড়াকান্নায় পাড়া উঠল কেঁপে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে খ'সে লাঠিখানা সশব্দে প'ড়ে গেল।

দরজার মুখে এতক্ষণ যত ঝি চাকর দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কলরব করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চেঁচামেচি শুনে বিশুদা তার লাঠির ওপরে ভর দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এসে উপস্থিত হ'ল। দেখলুম, বড়কর্তা ছোরাখানা খাপের মধ্যে পুরে সেটাকে কোমরে গুঁজে ভিড় ঠেলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। বিশুদা দিদিমণির মাথার কাছে বিষন্ন মুখে ব'সে আছে, আহিয়া ছেঁড়া নেকড়া দিয়ে দিদিমণির আঙুলটা বাঁধবার চেষ্টা করছে, দেখলুম, আঙুলটা নড়নড় করছে।

সে রাত্রে বাবুজী বাড়িতে ফিরে আহিয়া ও চাকরবাকরদের মুখে সব শুনে, দিদিমণির ক্ষত সেলাই ক'রে হাতের কবজি অবধি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে হাতখানা গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে বললেন।

বাড়িতে অতবড় একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্যই করলেন না, শুধু পরিতোষকে আদর ক'রে বললেন, তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা, এসব আমারই দোষ।

সে রাত্রে আমাদের ঘরেই ঢালা বিছানা ক'রে দিদিমণি বিশুদা আহিয়া-ও আমরা সব শুয়ে পড়লুম, শুধু বাবুজী নিজের ঘরে চ'লে গেলেন।

শেষরাত্রে একবার ওঠবার দরকার হয়েছিল। উঠে দেখলুম, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, দিদিমণি তখনও জেগে রয়েছে, অদ্ভুত একরকম উদাস দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাইতে লাগল।

ছাত থেকে ঘুরে এসে তার পাশে এসে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে মনে হ'ল, খুব জ্বর হয়েছে।

বললুম, ঘুমোও নি ?

ঘুম আসছে না।

জ্বরে কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

ও কিছু না, কালই সেরে যাবে। ছোট্‌কার গায়ে রেজাইটা ভাল ক'রে চাপা দিয়ে তুই শুয়ে পড়্‌।

বিশুদার গায়ে লেপটা ভাল ক'রে চাপা দিয়ে আবার দিদিমণির শিয়রে এসে বসলুম। দিদিমণি একটা হাত উঁচু ক'রে আমায় ঘাড় ধ'রে মুখটা তার মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কানে কানে বললে, আমার ওপরে খুব রাগ হয়েছে তোদের, না ?

কিছু না।—ব'লে তার কপালে ও চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম, তারপর ক্লান্ত হয়ে নিজেই কখন তার মাথার কাছে শুয়ে পড়লুম মনে নেই।

ভোর হতে না হতে ঘুম ভেঙে গেল।

বোধ হয় দিন পনেরোর মধ্যেই দিদিমণি চাঙ্গা হয়ে উঠল। শুধু বাঁ হাতের তর্জনীটা একটু বেঁকে রইল মাত্র। আবার পুরোনো দিনের মতন সেই শেষরাত্রে উঠে স্নান ও সারাদিন ধ'রে সংসারের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

পদচিহ্ন

আঠারো

নবগ্রামের আশপাশের পল্লীসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কায়স্থ সদ্গোপ এবং অন্যান্য বর্ণের হিন্দুপল্লীগুলি বিস্ময়ে বিচলিত হ'ল। মুসলমানপল্লীগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারের সংস্রব না থাকলেও তারা বললে, বাবুরা কেরেস্তানি কাণ্ড করলে এটা। তারা কিছুটা বিস্মিত হ'ল। নবগ্রামের মধ্যেও আলোড়নের অন্ত ছিল না। সমাজের যারা প্রধান ব্যক্তি, তারাই যদি ধর্মবিরোধী সমাজপ্রচলিতবিধিবিরোধী আচরণ করে, তবে সে সমাজের রক্ষা কোথায় ?

একা রাধাকান্ত নয়, রাধাকান্তের পরই স্বর্ণবাবু এবং তাঁর পরই গোপীচন্দ্র বিলাত-ফেরত রায়চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছেন। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে উত্তরোত্তর তাঁকে সমাদরের সমারোহ বৃদ্ধি পেয়েছে। গোপীচন্দ্র তাঁকে রূপোর বাসনে খেতে দিয়েছেন। কেমন ক'রে নবগ্রামে এ ব্যাপারটা ঘটল, সে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু এর মধ্যে যে একটা উদারতার প্রতিযোগিতা আছে, সেটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এর মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা বা স্বার্থেরও কোন সংস্থান ছিল না। রায়চৌধুরী বিলেত থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে এসেছেন এবং ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে এসেছেন। আই. সি. এস. এমন কি ব্যারিষ্টার হয়ে এলেও মামলা-মকদ্দমায় আসক্ত এই বিষয়ী ব্যক্তিগুলির তাঁকে সমাদরের মধ্যে একটা স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় আবিষ্কার করা যেত। রায়চৌধুরীবংশ এককালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে এ অঞ্চলে রাজ উপাধিধারী ভূস্বামী ছিলেন। নবাবী আমলেই তাঁদের পতন হয় নবাবের রোষবহ্নির প্রকোপে। তারপরও অবশ্য তাঁদের সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল ক্রমে কালে কালে বংশবৃদ্ধিহেতু শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে রায়চৌধুরীবংশের অনেকে দরিদ্র গৃহস্থে পরিণত হন। জ্ঞানদা রায়-চৌধুরীর বাপ রাধাকান্তের বাপের ওকালতি-সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করেছিলেন এক সময়। জ্ঞানদা চৌধুরী ছিলেন তীক্ষ্ণধী ছেলে। তিনি বহুকষ্টে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে বৃত্তি পেয়ে কলকাতায় পড়তে যান। সেইখানে মহীয়সী অ্যানি বেসান্তের সুনজরে প'ড়ে রায়চৌধুরীর অদৃষ্টে পরিবর্তন ঘটে। তিনিই তাঁকে ইংলণ্ড পাঠান। সেখানে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর রায়চৌধুরী অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে ইউরোপ এবং আমেরিকায় কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে দেশে ফিরেছেন। তিনি বিবাহও করেছেন একজন অ্যামেরিকান মহিলাকে। দেশে ফিরে তিনি স্বগ্রামে আসেন। রায়চৌধুরীবংশের এখনও অন্ধকার যুগ চলছে সর্বদিক দিয়ে। অবস্থার অস্বচ্ছলতা, শিক্ষার বিমুখতা—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে এক ধর্ম তৈরি ক'রে ব'সে আছেন গতিশীল জীবনের সঙ্গে সংস্রবহীন হয়ে। এই অবস্থায় জ্ঞানদার সহোদরও তাঁকে বাড়িতে স্থান দিতে সাহস করেন নাই। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরে যাবার, কিন্তু নবগ্রামের অবস্থার কথা শুনে তিনি এখানে না এসে পারেন নাই। স্বর্ণবাবুর পিতা ছিলেন রায়চৌধুরীবংশের দৌহিত্র, সেই সূত্রেই তাঁদের গ্রামের জমিদারির একটা অংশের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তারপর অবশ্য তিনি দীন অবস্থায় উপনীত মাতামহবংশের কয়েকজন শরিকের কাছে তাঁদের জমিদারী স্বত্ব কিনে তরফ ন-আনির ষোল আনারই মালিক হয়েছিলেন। সুতরাং রায়চৌধুরীরা স্বর্ণবাবুদের জমিদার এবং আত্মীয় দুই হিসেবেই মেনে আসছেন। স্বর্ণবাবুরাও যথাসাধ্য উভয় সম্বন্ধেরই মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলেছেন। সেই সূত্রেই তিনি প্রথম এসে ওঠেন স্বর্ণবাবুর ওখানে। স্বর্ণবাবু তখন ছিলেন সদরে। সংবাদটা শুনে তিনি বিব্রত হলেন।

বিলাত-ফেরত, তার উপর মেম বিবাহ করেছে জ্ঞানদা চৌধুরী। প্রথমেই মনের মধ্যে আশ্চর্যভাবে ভেসে উঠল গোপীচন্দ্রের মুখ, তারপর মনে হ'ল কীর্তিচন্দ্রকে, তারপর সুলোচন এবং সমগ্র সরকারবংশীয়দের; রাধাকান্তকেও মনে হ'ল। আজই তিনি রাধাকান্তকে ব্রাহ্ম ব'লে শ্লেষ করেছেন। আরও একটা বিচিত্র মনোভাব মনে জেগে উঠে মুখখানাকে ঈষৎ বক্র ক'রে তুলল, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হ'ল। বিলাত-ফেরতদের কথায়-বার্তায় ভাবে-ভঙ্গীতে এমন একটা অবজ্ঞার ভাব আছে, যা তাঁর অসহ্য মনে হয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিষ্টারদের কাছে প্রত্যেকবার এই ভাব তিনি অনুভব করেছেন। সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা নিরুপায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর মহালের অধিবাসী একজনের কাছে সেই অবজ্ঞা সহ্য করতে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করলেন। তিনি ব'লে দিলেন গিয়ে বল, তাঁর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি শুয়ে আছেন, বাইরে আসতে পারছেন না। তবে—। একটু থেমে বললেন, তবে আপনি থাকুন এখানে। বিশ্রাম করুন। মুখহাত ধোয়ার জল দাও গিয়ে।

উত্তর শুনে রায়চৌধুরী ক্ষুব্ধ হলেন তিনি যে গাড়িতে এসেছিলেন, সেই গাড়িতেই সাত মাইল দূরবর্তী রেলষ্টেশনে যাবার জন্য উঠলেন। সেই মুহূর্তেই রাধাকান্ত গোপীচন্দ্রের ফুলডাঙা থেকে ফিরছেন। তিনি রায়চৌধুরীকে চিনতে পারেন নাই। রায়চৌধুরীই কিন্তু চিনলেন। বললেন, কি রাধাকান্তবাবু, চিনতে পার?

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, অত্যন্ত পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু—। তিনি অপরাধীর মতই নীরবে সত্যকে স্বীকার ক'রে নিলেন।

আমি জ্ঞানদাশঙ্কর রায়চৌধুরী। তোমার সঙ্গে জেলা-ইস্কুলে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

জ্ঞানদা? তুমি এখানে কখন ভাই? তিনি সাদরে এসে তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন।

জ্ঞানদ বাবু বললেন, বিলেত-ফেরত ছুঁলে চান করতে হবে না তো?

হা-হা ক'রে হেসে উঠে রাধাকান্ত বললেন, বিলেতের সাহেবদের সেলাম ঠুকে আমাদের কপালে কড়া প'ড়ে গেল ভাই, বিলেত এখন আমাদের দেবলোক, সেই দেবলোক-ফেরত তুমি; তোমাকে স্পর্শ করা তো পুণ্য।

পরমুহূর্তে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল, বললেন, ও কথাটা রহস্য ক'রে বললাম নাই। আর কি সেদিন আছে, না থাকা উচিত? আজ তো আমাদের দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁরা তো প্রায় সকলেই বিলেত-ফেরত। আজ তাঁদের কথাতেই তো আমাদের চোখ ফুটছে। আবার তাঁর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটল, বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠল কণ্ঠস্বরে, বললেন, ছেলেবেলায় লেখাপড়াকে অবহেলা করেছিলাম। ইংরিজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েও হারিয়েছি আমার নিজেরই কর্মদোষে জ্ঞানদা। তবে আমাদের

শাস্ত্রেও পরম বস্তুর অভাব নাই। পরমহংসদেব তো ইংরিজী জানতেন না, কিন্তু তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ জগৎধর্মসভায় হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন ক'রে যে বক্তৃতা দিলেন, সে তো নিজেই স্বীকার করেছেন সে তাঁর গুরুদেবের কৃপায়। সবই তাঁর ব'লে দেওয়া কথা। তাঁরই আদর্শেই তো তিনি মুচি-মেথর-চণ্ডালকে আপন ভাই, আপন রক্ত ব'লে মনে করতে উপদেশ দিয়েছেন। সবই তো তাঁর এই শাস্ত্র থেকে পাওয়া। আমরা মেনে উঠতে পারি না, সংস্কারে লাগে। তোমার সঙ্গে পংক্তিভোজন করতে হয়তো পারব না ভাই, কিন্তু তুমি যদি আমার বাড়ি এস, তবে অতিথি হিসেবে মহামাননীয় ব্যক্তির মত সমাদর করব। তোমার উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করতেও আমার আপত্তি হবে না। তাতেও আমি স্নান করব না। এইটুকু তোমাকে বলতে পারি ভাই।

মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রায়চৌধুরী বললেন, চল, আজ তোমার বাড়িতেই থাকব আমি। ভেবেছিলাম, এই গাড়িতেই ফিরে যাব রেলস্টেশনে ; কিন্তু না, তোমার আতিথ্যের লোভ সামলাতে পারছি না। গাড়িখানার গরু দুটোও ক্লান্ত হয়েছে।

এস এস। এ আমার মহাসৌভাগ্য ভাই।

চলতে চলতে রায়চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, তুমি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েছ সব ?

সব নয়। কিছু কিছু পড়েছি। ভাল লাগে অমৃতের মত। কিন্তু কি তার জানলা, হৃদয় করতে পারি না। তারপর হেসে বললেন, তুমি বিলেত-ফেরত হ'লেও প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বংশের ছেলে। তোমার পূর্বপুরুষ রাজা জীবনরাম শুধু রাজাই ছিলেন না, মহাতান্ত্রিকও ছিলেন। সেই সাধনা তোমাদের বংশে কুলাচার হিসেবে আজও চলছে। তুমি তো জান, তন্ত্রে মদকে বলে সুধা, তন্ত্রমতে শোধন ক'রে নিতে পারলে মদ সুধা হয়। আমরাও তান্ত্রিক, কিন্তু সাধনার অভাবে মন্ত্রতন্ত্র সব ব্যর্থ হয়ে যায়, মদ সুধা হয় না, কারণ করার নামে মদ খেয়ে আমরা মাতাল হই। তাই আর কি !

রায়চৌধুরী বললেন, বড় আনন্দ পেলাম ভাই তোমার কথায়। ছেলেবেলায় ক্লাসে তুমি ফার্স্ট হ'তে, তবল প্রোমোশন নিয়ে আমাদের চেয়ে ওপরের ক্লাসে চ'লে গেলে। লেখাপড়া না ছাড়লে তুমি এদিক দিয়ে কৃতবিদ্য হতে পারতে। কিন্তু সে যতই ক্ষতি তোমার হয়ে থাক, তুমি শাস্ত্রচর্চা ক'রে তার পূরণ করেছ। তুমি ভাই, মদটা ছেড়ে দাও।

হাসলেন বাবাকান্ত। বললেন, বাবার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মদ খাব না, তখন আমার আঠারো বছর বয়স। প্রচুর মদ খেয়ে একদিন একটা বোঝাই গরুর গাড়ির সামনে উপুড় হয়ে প'ড়ে গেলাম, গাড়িটাকে আটকাতে পারলে না গাড়োয়ান, বোঝাই গাড়িটা পিঠের ওপর দিয়ে চ'লে গেল। সঙ্গে যারা ছিল, তারা ভাবলে, আমি ম'রে গিয়েছি। ছুটে পালাল। আমি মিনিট কয়েক পরেই সামলে উঠে বাড়ি এলাম।

বাবা পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন। তারপর বাবাই দীক্ষা দেওয়ালেন—তান্ত্রিক দীক্ষা। বললেন, কুলগুরুর আদেশ, আমার আদেশের চেয়েও বড়। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। পরিমিত, শাস্ত্রসম্মত কারণ করতে আবার আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। শাস্ত্রসম্মত ছাড়া অকারণ মদ্যপানে আমার নিষেধ রইল। এর পরেও কি তুমি মনে কর, মদ ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর? মদ্যাসক্তি আমার গ্রহনক্ষত্রের ফলও বলতে পার, অদৃষ্টের নির্দেশও বলতে পার। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র তাই।

কথা বলতে বলতে তাঁরা রাধাকান্তের বৈঠকখানার সামনে এসে পড়েছিলেন। রাধাকান্ত বললেন, এই যে, এই আমার বৈঠকখানা। তিনি চাকরকে ডাকলেন, কেষ্ট। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, সামনের দিক থেকে দুটি তরুণ-বয়সী ছেলে চ'লে আসছে। সঙ্গে দুজন কুলীর মাথায় কিছু জিনিসপত্র। দুজনের একজন রবি—কাশীর বউয়ের সহোদর, অন্যজন কিশোর। গাড়ি না পেয়ে তারা সাত মাইল দূরবর্তী স্টেশন থেকে হেঁটেই আসছে।

কিছুক্ষণ পর, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরেই এলেন স্বর্ণবাবু। সঙ্গে কয়েকজন লোক নিয়ে তিনি এসেছেন। বললেন, এ তোমার অন্যায় রাধাকান্তদা। আমি মাথা-ধরায় প্রায় অজ্ঞানের মত প'ড়ে ছিলাম, তাই তখন জ্ঞানদাবাবুকে নিজে এসে অভ্যর্থনা ক'রে নিতে পারি নি। তুমি সেই সুযোগে জ্ঞানদাকে নিয়ে এসেছ। এটা তোমার বিশেষ অন্যায় হয়েছে। জ্ঞানদাবাবু আমার আত্মীয়।

জ্ঞানদাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমি নিজে যেচে রাধাকান্তবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করেছি স্বর্ণবাবু। শিরঃপীড়া আপনার কমেছে?

স্বর্ণবাবু বললেন, আসুন, আগে কোলাকুলি করি। নিজেই এগিয়ে এসে তিনি কোলাকুলি করলেন, তারপর বললেন, মাথা ধরলে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাই। একটু সুস্থ হয়েই খোঁজ করলাম আপনার। শুনলাম, রাধাকান্তদা নিয়ে এসেছেন আপনাকে। অন্যায় এটা। তবে সংসারের ধারাই এই, রাধাকান্তদার দোষ কি? সংসারে যে বড় হয়, তাকে বন্ধু ব'লে সমাদর ক'রে সবাই কৃতার্থ হতে চায়।

জ্ঞানদাবাবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি দৃঢ়ভাবে স্বর্ণবাবুর কথার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তার পূর্বেই রাধাকান্ত বললেন, কথাটা তুমি সত্যই বলেছ স্বর্ণ। বড়লোক মানে মহৎ ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান ক'রে কৃতার্থ হতে চায়, কারণ মহত্ত্বই হ'ল পৃথিবীর পরমার্থ। তবে কি জান, মহৎ ব্যক্তি তোমার দোরে এলেন, তুমি মাথা-ধরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লে; সে ক্ষেত্রে আমার মহৎ জনকে সম্মান করার যে কর্তব্য সে তো তোমার মাথা-ছাড়ার অপেক্ষা ক'রে থাকতে পারে না।

আর যদৎ জনও তোমার মাথা কখন ছাড়বে, তারপর তুমি তাঁকে সমাদর শ্রদ্ধা করবে, তার প্রতীক্ষায় ব'সেও থাকতেন না, যেমন ব'সে থাকেন ওই রায়চৌধুরীরা, যাঁরা তোমার কাছে বৈষয়িক স্বার্থের প্রয়োজনে আসেন, তাঁদের মত। তোমার মাথা এত শীঘ্র ছাড়ল সেটা ভাগ্য, মাথা তো তোমার সারারাত্রিই না ছাড়তে পারত।

ঠিক এই সময়ে বাইরে জুতোর শব্দ হ'ল। কয়েকজনই যেন এলেন। লণ্ঠনের আলোয় লণ্ঠনধারীর পিছনে দীর্ঘ আকৃতি, মাথায় পাকাচুল দেখেই সকলে চিনলেন, গোপীচন্দ্র এসেছেন; গোপীচন্দ্রের পিছনে কীর্তিচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে বংশলোচনবাবু।

গোপীচন্দ্র নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন জ্ঞানদা রায়চৌধুরীকে। বললেন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আমার ওখানে শুধু খাবার জন্যেই নিমন্ত্রণ নয়, আমি কতকগুলি কঠিন কাজে হাত দিয়েছি—স্কুল করছি, বোর্ডিং ডাক্তারখানারও ঘর আরম্ভ হয়েছে; সেগুলি আপনাকে দেখতে হবে। উপদেশ দিতে হবে।

জ্ঞানদা রায়চৌধুরী বললেন, আজ আমি রাধাকান্তবাবুর অতিথি। কাল দিনে স্বর্ণবাবুর নিমন্ত্রণ নিতে হবে। আপনার আগেই উনি এসেছেন। রাত্রে আপনার ওখানে নিমন্ত্রণ নিলাম। এতে কি অসুবিধে হবে আপনার?

গোপীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কি কথা, অসুবিধে কিসের এতে? তাই হবে।

রায়চৌধুরী বললেন, স্বর্ণবাবু, তা হ'লে এই কথাই স্থির রইল?

স্বর্ণবাবু বললেন, তাই হবে। যেমন আপনার ইচ্ছা। এ ক্ষেত্রে কর্তা আপনি।

রায়চৌধুরী বললেন, আর একটা বিষয়ে কর্তৃত্ব আমার আছে, সেটা সময়ে জানিয়ে রাখাই ভাল; আমি মাছ মাংস খাই না, নিরামিষ খাই আমি।

সকলে যেন চমকে উঠল। বিলাত-ফেরত, মেম বিয়ে করেছে যে লোক, সে মাছ মাংস খায় না? সে কি কথা! বংশলোচন ব'লে উঠলেন, আপনার মেমসাহেব? আপনি তো মেমসাহেব বিয়ে করেছেন?

রায়চৌধুরী নিজের দেশের মানুষকে ভাল ক'রেই চেনেন না, এ প্রশ্নে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন না, বললেন, আমার স্ত্রীও নিরামিষ খান। ওদেশের অনেক লোকেই মাছ মাংস খায় না, তবে ডিমটা ওদের দেশে আমিষ নয়।

স্বর্ণবাবু বললেন, তা হ'লে ওরা এইবার হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যটা বুঝতে পেরেছে।

রায়চৌধুরী হেসে উত্তর দিলেন, হিন্দুধর্মে তো মাছ মাংস নিষিদ্ধ নয়। মাছটা অবশ্য বাংলা দেশেই বেশি প্রচলিত, কিন্তু মাংস তো অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত। যজ্ঞকাণ্ডে পশুবলি এবং সে মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রের বিধান।

বংশলোচন তর্ক জুড়ে দিলেন বৈষ্ণব ধর্মের কথা তুলে।

গোপীচন্দ্র বললেন, ওসব কথা আজ থাক লোচনকাকা, আজ উঠুন, অনেক কাজ রয়েছে, লোকজন ব'সে আছে।

বংশলোচন তর্ক রেখে সঙ্গে সঙ্গেই উঠলেন। রাধাকান্ত প্রত্যাখ্যান করার গোপীচন্দ্র তাঁকেই এখানকার ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন।

পরদিন সকালেই রাধাকান্তের বৈঠকখানার দরজায় গোপীচন্দ্রের জুড়ি এসে দাঁড়াল। কীর্তিচন্দ্র নামলেন জুড়ি থেকে। জ্ঞানদা চৌধুরীকে নিতে এসেছেন তিনি। গোপীচন্দ্র তাঁর অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। স্কুল-বাড়ি ডাক্তারখানার ইমারত দেখাবেন এবং অন্যান্য আরও পরিকল্পনার কথা বলবেন, আলোচনা করবেন।

স্বর্ণবাবুও এলেন। বললেন, আজ এ বেলা তো আমার ওখানে—

রাধাকান্তবাবু বললেন, চা খাও স্বর্ণ? কীর্তি ভাই, ঘরের মধ্যে বসবে চল। চা খাবে।

জ্ঞানদাবাবু প্রাতঃকৃত্য সেরে কাপড় বদলাচ্ছিলেন। পাশের ঘর থেকে বৈঠকখানার ভিতরে এসে বসলেন। বললেন, সকালবেলার ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ইস্কুল বোর্ডিং এসব দেখে আসি। ফিরে আপনার ওখানে যাব স্বর্ণবাবু।

স্বর্ণবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে হাসলেন, বললেন, উত্তম। তাই হবে। কিছুক্ষণ পর আমার টমটম পাঠিয়ে দেব।

কীর্তিচন্দ্র বললেন, তার দরকার হবে না, আমাদের গাড়িই পৌঁছে দেবে এখানে।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, সেই ভাল, আমার টমটম খোলা, দুপুরে রোদ উঠবে। তোমাদের গাড়ি-গাড়িতেই আরামে আসবেন। বেশ, তাই হবে। উঠলাম তা হ'লে।

উঠেও কিন্তু তিনি গেলেন না। কীর্তিচন্দ্র ও জ্ঞানদাবাবুর সঙ্গে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ বললেন, আমার ইস্কুলের পণ্ডিত মশায় এসে হাজির সকালবেলা। ইস্কুল তো এখন বন্ধ; পণ্ডিত মশায় স্থানীয় লোক, তাঁহার ইচ্ছা, ইস্কুল দেখাবেন জ্ঞানদাবাবুকে। আমি হাসলাম। অনেক বুঝিয়ে তাঁকে ক্ষান্ত করলাম। আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত খারাপ। পড়াশুনাও বিশেষ করি না। তবু রাধাকান্তদার ঠেলায় মাইকেলের পদ্যের বই ইন্দ্রজিৎ বধ পড়েছিলাম। দুটো লাইন আবছা মনে পড়ল। কি সেইখানটা রাধাকান্তদা? মধ্যে মধ্যে তুমি আউড়ে থাক গো। কি যে—সেই ইন্দ্রজিৎ বলছে বিভীষণকে, "—রাজহংস করে কেলি", মনে পড়ছে না ঠিক। মানে, বড় বড় দিঘিতে কালো জলে রাজহংস খেলা করে। ডাওলা-ভরা ডোবায় সে কি যায়, না তাকে মানায়? আচ্ছা কবি, নমস্কার করতে হয়। দেবে তো বইখানা আর একবার রাধাকান্তদা, আর একবার পড়ব। সেইখানটা আমার আরও ভাল লাগে, সেই যে

প্রমীলা বলছে, "রাবণ শ্বশুর মোর মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে ?"

আনন্দবাবু একটি নীল চশমা চোখে পরেছিলেন, তাঁর মুখের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা গেল না, কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের দৃষ্টি তীক্ষ হয়ে উঠল ; পরমুহূর্তেই তিনি গাড়ির দরজা খুলে রায়চৌধুরীকে সসম্ভ্রমে বললেন, আসুন। তারপর রাধাকান্তের দিকে চেয়ে বললেন, আপনিও আসুন ঠাকুরদা।

রাধাকান্ত বললেন, থাক্ ভাই, গৃহস্থ মানুষ, কাজকর্ম রয়েছে, মনে হচ্ছে ফিরতে দেরি হবে।

রায়চৌধুরী স্বর্ণবাবুকে বললেন, পণ্ডিত মশায়কে বলবেন, ও বেলায় তাঁর ইস্কুল দেখব। তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়িখানা চ'লে গেলে স্বর্ণবাবু বললেন, গেলেই পারতে রাধাকান্তদা, আধ-কাটারো হ'লেও জিমি তো বটে, জল না খাক্, চাকিবারে একবার বেড়িয়ে আসতে।

রাধাকান্ত ও কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সকালবেলাতেই মদ্যপান করেছ স্বর্ণ ?

হ্যাঁ, বিলিতী। খাবে একটু ?

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আহ্নিক এবং সন্ধ্যার সময় ভিন্ন মদ আর খাব না স্থির করেছি, সে তো তোমাকে বলেছি।

সাধু সাধু !—ব'লে হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন স্বর্ণবাবু।

রাধাকান্তও হাসলেন। স্বর্ণ কিন্তু হয়ে উঠেছে গোপীচন্দ্রের প্রধান প্রতিষ্ঠা। কিন্তু—। হঠাৎ শ্যামাকান্তের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল, একটু ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে তিনি দেখলেন, শ্যামাকান্ত তাঁর বৈঠকখানার বারান্দায় অস্থিরপদচারণায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং অনবরত নখ খুঁটছেন, অনর্গল ইংরিজী ব'লে যাচ্ছেন—

You are a beast. A cunning fox. A greedy wolf. A venomous serpent. A fuel seller by profession. A gharry with a pair of horse and a long coat can not make a fuel seller a king. A blue dyed jackle once became the king of the forest. His fate you are sure to meet in the end. A beast., A rouge, plague no thee, thou art too bad to curse. শ্যামাকান্ত গোপীচন্দ্রকেই গালাগাল করছেন।

রাধাকান্ত ফিরে ভিতরে এসে বসলেন। বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। নিজেও তিনি যাচাই ক'রে দেখছিলেন। তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে উঠেছেন, তারও হেতু গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। আনন্দ রায়চৌধুরীকে তিনিই কাল সমাদর অনুভব করলেন,

ক'রে সর্বপ্রথম এনেছিলেন নিজের বাড়ি। আনন্দ অকৃতজ্ঞতার কোন কাজ করেন নাই, সে দোষ তাঁকে তিনি দিতে পারবেন না ; কিন্তু তি'নি যে তাঁকে উপেক্ষা ক'রে গোপীচন্দ্রের কীর্তি দেখতে চ'লে গেলেন, তার জন্য বেদনা অনুভব না ক'রে তিনি পারছেন না। সে বেদনাকে যেন সম্বরণ করা যায় না।

হঠাৎ তাঁর মনে একটা জিজ্ঞাসা জেগে উঠল, পৃথিবী কি চলছে শুধু ঈর্ষার আবেগে ?

আনন্দ রায়চৌধুরীকে নিয়ে ক্ষোভ তাঁর আরও বেড়ে গেল। দুপুরবেলা সর্ববাবুর টমটমটা খালি ফিরে এল এবং তার পিছনে এল গোপীচন্দ্রের খালি জুড়িখানা। রায়চৌধুরীর ব্যাগ বিছানা নিতে এসেছে। গোপীচন্দ্রের ওখানেই স্নান করবেন রায়চৌধুরী। ওখানে স্নানের সুব্যবস্থা আছে, স্নানের ঘর আছে, বিলাতী-মতে বড় স্নানের টব আছে। খালি জায়গায় স্নান করতে অসুবিধা বোধ করেন তিনি। তা ছাড়া আলাপ-আলোচনায় তি'নি মত্ত হয়ে রয়েছেন। বলেছেন, এখানেই স্নান ক'রে সর্ববাবুর ওখানে যাবেন খেতে। খেয়েই সর্ববাবুর ইস্কুল দেখে আবার আসবেন গোপীচন্দ্রের ওখানে। সেখানে আলোচনা আছে অনেক। বিকেলে আবার গাড়ি ক'রে বের হবেন, এখানকার মহাপীঠে যাবেন। গ্রামের চারিদিক ঘুরে দেখবেন। সন্ধ্যায় এখানকার লাইব্রেরি দেখবেন, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবেন, গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্র তার আয়োজন করছে। রাত্রে গোপীচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাঁর জুড়িতে সাত মাইল দূরের রেলস্টেশনে গিয়ে কলকাতা যাবার ট্রেন ধরবেন। গোপীচন্দ্রের জুড়িতে এসে'ছলেন বংশলোচনের বড় ছেলে ত্রিলোচন। ত্রিলোচন কীর্তিচন্দ্রের সমবয়সী, দুজনের মধ্যে ঘ'নিষ্ঠতাও আছে। এখানকার সমাজে বংশগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার মধ্যে মধ্যে সে ঘনিষ্ঠতা ব্যাহত হ'লেও প্রথম যৌবনের অন্তরঙ্গতার মূল সূত্রটি অব্যাহতই আছে, একেবারে ছিন্ন হয় নি কখনও, মধ্যে মধ্যে জট পাকিয়ে একটা একটা ক'রে কয়েকটা গি'ট পড়েছে। জীবনের গোপন উৎসবে পরস্পরকে না হ'লে চলে না। সম্প্রতি বংশলোচন গোপীচন্দ্রের স্থানীয় বিষয়-সম্পত্তির ভার নেওয়ার ফলে সে ঘনিষ্ঠতা সাময়িকভাবে দৃঢ় হয়েছে। ত্রিলোচনকে গোপীচন্দ্র কলকাতার নিজের কয়লার আপিসে চাকরি দিয়েছেন। ত্রিলোচন ইংরিজী লেখাপড়া কিছু শিখেছে, এণ্ট্রান্স পাস। বংশগত বাক্‌পটুতায় তারও পটুত্ব আছে। বর্তমানকালের সমাজের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী অল্পবয়সেও গম্ভীর এবং প্রবীণ হয়ে উঠেছে। সে ব'লে গেল অনেক কথা গোপীচন্দ্রবাবু আনন্দ রায়চৌধুরীকে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কি কথা বলেছেন, আনন্দ রায়চৌধুরী তাতে কেমন শ্রদ্ধা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং আরও কি কীর্তি স্থাপনের কল্পনা করেছেন সেই সব কথা।

ত্রিলোচন বললে, গোপীচন্দ্রবাবু আজ মনের কথা খুলে বললেন, বুঝেছেন কিনা? সে এক বিরাট কাণ্ড। ইস্কুল হ'ল, বোর্ডিং ডাক্তারখানা হচ্ছে, ইস্কুল ওপেন করবেন ম্যাজিস্ট্রেট আমেদ সাহেব, বোর্ডিং ডাক্তারখানা ওপেন করবার জন্তে কমিশনার সাহেবকে আনবেন ঠিক করেছেন। জ্ঞানদাবাবু অবশ্য বললেন, সরকারী কর্মচারী কমিশনার, সরকারী লোক বাদ দিয়ে আমাদের দেশের কোন বড়লোককে এনে ওপেন করালে ভাল করতেন। কিন্তু তা তো হবার উপায় নাই এখন। কমিশনার সাহেবকে জানাবার জন্ত আমেদ সাহেবকে বলা হয়ে গিয়েছে। বোর্ডিং ডাক্তারখানার পর এখানে একটি টোল করবার জন্তে বললেন জ্ঞানদাবাবু। টোলও হবে। গোপীবাবু বললেন, ইস্কুল-ডাঙার সীমানা জরিপ করিয়ে একটা প্ল্যান করাচ্ছেন, তিনি, রাস্তা করবেন চারিদিকে, বাগানপুকুর হবে, নিত্য হাট বসাবেন, গ্রামের লোকে বালিকা-বিদ্যালয় করে ভাল, নইলে তিনিই বালিকা-বিদ্যালয় করবেন, ওই দিকেই তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বাড়িঘর হবে, বাজার একটা বসাচ্ছেন, সাবরেজেস্ট্রী আপিস যাতে ওইখানেই হয় তার ব্যবস্থা করছেন; পবিত্র ধরেছে, এখানে একটা থিয়েটার-ক্লাব করবে, সেও হচ্ছে। গোপীবাবুর এতে একটু দ্বিধা ছিল। কিন্তু জ্ঞানদাবাবু বললেন, না না না। খুব ভাল কথা। ওতে বাধা দেবেন না। অভিনয় খুব উঁচুদরের আর্ট। সমাজে লোকশিক্ষা হবে। লাইব্রেরিটাকেও ওই ক্লাবের সঙ্গে খুব ভাল ক'রে করা হবে। জ্ঞানদাবাবুই থিয়েটার-ক্লাবের নামকরণ করলেন—বন্দে মাতরম্ থিয়েটার, লাইব্রেরির নামও ওই বন্দে মাতরম্ লাইব্রেরি নাম হবে।

এক নিশ্বাসে অনেক কথা ব'লে সে এবার থামলে। রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে দেখে এবার সে একটু নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল। রাধাকান্তের মুখ যেন পাথরের মুখ।

ত্রিলোচন অকস্মাৎ হাঁক মেরে ডাক দিলে গাড়ির সহিসটাকে, হারামজাদা বেটা গাড়ির দরজা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছ যে বড়? ইদিকে আয় বেটা শূয়ারের বাচ্চা, ইদিকে আয়। তোল্ জিনিসপত্র, তোল্। চাপা গাড়িতে।

রাধাকান্ত ডাকলেন নিজের চাকরকে। কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। তার বদলে এসে দাঁড়াল রবি।

রবি বললে কেষ্ট তো নেই, সে বাজারে গেছে। কিছু বলছেন?

ত্রিলোচন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, এটি?

ওটি আমার সম্বন্ধী।

রবি প্রশ্ন করলে, কিছু বলছেন?

রাধাকান্ত বললেন, তোমাদের কিছু না। রায়চৌধুরীর জিনিসগুলি গাড়িতে তুলে দেবার জন্তে ডাকছিলাম কেষ্টকে।

রবি বিনাবাক্যব্যয়ে এগিয়ে গিয়ে সহিসটার মাথার ভারী ট্রাঙ্কটার এক দিক ধ'রে তুলে দিলে এবং ছোট জিনিসের কয়েকটা নিজেই হাতে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিতে উদ্যত হ'ল।

ত্রিলোচন হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, এবং হাঁ-হাঁ করার মধ্যেই শ্লেষাত্মক হেসে বললে, আরে, আরে আরে, তোমাকে ওসব করতে নাই, রাখ রাখ রাখ।

রবি একটু বিস্মিত হয়ে বললে, ওই ভারী ট্রাঙ্ক ও একলা তুলত কি ক'রে? আর এগুলো ছোট জিনিস, আমি তুলে দিলে ক্ষতি কি?

আছে আছে, ক্ষতি আছে। রাখ, তুমি রাখ।

রাধাকান্ত মৃদুস্বরে বললেন, যাও, দিয়ে এস তুলে। কোন ক্ষতি নাই।

রবি চ'লে গেলে ত্রিলোচন বললে, লোকে বলবে, সম্বন্ধীকে আপনি চাকরের মত খাটাচ্ছেন।

রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, লোকে অনেক কথাই বলছে এবং বলবে ত্রিলোচন। বিলাত-ফেরত রায়চৌধুরীকে বাড়িতে খাওয়ানো নিয়েই মেয়ে-মহলে, গ্রামে গ্রামান্তরে লোকের কথা বলার আর শেষ নাই। তা ছাড়া—। কথাটা বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। এখানকার ধারাধরন অনুযায়ী অভ্যাসবশে একটি শ্লেষাত্মক কথা তাঁর জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল; অন্য সময় হ'লে তিনি কথাটা ব'লেই ফেলতেন, কিন্তু আজ অনেকক্ষণ থেকেই একটা চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরছে, তিনি ভাবছিলেন, পৃথিবী কি ঈর্ষার আবেগেই শুধু চলছে? তাই বলতে গিয়েই তাঁর মনে হ'ল, শ্লেষাত্মক কথাটার পিছনে ঈর্ষার তাড়না রয়েছে। মনে হওয়া মাত্র তিনি সংযত হলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, কালে প্রবলপ্রতাপ জমিদারদের বংশধরেরা গোমস্তার বদলে নিজেরাই দপ্তর বগলে চাষীর ঘরে ঘরে খাজনা আদায় ক'রে বেড়ায়। কালের বশে আমার বংশধরদের হয়তো কুলীর পয়সার অভাবে নিজের মোট নিজেকেই বইতে হবে। আমার শ্বশুর চাকরে মানুষ; তাঁর ছেলেদের ওতে অপমান হবে না। মোট ব'য়ে পয়সা তো নিচ্ছে না।

• • •

রাধাকান্ত যেদিন কথাটা বললেন ত্রিলোচনকে, সেদিন বিলাত-ফেরত রায়চৌধুরী সবে এসেছেন গ্রামে। কোন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত এবং অকল্পিত ঘটনা যখন সংসারে ঘটে, তখন মানুষ সচরাচর বিস্ময়ে এবং আকস্মিকতার সংঘাতে প্রায়ই বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ঘটনাটা ঘ'টে যাওয়ার পর যখন মানুষ সম্বিৎ ফিরে পায়, তখনই রব ওঠে বেশি। আস্ফালন, আর্তনাদ, সমালোচনা ইত্যাদি তখনই পূর্ণমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। রাধাকান্ত সেদিন ত্রিলোচনকে বললেন, রায়চৌধুরীকে

খাওয়ানো নিয়ে মেয়ে-মহলে, গ্রামে গ্রামান্তরে লোকের কথা বলার আর শেষ নাই ; কিন্তু রায়চৌধুরী চ'লে যাওয়ার কয়েকদিন পরে গ্রামে গ্রামান্তরে, মহিলা-মহলে, এক কথায় অঞ্চল জুড়ে এ নিয়ে আলোচনার এবং কথার যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল, তার কাছে প্রথম দিনের আলোচনা, কালবৈশাখী ঝড়ের কাছে চৈত্র-দুপুরের অল্পক্ষণস্থায়ী খানিকটা গরম বাতাসের ঝটকা বা ঘূর্ণির মত, নিতান্তই তুচ্ছ। গ্রামের মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় আলোচনাটা তুললেন। বড়লোক ব'লে সমাজে এ ধরনের যথেচ্ছাচার করবার অধিকার আছে কি না এই নিয়ে বিচার করতে বসলেন ; বিচার করতে ব'সে তাঁরা ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে অথবা সাহসিকতার সঙ্গে আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আবিষ্কার করলেন যে, বড়লোকে যদি এই ধরনের যথেচ্ছাচার করে, তবে তার প্রতিবিধান করা তাঁদের অবশ্যকর্তব্য এবং সে অধিকার দায়ভাগসম্মত পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকারের মত দৃঢ়। গ্রামের গন্ধবণিক-সমাজেরও একটি অংশ এই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। তারাও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলে, ব্রাহ্মণ এবং বড়লোক ব'লে তাদের এ অনাচার তারাও সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। সমাজ একা ব্রাহ্মণের নয়। হিন্দুসমাজ হিন্দুর। এর প্রতিবিধানে তারাও প্রতিকারোদ্যোগী ব্রাহ্মণদের পিছনে রয়েছে এবং থাকবে। এদের মুখপাত্র হ'ল মণি দত্ত ; দলের মধ্যে চন্দ্র গড়াঞীও আছে। গ্রামান্তরে ক্রোশখানেক দক্ষিণে বিপ্রচক্র গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বলেছেন, নবগ্রামের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁরা আর খাওয়াদাওয়াই করবেন না। ক্রোশ দুয়েক পশ্চিমে চারহাটি অন্ত একখানি ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রধান গ্রাম ; বিপ্রচক্র গ্রামের ব্রাহ্মণদের মতই এখানকার ব্রাহ্মণেরা কৃষি এবং কুলধর্ম অর্থাৎ টোল পৌরোহিত্য ইত্যাদি নিয়েই পুরুষানুক্রমে কালাতিপাত ক'রে আসছেন। কালের মর্জিমায় মধ্যে মধ্যে জমি-জেরাত নিয়ে মামলা অথবা অল্পস্বল্প মহাজনী কারবারে নালিশ-মকদ্দমা উপলক্ষ্যে সদর ও চৌকিতে বিধর্মী রাজার আদালতে যাওয়া এবং 'হুজুর' ব'লে সেলাম করা ছাড়া সর্বপ্রকারে হিন্দুসমাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতাকে বর্ণে বর্ণে রক্ষা ক'রে চ'লে থাকেন। ট্রেনে চলা-ফেরা করার সময় নিতান্ত তৃষ্ণার্ত বা ক্ষুধার্ত না হ'লে "বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই"— এই বাংলা প্রবচন অনুযায়ী জল পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। একান্ত অক্ষম হ'লে এই বচনটার সঙ্গে "আতুরে নিয়মো নাস্তি" এই সংস্কৃত বচন জুড়ে দিয়ে তবে গ্রহণ করেন। চারহাটি গ্রামেও বিপ্রচক্রের মত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল কিন্তু সর্ববাদিসম্মতরূপে নয়। কয়েকটি বিশিষ্ট ঘর এই বিষয়ে মৌন হ'য়ে গেলেন। তাঁদের এক ঘর হ'ল নবগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজের পুরোহিতের ঘর, অপর ঘরটি হ'ল নবগ্রামের সভাপণ্ডিতের ঘর। এঁদের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন আরও কয়েক ঘর ওঁদের সঙ্গেই থেকে গেলেন। বাউড়ী ডোম প্রভৃতি জাতির সমাজ কোন পক্ষ অবলম্বন করলে না, কিন্তু উৎসুক হয়ে রইল। স্থানীয়

মুসলমানেরাও বিচলিত হয়েছে এতে। এবাবৎ হাজী সাহেবের দলিজায় কয়েকজন মাতব্বর ব'সে আলোচনা করেছে এই প্রসঙ্গ নিয়ে। হাজী বলেছে, ই ভাল নয়, আপন ধরম ছেড়ে ই সব কাম ভাল নয়।

সালেবেগ সম্প্রতি গোপীচন্দ্রের চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে, এবং স্বয়ং গোপীচন্দ্র তাকে একজন বিশিষ্ট বংশের সন্তান ব'লে স্বীকার করায় সে মুসলমান-সমাজে বেশ সম্ভ্রম রেখে চলা-ফেরা করতে চেষ্টা করে; সালেবেগ নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছে, ই আর কি দেখলে তোমরা? আমি যা দেখি, তোরা তো বো! সালেবেগ থুথু ফেলে বললে, সায়েব আসছে, সুবা আসছে, আমি দেখ'ছ আপন চোখে, সায়েবদের সাথে ইয়ারা ন খায় কি? আমার মনে লাগে কি জান হাজী? আমার মনে লাগে, দশ-বিশ বছরের মধ্যে নবগেরামের বাবুরা কেরেস্তান হয়ে যাবে।

হাজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, কেরেস্তানী বিদ্যা—এই আংরেজী লিখা-পড়াটাই হ'ল সবনাশের মূল সালেবেগ। সেই বিদ্যা শিখার লেগে তুমার গোপীবাবু এখানে ইস্কুল করছে। ভাল কাম হ'ল না ইটা। এই দেখ, জেলার ম্যাজিস্টর সাহেব আহমদ সাহেব মুসলমান, বড়ঘরানা আমীর লোকের ছাওয়াল। বিলাত গিয়া কেরেস্তানী বিদ্যা শিখে ম্যাজিস্টর হয়েছে। না খায় কি বল তো? কেরেস্তান ইংরাজের সঙ্গে যখন একসঙ্গে সে খানাপিনা করে, কেরেস্তানী হোটেলে খায়, তখন অখাদ্যি-কুখাদ্যি খায় না সে?

সালেবেগ হেসে বললে, কিন্তু বিলাত না গেলে ম্যাজিস্টর কি ক'রে হ'ত কও?

ইখানে ম্যাজিস্টর হ'ল, কিন্তু খোদাতায়লার দরবারে কি হবে, কি কৈফিয়ৎ দিবে, কও? তারপর বার বার ঘাড় নেড়ে সে বললে, না না, ভাল নয়, ই ভাল নয়।

ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হ'ত বলা কঠিন। ঘটনাপ্রবাহের স্রোত প্রবল গতিতেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল। মধ্যবিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিলে সরকার-বংশীয়দের প্রায় সকলেই। বংশলোচনবাবু গোপীচন্দ্রের ম্যানেজার, তাঁর ছেলে ত্রিলোচন গোপীচন্দ্রের কলকাতার আপিসে চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা নির্লিপ্ত হয়ে দূরেই রইলেন। ঘটনাপ্রবাহের প্রথম ধাক্কাটা রাধাকান্তের উপরে পড়বার জন্ত উদ্যত হ'ল। তিনি জ্ঞানদা রায়চৌধুরীকে বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন, তিনিই এ অনাচারের পথ দেখিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি বলেছেন, জ্ঞানদা রায়চৌধুরীর জাত গিয়েছে ব'লে তিনি মনে করেন না। বিদ্যা-শিক্ষার জন্ত দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ দৈত্যলোকে এসে বাস করেছিল। জ্ঞানদা বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখে এসে দেশের মুখোজ্জ্বল করেছে

তাকে যথেষ্ট সমাদর আমি করতে পারি নি। আমার অপরাধ যদি হয়ে থাকে, তবে সেইটেই আমার একমাত্র অপরাধ।

গোপীচন্দ্র কোন কথাই বলেন নাই। তিনি নীরবই আছেন, মৃদু হেসেছেন শুধু। বংশলোচনের সঙ্গে আলোচনায় তাঁকেই শুধু বলেছেন, রাধাকান্তবাবু স্বর্ণবাবুর অপরাধ হয়ে থাকলে আমারও হয়েছে। ওঁরা প্রায়শ্চিত্ত করেন, আমিও করব।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বলেছেন, আমার বাড়িতে বড়লোক আসেন, সায়েব-সুবো আসেন, মুসলমান জমিদার ফকির ওস্তাদ আসেন, তাঁদের কি আমি খাওয়াই না?

বংশলোচন গোপীচন্দ্রকে বলেছেন, গোপীচন্দ্রের অনুরোধে রাধাকান্তরও কাছে এসে গোপনে ব'লে গেছেন, বিপদ হ'ল শক্ত কঠিন বস্তু, তার রঙ হ'ল মিশমিশে কালো, বুঝলে বাবা রাধাকান্ত,—মানে কষ্টিপাথর। বিপদের সময় মনুষ্যকে ক'ষে নিতে হয়।

রাধাকান্ত হেসেই উত্তর দিলেন, উপমাটা ভালই দিলে লচুকাকা। কিন্তু সমস্ত জীবনটাই যার তামা পেতল নিয়ে কারবার ক'রে কাটল, সে খাঁটি সোনার দাগ চিনবে কি ক'রে বল? আমার তো মনে হচ্ছে, সবই তামা পেতল।

মুখের কাছে মুখ এনে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর আর একটু ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, স্বর্ণের কথা শুনেছ?

শুনেছি। সে এই আন্দোলনে হাতে-তালে কাঠি দিচ্ছে। ওদের তাতাচ্ছে। শুনেছি আমি লচুকাকা। তবে সে নিয়ে দুঃখ ক'রে কি করব? আর বিপদের কষ্টিপাথরে স্বর্ণকে ক'ষে দেখতে বলছ, কিন্তু আমি ব্যস্ত রয়েছি আমার নিজের কষটা পরীক্ষা করতে। ভাবছি, আমার মধ্যে খাদ রয়েছে কতখানি!

বংশলোচন বললেন, সাধু, সাধু, সাধু। তুমি মহৎ ব্যক্তি। আহা-হা! সেই যে কি বলে, ধুলাখেলা খেলব না আর হরি নামে মন মজেছে, সেই জ্ঞান হয়েছে তোমার। তা ভাল। তবে ধুলোখেলা না কর, ভাত ডাল খেতে তো হবে। ভাত-ডালটা ছেড়ো না বাবা। ভাত-ডাল খেতে যেটুকু সংসারজ্ঞান দরকার, সেটুকুও জলাঞ্জলি দিও না।

না, তা দেব না লচুকাকা, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। বিশেষ সাবধান হয়েই রয়েছি। খবরাখবর রাখছি। রাখছি ঠিক নয়, লোকে এসে আপনা থেকেই দিয়ে যাচ্ছে। সংসার বিচিত্র স্থান। আপনার জন শত্রুতা করে, পর আপনার জন হয়। কাল রাত্রে আমার সবচেয়ে আপনার জন, স্বর্ণকান্তদার বৈঠকখানায় মজলিস হ'ল প্রকাশ্যে। দাদা মাথা হয়ে আমাকে, গোপীবাবুকে সামাজিক শাস্তি দিতে চেয়েছেন, তাতে স্বর্ণকে শাস্তি দিতে হয় দেবেন, এ খবর আমি পেয়েছি। খবর দিলেন তোমাদের সরকার-বংশেরই একজন, নাম আমি করব না। দাদার ওখানে মজলিস সেরে বাড়ি ফেরার পথে আরও একটা মজলিস হয়েছে এক স্থানে, সে খবরও পেয়েছি। সেখানে

একজন আমাকে জালে-পড়া ধাড়ালুব ঘুঘু বলেছেন, তাও শুনেছি। বলেছেন, বড়ই ট্যাক ট্যাক ক'রে কথা বলেন, সব তাতেই ঠোক্কর মারেন, এবার বাবু প্যাঁচে পড়েছেন। অবশ্য দোষ স্বীকার ক'রে প্রায়শ্চিত্ত একটা—নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্যাপারটা চুকে যায়, সে আমি জানি। কিন্তু যাকে আমি অন্যায় মনে করি না, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কেন করব আমি?

থাম, থাম বাবা। ছিঃ। তুমি অন্যায় মনে কর না, না কি বললে? মানে? বিলাত গেলে ধর্ম যায় জাত যায়, তা তুমি মনে কর না? মেম বিয়ে করলেও না?

না।

তবে, বিলাত গিয়ে তুমি একটা মেম বিয়ে ক'রে এস। খেদ কেন থাকে! রাধে রাধে রাধে, এই কথা দীনবন্ধুবাবু উকিলের ছেলের মুখে শুনতে হ'ল?

বাইরে জুতোর শব্দ উঠল। এসে ঘরে ঢুকলেন স্বর্ণবাবু। বাইরে থেকে স্বর্ণবাবু সম্ভবত জ্যাঠামশায়ের মন্তব্য শুনেছিলেন, তিনি বললেন, বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করার দরকার নাই রাধাকান্তদাদার। আমাদের কাশীর বউ'দের মুখও মেমের মত ফরসা, আর ধারাধরন চালচলন তাও মেমের মতনই।

আলোচনাটা কোথায় কতদূরে গিয়ে পৌঁছত, তা বলা কঠিন। রাধাকান্ত ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন। স্বর্ণবাবুর এই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগদান করাটা ঠিক গোপন কথা নয়। সে প্রায় সকলেরই কানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু রাধাকান্ত যে আরও একটি গোপন মজলিসের কথার উল্লেখ করলেন বংশলোচনের কাছে, সে গোপন মজলিসটি গভীর রাত্রে বংশলোচনের বৈঠকখানাতেই বসেছিল। এবং রাধাকান্তকে তিনিই তুলনা করেছেন, জালে আবদ্ধ ধাড়ালুব ঘুঘুর সঙ্গে। সুতরাং মনের অপ্রসন্নতা গোপন রেখেই এতক্ষণ তিনি আলোচনা করছিলেন। ঠিক এই সময়েই স্বর্ণবাবু এসে কাশীর বউ সম্বন্ধে ওই মন্তব্য করায় মন তাঁর অসহনীয় তিক্ততায় ভ'রে উঠেছিল। রায়চৌধুরীকে সমাদর ক'রে বাড়িতে গ্রহণ করায় এখানকার সমাজে যে একটা প্রবল আন্দোলন হবে, সে তিনি জানতেন। যখন তিনি স্বর্ণবাবুর বাড়ি থেকে, স্বর্ণবাবু কর্তৃক একরকম প্রত্যাখ্যাত রায়চৌধুরীকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের বাড়িতে, তখনই তিনি এই আন্দোলনের কথা ভেবেছিলেন, কল্পনায় এই আন্দোলনের পুরোভাগে নেতা হিসাবে কল্পনা করেছিলেন স্বর্ণবাবুকেই। কিন্তু রায়চৌধুরী তাঁর বাল্যবন্ধু এবং তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি—বিদেশ থেকে বিদ্যা আহরণ ক'রে এসে যিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁকে সমাদরে গ্রহণ না করলে অন্যায় হবে, পাপ হবে তাঁর, এবং এই গ্রামের সমাজও চিরদিন নিন্দিত হবে ব'লেই তিনি সমস্ত ভাবী বিপত্তি মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই তাঁকে ঘরে এনেছিলেন। রায়চৌধুরীদের মত ব্যক্তিদের আজ সমাজে গ্রহণ করা অব-

কর্তব্য ব'লেই তিনি মনে করেন। নিজে তিনি রায়চৌধুরীকে বলেছিলেন, তিনি বয়সে প্রবীণ না হ'লেও প্রাচীনপন্থী। কিন্তু প্রাচীনপন্থী হ'লেও বৃহত্তর সমাজ ও সমগ্র দেশের প্রভাব তাঁর উপর এসে পড়ে, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর মনকে প্রাচীন কাল থেকে নূতন কালে নিয়ে এসেছে। এই কারণেই তাঁর পক্ষে সামাজিক নির্যাতনকে সহ্য ক'রে নূতন ন্যায় ও রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার কল্পনা ও সংকল্প করা সম্ভবপর হয়েছিল। স্বর্ণবাবুর নেতৃত্বে আন্দোলনের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তারপর ঘটনাটা আকস্মিকভাবে অন্যরকম ঘ'টে গেল। কালের প্রভাবের অস্থায়ী আবেগে স্বর্ণবাবু রায়চৌধুরীকে রাধাকান্তের সমাদর ক'রে গ্রহণ করা দেখে, মনে মনে তাঁর প্রশংসা ক'রেই নিজে এসে রায়চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করলেন। তারপর তাঁকে সমাদর ক'রে নিয়ে গেলেন গোপীচন্দ্র। রাধাকান্ত খা'নকটা বিস্মিত হয়েছিলেন, আনন্দিত হয়েছিলেন। নবগ্রামের সমাজের জন্য গৌরব অনুভব করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ ও গন্ধবণিক সমাজের আন্দোলনের জন্য সে আনন্দ, সে গৌরববোধ একটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই তাঁর। কিন্তু স্বর্ণবাবু ও বংশলোচনের সরীসৃপের মত গোপন যোগদানের সংবাদে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁর নিকটতম আত্মীয় জাঠতুতো দাদা শ্যামাকান্তের এই বিরোধী দলে যোগদানের জন্যও তিনি এতখানি ক্ষুব্ধ হন নাই। অন্তরের এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় বংশলোচন এবং স্বর্ণবাবুর আলোচনা তাঁর ধৈর্যকে প্রায় শেষ সীমায় ঠেলে নিয়ে এসেছিল, এর পরই একটা বিস্ফোরণ হয়তো হ'ত। কিন্তু এই মুহূর্তেই আবার জুতোর শব্দ উঠল। এবার এলেন থানার দারোগা সাহেব। ফুঃ-ফুঃ ক'রে পানের কুচি ফেলে হেসে নমস্কার ক'রে বললেন, ক দিন থেকেই আসি আসি মনে করছি, কিন্তু হয়ে আর ওঠে না। ফুঃ-ফুঃ। আজ ঠেলেঠুলে চ'লে এলাম। কেমন আছেন?

দারোগার জন্যই কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। উনিশ শো পাঁচ ছয় সালের সামাজিক অবস্থায়, দারোগাবাবু এবং প্রায় ভদ্রলোকের—বিশেষ ক'রে সম্ভ্রান্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধটা একালের মত ছিল না। তাঁদের মধ্যে অনেকটা গাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল। একালে সম্ভ্রান্ত সমাজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ক'রে যে গৌরব এবং আনন্দ অনুভব করেন, সেকালে দারোগা ইন্‌স্পেক্টারের অন্তরঙ্গতায় সেই আনন্দ এবং গৌরব ছিল। সকলেই সহাস্যে সমাদরের সঙ্গে দারোগাকে অভ্যর্থনা করলেন। রাধাকান্ত চাকরকে ডেকে বললেন, চা নিয়ে আয়।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, তারপর, হুজুর-বরদারের কি খবর?

এই এলাম একবার আপনাদের খবরাখবর নিতে—কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত? কাল পথে একটি ভারী সুন্দর ছেলেকে দেখলাম, কিশোরের সঙ্গে যাচ্ছিল থানার সামনে দিয়ে। শুনলাম, রাধাকান্তবাবুর শালা। ভারী ভাল লাগল ছেলেটিকে। চমৎকার

কথাবার্তা। ফুঃ-ফুঃ। শুনলাম, এবারই সে আই. এ. দেবে। এত অল্প বয়স, ভারী চমৎকার লাগল। সকাল থেকে কাজ ছিল না, ভাবলাম, যাই রাধাকান্তবাবুর ওখানে। ওঁর খবরও নেওয়া দরকার। আপনারা তো সব ওঁকে সমাজের প্যাঁচে ফেলবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, ভদ্রলোক কি করছেন দেখবার জন্যে এলাম।

আবার কয়েকজনের জুতোর শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। এবার এলেন অমরচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন—কীর্তিচন্দ্র, ত্রিলোচন প্রভৃতি। এলেন যেন একটা বেগবতী প্রবাহের গতি নিয়ে। ডাক্তারখানা, বোর্ডিং ওপ্‌নিং হবে দশ দিন পর। কমিশনারের সঙ্গে দেখা ক'রে দিন স্থির ক'রে এসেছেন অমরচন্দ্র। অমরচন্দ্র বললেন, আর দিন নাই। এখানকার উদ্যোগ-আয়োজনে সকলেরই আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন।

স্বর্ণবাবু চুপ ক'রে রইলেন। রাধাকান্ত বললেন, আমার দ্বারা যতটুকু হয় করব।

অমরবাবু বললেন, সে জানি আমি। তারপর বললেন, জ্ঞানদা রায়চৌধুরীকে আপনারা যে সমাদর ক'রে গ্রহণ করেছেন, তার কথা আমি মিঃ রায়চৌধুরীর কাছেই শুনলাম কলকাতায়। আমার বুকটা ফুলে উঠল।

আরও কয়েকটি কথার পর তাঁরা চ'লে গেলেন। কাজ অনেক। বোর্ডিং হবে, দেশ-দেশান্তরের বিদ্যার্থীরা আসবে নবগ্রামে—তীর্থযাত্রীরা যেমন আসে তীর্থে। দাতব্য-চিকিৎসালয় হবে, দরিদ্রেরা ওষুধ পাবে। নবগ্রামের নাম দেশ-দেশান্তরে খ্যাত হবে। কমিশনার আসবেন, গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবেন। নূতন কর্মের উৎসাহ এবং সমারোহের কল্পনার সে একটা প্রবাহ যেন। নবগ্রামের বহু ভাগ্যে বহু তপস্যায় সম্ভবপর হয়েছে। সেই প্রবলতর প্রবাহের মধ্যে এই সামাজিক আন্দোলনের ক্ষীণবেগ ধারা যেন চাপা প'ড়ে গেল।

অমরচন্দ্রেরা চ'লে যাওয়ার পর পূর্বের আলোচনার পরিবর্তে এই বোর্ডিং চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারির আলোচনাই চলতে লাগল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন স্বর্ণবাবুকে, আপনার স্কুলের কি করবেন স্বর্ণবাবু? শুনলাম, অধিকাংশ ছেলেই এইচ. ই. ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছে।

অন্যমনস্কভাবে স্বর্ণবাবু বললেন, হ্যাঁ। তারপরই তিনি উঠলেন, বললেন, চলি রাধাকান্তদা। চলি দারোগাবাবু। লচুকাকা, তুমি থাকছ নাকি?

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তিনি চ'লে গেলেন।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন রাধাকান্তবাবুকে, কই, আপনার নবাবী কই?

রবিকে খুঁজে পেলেন না রাধাকান্তবাবু। শহরের ছেলে, পল্লীগ্রামে এসে সে অনবরত ঘুরছে।

সে এখন থাকছে তো?

হাঁ।

আচ্ছা। আজ তা হ'লে উঠি। পরে একদিন আসব।

রাধাকান্তবাবুর বৈঠকখানা থেকে পথে নেমেই দারোগাবাবু দেখলেন, গাড়ি বোঝাই বাঁশ চলেছে। দুখানা গাড়িতে শামিয়ানা চলেছে। একটা কুলী খান চারেক মার্বেল ট্যাবলেট নিয়ে চলেছে। নূতন নবগ্রামের নবরূপের আয়োজন চলেছে। নবগ্রামের জীবনে নূতন কর্মস্রোতের ইঙ্গিত এগুলি—ঝড়ের আগে উড়ন্ত ঝরাপাতার মত। সমস্ত গ্রামের পথ দিয়ে ঘুরে এই আয়োজন ইস্কুলডাঙায় পৌঁছতে পৌঁছতে মানুষের মনগুলিকেও এই মুখী ক'রে তুলল। তখন থেকেই আরম্ভ হ'ল বোর্ডি-ডাক্তারখানার আলোচনা। সামাজিক আন্দোলনের একটি মজলিস বসবার কথা ছিল স্বর্ণবাবুর বাড়িতে, সে মজলিস কিন্তু বসল না। লোকজনও আসে নাই, স্বর্ণবাবুরও মাথা ধরেছে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রিহ্যাবিলিটেশন

একটি মাত্র পন্থা, ছেঁড়া কম্থা নিয়ে কক্ষে
পোড়া ভিটেয় বসব নিয়ে অভয়-মন্ত্র বক্ষে,
স্কন্ধকাটা করবে নৃত্য
বশংবদ হবে মৃত্যুভীত
মাভৈঃ বাণী শুনব গুরুর, তবেই পাব রক্ষে!
খুনে লড়াই চলবে না ভাই, হাজারে আর লক্ষে।

নির্ভয়েরে ভয় করে না কোথায় সে দুর্বৃত্ত,
গড্ডলিকা গর্জালেও শক্ত-পদে ভৃত্য।
সংখ্যা গুনে মিথ্যা শঙ্ক,
নিঃশঙ্কেরই বিজয়-ডঙ্কা
বাজছে শোন, জগৎ জুড়ে অভয় কর চিত্ত,
ক্ষণিক যা তা ক্ষণিক এবং নিত্য যা তা নিত্য।

যে মানুষকে পশু করে উত্তেজনার ধর্ম,
প্রেমিক জনাই জানে শুধু সেই মানুষের মর্ম।
হাল ধরেছেন সেই প্রেমিকে
বিশ্বাসীরা আর বাধি কে—
ছিঁড়তে আজো কেউ পারে নি মৃত্যুঞ্জয়ীর বর্ম,
গুরুর মন্ত্রে বলী যারা এ তাদেরই কর্ম।

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬

and this defendant further answering denies that this defendant seeking to inquire or defraud the said complainant of any right or rights to the estate in the Bill of Complaint untruly described as the joint estate or with any such view as in the said Bill is untruly stated applied to or obtained from the said Gooroodoss Muckerjee a bill of sale or conveyance of the Talooks of Govindpore and Rammessorpore aforesaid or that this defendant with the view or for the purpose in the Bill respectively untruly alleged or for any other purpose or with any other view than as hereinbefore in that behalf is mentioned caused or procured the said last mentioned Talooks to be transferred in the books of the said Collector of Burdwan into the name of this defendant and this defendant further answering denies that this defendant at any time or in any manner sought or attempted to defraud the said Complainant of any part or share of the personal estate to which the said Juggomohun Roy may have been entitled at the time of his death and this defendant positively saith that the said Juggomohun Roy at the time of his death was not entitled jointly with this defendant to any personal estate whatsoever and this defendant further answering saith that he this defendant after the said partition as aforesaid very seldom resided in the said house of Nangoorparah although he admits that until the period in the Bill in that behalf mentioned the said Complainant did live at the house at Nangoorparah as a member of a divided Hindoo family And this defendant further answering saith that the said Complainant shortly after the death of the said Juggomohun Roy did as this defendant hath been informed and believes prefer or cause to be preferred a certain complaint in the Zillah Court at Hooghly and thereby claim to be entitled to the whole of the property which belonged to his said father the said Juggomohun Roy at the time of his death and in virtue of such claim did obtain from the said Court a certain process of the said Court against a person who was indebted to the said Juggomohun Roy at the time of his death upon some judgment or Decree of the said Zillah Court obtained by the said Juggomohun Roy in his lifetime and this defendant hereby submits that the institution of such last entioned suite by the said Juggomohun Roy in his lifetime and after his death by the said complainant in the said Zillah Court it is evident that the

said Juggomohun Roy in his lifetime and the said complainant after the death of his said father respectively acted as persons who were divided in interest from this defendant And this defendant further answering denies that the said complainant at any time except by his said Bill of Complaint applied to this defendant to cause to a partition of any joint immoveable or real estate or to account with him touching any joint moveable as personal estate But this defendant humbly submits to this Honourable Court that as no property either real or personal which was of the said Juggomohun Roy the father of the said complainant in his lifetime or to which the said Juggomohun Roy was in his lifetime in any manner entitled has come to the hands possession or power of this defendant or to the hands possession or power of any person or persons to his use he this defendant would not have been bound even if this defendant had been thereto required to come to any partition or account and that this defendant is not bound to come to any partition or account with the said complainant touching the premises. And this defendant further answering saith that shortly after the date of the said instrument of partition the said Ramcaunt Roy withdrew from the house in which he had previously resided at Nangoorparah as aforesaid and went to reside at the house hereinbefore mentioned at Burdwan and that the said Ramcaunt Roy at all times afterwards until the time of his death continued to reside in the last mentioned house, separate and apart from this defendant and the said Juggomohun Roy and that the said Ramcaunt Roy at no time afterwards, returned to reside in the said house at Nangoorparah although he occasionally visited the members of his family there for short periods of time in the same manner as the said Ramcaunt Roy made occasional visits to the said Ramlochun Roy and such members of the family as resided in the said house at Radanagar and this defendant further answering saith that from the time when the said Ramcaunt Roy so separated himself from his family as aforesaid and proceeded to reside in the said house at Burdwan until the time of his death the dealings and transactions of the said Ramcaunt Roy were separate and distinct from the dealings and transactions of this defendant and of the said Juggomohun Roy respectively and the said Ramcaunt Roy as this defendant hath been informed and believes kept separate and distinct accounts of his own dealings and transactions and employed his own servants and in every other respect acted and transacted his affairs as a person separated in interest from the other members of his family

সংবাদ-সাহিত্য

সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে সমগ্র দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, এবং প্রধানত কলিকাতা শহরের ব্যষ্টিক ও সামাজিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হওয়ায় ধর্মে-কর্মে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষা-দীক্ষায় সামাজিকতায়, চিঠিপত্রে সময় ও নিয়মানুগ হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিতান্ত অপ্রত্যক্ষে অবস্থিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"কারীরা ব্যতীত সমাজের সকল স্তরের লোককেই পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আমরাও পিছাইয়া পড়িয়াছি। এই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ সান্ধ্য আইন বা কারফিউ-অর্ডার। কল-কারখানা মিল-ফ্যাক্টরি যান-বাহন আমদানি-রপ্তানি—আধুনিক জীবনের এই অপরিহার্য অঙ্গগুলি দিবসের প্রখর আলোকে তেমন ফূর্তিলাভ করে না, যেমন করে নিশীথরাত্রির অন্ধকারে। সান্ধ্যবন্ধনে সেই ফূর্তি ব্যাহত হইয়াছিল। এই কঠোর বন্ধন গত পরশু ১৩ ডিসেম্বর হইতে অপসারিত হইয়াছে। কলিকাতার "ল অ্যাণ্ড অর্ডারে"র মালিকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আর পাঁচজনের মত আমরাও "মেক আপ" করিয়া লইবার সুযোগ পাইব। সাময়িক সংঘাতের ঊর্ধ্বে যাঁহারা বিচরণ করেন, অর্থাৎ রেল-পোস্টাফিস-ট্রাম-বাসের বিপর্যয় যাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না, সেই সকল হৃদয়হীন সৌভাগ্যবানদের নির্মম অনুযোগ অতঃপর সম্ভবত আমরা এড়াইতে পারিব। পৌষের 'শনিবারের চিঠি' পৌষের বিশ তারিখের মধ্যে বাহির করিয়া মাঘের প্রথম সপ্তাহে যথারীতি পূর্বনিয়মে সগৌরবে মাঘ সংখ্যা নিষ্কাশণ করিতে পারিব আশা করিতেছি। ডাক-বিভাগকে অকারণ-প্রশ্রয়-দেওয়া মূল্যবান গালাগালি আর সহ্য হইতেছে না।

* * *

সুদীর্ঘ চারমাসব্যাপী সান্ধ্যবন্ধন রদ হওয়াতে গার্হস্থ্যজীবনে বহির্মুখী প্রতিভা যাঁহাদের, তাঁহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ঘনসান্নিধ্যে অবস্থান-জনিত তিক্ততায় পর্যবসিত প্রেম আবার মধুর হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইবে। অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য-লেন-দেনের ক্ষেত্রে অসহায় পক্ষ অক্ষমতাজাত বিলম্বের একটা সুলভ কৈফিয়ৎও হারাইল। আমরা ছাপাখানাওয়ালা ও দপ্তরীদের অসুবিধার কথাই ভাবিতেছি। কিন্তু ইহা হইল ক্ষুদ্রতর স্বার্থের কথা। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তা করিলে বলিতে হইবে, ভালই হইল।

সান্ধ্য আইন প্রবর্তনের যাহা মূল কারণ, সান্ধ্য আইন রদ করার ফলে তাহাও অনেকটা দূর হইবে। যাহারা চিরকাল সন্ধ্যার পরে জাতিধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল নগরবাসীরই পকেট অথবা গলা কাটিয়া শহরের অসাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বজায় রাখিত, গত চারমাসকাল ন্যায্য শিকারের অভাবে তাহারাই ঘোরতর সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিয়া সুবিধাজনক মহল্লায় লুঠতরাজ অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির দ্বারা অভ্যাস ও ভবিষ্যৎ বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা আবার পূর্বতন অধিকার অর্জন করিয়া নিঃশেষে সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিবে, মৃত ও নির্জীব গলির মোড়গুলি আবার ছায়াসচল হইয়া পথভ্রান্ত পথিক মাত্রেরই আনন্দবিধান করিবে, হিন্দু মুসলমান মহল্লাভেদে সাম্প্রদায়িক হানাহানি অচিরাৎ দূর হইবে। বিড়ি ও পানের দোকান এবং হোটেল ও কাফিখানাগুলি আবার চঞ্চল হইয়া উঠিবে, থানা ও আদালতে চোরে ও পুলিসে আবার চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক সহযোগিতা প্রশ্রয় লাভ করিবে, হঠাৎ-গজানো সাম্প্রদায়িক জুজুর ভয় আর থাকিবে না।

—

বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যে সকল ছাত্র প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাদের পিতা বা অভিভাবকেরা সোল্লাসচিত্তে সস্মিতবদনে উপস্থিত আছেন। যে ছাত্র কোনও ক্রমে তরিয়া গিয়াছে, তাহার পিতাও এই আনন্দ-উৎসবে যোগ দিয়াছেন। ধরিয়া লইতেছি, তিনি উদারচিত্ত ব্যক্তি, অপরের আনন্দ তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক নহে। তথাপি তাঁহার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বেতারে দিল্লীর গণপরিষদের অধিবেশনের সজীব বর্ণনা শুনিয়া সেই অনুভূতির কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। হিংসা নয়, আত্মগ্লানি। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে গিয়া পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রাদেশিক মনোবৃত্তির ক্ষমা অবশ্যই আছে।

আমাদের বর্তমান মনোভাবকে ৬১ বৎসর পূর্বে (১২৯২) রবীন্দ্রনাথ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনও সংবাদ দিবার নাই? জগতের একতান-সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

"আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনও গান বহন করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

"দেশ-বিদেশ হইতে অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজী খবরের কাগজ লিখিব? সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে? জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব?"

* * *

পাগল কমলাকান্তের "একটি গীত" ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলিতেছে—

"সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই! একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না?...

"সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্মোক্তি।...যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।...আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি,

এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য রাজধানীর চিহ্ন কই? ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্তি কই? কীর্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখচিহ্নও গিয়াছে; বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?"

অতদূরে আমাদের দৃষ্টি চলে না, আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বসিয়া আমরা বাংলার গৌরবদৃপ্ত উনবিংশ শতাব্দীরই কথা চিন্তা করিতেছি। মাত্র সে দিনের কথা সে সুখের সে গৌরবের স্মৃতি আছে, কিন্তু হায়, এই অত্যল্পকালের মধ্যে নিদর্শনও যে যাইতে বসিয়াছে! রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, সুরেন্দ্রনাথ—বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জনের বাংলা দেশ—দিল্লীর অধুনা-অনুষ্ঠিত পুরস্কার-দরবারে ইঁহাদের স্মৃতিও কি কেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে? আমাদের উঠানের মাচার লাউকুমড়ার মামলার নিদর্শন ছাড়া সেদিনের মহত্ত্ব ও গৌরবের কোন্ নিদর্শন আমরা সঙ্গে লইতে পারিয়াছি?

আত্মগ্লানি স্বভাবতই মনে জাগে, তবু স্বাধীন ভারতবর্ষের এই নবউদ্বোধন-দিবসে ফেল করিয়া যাওয়া ছাত্রের পিতার মত আমরা আনন্দই করিব, এক-জাতীয়তার বিপুল সুখে আমাদের প্রাদেশিক দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

গত কার্তিক সংখ্যায় "প্রসঙ্গ কথা"য় নোয়াখালির দুর্গতদের সেবা-প্রসঙ্গে কয়েকজন কর্মীর নামোল্লেখ করিয়াছিলাম। সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংবাদ ও বিবৃতিমাত্র আমাদের নির্ভর ছিল, খাঁটি ও নকলের তারতম্য করিবার মত জ্ঞান তখনও ছিল না, এখনও নাই। তবে যাঁহারা সেখানে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে কিছু কিছু খবর পাইতেছি। দেশ ও দুর্গত সেবার পুণ্যনামে যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্য। যাঁহারা এই সুযোগে যে ভাবেই হউক স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতেছেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ বর্তমান অবস্থায় না তোলাই ভাল। এই বিষয়ে জনৈক কর্মীর যে পত্র পাইয়াছি, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেছি মাত্র। তিনি লিখিয়াছেন—

"কলিকাতায় ফিরে এসে কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'খানা পড়েছি। "প্রসঙ্গ কথা"

মোটামোটি ভালই লাগল, তবে দু-একটা জায়গায় কিছু সত্যের অপলাপ না হ'লেও বিকৃতি থাকায় এই চিঠিখানা লিখছি। এক মাসের ওপর নোয়াখালিতে কাজ করেছি এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ফিরে যাব। পড়াশোনার তাগিদ আছে, কারণ ছাত্রজীবন আজও শেষ হয় নি। নোয়াখালির ডাকে সাড়া না দিলে ডিগ্রী পেতে পারি ভাল ক'রে, কিন্তু মনুষ্যত্ব হারাব ভয় আছে। যাক, কাজের কথায় আসি।

"শরৎবাবু, শ্যামাপ্রসাদ, কিরণশঙ্করকে উল্লেখ ক'রে যা বলেছেন সেটা নেতা হিসাবে তাঁহাদের প্রাপ্য। কিন্তু সুরেনবাবুর 'নেতৃত্ব' অথবা প্রেরণা নোয়াখালির অথবা ত্রিপুরার কোথায় আপনি দেখেছেন? চৌমুহানিতে আমি ছিলাম। সুরেনবাবুও সেখানে ছিলেন। কিন্তু যোগেন মজুমদারের একটি ঘরের বাইরে তিনি অথবা লাবণ্যপ্রভা দত্ত যান নি, এ কথা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোথাও তিনি যান নি, এ কথা কি আপনি জানেন? অবশ্য তিনি দত্তপাড়া গিয়েছিলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। আর সতীন সেনকেই বা আপনি কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? সতীশ-বাবুর সম্বন্ধেই শুধু আপনার স্তুতিবাদ সত্য, কারণ তাঁর মনের বল তিনি দেখিয়েছেন প্রশংসনীয় উপায়ে।

"মহিলাদের মধ্যেও কয়েকজনের আপনি নাম উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনীর কথা আমাদের ভোলা শক্ত হবে, এ কথা সত্যি। কিন্তু বীণা দাসকেও আপনি তাঁর পংক্তিতে স্থান দিলেন কোন্ সংবাদের ওপর ভিত্তি ক'রে? শ্রীযুক্তা দাস ২।১ দিন ঘুরে এসে কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন। তাই ব'লে আপনার তাঁকে বড় করা উচিত হয় নি। লীলা রায়ও উল্লেখযোগ্য কিছু করেন নি। A. I. W. C.'র ফুলরেণু গুহ, রেণুকা রায় প্রভৃতির প্রশংসা শুধু বরদাস্ত করা যায়। নোয়াখালির সেবায় যাঁরা stick করেছেন তাঁদের আপনি প্রশংসা করুন ক্ষতি নেই। কিন্তু যাঁরা নেতৃত্ব বজায় রাখতে, জনসাধারণকে ধোকা দিতে, শুধু মজা দেখতে নোয়াখালি বেড়িয়ে এসে কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন সবজান্তার ভূমিকা নিয়ে, তাঁদের মুখোশ অন্তত আপনি খুলে দেবেন আশা ছিল। বহু নেতা এবং নেত্রীর ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলেছে, নোয়াখালির পর আবার অনেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন এই কঠিন পরীক্ষায়। যাঁর যা প্রাপ্য তাঁকে তাই দেবেন, এই আশা নিয়েই 'শনিবারের চিঠি' পড়ি। সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। নামটা প্রকাশ করুন প্রয়োজন হ'লে। ইতি নোয়াখালির দুর্গত অঞ্চলের জনৈক কর্মী।"

—

ভারতবর্ষ আজ বৃহত্তম পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে—অনেকে

এইরূপ মনে করিতেছেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়ও নানাবিধ সমস্যা আসিয়া জুটিতেছে, যেগুলি একেবারে আধুনিক। ধনিক-শ্রমিক জমিদার-চাষীর পুরাতন সম্পর্ক সম্পূর্ণ নূতনরূপ পরিগ্রহ করিতেছে; রাশিয়া ও ইংলণ্ডে ইন্‌কর্পোরেটেড অনেক পার্টি-নামধেয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় শাখাগুলি লুটিয়া-পুটিয়া খাইবার জন্য সমস্ত এলোমেলো করিয়া দিবার তালে আছেন। ইঁহারা অতিশয় কৌশলী। দেশ ও জাতির কল্যাণের মুখোশ পরিয়া শনৈঃ শনৈঃ সুনিপুণ প্রোপাগাণ্ডার সহায়তায় ইঁহারা কল-মিল-ফ্যাক্টরী-কারখানা হইতে সমাজ-জীবনের মর্মস্থলে আঘাত হানিতেছেন; ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ভাঙন দেখা দিয়াছে। ইহার উপর অনেক নূতন সমস্যা লইয়া ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিরোধ মুহুর্মুহু ব্যাপক আকারে উপস্থিত হইতেছে। ধর্মান্তরিতকরণ, নারীহরণ, পৈশাচিক বিবাহ, গৃহ ও গ্রাম ত্যাগে বাধ্য নিরাশ্রয় গ্রামবাসীর আশ্রয় ও আহার সমস্যা—মোটের উপর আমরা যে মন্বন্তরের দ্বারদেশে আসিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ধর্ম ও লোকাচারকে আশ্রয় করিয়া সাধারণ অসহায় মানুষ এইরূপ সময়ে মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, সাময়িক প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাহারও সংস্কার প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে এইভাবে বিভিন্নকালে বিভিন্ন সংহিতার জন্ম হইয়াছিল। গত আগস্ট মাস হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল দুর্ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটিয়া গেল, তাহার ফলে আবার নূতন করিয়া সব ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন ঘটিতেছে। দেখিতেছি, সমাজপতিরা দফায় দফায় বিবিধ বিধান দিতেছেন; কেহ বলিতেছেন, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে; কেহ বলিতেছেন, তাহা অনাবশ্যক। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখেও ক্রুদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইতেছেন দেখিতেছি। তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, গুণ্ডাদের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা সকলেই শিক্ষিত নহেন, লৌকিক সংস্কারের জড়তা অনেকের মধ্যেই বর্তমান। যাহারা বিনা দোষে ও অকারণে লাঞ্ছিত হইয়া নিজেদের পতিত মনে করিয়া গ্লানি অনুভব করিতেছে, তাহাদিগকে সহজ ও সুস্থ করিবার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় তাহাদের বিশ্বাস আছে তাহাই করিতে দিতে হইবে। বিবিধ সংহিতার যে সকল বিধান আজ আমরা অনাবশ্যক ও হাস্যকর বলিয়া মনে করিতেছি, সময়ের প্রয়োজনে আর্ত ও পীড়িত মানুষকে সাহস ও সান্ত্বনা দিবার জন্যই সেগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল সংহিতার

অনেকগুলির প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরাইয়াছে, নূতন বিধান দিবার ব্যবস্থার অভাবে অনেকগুলিকে যুগে যুগে প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। পরাশরসংহিতা ও মনুসংহিতা অতিশয় পুরাতন, কিন্তু সংহিতাকারেরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বহুক্ষেত্রে একালের প্রয়োজনও তাঁহারা মিটাইতে পারিতেছেন। পরাশরসংহিতার দশম অধ্যায়ের ১৭-২৬ শ্লোক-বর্ণিত ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন হইলে প্রযুক্ত হইতে পারে। বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রাচীন আর্যাবর্তে কোথাও অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সংহিতার শ্লোকগুলির মর্ম ভাষায় এইরূপ—

"বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, মারীভয়ের সময়, বিপক্ষ রাজা কর্তৃক বন্দী হইবার সময় কিংবা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময় সর্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে (১৭) যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশ জন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে।(১৮) সে এক রাত্রি নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দম পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে।(১৯) তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে।(২০) তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং স্বর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে।(২১) তৎপরে যতদিন পুনর্বার না ঋতুমতী হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে। এবং যে পর্যন্ত ব্রত অনুষ্ঠান করিবে সে পর্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে।(২২) এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে ও দুইটি গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে। এই মত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ লাভ হইবে ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই এক রূপ। সুতরাং তাহা একেবারে দূষণীয় হয় না (২৪) বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কিংবা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সান্তপনব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধ লাভ করিবে।(২৫) যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপকর্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। (২৬)"

বহু শতাব্দী পূর্বে সদ্যোজাত ইসলামধর্মের দিগ্বিজয়ী বীরেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া সিন্ধুদেশে যখন প্রথম আঘাত হানিয়াছিলেন, তখনই

তদানীন্তন হিন্দুসমাজ বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ও ধর্ষিতাদের লইয়া বিব্রত হইয়াছিল। সমাজপতিরা তখন সজীব ও সচেতন ছিলেন। এই সকল তথাকথিত পতিতদের সমাজে পুনঃগ্রহণের জন্য 'দেবলসংহিতা' নামক একটি সংহিতা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সংহিতার ব্যবস্থা বর্তমানে সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই সংহিতাখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যদি কাহারও নিকট মুদ্রিত বা পুথির আকারে ইহার প্রতিলিপি থাকে, তিনি তাহা যে ভাবেই হউক প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। আমরাও প্রকাশের দায়িত্ব লইতে রাজি আছি।

* *

কিন্তু সমাজকে ভাঙনের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল প্রক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সাময়িক, আপাতবেদনানিবারক প্রলেপ মাত্র। আসলে নব মন্বন্তরের মুখে ভারতীয় সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য নূতন সংহিতা রচনার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ইহার জন্য শিক্ষিত ও সহানুভূতিশীল মনীষীদের সমবেত চিন্তা ও চেষ্টা প্রয়োজন—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান—কোনও ধর্মের আশ্রয়ে এই সমাজ নয়; হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ইহা ভারতীয় সমাজ হইবে। ধর্ম হইবে গৌণ, মুখ্য হইবে দেশ অর্থাৎ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বর্ণাশ্রম অথবা চতুরাশ্রম—এই সমাজের ভিত্তি কি হইবে পণ্ডিতেরা তাহা নির্ধারণ করিবেন। ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে আসমুদ্র হিমাচল এক-ভারতীয় সমাজ গঠন ছাড়া উপায় নাই। ইহাতে কোনও বিশেষ ধর্মের প্রভাব মাত্র থাকিবে না, ভারত ও ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে ইহার একমাত্র কাম্য। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে এই ভারতীয় সমাজের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইবে, তাঁহারা ধর্ম ও আচারের অত্যাচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিবেন।

ভারতবর্ষের বহু মনীষী এইরূপ একটি সমাজ-গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কাহারও স্বপ্ন বাস্তবের রূপ ধরিবার অবকাশ পায় নাই। এই প্রসঙ্গে আজ সর্বাপেক্ষা অধিক স্মরণ হইতেছে সন্ন্যাসী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে। তাঁহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও এককালে এই ভারতীয় সমাজ-গঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় নিজে রোমান-ক্যাথলিকপন্থী খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। তাঁহার এই সমাজ-গঠনের স্বপ্ন একটা নির্দিষ্ট রূপ লইয়াছিল। আজিকার দিনে এই সমাজ-গঠনের প্রয়োজন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এ যুগের

চিন্তানায়কেরা উপাধ্যায়ের 'সমাজ'-চিন্তা হইতে বহু বাস্তব নির্দেশ পাইবেন। আমরা তাঁহার চিন্তাধারার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা আগেই বলা যাউক। হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন ধর্ম্মমতের অপেক্ষা করে না। সাংখ্যদর্শন বেদান্তের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তত্রাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু ঋষি। বৈষ্ণব-চূড়ামণি রামানুজ বেদান্তের অদ্বৈতবাদী আচার্য্যদিগকে মায়াবাদী ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে কোন বৈষ্ণব শিবমন্দিরের ছায়াস্পর্শ এবং শৈবদিগের সহিত আহারাদি করেন না। মাধ্বাচার্য্য আবার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চমকারসাধক ছাগমহিষ-হননকারী শাক্তের সহিত নিরামিষাশী জৈনের এত প্রভেদ যে বর্ণনায় কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু শৈবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু, বৈষ্ণবও হিন্দু এবং জৈনকেও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। যদি মতামত লইয়া হিন্দুত্ব গঠিত হইত তাহা হইলে হিন্দুসংজ্ঞা অনেক দিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

"হিন্দুর হিন্দুত্ব আহারপান বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। এক মহামাংস ভক্ষণ ব্যতীত খাদ্যাখাদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শিখেরা শূকর মাংস ভক্ষণ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা ও পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কুক্কুটমাংস ভোজন করে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদিরা পান করে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাশী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কুলকে পতিত ও ভ্রষ্ট মনে করে। এমন কি পুরাতন সংহিতাকারগণ মহামাংস ভোজনেরও বিধি দিয়াছিলেন। এখন কাহাকে হিন্দু বলিব এবং কাহাকে হিন্দুত্ব হইতে অপসারিত করিব? মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বা শিখদিগকে ছাড়িয়া দিলে হিন্দুজাতি যে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যদি হিন্দুত্ব ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধিনিষেধের উপর নির্ভর না করে তবে হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা কোথায়? কোন্ আলম্বে হিন্দুর জাতীয়তা আলম্বিত আছে?

"হিন্দুত্বের ভিত্তি, হিন্দুত্বের সার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা।...

"অনেকে হিন্দু-চিন্তার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মমতসমূহ মিশাইয়া ফেলেন। তদ্রূপ য়ুরোপীয় চিন্তা বলিতে য়ুরোপে প্রচলিত ধর্ম্মমত বোঝেন। এইরূপ অযথা ধর্ম্মারোপ ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর প্রভবস্থান পুরাতন গ্রীকদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, চিন্তাপ্রণালী ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্। হিন্দুস্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে;—

বেদাবভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং—

কিন্তু সমাহিত হইয়া দেখিলে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় যে একই চিন্তাস্রোত, সকল বিভিন্নতার নিম্নদেশে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। সেই একনিষ্ঠচিন্তার গতি নির্দ্ধারণ করা যাউক।"

"আর্য্য ঋষিদের আধ্যাত্মিকদর্শনে একনিষ্ঠতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্য্যকারণপরম্পরার সুদীর্ঘ সূত্র ধরিয়া আবিষ্কারণে উপনীত হইতেন না। কোন শক্তিশালী বা জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিলে সেই প্রকাশের অন্তরে প্রকাশ কর্ত্তাকে দেখিতে পাইতেন। ঘোরকৃষ্ণজলদজালের আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিলে যদি বলা যায় যে তপনতপ্ত জলকণার সমবায়ে এই পয়োবাহের জন্ম হইয়াছে তাহা হইলে মীমাংসার কোন ব্যবস্থা হয় না। প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই, যাহা ছিল না তাহা কিরূপে হইল। মেঘ ছিল না মেঘ হইয়াছে, মেঘের উৎপাদক পূর্ব্ববর্ত্তী জড় প্রক্রিয়া ছিল না হইয়াছিল; এইরূপে যতই আমরা পশ্চাতাপে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাই না কেন অসত্যের হাত হইতে এড়াইতে পারিব না। যদি কোটি যোজন ভ্রমণ করি বা কোটি যুগকে অতিক্রম করি তথাপি নাস্তির রাজ্য অনুলঙ্ঘনীয়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে-ই বলে আমি ছিলাম না হইয়াছি, আমি আদিতে অসৎ অন্তেতে অসৎ কেবল মধ্যেতে সদ্রূপে প্রতিভাত। কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া চলিলে এক মহতী অবস্থার মধ্যে হারাইয়া যাইতে হয়। অন্ধকে চলিতে দেখিলে চক্ষুষ্মান্ চালকের অনুসন্ধান করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অন্ধের সমষ্টিতে চক্ষুষ্মতার উৎপত্তি হয় না। অসৎ, জঙ্গম, অস্থাবর, নামরূপসমন্বিত প্রপঞ্চের অন্তরেই সৎ, স্থির, স্থাবর, অনাম, অরূপ, সারবস্তু বাস করে। ঋষিরা ক্রিয় ও ক্রিয়াফলের অপেক্ষা না করিয়া দৃশ্য বস্তুর গর্ভে একেবারেই অদৃশ্য হিরণ্য-গর্ভকে দেখিতেন। এই দৃষ্টিকে একনিষ্ঠতা বলে।...

"একনিষ্ঠ চিন্তাপ্রবণতা, বস্তুর বস্তুস্বদর্শন, কর্ত্তা এবং কার্য্যের পারমার্থিক অভেদানুভূতি ঋষিদের মানিকতা জ্ঞানই হিন্দুর হিন্দুত্ব। বেদে ইহার আরম্ভ এবং বেদান্তে ইহার পরিণতি। এই আধ্যাত্মিক দর্শন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। ভিন্নকে অভিন্ন করা, অনেককে একীভূত করা বর্ণবিভাগের উদ্দেশ্য। যে দিন হইতে এই একনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার হ্রাস হইতে লাগিল, যে দিন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে ভারতের অধঃপতন। আজ কোথায় সেই একনিষ্ঠতা! পাশ্চাত্য বিদ্যা লাভ করিয়া আর্য্য সন্তানেরা বহুনিষ্ঠ ও বর্ণাশ্রমবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন না ঋষিদের অভেদবৃষ্টি এবং বর্ণধর্ম্ম পুনরাবির্ভূত না হয় ততদিন ভারতের উত্থান অসম্ভব। অনুকরণে যতদূর উৎকর্ষ হইতে পারে হইবে, কিন্তু অভিমজ্জাগত উন্নতি হইবে না।...

"একনিষ্ঠার অভ্যুদয়চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা যেন য়ুরোপীয় বহুনিষ্ঠার বিরোধী না হই। এই বহুনিষ্ঠা আমাদের জাতীয়তাকে পোষণ করিবে। যেমন আমাদের দেশে

বৃক্ষ সকল য়ুরোপীয় বিজ্ঞানপ্রভাবে পরম শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তা সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে। অশ্বত্থকে ইংলণ্ডে রোপণ করিলে বিজ্ঞানের সহায়তা তাহার কোন কাজে আসে না। হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে এবং য়ুরোপীয় হয় তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে তাহা হইলেই তাহাদের ইহপরকালে মঙ্গল হইবে। নিজের ঘর ছাড়িও না, অ-প্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও। তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্দ্ধিত হইবে এবং সুফলসম্পন্ন হইবে।

"কথায় বলে, "তিন শত্রু রিতে নাই।" কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকোপে আমাদের জাতীয়-জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়। যেমন ত্র্যহস্পর্শের তিথিগুলি একে একে ভাল, কিন্তু সংস্পর্শবশতঃ পড়ে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি তাঁহারা দেশকালভেদে নিজে নিজে ভাল হইলেও সম্মেলন-সংঘর্ষহেতু মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কাহারা?

"প্রথম।— বৃথাভিমানী 'হিন্দু'-'হিন্দু'-রব-নির্ঘোষকারী গোঁড়ার দল। তাঁহাদের নিকটে সনাতনে ও নূতনে, আর্য্যে ও অনার্য্যে, ভগবদ্গীতায় ও মনসা-ঘেঁটুর গীতে কোন প্রভেদ নাই। অনুষ্টুপ্ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইলেই, তাহাতে যাহাই থাকুক না কেন—আচার, অনাচার, বামাচার—তাহা বেদ। বেদশাখা যদিও ইঁহাদের কর্ণকুহরে কখনও প্রবেশ করে নাই, তথাপি ইঁহারা শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, বেদে বাষ্পযান ও ব্যোমযানের কথা উল্লিখিত আছে—নহিলে রেলগাড়ী চড়িয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছবিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতেন না। …এই গোঁড়ারাই দশের গাঁড়ার শত্রু।

দ্বিতীয়। ইংরাজিনবিশ হিন্দুনামধারী রামপক্ষীভক্তীর দল। ইঁহাদের যে পাঠ পড়াও, সেই পাঠই পড়েন। "রাধাকৃষ্ণ" বলাও, তা-ও বলেন, "কালীকল্পতরু" ভজাও, তাও ভজেন। ইংরাজি সভ্যতার প্রথমাবেগে শ্বেতাঙ্গগুরুদেবেরা শিখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুরা চিরকালই ইষ্টককাষ্ঠ পূজা করিয়া আসিতেছে—ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু তাহারা জানিতও না, জানেও না। অমনি তথাস্তু বলিয়া হ্যাটকোটরূপ চূড়াধড়া পরিধান করিয়া কাঁটাচামচ বাজাইয়া সাহেবী পন্থা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার আজ সেই শ্বেতাঙ্গদেবেরা শিখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা অধ্যাত্মদর্শনের অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারবিদ্যায় তাঁহারা বড় একটা মন দিতেন না। ধর্ম্মমতে হিন্দু হওয়া চাই, কিন্তু যেখানে রাজনীতি, সমাজনীতি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ব্যাপার, সেখানে য়ুরোপীয় হওয়াই উচিত।…

তৃতীয় ।—সমন্বয়বাদীর দল। এঁরা জোড়াতাড়া দিয়া একীভূত করেন। আমাদেরও কিছু আছে, ওদেরও কিছু আছে, সকলেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আছে। এই বিকীর্ণ 'কিঞ্চিৎ'-গুলা জড় করিয়া একটা স্তূপ বাঁধিলে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য লাভ করা যায়। হিন্দুরা বলে, জগৎ অলীক, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। আর হারবার্ট স্পেন্সর বলেন, জগৎই একমাত্র সত্য, ব্রহ্ম বলিয়া কোন পদার্থ আছে কিনা জানা যায় না। এস, দর্শন ও বিজ্ঞানকে মিলাইয়া দাও এবং পূর্ণ সত্য গ্রহণ কর। ব্রহ্ম সৎপদার্থ বটে, কিন্তু একাকী নহে। পাঁচটা ভূতও সৎ ও তাঁর চিরসঙ্গী। আমরা বড় ধ্যান করিতে ভালবাসি, সদাই স্তিমিতলোচন, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল দৌড়ঝাপ করে; এস আমরাও দৌড়াই, কিন্তু চক্ষু মুদিয়া। হিন্দুরা ঈশ্বরপরায়ণ, আর ম্লেচ্ছেরা সংসারভক্ত; যদি পূর্ণতা লাভ করিতে চাও, তবে ঈশ্বর ও সংসার, দুই সমান মাত্রায় বজায় রাখ। আমরা কদলীপত্রে ভোজন করি, আর সাহেবরা টেবিলে খায়; এস আমরা টেবিলে কলাপাতা বিছাইয়া খাই। সকলেরই মন রাখা উচিত, কাহাকেও ছোটবড় করা ভাল নয়। দুই জমিদার সমান ঘুষ দেওয়াতে কোন এক ন্যায়বান্ মুন্সেফ রায় দিয়াছিলেন—এক পক্ষের অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্, অপর পক্ষেও অর্দ্ধেক ডিক্রী অর্দ্ধেক ডিস্‌মিস্। পুরাতন সভ্যতা উপহার লইয়া উপস্থিত, নূতনও ভেট পাইয়াছে, এখন কাহাকে ছাড়ি, কাহাকে ফেলি। দু'জনেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া একটা পুরা-সভ্যতা গঠন করা চাই। তুফান হইতেছে। মুসলমান মাঝি আল্লার দোহাই দিল, আর পৌত্তলিক হিন্দু আরোহীরা 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিল। কিন্তু আল্লাও মানিল না, দুর্গাও মানিল না। ইহা দেখিয়া ইংরেজী-সংস্কৃত-পড়া একজন বাবু "দুর্গা আল্লা" "দুর্গা আল্লা" বলিতে আরম্ভ করিল। এই সমন্বয়ের প্রভাবে নৌকা ভরাডুবি হইল, কি ঘাটে পঁহুছিল, তাহা জানা যায় নাই।...

"একজন 'হিন্দু'-শব্দের অর্থ করিয়াছে—"হীন" ও "দুষণদায়ক"। বাস্তবিকই হিন্দুস্থানের হীনতার অবধি নাই। হিন্দু নিঃস্ব হইয়াছে। এই দুর্দ্দশার প্রতীকার আবশ্যক। পশ্চাতে হটিয়া যাওয়া যায় না এবং দাঁড়াইয়া থাকাও শ্রেয়স্কর নহে। অগ্রসর হইতেই হইবে। এখন কোন্ প্রণালীতে আমাদের গতিবিধি নিয়মিত করা উচিত?

"প্রথমে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আবশ্যক। আমাদের কিছু আছে, আমরা অসার নহি, এইরূপ বোধ হওয়া চাই।

"সমাজসংস্কার বিষয়ে এইরূপ আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই সেই ভিত্ত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিলে কেহ যেন বর্ত্তমান কর্ম্মভ্রষ্ট শতবিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব, কিন্তু

বর্ণাশ্রমধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয় প্রথা বর্ণধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকরী হইবে, ন'হলে বিষফল ফলিবে।

"রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রণালী। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে, আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না। য়ুরোপ হইতে ইহার আমদানি করা আবশ্যক। য়ুরোপে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এদেশে ভোট চালাইব। কিন্তু অবহিত হইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, য়ুরোপের রাজতন্ত্র অর্থোন্নতি-সাপেক্ষ। ব্যবসায়ী বণিকেরা রাজাকে অর্থের লাভ বা হানি দেখাইয়া যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে বাধ্য করিতে পারে। কোন বিধান বা ব্যবস্থা ধনাগমের সহায় না হইলে একেবারে পরিত্যক্ত হয়। য়ুরোপের রাজশক্তি তরবার ও সুরাজীবীদিগের অর্থলালসার দ্বারা চালিত। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে চাহি না; কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যদি অর্থকরী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুর্দশার আর সীমা থাকিবে না। যাহার ধন আছে, যে রাজস্ব দিতে পারে, সে-ই ভোটের অধিকারী এবং সেই অর্থগত ভোটের উপর হিন্দুস্থানের রাজতন্ত্র স্থাপিত হইলে, বড়ই এক গোলযোগ বাধিবে। হিন্দুর রাজ্যশাসনপ্রথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অস্ত্রজীবী কর্তৃপক্ষ এবং বণিক সম্প্রদায়ের উপর রাজার শক্তি বা শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যাঁহারা জ্ঞানী অথচ অর্থহীন, যাঁহারা অস্ত্রসঞ্চালন করিতেন না, ক্রয়বিক্রয়ের অপেক্ষা রাখিতেন না, এইরূপ সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক-শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের অধিকার ভোট হইতে উদ্ভূত হইত না বা ভোটে বিনষ্ট হইত না। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈরাগ্যের উপর ঐ শাসন-বিধাতৃগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলদৃপ্ত নৃপতি ও অর্থলোলুপ বৈশ্য ঐ সুধীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইত। এই পুরাতন হিন্দু শাসন-প্রণালীই য়ুরোপীয় প্রণালী অপেক্ষা ভাল কি মন্দ, তাহা আপাততঃ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা জাতীয়তা-ভ্রষ্ট হইতে না চাহি, তাহা হইলে আর্য্য রাজনীতি-প্রথাকেই আমাদের নূতন রাজতন্ত্রের ভিত্তি করিতে হইবে। তাহার উপর যত ইচ্ছা ভোট চড়াও ক্ষতি হইবে না।"

—

দীর্ঘকাল আমরা স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলাম। 'শনিবারের চিঠি' প্রধানত সাহিত্য-পত্রিকা, কিন্তু আমরা কালধর্মে ও স্থানমাহাত্ম্যে কিছুকাল ধর্মভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এইজন্য নানা তরফ হইতে অনুযোগের অন্ত নাই। শাশ্বতের প্রতি আস্থা রাখিয়া সময়ের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই বলিয়া আমরা লজ্জিত।

হাঙ্গামা ধীরে ধীরে চুকিবে বলিয়া মনে হইতেছে, আমরা আবার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব আশা করিতেছি। চারিদিকে হাতড়াইতে গিয়া

দেখিতেছি, শুধু আমরা নহি, বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজের উপর দিয়াই যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মুখে কোটর-আশ্রিত পক্ষীর মত অনেকেই হাত-পা গুটাইয়া প্রহর গনিয়াছে, পূজার বাজারে কোনও রকমে একবার জলঝড়ের মধ্যেই আকাশ বিহারের চেষ্টাও কেহ কেহ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ একেবারে বেপরোয়া—আউট হইয়া যাক প্রাণ তবু একবার দেখিয়া লইব—এই মনোভাব লইয়া গভীর ক্লেদাক্ত পঙ্কে নামিয়াছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাপারে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হইয়াছেন। অভিজাত পত্রিকা 'পরিচয়ে'র কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "জীয়ন্ত" উপন্যাসের কয়েকটি পংক্তিতে তিনি ভাব ও ভাষার যে উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, তাহার পরে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কর্তব্য ও বক্তব্য আর কিছুই থাকে না। বর্তমানে ছেলেপিলে লইয়া ঘর করি, সুতরাং উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তাই বলিয়া এই কয় মাসে ভাল কাজ যে কিছু হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। গত কয়েক মাসে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তক দৃষ্টে আনন্দ লাভ করিয়াছি। আগামী সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে সেগুলির পরিচয় প্রদান করিব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা যতই চালাক করুন, এখানেই আমাদের আশা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২১ ও ২২ খণ্ড বাহির করিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান অসুবিধার মধ্যে এগুলিকে ইংরেজীতে অ্যাচিভমেণ্ট বলা যাইতে পারে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে অদম্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার মধ্যেই তাঁহার "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র পুষ্টি সাধন করিয়া চলিয়াছেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্ভরযোগ্য জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী আমরা লাভ করিয়াছি। রাজকৃষ্ণ রায়ের নূতন সংস্করণে অনেক অজ্ঞাত নূতন তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। মোটের উপর বাংলা সাহিত্য দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যেও কয়েকজনের বেয়াড়াপনা সত্ত্বে কল্যাণের পথ ভোলে নাই।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

"এই পত্রিকাখানি বহু মূল্যবান কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, চিত্র এবং তথ্যে পূর্ণ হয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা-কাজে এবং পত্রিকার অঙ্গসজ্জায় এমন নিপুণ মনোযোগ আর কোনো কাগজে দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অপ্রকাশিতপূর্ব বহু সংবাদই শুধু নয়, দেশের শিল্প, সাহিত্য এবং ঐতিহাসিক বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।..."

"বিশ্বভারতী পত্রিকা নিয়মিত না পড়লে সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতির একটা বড় ভোজ থেকে পাঠক নিয়মিত বঞ্চিত থাকবেন।..."

"প্রত্যেকখানি সংখ্যা স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একখানি গ্রন্থ। প্রচুর চিত্রশোভিত, উৎকৃষ্ট ছাপা। প্রতি সংখ্যার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত কবিতা ও চিঠি। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই এক-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি-সম্পর্কেও পৃথক আলোচনা থাকে সেজন্য এই পত্রিকা অতি মূল্যবান। যাঁহারা সাহিত্যপ্রিয় এবং যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্পর্কে নিত্য নূতন সংবাদ পাইতে চান তাঁহাদের এই পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।..."

—যুগান্তর

"The latest issues of the Bengali literary quarterly published by the Visva-Bharati maintain the very high standard of literary excellence the journal has attained in its brief career. Each issue contains several unpublished writings of Rabindranath as also many interesting contributions from the pens of distinguished writers.···Booklovers surely connot afford to be without a copy of this excellent quarterly journal.······

—HINDUSTHAN STANDARD

॥ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়:— শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র ও বৈশাখ-আষাঢ়। বার্ষিক মূল্য (রেজেষ্ট্রি ডাকে) ৫৷৹। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪৷৹।

পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণীয়:

কর্মাধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা

৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

কুন্তলশ্রীর স্নিগ্ধ মন্দাকিনী
কাঞ্চন
কাবেরী
বসন্ত মল্লিকা
প্রিয় কেশ তৈল
KANCHAN
কোণার্ক কেমিক্যাল

চাঁদের ভাগ্যলিপি

'অদূর ভবিষ্যতে চাঁদ পৃথিবীর বিপদ-গণ্ডিতে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে পড়বে দুটি অংশে। তারপর এই করো দুটি আবার ভেঙে পড়বে, গুঁড়ি হতে থাকবে দূর থেকে দূরতর চাঁদের দল, তখন দিনে-রাতে সব সময়ই চাঁদের আলোর একটানা বর্ষণ চলবে পৃথিবীর উপর।' অবিশ্যি এ-ঘটনা দেখে যাবার সৌভাগ্য আমাদের হবে না, কারণ পাঁচকোটি বছরের মধ্যে এ-অপঘাত ঘটবে বলে মনে হয় না।

রামধনু

পুরাকালে হিব্রুরা মনে করতো: 'রামধনু আকাশে নিবদ্ধ বাস্তব একটা-কিছু, ভগবান ও মানুষের মধ্যে একটা চুক্তির নিদর্শন, চেকের উপর স্বাক্ষরের মতোই এর বাস্তবতার মাত্রা।' এখন জানা গেছে এই বাস্তব রামধনু নিছক ভ্রান্তিমাত্র। বৃষ্টির ফোঁটা সূর্যের আলোকে নানা রঙের রশ্মিতে বিভক্ত করে; যে-রঙিন রশ্মি একজনের চোখে এসে পড়ে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির চোখে পড়তে পারে না, তাই দুজনের পক্ষে একই মুহূর্তে একই রামধনু দেখা অসম্ভব।

—বলেছেন বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্‌স জিন্‌স্‌

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় পৌঁছে দিতে জিন্‌স্‌-এর দক্ষতা অপরিসীম। এই তথ্যের পরিচয় মিলবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ 'বিশ্ব-রহস্যে'। আজ আমাদের দেশের বৃহত্তম অংশে যে কুসংস্কার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার চিন্তায় যে এসেছে এক সর্বনাশে জড়তা—তার কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা ও অবাস্তবিকতা। এই চরম দুর্গতি থেকে তাকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণের উপযোগী করে লেখা জিন্‌সের বইগুলির বাংলায় অনুবাদ করার ভার আমরা গ্রহণ করেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের যে সব সমস্যা স্বভাবতই আগ্রহের সঞ্চার করে তাদেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান এই গ্রন্থে।

অনুবাদ করেছেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তাঁর দক্ষতা আছে;—'পৃথি-পরিচয়', 'জীবজগৎ-পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থ তার সুস্পষ্ট পরিচয়। ভাষা প্রয়োগে তাঁর নিপুণতা আছে, নির্মমতা নেই। সচিত্র। মজবুত বাঁধাই। দাম ৩্। প্রকাশক: সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০

সূচী

পৌষ ১৩৫৩

শনিবারের চিঠির অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৫০ ও ষাণ্মাসিক ২।৶০ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৶০ ও ২।৵০ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩।০। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৶১০ ভি. পি.তে ।৶০। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

নবতম উপন্যাস

(১ম পর্ব্ব) ৩।।০

(২য় পর্ব্ব) ২৸০

বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক
ঘটনার পটভূমিকাকে কেন্দ্র ক'রে
লেখক অতি নিপুণতার সহিত ফুটিয়ে
তুলেছেন এই দীর্ঘ উপন্যাসটিকে।

তাসের ঘর ২।।০

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সুখ এবং দুঃখের সবুজ-সজীব আলেখ্য।

কণ্ট্রোলের শাড়ী ২৲

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত বাঙ্গালা জীবনের নিখুঁত চিত্র।

—নাটক—

রীতিমত নাটক	প্রাণের দাবী	আত্মাহুতি
পি-ডাব্লিউ-ডি	রাঙা রাখী	অসবর্ণা
সিঁথির সিন্দুর	কবি কালিদাস	মন্দির প্রবেশ
শক্তির মন্ত্র	হাউস্ ফুল	ত্রিমূর্ত্তি
সত্যের সন্ধান	নারী-ধর্ম্ম	আঁধারে আলো

রথের ঠাকুর (কাব্য-নাটিকা) ১৲

চলন্তিকা নাটক-নভেল এজেন্সি
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্নিগ্ধতায়...
কেশবর্দ্ধনে...
সংরক্ষণে...
প্রসাধনে...

প্রতি ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের দেহকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে যে যন্ত্রটিকে সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় সেটি হচ্ছে লিভার। আর এই লিভার শরীর রক্ষা ও পোষণের কাজে এতই প্রয়োজনীয় যে তার কাজ বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা, সামান্যমাত্র শ্লথ হলেই মানবদেহের স্বাস্থ্যহানি হতে বাধ্য। তাই এই লিভারের কর্ম্মশক্তি যাতে সব সময়ে অটুট থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—এবং লিভারের বিন্দুমাত্র অসুস্থতাকে ভবিষ্যতের বড় বিপদের ইঙ্গিত মনে ক'রে তখনই প্রতিকার করা উচিত।

লিভারের স্বাস্থ্যরক্ষায় **কুমারেশ** অপরিহার্য; কারণ লক্ষ লক্ষ রোগীর লিভার ও পেটের পীড়া নিরাময় করার ফলে **কুমারেশ** আবিসংবাদিত আমাশয় ও অজীর্ণ, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, পুরাতন ও জটিল কোষ্ঠবদ্ধতা, সূতিকা, গর্ভাবস্থার অজীর্ণ, শিশু-যকৃৎ, শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন পেটের পীড়া প্রভৃতি লিভার ও পেটের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ ঔষধ ও প্রতিষেধক ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।

ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল লেবরেটরী লিঃ

সালকিয়া :: হাওড়া

"অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন। এই শক্তি যখন পৃথিবীর উপরে প্রকাশ পায় তখন তার ক্রিয়া হয় প্রাণের ও জড়ের স্তরে; বাহ্য জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এ শক্তিটী অপরিহার্য্য।"

—শ্রীঅরবিন্দ

গ্লোব নার্শরীর নূতন ষ্টল

হাওড়া ষ্টেশনে শুভ উদ্বোধন

গত ২১ ডিসেম্বর শনিবার গ্লোব নার্শরীর নূতন ষ্টলের শুভ উদ্বোধন হইয়াছে। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী এই শুভ কার্য্যের পৌরোহিত্য করেন। বিভিন্ন স্থানের রেলযাত্রীদের সুবিধার্থে এবং অধিকতর খাদ্যোৎপাদন পন্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য এই দুর্দ্দিনেও হাওড়া ষ্টেশনে ষ্টল করা হইল। প্ল্যাটফর্ম্মের মধ্যস্থানে অবস্থিত হওয়ায় যাত্রীদের চিত্তবিনোদন হইবারও সম্ভাবনা।

এই ষ্টলে সকলপ্রকার বীজ, গাছ, চারা, ফুল ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষিপুস্তক পাওয়া যাইবে। যাহাতে যাত্রীরা সুবিধামত ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি পান তাহার জন্যই হাওড়া ষ্টেশনে এই ষ্টলের শুভ উদ্বোধন হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্লোব নার্শরী, উহার সত্বাধিকারী মিঃ এ, এন, রায় কর্ত্তৃক ১৯১৮ সালে শ্যামবাজারে অতি সাধারণ একখানি কাঁচা ঘর স্থাপিত হয়। মিঃ এ, এন, রায় পূর্ব্বে স্বর্গীয় আচার্য্য স্যার পি, সি, রায় এবং স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণাগারে কাজ করিতেন

একমাত্র কৃষির উন্নতিতেই দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে মিঃ রায় ইহা বুঝিতে পারিয়া খাঁটি ও সতেজ চারা বীজ এবং গোলাপ ও অন্যান্য ফুল এবং নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য চারা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এই নার্শরীর পত্তন করেন। তখন উহা রায় ব্রাদার্স কোং নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৯ সালে রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ মান্নার (পুষ্পতত্ত্ববিদ) এম্পায়ার নার্শরীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গ্লোব নার্শরী নাম গৃহীত হয়।

দমদমায়, গৌরপুরে এই নার্শরীর প্রায় ১০০ একর জমি আছে। শ্যামবাজার হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানাবিধ ফুল ও চারার চাষ হয় এবং ইহার মধ্যে ৫-৭টা পুষ্করিণীতেও মৎস্যের চাষ হয়। একজন পক্ষীতত্ত্ববিদের অধীনে দমদমায় ঐ বাগানে একটি পোল্ট্রীফার্ম্মও আছে। কৃষিসম্পর্কিত দ্রব্যাদি সাধারণ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে নার্শরী হইতে 'কৃষিলক্ষ্মী' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। মিঃ রায় ইহা ছাড়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বাংলা পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। সাধারণ কৃষকগণও ঐ সকল পুস্তকপাঠে সহজে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিতে পারে।

১৯৩৪ সালে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটি ষ্টল, ১৯৪০ সালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি ষ্টল, ১৯৪২ সালে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে (নিউ মার্কেটে) একটি ষ্টল, এবং হগ মার্কেটে একটি ষ্টল (Vegetable Stall) খোলা হইয়াছে এবং ১৯৪৬ সালে হাওড়া ষ্টেশনে এই নূতন ষ্টলটি খোলা হইল।

এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন?
Saridon
সারিডন
মাত্র দশমিনিটেই
মস্ত বেদনা দূর করে

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

লিমিটেড্

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ কুমিল্লা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য সুষ্ঠুভাবে করা হয়।

ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
মিঃ বি, কে, দত্ত	মিঃ এন্, সি, দত্ত

COCOLA
KALYANI
PERFUMED
ত্রিগুণ
চারিটি রত্নে
মুকুট-মণি
কোকোলা
কল্যানী
ত্রিগুণ
জয়েল আমলা

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাঁদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জনসন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগাযোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য।"

প্রেরণার উৎস

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 266

শনিবারের চিঠি
১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৩

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

১

আত্মা যে তব অমৃতে অমর,
অমোঘ তপঃশক্তি,
হে ভারত, তুমি দাও সেই পরিচয়।
উদ্ধত সারা বিশ্বের যত
উদ্যত অসিপংক্তি
মাথা নত করি বরি লবে পরাজয়।

২

বাঁচতে গেলেই মারতে হয়—
বীরের কথা নয় এ নয়,
সেই তো মারে অন্তরে যে মৃত্যুভয়ভীত।
মরার সাহস থাকলে পরে
না মেরে সে আপনি মরে।
মারণ দিয়ে মরণ কেন করবে কলঙ্কিত?
ইতিহাসের পাতায় পাতায় জ্বলছে উদাহরণ,
এই মানুষেই মরণ দিয়ে জয় করেছে মারণ।

৩

নৃশংস আততায়ী,
বাহুতে শক্তি নাহি,
প্রাণসংশয় সঙ্কট এল কর্তব্যের দ্বারে :—
পলায়নই জানে শ্রেয়ঃ
ভীরু কাপুরুষ হেয়;
যুঝি প্রাণপণ হারায় জীবন, পুরুষ বলি যে তারে।
স্থান হতে নাহি সরে,
মারে না, দাঁড়ায়ে মরে,—
অমৃতবাহী সে পুরুষোত্তম এ মর্ত্য সংসারে।

৪

আপন মায়ের পায়ের শিকল ঘুচাতে
আর, নয়নের জল মুছাতে
যদি, সন্তান সবে শোণিতোৎসবে—
শাণিত হিংসা হানে,
আমি, মানিব তাদের আছে অধিকার,
তবু নিবারিয়া কব বার বার—
হিংসাকলুষ-রুধির, হে বীর,
দিও না মায়ের স্থানে।
জননী, তোমার ললাটের পটে
সে বিড়ম্বনা যদি কভু ঘটে,
ফুরাবে এবার মাতৃসেবার কাজ;
মায়ের গরব ত্যজিয়া বহিব
শুধু জন্মের লাজ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা

সম্প্রতি বাংলাদেশের যে প্রাচীনতম দৈনিক পত্র কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের পারস্পরিক সংঘর্ষে উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে, সাময়িকপত্র-সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্বের যাদুকর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক বহুবিধ বাধা সত্ত্বেও তাহার গৌরবময় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় এই সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত করিলেন; নিজ পত্রিকা আপিসেও এত দিন এই ইতিহাস অজ্ঞাত ও অসম্পূর্ণ ছিল। এই পত্রিকা বাংলাদেশের গৌরব; বাংলাদেশ ও বাঙালী-সমাজের এবং পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্যবিষয়ক বহু সংস্কার ও ক্রমোন্নতির সহিত ইহার অগ্রগতি বিজড়িত ছিল, সহানুভূতিহীন ঔদ্ধত্যের বশে তাহার সর্বনাশ সাধনের অধিকার বর্তমান মালিকদেরও নাই। দেশের হিতকামী চিন্তাশীল নায়কেরা অচিরাৎ হস্তক্ষেপ করিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে উদ্ধার করিবেন, ইহাই সকলের কামনা। আশা করি, এই দুঃসময়ে 'পত্রিকা'র বিস্মৃত ইতিহাস সকলকেই সচেতন করিবে।—স. শ. চি,

১

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম দুই বৎসরের প্রায় সকল সংখ্যাই সম্প্রতি দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। এই সুবিধা ঘটাইয়া দিয়াছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এই সংখ্যাগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য; পত্রিকা-কার্য্যালয়েও এগুলি নাই, তথায় ৩য় বর্ষ হইতে পত্রিকার ফাইল রক্ষিত আছে।

'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রথমে বাংলা সাপ্তাহিক পত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করে; ইহা সম্পাদন করিতেন—স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ। তখন পত্রিকার আকার ছিল, ১৭" × ১০½", ৮ পৃষ্ঠা। "এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।" ডাকমাশুল বাদে পত্রিকার মূল্য—প্রত্যেক সংখ্যা ।০, ত্রৈমাসিক ২৲, ষাণ্মাসিক ৩৲ ও বার্ষিক ৫৲ ছিল।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—"৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দ।"* ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (১১ মার্চ ১৮৬৯) পর্য্যন্ত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র কণ্ঠে এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

"পরাধীন কালকূট যদি হায় রে।
করেছে কি আর। স্বতে চেনা নাহি যায়।"

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার প্রারম্ভে সম্পাদক লিখিতেছেন :—

"আপনার পরিচয় আপনি দেওয়া বিষম বিপদ, এই জন্য বোধ হয় পূর্ব্বকালে ভদ্রলোকের পরিচয় ভাটেরা দিত। সংবাদপত্র সম্পাদকেরদের নিকট এটী ক্ষেত্রের পঞ্চম প্রতিজ্ঞা। এই দায় হইতে একবার কোন প্রকারে উদ্ধার

* ডক্টর কালিদাস নাগ ১৯৪৩ সনের বার্ষিক-পূজা-সংখ্যা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় "Indian Journalism and Amrita Bazar Patrika" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বর্ষের পত্রিকার সহিত পরিচিত না থাকায় তিনি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম প্রকাশকাল "মার্চ ১৮৬৮" লিখিয়া বসিয়াছেন! এই প্রবন্ধে আরও একটি বিস্ময়কর বস্তু আছে। "১৮৬৮" সনে প্রকাশিত ১ম বর্ষের "৪৪ সংখ্যা" ("১ম ভাগ ১ পৌষ বৃহস্পতিবার ১২৭ । ১৫ ডিসেম্বর খৃঃঅব্দ ৪৪ সংখ্যা") 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি বলিয়া যে ব্লক দেওয়া হইয়াছে, তাহা কখনই ঐ সংখ্যার প্রতিলিপি হইতে পারে না, কারণ ঐ ৪৪ সংখ্যার প্রকাশকাল—"১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১২৭৫ সাল ২৮ শে জানুয়ারি ১৮৬৯ খৃঃঅব্দ"। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০ সনে (১২৭৭ সাল) প্রকাশিত '৩য়' ভাগের ৪৪ সংখ্যাটির "৩য়" কথাটিকে কৌশলে "১ম-"এ পরিণত করিয়া উহাকে "১৮৬৮" সনে প্রকাশিত ১ম ভাগ ৪৪ সংখ্যার প্রতিলিপি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

হইতে পারিলে আর অধিক চিন্তার বিষয় থাকে না ; এক প্রকার করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া দিতে পারিলেই হয়।

অনেকে গ্রন্থ লিখিয়া ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিবার কারণ বন্ধুগণের, বন্ধু, স্বপ্নের আদেশ। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যে আমরা পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে স্বপ্নও দেখি নাই, বন্ধুকর্ত্তৃক আদিষ্টও হই নাই। আমরা আপনারা২ অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই দুরূহ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছি।

দেশের হিত সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে সাহস হয় না, কারণ দেশের মঙ্গল সাধন করিবার নাম করিয়া নানাবিধ লোক দেশের এত অমঙ্গল ঘটাইতেছে যে আপনাদিগকে সেই দলস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করি না, তবে যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিমে ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্ব্বে দেড় বৎসরের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত একটীও মুদ্রাযন্ত্র নাই ; সুতরাং সংবাদপত্র থাকাও অসম্ভব, এমত স্থলে এ পত্রিকা দ্বারা কিছু উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি কেমন বহুদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন।

এই পত্রিকাতে কি কি বিষয় লিখিত হইবে তাহার তালিকা দেওয়ার দুইটী আপত্তি আছে ; প্রথমতঃ জানি না এখন যেরূপ প্রতিজ্ঞা করি, ভবিষ্যতে তাহা পালন করিতে পারি কি না ; দ্বিতীয়তঃ পাছে একটি লম্বা জায় দিলে আত্মাভিমান প্রকাশ হয়। আবার নিতান্ত নম্রতা দেখাইতে ভয় হয়, কি জানি পাছে আমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া পত্রিকাটী সকলে ঘৃণা করেন।

কিন্তু রীতি আছে, ব্যবসায়ীরা আপনাদের পণ্যদ্রব্য প্রশংসা করিয়া থাকে ও তাহাতে লোকের নিকট নিন্দনীয় হয় না। হলোএ সাহেব বরাবর জগত ব্যাপিয়া রাষ্ট করিয়া আসিতেছেন যে তাঁহার বটীকা ও মলমের তুল্য ঔষধ পৃথিবীর কোথায় কখন জন্মে নাই, অথচ তাহাকে আত্মাভিমানি বলিয়া কেহ বিদ্রূপ করে না। আমাদেরও এটী ব্যবসায়, সুতরাং আমাদের এসম্বন্ধে দুটি একটী কথা ফাঁক গেলে উল্লিখিত রীত্যানুসারে বোধ হয় দোষ বলিয়া গণ্য হইবে না।

আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এদেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এদেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসনপ্রণালী, ও তাহাদের

পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন—যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য-শাসনের স্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্ত ক্ষেপণ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা, ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।

আমাদের পত্রিকায় কাহার কুৎসা ও নিন্দা যে থাকিবে না এরূপ বলিতে পারি না, ও এক্ষণে বলিলেও পরে কথা রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সমুদয় সম্পাদক একত্রিত হইয়া আমাদিগকে সমাজচ্যুত ও একঘরিয়া করিবেন। বিশেষতঃ গালি ও নিন্দা সংবাদপত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদপত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চা রহিত করিলে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, যে অপরের নিন্দাচর্চা করিব না তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কি?

সকল প্রকার কটু অসুখকর, কেবল অন্যের কটু বলা কি শ্রবণ করা ব্যতীত। আমরা কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে যেরূপ তৎপর, গ্রহণ করিতেও সেইরূপ তৎপর থাকিলাম। পাঠক, মনে রাখিও, এই কটু বাক্য যেন চিকিৎসকের অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও পুঁজকারক হয়।

আমরা স্থানে স্থানে সংবাদদাতা নিযুক্ত করিয়াছি; সুতরাং প্রত্যাশা করি, যে পাঠকবৃন্দকে দেশ বিদেশের নূতন২ সংবাদ দিতে পারিব। এবং নিশ্চিত বলিতে পারি, যে যত দিন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, ফিনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্য শেষ না হয়, তত দিন সংবাদাবলী দ্বারা আমাদের পত্রিকা সুসজ্জিতা করিবার কোন চিন্তা থাকিবে না, কিন্তু সম্পাদকদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি এ সমুদয় ক্ষান্ত হইয়া যায়, আর নূতন কোন রাজবিপ্লব, ঝটিকা জলপ্লাবন প্রভৃতি উপস্থিত না হয়, তখন আমাদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ দায়ে যদি পড়ি, তখন আমরা সংবাদ প্রস্তুত করিতে ত্রুটী করিব না, ও যদি কোন সম্পাদকের অনুগমন করিয়া সংবাদ প্রস্তুতে প্রবর্ত্ত হই, তবে আমরা এরূপ চমৎকার সংবাদ দিব, যাহা কোনকালে ঘটেও নাই, ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই।"

২১শ সংখ্যায় (৯ জুলাই ১৮৬৮) পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন :—

"যাঁহারা কলিকাতা মহানগরীতে থাকেন, তাঁহারা আমাদের মফঃস্বলে লোকের দুরবস্থার কথা অতি কম জানেন। আমাদের এখানে একজন কনেষ্টবলকে দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়।

আমাদের পত্রিকার উপর কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের পত্রিকায় যদি মিথ্যা কথা লিখি, তবে কাহারও ক্ষতি হইতে পারে না। যদি সত্য কথা লিখি, তবে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আমারদিগকে তাড়া দিয়া ক্ষান্ত করিবার কিছু লাভ নাই। বলের দ্বারা সত্য লুকাইয়া রাখা এবং কাপড় দিয়া আগুন বাঁধার চেষ্টা সমান। আমরা প্রায়ই স্পষ্ট কথা বলি। যে ঘটনা যে রকম, তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া দেখাই। কাহার অনুরোধে কিংবা কাহাকে বিরক্ত করিবার ভয়ে কোমল করিয়া লিখি না। ফল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রার্থনা করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নয়; আমাদের দেশীয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কিরূপ হীনাবস্থায় আছেন, তাহা তাঁহারদিগকে দেখানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা ফটগ্রাফার মাত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক ফটগ্রাফ লইয়া আমরা এদেশীয়দিগকে দেখাইয়া থাকি, যদি ফটগ্রাফি তুলিতে এরূপ ছবি উঠে যে, কেহ২ অন্যের মুখের ভাত কাড়িয়া খাইতেছে; বলবান দুর্ব্বলের গলা টিপিতেছে; অভদ্র অপমান করিতেছে; একজনের ন্যায্য স্বত্ব অন্যকে দেওয়া হইতেছে, বিচারক অবিচার করিতেছেন, তবে আমাদের হাত কি?

কোন২ প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ আমারদিগকে এরূপও বলিয়াছেন যে, আমাদের পত্রিকা কর্ত্তৃক জাতিবৈরতা নষ্ট না হইয়া আরো বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশের নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ। কিন্তু জাতিবৈরতা নিবারণ করার কর্ত্তা কে? আমরা অধিক ত কিছু চাই না, দুটি মিষ্ট কথা আর পাতের চারিটি প্রসাদ পাইলেই কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হই। প্রতিবিধিৎসার স্থান হিন্দুদিগের মন নয়। আমরা প্রহার খাইয়া যদি প্রহারকের নিকট দুটি মিষ্ট কথা শুনি, তাহা হইলেই আমাদের মন গলিয়া যায়। আমরা ইংরাজ অপেক্ষা এদেশীয়দিগকে অধিক ভালবাসি, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু বোধ হয় ন্যায়পরতা আমাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। মনে একটি মুখে অন্য প্রকার যাহারা প্রকাশ

করেন, তাহাদের অপেক্ষা মনের কথা যাহারা খুলিয়া বলেন, তাহারা কি ভাল করেন না? অতএব সত্যকথা বলিতে যে ফল হউক না কেন, আমরা তদ্বিষয় একবার চিন্তাও করি না।"

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা সরকারী কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হইয়াছিল। পত্রিকাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার সুযোগ শীঘ্রই তাঁহাদের মিলিয়া গেল। ১৭-সংখ্যক পত্রিকায় "ঘোর অত্যাচার" প্রস্তাবের জন্য পত্রিকার বিরুদ্ধে এবং ১৯ সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত "পাঠকগণের প্রতি" রচনাটি ফৌজদারির হেড ক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক লিখিত বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মকদ্দমা শুরু হইল। মকদ্দমার ফলাফল নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইবে:—

"আমাদের লাইবেলের মকৰ্দ্দমা। গত সোমবারে আমাদের লাইবেল মকদ্দমার হুকুম জজ সাহেব দিয়াছেন। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবুর এক বৎসর মিয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা ও প্রিণ্টার বাবু চন্দ্রনাথ রায়ের ছয় মাস মিয়াদ হইয়াছে। শিশির বাবু অব্যাহতি পাইয়াছেন।

যাহারা ভাবিতেন এ মকদ্দমা শুদ্ধ কেবল দুই ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদের ভ্রম গিয়াছে। যাঁহারা এই মকৰ্দ্দমাটীতে শুদ্ধ একটি সামান্য লাইবেল মকৰ্দ্দমা ভাবিতেন, তাঁহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ব্রাইটকে অপমান করাতে এত গোল কখন হইত না, ইহার অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এ মকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী উভয়েই নগণ্য ব্যক্তি তবু লং সাহেবের বিরুদ্ধে নীলকরেরা যে লাইবেল মকদ্দমা আনেন তাহা অপেক্ষা ইহাতে অধিক জনরব কেন হইল?

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংশ হয়। আর যে দিবস কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটী বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালি মাত্রের যেন মনে থাকে যে ইংরাজ বাহাদুরেরা বাঙ্গলা কখন সমরে অধিকার করেন নাই। সেরাজদ্দৌলার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগকে আহ্বান করে, আর এই ছুতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজেরা বাঙ্গলা শাসন করিতেছেন। সমরে পরাজিত হইলে অধিবাসিগণ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া যায়, বাঙ্গালিদের সে অবস্থাটী হয় নাই।

যশোহর সব ডিবিসনে। রাইট সাহেবের ঝিনিদহ হইতে দুই দিনের পথ। ইনি রাইট সাহেবকে দেখেনও নাই, কখন নামও শুনেন নাই। উভয়ে অতি কঠোর দণ্ড পাইয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা, ইহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মনের সহিত ঈশ্বরকে বলিবেন। অদ্য এই পর্যন্ত।" (১৮ পৌষ ১২৭৫। ৩১ ডিসেম্বর ১০৬৮)*

এই সংখ্যা হইতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' "শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত" হয়।

১ম বর্ষের ২৮-সংখ্যায় একখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পত্রখানি উদ্ধৃত হইল।—

"...সংপ্রতি দেশ প্রচলিত কয়েকটী বাক্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি, পাঠকবর্গের এতদ্বারা কিঞ্চিৎ সন্তোষ সম্পাদিত হইলে ক্রমশঃ লিখিতে থাকিব। যথা :—

কাষ্ঠ ত্যাগ (অগ্নি দেওয়া)—হিন্দুদিগের নিয়ম আছে যে রন্ধনের সময় নীচ জাতিকে অগ্নি দিলে পাক অশুচি হয়। অথচ সাধারণতঃ না দিলে কর্ম্ম চলে না। অতএব বোধ হয় শিকদিগের মধ্যে যেমন "অন্দিবাস" শব্দে গাঁজা ইত্যাদি কতকগুলি সাটে কথিত কথার সৃষ্টি হয়, অন্যের ভয়ে হিন্দুরাও ঐরূপ সঙ্কেত করিয়া থাকিবেন।

কোকিল পুড়িয়া খেয়েছেন—কদর্য্য স্বর বিশিষ্ট লোককেই ইহা বলে। এটী ব্যঙ্গোক্তি। কেননা কোকিল সুগায়ক তাহার বিপরীতই কুৎসিত স্বরবিশিষ্ট লোক।

গামছা মোড়ার দল—কুলোক মাত্রের প্রতিই এই বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরেজ শাসন আরম্ভের অনেক কাল পর পর্য্যন্ত এ দেশে স্থানে স্থানে কতকগুলি দস্যু থাকিত, পাথকের গলায় গামছা দিয়া বিনাশ পূর্ব্বক তাহার দ্রব্যজাত লুটিয়া নিত।

গোড়ায় জল গিয়াছে (চেতনা হইয়াছে)—বর্ষাকালে এদেশে যে সকল বৃক্ষের মূলে জল যায়, তাহার অনিষ্ট করে; এবং সেই অনিষ্টের চিহ্ন বৃক্ষে লক্ষিত হয়। সুতরাং তখন গাছের চেতনা হইয়াছে, এরূপও বলা যাইতে পারে।

---

* নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে' (২য় ভাগ, পৃ. ১১-৩১) এই মানহানির মকদ্দমা ও শিশিরকুমার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আছে।

কাশীতে ভূমিকম্প (অঘটন ঘটা)—হিন্দুদিগের বিশ্বাস আছে, কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত সুতরাং তাহাতে ভূমিকম্প হয় না।

চাঁদের দিন বুধের দশা (সৌভাগ্য সময়)—চাঁদের দিন অর্থে পৌর্ণমাসি, সুতরাং সেটী অত্যন্ত সুখকর। বুধের দশা এ কথাটী হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। কেন না বিশ্বাস আছে, যে রাশিতে বুধ গ্রহ ভোগ করেন, তাহার সৌভাগ্য।

ছাতারের নৃত্য (কদর্য্য নৃত্য)—অপটু নটের প্রতি এই বাক্যটী প্রয়োগ হয়। ছাতার নামক এক প্রকার পাখি আছে, তাহারা কেবল লম্ফ ঝম্ফ দেয়।

ডুমুরের ফুল (দুর্ঘট)—ডুম্বর বৃক্ষের ফুল হয় না, সুতরাং কোন ব্যক্তিকে অনেক দিন না দেখিলে বলা হইয়া থাকে "তুমি যে এখন ডুমুরের ফুল হয়েছ" অর্থাৎ তোমাকে সচরাচর দেখা যায় না।

নাকাল করা (জব্দ করা)—নাকাল শব্দে শল্য (নাসিকার লোম ফেলিবার অস্ত্র) শল্য, মধ্যে পড়িলে যেমন লোমের এড়াইবার যো নাই, যখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ ঘুঁটিয়া ধরা যায় যে তাহার পরাভব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, তখনি বলা হয় "অমুককে নাকাল করেছি।"

পাবড়া কাটন (বিপদুদ্ধার)—কলিকাতা প্রদেশে বঁউচি নামক স্থানে কতিপয় বর্ষ গত হইল, একরূপ দস্যুগণ বাস করিত, যাহারা বাঁশের কচা চোখ করিয়া গুপ্তভাবে পথিকদিগের গাত্রে আঘাত করিত; এইরূপে উক্ত স্থানে অনেকগুলি লোক নষ্ট হয়। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে কেহ যাইতে পারিলেই বলিত, "আমি আজকার পাবড়া কাটায়েছি"—জ্যোতিষ হইতে আর একটী বাক্যও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেটী "ফাড়া কাটন"।

পটল তোলা (প্রস্থান)—পটল শব্দে তালপত্রের গ্রন্থ, যাহাতে পূজার বিধি লেখা থাকে। উহা বাঁধিলে (তুলিলে) পূজা সাঙ্গ হয়, সুতরাং পূজার কর্ত্তা চলিয়া যান। অতএব ঐ বিষয় হইতেই পটল তোলা কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

পোয়া বার (লাভের বিষয়)—দ্যুতক্রীড়া হইতে এই কথাটী গৃহীত হইয়াছে। কেননা উক্ত দানে অনেকগুলি সুবিধা আছে।

বুকে মাটি ঠেকেছে (দায় পড়িয়াছে)—পলো দ্বারা মাছ ধরা হইতেই এ কথাটী গৃহীত হইয়াছে। কেন না, যে পর্য্যন্ত মাছ মাটিতে নিস্তেজ হইয়া না পড়ে তাবত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে।

তাত্রমাসাজ্ঞান নাই (তালবোধ নাই)—ভাদ্র মাসে তাল ফল পাকে, অতএব তাহা হইতে এটী নীত হইয়াছে।

জীব বলতে লোক নাই (কোন সুহৃদই নাই) হাঁচি দিলে "জীব" বলা আশীর্ব্বাদ বিশেষ, এটী এদেশ প্রচলিত একটি রীতি।

মহাভারত, রাম২।—ঘৃণা প্রকাশ স্থলে এই দুইটী কথার ব্যবহার হয়। কেন না হিন্দুরা বিশ্বাস করেন কোন অপবিত্র বিষয় দর্শন কি স্পর্শ করিলে এ নাম উচ্চারণে অপবিত্রতা দূর হয়।

শিঙ্গা ফুঁকলেন (মরিলেন)—শিঙ্গা শিবের বাদনযন্ত্র, শিব সংহারকর্ত্তা সুতরাং শিঙ্গারব হইলেই মৃত্যু বোঝা যায়। শিবির ভঙ্গের সময়ও শিঙ্গাবাদনের রীতি আছে, বোধ হয় তাহা হইতেও এটী গৃহীত হইতে পারে।

শিয়াল বাঁহাত (সফল মনোরথ)—যাত্রাকালে বামভাগে শৃগাল দেখিলে শুভযাত্রা হয়, সুতরাং কৃতকার্য্য হইলেই এই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

শরিষা ফুল দেখলেম (অন্ধকার দেখলেম)—অত্যন্ত অপ্রতিবিধেয় বিপদ কিম্বা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলে এই বাক্যটী প্রয়োগ হয়। মস্তক ঘুরিয়া গেলে যে অন্ধকার দেখা যায়, তাহার মধ্যে জোনাকি পোকার মত উজ্জল কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলি শরিষা ফুলের বর্ণের মত।

শ্রীপঞ্চমী (মূর্খ)—এটীও ব্যঙ্গোক্তি। অর্থাৎ বিদ্বানের বিপরীতার্থে ব্যবহৃত হয়।

বৃহস্পতি (বুদ্ধিমান)—দেবগুরু বৃহস্পতি অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন, তাঁহা হইতে একথার সৃষ্টি। অনেক সময় ব্যঙ্গ করিয়া মূর্খ অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

শ্রীবিষ্ণু (কিছু না জানা অর্থে প্রয়োগ হয়)—আচমনের সময় উক্ত শব্দটী উচ্চারণের নিয়ম আছে। অতএব শ্রীবিষ্ণু করিলে, কি না নূতন যেন শুনিলে কি জানিলে ইত্যাদি ভাবার্থ।

ষণ্ডামার্ক (লম্পট, কি গোঁয়ার)—ষণ্ডামার্ক মুনি হইতে এটী নীত হইয়াছে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন "ষণ্ড—ষাঁড়" শব্দ হইতে নীত। ফলতঃ এইটীই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়, কেন না ষণ্ডামার্ক মুনি পরম সাধু ছিলেন।

শ্রীহরি (প্রস্থান)—এই শব্দ যাত্রাকালে উচ্চারিত হয়, অতএব তাহা হইতে প্রস্থান করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হরিবাসর (উপবাস)—বৈষ্ণবদিগের উক্ত নামধের একটী পর্ব্ব হইতে

উহা গৃহীত হইয়াছে। কেহ২ হরিবাসরকে একাদশী আবার কেহ জন্মাষ্টমী কহেন।

লেজে গোবরে—গরুতে অসাবধান হইয়া শয়ন করাতে প্রায়ই লেজে গোবর লাগে, অতএব কেহ কোন অন্যায় কার্য্য কি অসাবধানতার কার্য্য করিলেই বলে "অমুকে লেজে গোবরে করেছে।" (১২ ভাদ্র ১২৭৫। ২৭ আগষ্ট ১৮৬৮)

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র আলোচ্য সংখ্যাগুলিতে কতকগুলি পুস্তক-পত্রিকার সমালোচনা আছে। সংক্ষেপে ইহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি; বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসকারের ইহা কাজে লাগিতে পারে :—

(১) **হিতসাধক** মাসিক পত্র। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ইংরাজি ওএল উইশারের অনুকরণ···(২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫। ২৮ মে ১৮৬৮)

(২) আমরা **প্রয়াগ দূত** নামক পাক্ষিক পত্রিকার প্রথম তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে বাঙ্গালা পত্রিকা বাহির হইতেছে, আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।··(১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫। ২৮ মে ১৮৬৮)

(৩) **কবিতাবলি**।···গ্রন্থখানি বালেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় কৃত। ১২ পেজী ফারমার ৫১ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানি কাব্যগ্রন্থ।···বঙ্গভাষায় বীরাঙ্গনা, সদ্ভাবশতক, পদ্যপাঠ প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ কোষকাব্য আছে। এই গ্রন্থখানি কোষকাব্য হইলেও চতুর্দ্দশপদি কবিতাবলি ভিন্ন অন্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। ইহাকে ইংরাজিতে সনেট বলে। ইটালী দেশীয় প্রসিদ্ধ কবি পেট্রার্ক ইহার স্রষ্টা। মধুসূদন বাবু বঙ্গভাষায় এরূপ কাব্য প্রথম লিখেন। এবং প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি এই শ্রেণীর দ্বিতীয় কাব্য। ইহাতে বিলক্ষণ ভাবালালিত্য, শব্দচাতুর্য্য, এবং ভাবের মাধুর্য্য ও গাঢ়তা প্রভৃতি কাব্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দৃষ্ট হয়।···(২০ আষাঢ় ১২৭৫। ২ জুলাই ১৮৬৮)

(৪) **সমালোচনী**।—এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বহরমপুর সত্যরত্ন হইতে বৈশাখ মাস হইতে প্রচার হইতেছে। এই দুই সংখ্যায় বঙ্গভাষাদি ১৪টী প্রবন্ধ ও কতকগুলি চিত্রকথা লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী রিভিউর ধরণে ইহার লেখা। অধিকাংশই গদ্যে, শেষভাগে কিছু২ পদ্য রচনা আছে।···ইহার লেখা মন্দ হয় নাই, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রথম।···(১৬ শ্রাবণ ১২৭৫। ৩০ জুলাই ১৮৬৮)

(৫) নির্ব্বাসিতের বিলাপ।—শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।... প্রথমতঃ গ্রন্থের অভিধানটী সঙ্গত হয় নাই। কেন না, সমস্ত পুস্তকখানি পড়িয়া একবিন্দু জলও চক্ষে আসিল না। প্রথম কাণ্ডটি তবু "বিলাপ" বলা যায়। অপর কাণ্ড তিনটীতে কেবল কল্পনারই পরিচয় পাইলাম। ক্রমাগত তিনটী কাণ্ডে স্বপ্ন দেওয়াতে পড়িতে বৈরক্তি উৎপাদিত হয়। মধ্যে২ অসংলগ্নও হইয়াছে। লেখক লিখিতে২ স্বপ্নের কথা যেন ভুলিয়াছেন।...পুস্তকখানি ঠিক ইংরেজি কাব্য প্রণালীতে লেখা। ভাষা পারিপাট্য বিলক্ষণ আছে, মধ্যে২ নূতন ভাবও অনেক দেখা যায়, লেখা অতি প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হইয়াছে।...শিব বাবুর বেশ কবিত্ব শক্তি আছে। গ্রন্থকার হইতে প্রয়াস না পাইয়া আর কিছুদিন লিখিতে অভ্যাস করুন, কালে একজন ভাল লেখক হইবেন। (২৫ পৌষ ১২৭৫। ৭ জানুয়ারি ১৮৬৯)

(৬) কল্প লতিকা—এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। কলিকাতা সুকিয়াস ষ্ট্রীট ২৬ নং ভবনে নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৪৲ টাকা।...(৯ মাঘ ১২৭৫। ২০ জানুয়ারি ১৮৬৯)

(৭) আমরা "অবলা বান্ধব" নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। এরূপ পত্রিকা দ্বারা দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এখানি দীর্ঘায়ু হয়, আমাদের প্রার্থনা। এস্থলে আমরা ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদিগের আত্মক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল না। যে অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় দুর্ব্বল দেহে নববলের সঞ্চার হইতেছে, নিতান্ত অক্ষমেরও মহাক্ষমতা জন্মিতেছে, সেই পূর্ণ ক্ষমতাবান মহাপুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথায় যাহাদিগের অসুখ জন্মায় আমরা তাহাদিগের প্রত্যাশী নহি। এস্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রী সমাজের সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে, আত্মীয়তা ধর্ম্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন বিষয়ে কিরূপ রুচি আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, বামাকুলের অনেক গুণ দোষ আমাদিগের নিকট

প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠক সমাজে কতদূর আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগের পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশু গ্রহণ করিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি, কতকগুলা লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থক একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন তাহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিতে ত্রুটি করেন না। মেয়ে মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাঁহাদিগকে "মেগে" বলিয়া উপহাস করেন। এ সকল লোকের নিকট অবলাবান্ধবের যত আদর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনায় ও পক্ষ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহারা ঐ বিদ্রূপার্থক উপাধি হয়ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্মের বৃদ্ধি হয়, আত্ম কর্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষায় অনুকূল হইবে, সময়ে২ তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল শুশ্রূবণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্তব্য পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন

এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা তাঁহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা পাইব।

উপসংহার কালে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা এই, যাহাতে অবলাবান্ধবের এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষা পাইয়া ইহার দীর্ঘজীবন হয়, তিনি এমন ক্ষমতা প্রদান করুন। (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬।২৭ মে ১৮৬৯)

(৮) মুষল মুদ্গর ॥—এখানি সাপ্তাহিক পত্র। মফস্বল হইতে বাহির হইতেছে। (৮ শ্রাবণ ১২৭৬। ২২ জুলাই ১৮৬৯)

(৯) সঙ্গীত সারঃ। শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইহার প্রণেতা।... রাধামোহন সেনের সঙ্গীত তরঙ্গের পর তিন খানি মাত্র সঙ্গীতগ্রন্থ প্রচারিত হইল, তাহার দুই খানি গোস্বামীর কৃত। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করি যে যতীন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা শৌরীন্দ্র বাবু, গ্রন্থকার গোস্বামী অধ্যাপক, আর অন্যান্য সঙ্গীতবেত্তাগণকে আশ্রয় দিয়া এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। যতীন্দ্র বাবুদিগের বদান্যতার এই গ্রন্থখানি আর একটী ফল। তাঁহারা এই পুস্তকখানি মুদ্রাংকনের সমুদয় ব্যয় বহন করিয়া এক্ষণে উহা বিতরণ করিতেছেন,...। (অতিরিক্ত পত্র, ১ মাঘ ১২৭৬। ১৩ জানুয়ারি ১৮৭০)

(১০) বঙ্গ সুন্দরী। শ্রীযুক্ত বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। বিষয় অনুযায়ী ভাব, ও ভাবানুযায়ী বাক্য বিন্যাস, এই দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি থাকিলেই, কাব্যগ্রন্থ ভাল হয়। এ গ্রন্থে আমরা তাহা বহুল পরিমাণে দৃষ্টি করিলাম। এবং পাঠ করিতে করিতে অনেক স্থানে মোহিত হইয়াছি।... যাহারা পাঠ করিবেন তাহারাও স্বীকার করিবেন বিহারী বাবুর বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে। "কালি ঢালা রক্তবর্ণ" বোধ হয় এখানে মুদ্রাঙ্কন দোষ ঘটিয়াছে, "কালি ঢালা বক্ত্র বর্ণ" হইবে। (২৯ মাঘ ১২৭৬। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেই ব্যাপারের পর থেকে বড়কর্তা বাড়িতে আসা একেবারে ছেড়ে দিলে। নিশ্চিন্ত আরামে ভবিষ্যৎ-ভাবনা-মুক্ত দিন কাটতে লাগল। ডাক্তারখানার সঙ্গে দিদিমণির সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ, সেই ব্যাপারের পর ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, সেখানকার সমস্ত হিসাবপত্র বড়কর্তাই দেখবে, লাভ-লোকসান সেই ভোগ করবে; কিন্তু অর্থের প্রয়োজন হ'লে বাড়ি থেকে আর কিছুই দেওয়া হবে না। বাবুজী যেসব মাসোহারা পান ও দৈনিক রুগী দেখে ভিজিটের দরুণ যা পান ও তাঁর পেন্‌শনের সব টাকা বাড়িতেই আসবে।

বাবুজী রোজ রাত্রে বাড়ি ফিরে সেদিনকার ভিজিটের টাকা কটি দিদিমণির হাতে দিয়ে দেন, তারই একটা হিসাব প্রতিদিন আমাকে রাখতে হয়। প্রতি-দিনের বাজার, গরুর খরচ, চাকর-বাকরদের খরচ সব পরিতোষের হাতে। রোজ সকালবেলা সে হিসেব দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়, সন্ধ্যে হ'লে আমরা তিনজনে ব'সে সারাদিনের হিসেব চুকিয়ে বিতলার ঘরে গিয়ে গল্প ক'রে রাত্রি দশটার সময় খেয়ে-দেয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। আগ্রার বাঙাল ব্যাঙ্কে দিদিমণির নগদ টাকা গচ্ছিত আছে; ছ মাস অন্তর তার সুদ আনতে যেতে হয় সেখানে বাবুজীকে। ছ মাসের সুদ প্রায় চার হাজার টাকা। ঠিক হয়েছে এবার থেকে আর বাবুজী যাবেন না, দিদিমণিকে নিয়ে আমি আর পরিতোষ যাব। দিদিমণির শ্বশুরবাড়ির দেশে তার একটা বড় গ্রাম আছে জমিদারি, যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন বাড়ির বড় বউ হিসাবে তার উপস্বত্ব সে ভোগ করবে। সেখানকার আমদানি বছরে প্রায় তিন হাজার টাকা। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শেষে বাবুজীকে সেখানে গিয়ে দশ-পনেরো দিন ক'রে থাকতে হয়। ঠিক হয়েছে, এবার বৈশাখের শেষে দিদিমণিকে নিয়ে আমি পরিতোষ ও বাবুজী সেখানে যাব। বছর দু-তিন পরে আর দিদিমণি কিংবা বাবুজী কারুকেই যেতে হবে না। আমি আর পরিতোষ যাব, আমরা ততদিনে সাবালক হয়ে যাব কিনা, আমাদের নামে দিদিমণি ওকালত-নামা দিয়ে দেবে।

এরই ফাঁকে ফাঁকে দুই বন্ধুর পরামর্শ চলতে থাকে, রাজকুমারীর প্রতিশ্রুতির প্রশ্রয়ে বেড়ে-ওঠা আমাদের সেই বিরাট বস্ত্র-ব্যবসায়, যা বিনা

কারণে অতি অকস্মাৎ একদিন ফেল পড়েছিল, তারই কথা। ঠিক ক'রে রাখা গেছে, দিদিমণির কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার সেই ব্যবসা ফাঁকিয়ে তুলতে হবে, চিরদিন কোথাও অন্নদাস হয়ে থাকা চলতে পারে না। ব্যবসা কিছুদিন চলবার পর টাকা শুধে দিলেই চলবে।

মনে পড়ছে সেই দিনগুলির কথা। শীতান্তের উতলা বাতাসে দেখ্ দেখ্ ক'রে প্রকৃতি মাতাল হয়ে উঠল। দিনরাত্রি হু-হু হাওয়া আর বড় বড় গাছের উল্লাস ও চীৎকারে ধরণী মুখরিত। বিকেলবেলা মাঝে মাঝে আমরা রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি, গাছগুলো নতুন পাতায় একেবারে চিক্কণ-সবুজ। মধ্যে মধ্যে এক এক ঝোঁক বাতাস ওঠে হা-হা ক'রে, আর সেগুলো থেকে ঝরঝর ক'রে শুকনো পাতা খ'সে পড়তে থাকে চারিদিকে, সজীব বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে কোথায় এত শুকনো পাতা লুকিয়ে থাকে, এমনিতে তা বোঝা যায় না। কলকাতার জীব আমরা, প্রকৃতির এই অপরূপ রীত এর আগে দেখি নি—

আর মনে পড়ছে সেদিন সকালের কথা—দিনটা ছিল রবিবার। বাবুজীর কাশী যাবার তাড়া নেই। চা-জলপানির পর্ব তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় দিদিমণি কাগজ ও দোয়াত কলম নিয়ে এসে হাজির হ'ল আমাদের ঘরে। বললে, আজ তোরা দুজনে কাশীতে গিয়ে এই জিনিসগুলো কিনে আন্, আমি খাবার তৈরি করতে বলেছি, খেয়ে বেরিয়ে যা, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসবি।

জিনিসপত্রের লম্বা ফর্দ তৈরি হ'ল। মনে আছে, তার মধ্যে আমাদের জন্যে তিন জোড়া ক'রে ধুতি, চারটে ক'রে শার্ট ও এক জোড়া ক'রে জুতো। তা ছাড়া বাবুজীর পাজামা ও ফতুয়ার জন্যে এক থান সবচেয়ে ভাল লাঠ্‌ঠা অর্থাৎ লংক্লথ, তা ছাড়া আরও কত কি জিনিস!

হিসেব ক'রে দেখা গেল, সব জিনিসের দাম সত্তর টাকার কিছু বেশি হবে। দিদিমণি আঁচলের গেরো খুলে একখানা একশো টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বললে, সাবধানে রাখ্।

নিজের হোক বা পরেরই হোক, একশো টাকার নোট হাতে করবার সৌভাগ্য জীবনে এর আগে আমার হয় নি। আজকের দিনে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলে বিড়িওয়ালার দোকানে যেমন একশো টাকার নোটের ভাঙানি পাওয়া যায়, সেদিন তেমন ছিল না, একশো টাকার নোট তখনকার দিনে নবাবী নোটের মধ্যে গণ্য ছিল। বয়স্ক লোকেরা সে নোট ভাঙাতে গেলেও

উল্টো পিটে নাম ঠিকানা লিখে দিতে হ'ত, ছেলেমানুষের হাতে দেখলে দোকানদারেরা হয় তাকে ফিরিয়ে দিত, নয়তো পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিত।

একশো টাকার নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুবিধা না পেলেও এসব বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলুম। নোটখানা হাতে নিয়েই বললুম, সর্বনাশ! এ নোট দেখলে দোকানদার নিশ্চয় আমাদের পুলিসে দেবে।

দিদিমণি বললে, দূর, তাও কি কখনও হয়!

শেষকালে মীমাংসার জন্যে বাবুজীর কাছে যাওয়া হ'ল। বাবুজী বললেন, ওরা ঠিকই বলছে। ছেলেমানুষদের হাতে ও নোট দেখলে হাঙ্গামা হতে পারে, ওদের খুচরো টাকা দিয়ে দাও।

দিদিমণির হাতে খুচরো অত টাকা নেই। শেষকালে বাবুজীই দশটা দশ-টাকার নোট দিয়ে আমাদের হাত থেকে সেই নোটখানা নিয়ে নিজের মনিব্যাগে পুরে রাখলেন।

যতদূর মনে পড়ছে, পাঁচ টাকার নোটের আবির্ভাব তখনও হয় নি।

ট্যাঁড়সের টক চচ্চড়ি দিয়ে দিয়ে খানেক ক'রে আটার ফুলকো লুচি মেরে বাকি জায়গাটা দুধে ভর্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম কাশীর উদ্দেশে।

* * *

আবার সেই রাজঘাট স্টেশন।

প্রথম যেদিন সন্ধ্যারাত্রে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এইখানে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলুম, সেদিন থেকে আজকের দিনের কত প্রভেদ! সেদিন আমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ আকাশ ছিল দিগন্তবিস্তৃত মেঘে সমাচ্ছন্ন। বিশ্বনাথের দয়ায় আজ সে মেঘ অপসারিত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি কল্পনার পরকলা দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে ভবিষ্যৎ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। আশাসে বুক ভরা, ট্যাঁকও পয়সায় ভর্তি।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একখানা এক্কা ভাড়া করা গেল চৌক অবধি, সেখান থেকে জুতো কিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাব, সেখানে বাঙালীদের বড় কাপড়ের দোকান আছে।

চৌকে নেমে দু-তিনটে জুতোর দোকানে ঘুরলুম, কিন্তু জুতো আর পছন্দ হয় না। শেষকালে রাস্তার ধারেই একটা বাড়ির দেওয়ালে আলমারি ঝোলানো এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আলমারিতে সাজানো জুতোগুলো দেখছি আর

দোকানদারের সঙ্গে দরদাম নিয়ে কথাবার্তা চলছে, এমন সময় একটা তীব্র চীৎকার কানে এল, এই যে, শালার ছেলে!

চমকে উঠে ফিরে দেখি, আমাদের বড়কর্তা অর্থাৎ বড়ো ভাই অর্থাৎ কিনা শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায় মহাশয় অক্টোপাসের মতন পরিতোষের একখানা হাত আঁকড়ে ধরেছে। ভয়ে বেচারার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

বড়কর্তা পরিতোষের গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় কষিয়ে হুঙ্কার ছাড়লে, এবারে তোর কোন্ বাবায় বাঁচাবে রে শালা!

পরিতোষ বেচারা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, দেখলুম, তার গালে ও ঘাড়ের খানিকটা জায়গায় লম্বা লম্বা আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল।

আমি বললুম, কেন ওকে মারছেন? কি করেছে ও আপনার?

লোকটা 'চোপ' ব'লে আচমকা আমার কোমরে একটা লাথি লাগাতেই আমি একেবারে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লুম। ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয় বুঝে উঠে পালাবার যোগাড় করছি, এমন সময় বড়কর্তা চীৎকার ক'রে উঠল, পাকড়ো শালেকো।

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, বড়কর্তাকে ঘিরে চার-পাঁচজন দুশমন চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একটা লোক দৌড়ে এসে আমাকে ধ'রে আমারই কোঁচাটা দিয়ে বাঁ হাতের বাহুতে এমন জোরে একটি বন্ধন লাগালে যে, হাতখানা ঝিমঝিম করতে করতে একেবারে অবশ হয়ে গেল।

ওদিকে বড়কর্তা পরিতোষের মুখে চড়, ঘুষি ও তার চেয়ে নিদারুণ খিস্তি চালিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল।

জুতোওয়ালা সামান্য একটু আপত্তি জানাতেই বড়কর্তা চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, এই হারামজাদারা খেতে পেত না, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াত, আমার ছোট ভাই দয়াপরবশ হয়ে এদের বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করছিল, কিন্তু শেষকালে নিমকহারামেরা তার বাক্স ভেঙে টাকা চুরি ক'রে পালিয়েছিল, আজ ধরেছি।

চল্ শালা কোতোয়াল—

বাস্, আর যায় কোথায়! বড়কর্তার মুখ দিয়ে এই বাক্যটি বেরুনো মাত্র

সেই ভিড় ভেঙে পড়ল চারদিক থেকে আমাদের ওপরে। তারপরে ঘুষি কিল চড় লাথি, যার যাতে হাত বা পা আসে তাই লাগাতে আরম্ভ করলে। চোখের সামনে দেখলুম, পরিতোষ এলিয়ে পড়ল পথের ওপরে। কিন্তু তখন আমার আর অন্য কারও দিকে দেখবার অবসর নেই, বাঁ হাতখানা অন্য লোকের কবলে, ডান হাত দিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কত আটকাব! তিন-চার মিনিটের মধ্যেই চোখের সম্মুখে ফুটে উঠল বিস্তীর্ণ সরষের ক্ষেত।

সংসারে কোনও জিনিসই বৃথা যায় না। শৈশব থেকেই পিতৃহস্তে যে তালিম পেয়েছিলুম, এতদিন পরে তা সত্যিকারের কাজে লাগল, এত প্রহার সত্বেও কিন্তু আমি জ্ঞান হারাই নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলুম।

ওদিকে বোধ হয় ভিড় বাড়ছে দেখে বড়কর্তার দল আমাদের টানতে টানতে নিয়ে চলল কোতোয়ালির দিকে।

পরিতোষের দিকে ফিরে দেখলুম, তার মুখখানা ফুলে এক অদ্ভুত রকমের দেখতে হয়েছে। আমার মুখও যে ফুলে উঠেছে, তা চোখে না দেখলেও বেশ বুঝতে পারছিলুম।

অঙ্গের বেদনায় এক পা চলতে পারি না এমন অবস্থা। আমাদের দুজনকে এক রকম হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিতোষকে ধরেছে বড়কর্তা, আর আমাকে যে ধরেছে তার চেহারা ভিক্তর হুগোর কল্পনারও অতীত।

সামনেই কোতোয়ালির লাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মনে করেছিলুম, আমাদের বোধ হয় সেইখানেই নিয়ে যাওয়া হবে, কিন্তু সেখানে না নিয়ে গিয়ে তারা ঠিক কোতোয়ালির পাশেই একটা সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের টেনে নিয়ে চলল, পশ্চাতে বিপুল জনসংঘ।

সরু একটা গলিতে ছোট একখানা বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম, পেছনে তখনও অনেক লোক। বড়কর্তা তাদের একটা ধমক দিয়ে কি সব বলতেই ভিড় কিছু পাতলা হয়ে গেল বটে, কিন্তু তখনও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে রইল মজা দেখতে। বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। বড়কর্তা জোরে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল।

বাড়িটা এত নীচু যে রাস্তা থেকে লাফিয়ে দোতলার রাস্তার ধারের জানলার খড়খড়ি ধ'রে ফেলা যায়। দরজা খুলে যাওয়ামাত্র লোকগুলো

আমাদের টেনে একরকম হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলতে লাগল। সিঁড়ির মাথাতেই একটা সরু বারান্দা, তার গায়ে ঘর। আমরা ওপরে পৌঁছবার আগেই ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে থ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার?

এ দলের লোকেরা কিন্তু তার কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমাদের টানতে টানতে মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেই ঘরে নিয়ে গেল।

যাই হোক, এতক্ষণে নারীমূর্তি দেখে মনে আশা জাগতে লাগল, হয়তো এবার এই নিরর্থক নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি পাব।

ঘরখানা অত্যন্ত ছোট ও নীচু, লাফিয়ে ছাদে হাত লাগানো যায়। ঘর-জোড়া একটা ময়লা শতছিন্ন শতরঞ্চি পাতা। এক কোণে প্রায় চৌকো একটা গদির ওপরে ময়লা ও বিচিত্র দাগ-ধরা চাদর পাতা। ওরা আমাদের দুজনকে সেই গদির ওপরে একরকম ছুঁড়েই ফেলে দিলে। তারপরে বড়কর্তা গদির ওপর উঠে এক কোণে ব'সে হাঁক দিলে, দুলারী, জল খাওয়া এক গ্লাস।

দুলারী তাড়াতাড়ি একটা মুরাদাবাদী গেলাসে জল ভ'রে এনে দিলে। বড়কর্তা স্রেফ এক ঢোকে সেটা শেষ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাসটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলে। এতক্ষণে বড়কর্তার অনুচরের দল কেউ বা শতরঞ্চির ওপর কেউ বা গদিতে উঠে বসল।

দুলারী গেলাসটা যথাস্থানে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি?

বড়কর্তা একবার রোষকষায়িত লোচনে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, আজ শালাদের ধরেছি।

কথাটা ব'লেই পরিতোষের হাতের বাঁধনটা ধ'রে এক টানে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে মারলে একটা চড়।

দুলারীর দিকে ফিরে একবার তাকে ভাল ক'রে দেখে নিলুম, বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী স্ত্রীলোক। আশা করছিলুম এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে হয়তো কিছু বলবে, কিন্তু তার চোখে বিপুল কৌতূহল ছাড়া সহানুভূতির চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলুম না।

বড়কর্তা দুলারীকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল, সেই যে কলকাত্তার ছোড়া দুটোর কথা তোকে বলেছিলুম, আমাদের বাড়ি থেকে বাক্স ভেঙে

এই কথা ব'লেই আবার সে পরিতোষকে মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে, পরিতোষ নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

এবার আমি মরিয়া হয়ে উঠলুম। ইতিমধ্যে হাতের বাঁধন খুলে কোঁচা দিয়েছিলুম। দাঁড়িয়ে উঠে যতটুকু হিন্দী-জ্ঞান তখন হয়েছিল সেই ভাষাতেই দুলারীর দিকে চেয়ে বললুম, এসব আগাগোড়া মিথ্যে কথা। প্রমাণ চাও তো তোমরা সবাই মিলে চল ওদের বাড়িতে। তারা যদি বলে, আমরা টাকা ভেঙে পালিয়েছি তো যত টাকা তারা বলবে, তার ডবল টাকা গুনে ওদের নাকের ওপরে ফেলে দেব। আমরাও ভিকিরীর ছেলে নই।

তারপরে বড়কর্তাকে সোজাসুজি ব'লে দিলুম, তোমার মতন দশ-পনেরোটা বদমাইস আমার বাড়িতে দরোয়ানের কাজ করে। আর চুরি যদি ক'রেই থাকি, তা হ'লে আমাদের পুলিসে দিয়ে দাও, বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল হয়!

আসর একেবারে নিস্তব্ধ। সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, এক বড়কর্তা ছাড়া সকলেই বিস্মিত।

আমি উৎসাহিত হয়ে আবার শুরু করলুম, আমাদের মেরেছ ভাল‍ই করেছ, যদি নিজে বাঁচতে চাও তো একেবারে মেরে ফেল, নইলে তোমার বরাতে দুঃখ আছে ব'লে দিচ্ছি।

আমার কথা শেষ হতে না হতে বড়কর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে একরকম লাফিয়ে এসে, 'তবে রে' ব'লেই আমার মুখে মারলে এক ঘুষো।

দুলারী হাঁ-হাঁ চীৎকার ক'রে আমাদের দুজনের মাঝে প'ড়েও বাঁচাতে পারলে না, নাক দিয়ে আমার ঝরঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল।

রক্ত দেখে দুলারী মহা চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলে। সে বলতে লাগল, আমার বাড়িতে এসব খুনোখুনি চলবে না, সে সব করতে হয় তো ওদের নিয়ে অন্য কোথাও চ'লে যাও, আমি আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে যদি শেষে টানাটানি হয় তো কারুর ভাল হবে না।

ঠারে-ঠোরে বুঝতে পারলুম, এর আগে এখানে খুন-খারাবিও হয়ে গিয়েছে এবং এদের বাঁচাতে গিয়ে দুলারীকে যথেষ্ট হাঙ্গামাও পোয়াতে হয়েছে।

দুলারীর ওই চেঁচামেচি শুনেও কিন্তু আমার মনে কোন ভয়েরই উদ্রেক হ'ল না, বরঞ্চ সমস্ত বিশ্ব-সংসারের প্রতি একটা দারুণ অভিমানে মনে হচ্ছে

লাগল, এরা যদি এখানে আমাদের সত্যিই মেরে ফেলে, তা হ'লে ভালই হয়। নিত্য বিনাদোষে এই অপমান আর সহ্য হয় না।

ইতিমধ্যে দুলারী চেঁচাতে চেঁচাতে এক গেলাস জল গড়িয়ে অঞ্জলিভরে আমার নাকে ছিটিয়ে দিতে আরম্ভ করলে, জামা কাপড় রক্ত ও জলে ভিজে যেতে লাগল।

মনে হ'ল, দুলারীর চীৎকারে বড়কর্তা যেন একটু দ'মে গেল। সে তার কথার কোন জবাব না দিয়ে ট্যাঁক থেকে একটা সিকি বার ক'রে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এক প্যাকেট রেলওয়াই সিগারেট নিয়ে আয় তো।

একটা লোক সিকিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমার নাকের রক্ত পড়া ক'মে গেল বটে, কিন্তু ভেতরটা খুব জ্বালা করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাকটা চেপে ধ'রে ব'সে রইলুম। একটু দূরেই পরিতোষ ব'সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, দেখতে দেখতে তার মুখখানা অসম্ভব রকমের ফুলে উঠতে আরম্ভ করল।

একটু বাদে দুলারী আমাকে প্রশ্ন করলে, তোমরা কবে কাশীতে এসেছ?

আজ সকালে। এই ঘণ্টা দেড়েক আগে।

এই যে বাবু বললে, তোমরা ওদের বাড়ি থেকে টাকা ভেঙে অনেকদিন হ'ল পালিয়েছ!

ওসব মিথ্যে কথা। ও আজ পনেরো দিন আগে ওর বোনকে ছুরি মেরে বাড়ি থেকে চ'লে এসেছে, ওকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না, তাই আমাদের ওপরে এত রাগ।

আমার কথা শেষ হতে না হতে বড়কর্তা সিংহের মতন গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কেয়া বোলা! আজ তুঝে মার্ ডালুঙ্গা—

ব'লেই কোমর থেকে সাঁই ক'রে সেই সনাতন বিছুয়া বার ক'রে ফেললে।

পরিতোষ সেই দৃশ্য দেখে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, নিমেষের মধ্যে আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দুলারী বললে, খবরদার, ওসব করতে চাও তো এদের নিয়ে অন্যত্র চ'লে যাও, নইলে এক্ষুনি আমি কোতোয়ালিতে খবর পাঠাব।

বড়কর্তা হঠাৎ যেমন দাঁড়িয়ে উঠেছিল, দুলারীর সেই মূর্তি দেখে ও কথা শুনে তেমনই ধড়াস ক'রে ব'সে পড়ল।

ইতিমধ্যে তার অনুচর এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসায় একটা ধরিয়ে সে নির্বিকারভাবে সাঁ-সাঁ ক'রে টানতে শুরু ক'রে দিলে।

দুলারী আবার আমায় জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ ভাই, তো কাশী কি করতে এসেছিলে আজ?

আমি বললুম, দিদিমণি ও বাবুজী অর্থাৎ ওঁর বোন আর ওঁর বাবা আমাদের কাশী পাঠিয়েছেন বাড়ির কতকগুলো জিনিস কেনবার জন্যে।

এবার দুলারী বড়কর্তার দিকে ফিরে বললে, শুনা তুম্‌নে?

বড়কর্তা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললে, শুনিস কেন ওদের কথা!

তারপরে আমাদের বললে, কোথায় কি জিনিস কিনতে দিয়েছে দেখি?

ফর্দখানা আমার কাছে ছিল, পকেট থেকে বের ক'রে দুলারীর হাতে দিতেই ফস ক'রে কাগজখানা সে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এ বাংগালীতে লিখেছে, তুই বুঝতে পারবি নে।

অনেকক্ষণ ধ'রে বানান ক'রে ফর্দখানা প'ড়ে সে বললে, টাকা কোথায়?

টাকা পরিতোষের কাছে ছিল। সে পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বের ক'রে তার হাতে দিতেই সে গুনে দেখে তার অনুচরদের নিয়ে বেরিয়ে গেল, আমরা দুলারীর ঘরে ব'সে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে এক অতিবৃদ্ধা নেমে এসে দুলারীকে কি সব বললে, বোধ হয় রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে। তার সঙ্গে কি সব আলোচনা ক'রে দুলারী ওপরে উঠে গেল, আমরা দুজনে সেই গদির দু কোণে গাড্ডু হয়ে ব'সে রইলুম।

অদৃষ্টের এই নতুন প্যাঁচে উভয়েই কাত, কারুর মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ পরিতোষ তার আঙুল থেকে দিদিমণির দেওয়া সেই আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললে, এটা লুকিয়ে রাখ্‌।

আমি তাড়াতাড়ি কাছায় খুঁটে আংটিটা বেঁধে ফেললুম।

দুজনে দু কোণে ব'সে আছি। পরিতোষ চোখ বুজে, আমার নাক চাপা থাকলেও চোখ দুটো তার দিকে স্থিরনিবদ্ধ। হঠাৎ মনে হ'ল, যেন সে থর-থর ক'রে কাঁপছে, দেখতে না দেখতে কাঁপতে কাঁপতে সে গদির ওপরে এলিয়ে

পড়ল। আমি উঠে গিয়ে তার মাথায় হাত দিতেই সে বললে, বড্ড শীত করছে রে!

পরিতোষ আচ্ছন্নের মতন প'ড়ে রইল, আর আমি তার মাথার কাছে নাকে কাপড় চেপে ব'সে রইলুম।

দুলারী সেই যে ওপরে গিয়েছিল, আর সে নামল না। মধ্যে মধ্যে তাদের কথাবার্তা, রান্নার আওয়াজ ও গন্ধ নাকে ও কানে এসে পৌঁছতে লাগল।

বোধ হয় ঘণ্টাদেড়েক এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর, বড়কর্তা তার দলবল নিয়ে ফিরে এল, প্রত্যেকে একেবারে মদে চুরচুরে হয়ে। আমি মনে করেছিলুম, আমাদের অঙ্গসেবা ক'রে বোধ হয় মনে অনুতাপ হওয়ায় আমাদের হয়ে সে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিল। হায় রে আশা!

বড়কর্তা ঘরে ঢুকেই আমাদের বললে, এই, ওঠ্।

পরিতোষ তখনও চোখ বুজে প'ড়ে, তাকে ঠেলে-ঠুলে দাঁড় করালুম। সে একরকম আমার ওপরেই ভর ক'রে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি রে?

বড়কর্তা ধমকের সুরে আবার বললে, চল্।

আমরা তাদের সঙ্গে নীচে রাস্তায় নেমে গেলুম। বড়কর্তার অনুচরদের মধ্যে যে লোকটা সব চাইতে ষণ্ডা ও দুশমনের মত চেহারা, দেখলুম, সেই সবচেয়ে বেশি মাতাল হয়েছে। নেশা হ'লে লোকের যেমন মাথার প্রতিক্রিয়ায় পা টলে, এর কিন্তু সে রকম হচ্ছিল না। এর কোমর থেকে মাথা অবধি লোহার ডাণ্ডার মতন স্থির। পা দুটো একটু ল্যাক-প্যাক করছিল বটে, কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ পা দুটো মুড়ে একেবারে ব'সে পড়বার মতন হয়ে সেই অবস্থাতেই একটা ছুটো পাক খেয়ে কাতরানো লাট্টু যেমন সোজা হয়ে ওঠে, তেমনই সামলে উঠতে লাগল।

আমি এক হাতে কোঁচার কাপড় জড়ো ক'রে নাকে চেপে ধরেছি, আর এক হাত দিয়ে পরিতোষকে ধরেছি জড়িয়ে, সে একরকম আমার ওপরেই ভর দিয়ে চলেছে। নিজের অঙ্গও প্রায় অবশ, তবুও সেই লোকটার ওই রকম সার্কাসের ক্লাউনের ধাঁচে চলবার ছিরি দেখে হাসি পেতে লাগল।

যা হোক, কোন রকমে তো বড় রাস্তায় এসে পৌঁছানো গেল। সেখানে ঘোড়া টিকে-গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ওরা আগেই সেখানা ভাড়া ক'রে এনেছিল।

আমাদের দুজনকে ঠেলে ঠেলে গাড়ির মধ্যে পুরে দিয়ে তারপরে বড়কর্তা উঠে সেই মাতাল লোকটাকে গাড়ির ভেতরে আসতে বললে।

লোকটা বললে, বে ফিক্‌র্ থাক, আমি কোচবাক্সে চড়ব।

ব'লেই সে সেই রকম হাঁটু মুড়ে মুড়ে বাকি তিনজনকে গাড়ির মধ্যে পুরে দিলে। তারপরে নিজে কোচবাক্সে চড়বার কসরৎ করতে আরম্ভ করলে। দু-তিন বার ওঠবার চেষ্টা ক'রে একবার হাঁটু মুড়ে ওপর থেকে দড়াম ক'রে নীচে প'ড়ে গেল।

গাড়ির ভেতর থেকে বড়কর্তা ও আর একটা লোক বিশ্রী গালাগালি দিতে দিতে বেরিয়ে প'ড়ে লোকটাকে রাস্তা থেকে টেনে তুললে।

ভূমিশয্যা থেকে উঠেই আবার সে কসরৎ ক'রে কোচবাক্সে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল, ওদের মানা শুনলে না।

যা হোক, ওরা ও রাস্তার আরও দু-চারজন লোকের সাহায্যে লোকটাকে কোচবাক্সে তুলে দেওয়া হ'ল। বড়কর্তারা গাড়ির মধ্যে ফিরে এসে গাড়োয়ানকে হুকুম দিলে, রাজঘাট চল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি রাজঘাট স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল। বড়-কর্তা গাড়ি থেকে নেমে আমাদের বললে, উৎরো।

গাড়ি থেকে নেমে দেখা গেল, কোচবাক্সের সেই লোকটা গাড়ির ছাতে হাত পা ছড়িয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। তাকে না তুলে, গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে ব'লে তারা আমাদের স্টেশনে নিয়ে গিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের একটা বেঞ্চিতে বসল।

কিছুক্ষণ, বোধ হয় মিনিট পনেরো, বাদে মোগলসরাই-যাত্রী একটা ট্রেন আসতেই তারা আমাদের নিয়ে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গ্যাঁট হয়ে বসল।

গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় বড়কর্তা উঠে বাইরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে পকেট থেকে দুখানা টিকিট বের ক'রে বললে, এই নাও, দুখানা হাওড়ার টিকিট, ফের যদি কখনও এখানে তোমাদের দেখতে পাই তো জান্‌সে মেরে দেব, মনে থাকে যেন।

আমি হাত বাড়িয়ে টিকিট দুখানা নেবার কয়েক মিনিট পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে, বড়কর্তার অনুচরদের মধ্যে তিনটে লোক আমাদের সঙ্গে গাড়িতে ব'সে রইল।

দেখতে দেখতে গাড়ি মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছে গেল। আমাদের সঙ্গের লোকেরা স্টেশনে নেমেই বললে, ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চ'লে এস তাড়াতাড়ি।

আমরা 'ওভারব্রিজ' পেরিয়ে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলুম। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, তার কামরাগুলো একেবারে খালি বললেই হয়। লোকগুলো আমাদের নিয়ে একটা একেবারে খালি কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

এতক্ষণে পরিতোষের সেই তন্দ্রা-ঘোর কেটে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার রে ?

আমার মুখে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার শুনে আর কোন কথা না ব'লে সে বেঞ্চির ওপর গা ঢেলে দিলে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অতি অস্বস্তিকর অপেক্ষার পর আমাদের ট্রেন ন'ড়ে উঠল। দেখলুম, বড়কর্তার তিনজন অনুচরের মধ্যে একজন নেমে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল, আর দুজন গাড়িতেই ব'সে রইল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। বিদায় বারাণসী !

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭

And this defendant further saith that the said Ramcaunt Roy after such partition and separation as aforesaid contracted debts to a considerable amount some of which were due and unpaid at the time of his death but that this defendant at any time hath not been required or compelled to pay and hath not in fact paid any of the debts of the said Ramcaunt Roy which were contracted after such partition or separation for that the said Ramcaunt Roy after such partition and separation was treated and considered as a person who had divided and severed his pecuniary interests from the other members of his family And this defendant further saith that shortly after the said separation and partition and after the said Ramcaunt Roy and Ramlochun Roy had respectively quitted the said family house at Nangoorparah this defendant and the said Juggomohun Roy also conducted themselves, except

as hereinbefore mentioned as persons entirely separated in interest and that this defendant employed and from that time until the time of the death of the said Juggomohun Roy and aferwards until the present time continued to employ separate agents and servants for the management of the affairs and dealings of this defendant over which agents or servants the said Juggomohun Roy had not any control and that this defendant at all times after such partition and during the lifetime of the said Juggomohun Roy carried on his dealings and transactions wholly distinct and separate from the dealings and transactions of the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy respectively and kept or caused to be kept books and accounts of the separate dealings and transactions of him this defendant which last mentioned books and accounts were at all times in the exclusive possession of this defendant and his agents or servants and which last mentioned books or accounts were not at any time to the knowledge or belief of this defendant subject or subjected to the inspection or control of the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy or of either of them and that after such partition and separation the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy or either of them did not to the knowledge or belief of this defendant claim or assert any right to any interest share or proportion in the dealings or transactions of this defendant or in the property immoveable or moveable which this defendant possessed or had acquired but that on the contrary thereof the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy and each of them during their respective lifetimes treated and considered the dealings and transactions of this defendant and the property acquired and possessed by this defendant after such partition as aforesaid as dealinge transactions and property respectively in which they the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy or either of them had not any share or interest whatsoever And this defendant further saith that after such partition and after the said Ramcaunt Roy and Ramlochun Roy had respectively withdrawn from the said family house at Nangoorparah as aforesaid the said Juggomohun Roy also employed and from that period until the time of his death continued to employ separate agents or servants for the management of the separate affairs and dealings of him the said Juggomohun Roy which last mentioned agents or servants were paid by the proper monies of him the said Juggomohun Roy and were not in any manner under the control or authority of this defendant or as this defendant believes under the control or authority of the said Ramcaunt Roy and that the said Juggomohun Roy at all times after the said partition during his lifetime carried on separate dealings and transactions wholly distinct and separate from the

dealings and transactions of the said Ramcaunt Roy and of this defendant respectively and kept or caused to be kept separate books and accounts of the dealings and transactions of him the said Juggomohun Roy which last mentioned books and accounts were at all times in the possession of the said Juggomohun Roy or of his agents or servants and which last mentioned books or accounts were not at any time inspected or examined by this defendant or as this defendant believes by any person or persons on his behalf or as this defendant believes by the said Ramcaunt Roy in his lifetime or by any person or persons on his behalf and that this defendant or the said Ramcaunt Roy to the knowledge or belief of this defendant did not at any time after such partition and separation as aforesaid claim or assert any right to interfere in the said dealings or transactions of the said Juggomohun Roy or any claim or right to any interest share or proportion in the property which was possessed or had been acquired by the said Juggomohun Roy subsequently to the said partition as aforesaid but that on the contrary thereof the said Ramcaunt Roy during his lifetime and this defendant at all times after the said partition and during the lifetime of the said Juggomohun Roy treated and considered the dealings transactions and property of the said Juggomohun Roy as dealings transactions and property respectively in which the said Ramcaunt Roy and this defendant or either of them had not any interest whatsoever and this defendant further saith that after the death of the said Juggomohun Roy and until the time of the filing of the complainant's Bill of Complaint the dealings and transactions of this defendant have been carried on and conducted in the same manner as they were carried on and conducted after the said partition as aforesaid during the lifetime of the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy respectively and separate from and unconnected with the dealings and transactions of the said complainant

ক্রমশ

ভ্রম-সংশোধন :—গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে পৃ. ১৫৯, পংক্তি ৩৪, hereby স্থলে humbly পড়িতে হইবে।

একটি সনেট

উদিল মধুবালা—কিরণ-মুকুট
রজনীর তম হেরি জাগিল পলকে,
উথলে রজত-সিন্ধু আলোর ঝলকে
উদিল প্রাচীর নভে তপনের মুখ।
রজনীর বক্ষে আজো পুরাতন দুখ,
অন্ধকার মালা, আহা, খসিত অলকে।
তবু নিশা চাহে মুক্তি আলোর ঝলকে,
একান্তে মিশিয়া গেছে অমর উৎসুক।

আবার প্রভাত হাসে মানসের জলে;
বর্তমান অন্ধকার নিশার পাথার।
তবু জ্যোতি ল'য়ে চাহে দিবাকর মম,
আলোক-পরশ তার সঙ্গোপনে জ্বলে;
এক সনে সম্মিলিত আলোক-আঁধার;
আবার তপন হবে জাগো প্রিয়তম।

শ্রীমতী বাণী রায়

অগ্নি

(পূর্বানুবৃত্তি)

১১

ইলেক্‌ট্রিসিটির বইখানা নিয়ে গেছে। মনের সঙ্গে যে নির্জনে বোঝাপড়া করবে তারও উপায় নেই। দু ঘণ্টা অন্তর পুলিসের লোক আসছে। প্রতিবারই নূতন লোক। জেরা চলছে ক্রমাগত। সঙ্গত-অসঙ্গত নানা প্রশ্ন। গাল দিচ্ছে। তাকে, তার বাবাকে, বংশকে, দেশকে, দেশের নেতাদের। অকথ্য, অশ্রাব্য গালাগালি।...ঘুমে চোখ বুজে আসছে, দেহ অবসন্ন, কিন্তু ওরা থামবে না। দু ঘণ্টা অন্তর নূতন লোক আসছে। জেরার পর জেরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গালাগালির ঝড় বইছে। ঘুমুতে দেবে না। নির্বাক হয়ে শুনে যেতে হচ্ছে খালি। নির্বাকও থাকতে দিচ্ছে না...সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রশ্ন...যা হোক কিছু একটা উত্তর দিতেই হচ্ছে...একই উত্তর সহস্র বার দিয়েছে, আবার দিতে হচ্ছে। চুপ ক'রে থাকলে গাল দিচ্ছে। জানি না, জানি না, জানি না, জানি না,—কতবার বলা যায় এক কথা! কিন্তু ওরা থামবে না। একই কথা শুনবে বার বার। বলছে—ব'লে যাচ্ছে ক্রমাগত। বসতে দেবে না, দাঁড় করিয়ে রেখেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শরীরের রক্ত ফুটছে টগবগ ক'রে, জিব শুকিয়ে আসছে, জোর ক'রে চাইতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরে শান্তভাব বজায় রেখে তবু ব'লে যেতে হচ্ছে—জানি না, জানি না, জানি না।

শেষ সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টার বিদায় নিয়ে যাবার আগে ব'লে গেলেন, তিনটে বাজল, এবার উঠি, আবার আসব কাল। ভাল ক'রে ভেবে দেখুন ইতিমধ্যে।

অন্ধকার ঘরে একা ব'সে রইল অংশুমান।

১২

নিশ্ছিদ্র নিবিড় অন্ধকার।

পথ। যে পথ মানুষ সৃষ্টি করে গতিকে মুক্তি দেবার জন্যে, সেই পথই আবার মানুষ বন্ধ করে মানুষেরই গতি-রোধ আকাঙ্ক্ষায়। মানুষই মানুষের সর্ব্বপ্রধান শত্রু ...

ঠক্ ঠক্ ঠকাঠক...সন্তর্পণে কিন্তু অনবরত পড়ছে আঘাতের পর আঘাত। ঘনঘন অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে কুড়ুল চালিয়ে যাচ্ছে। গাছ ফেলে রাস্তা

বন্ধ করতে হবে। মিলিটারি মোটর না আসতে পারে যেন। ঘর্মাক্তকলেবরে কুড়ুল চালাচ্ছে সবাই, ধরা পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও। হাত কাঁপছে না কারও। দৃঢ়-নিবদ্ধ ওষ্ঠ, চোখে আগুন জলছে সকলের। সকলেই যুবক নয়। বৃদ্ধ আছে, বালকও আছে।

নিন বাবু মশায় আমার নৌকোটাও।

সারি সারি নৌকা জমা হচ্ছে ঘাটে-আঘাটায়। প্রত্যেকটার তলা ফেঁড়ে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মালিকরা নিজেরাই দিচ্ছে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিতে হচ্ছে সকলকেই। দেশব্যাপী এই অপমানের প্রতিবাদ করতেই হবে। নদী পেরিয়ে পুলিস যেন না আসতে পারে। জনতার বিপুল দাবি, দিতে হবেই নৌকা সকলকে। দেখতে দেখতে সব কটা নৌকা ডুবে গেল। ওপারের দিকে চাইলে অংশুমান। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। আকাশে মনে হ'ল মেঘ করেছে একটু। মেঘের কোলে নক্ষত্র জলছে। এক ঝলক হাওয়া ছুটে এল কোথা থেকে আচমকা। তালগাছের পাতাগুলো হড়মড় ক'রে উঠল। শিহরণ জাগল নদীর জলে। অংশুমান সওয়ার হ'ল বাইকে, অনেক জায়গায় যেতে হবে এখনও।

মার গাঁইতি, হ্যাঁ, দাও আর এক ঘা—

আরে, কোদাল চালাও না ওই দিকটাতে। ভয় কি, ভাবছ কি তুমি?

মায়া হচ্ছে।—হেসে বললে একজন, নিজের হাতে গেঁথেছিলাম একদিন···

হ্যাঁ, চার আনা মজুরির বদলে, সাহেবদের মোটর যাবে ব'লে।

পড়তে লাগল কোপের পর কোপ।

হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল পুলটা।

ছুটল সবাই অন্ধকার মাঠ ভেঙে।

অদৃশ্য হ'য়ে গেল নিমেষে···।

রাস্তায় বড় বড় গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। টেলিগ্রাফের তার একটাও নেই। খুঁটিগুলো পর্যন্ত উপড়ে ফেলছে সবাই মিলে। টেলিফোনের তারও কাটা হয়ে গেছে···। অংশুমানের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ দারোগারই সঙ্গে।

কে ?

প্রদীপ্ত টর্চের আলোটা পড়ল মুখের উপর। পালাবার উপায় রইল না। বাইক থেকে নাবতে হ'ল।

আমি অংশু।

আপনি! এতরাত্রে এ দিকে কোথা গিয়েছিলেন ?

মনে হ'ল, কতকগুলো লোক টেলিগ্রাফের তার কাটছে, তাই বেরিয়েছিলাম যদি তাদের ধরতে পারি…

পাগল ক'রে দেবে দেখছি ব্যাটারা। গেল কোন্ দিকে, আমিও তাদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ওই যে ওই দিকে, বাগানের অন্ধকারে স'রে পড়ল সব।

যেদিকে লোকগুলো সত্যিই পালিয়েছিল, ঠিক তার উল্টো দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিলে অংশুমান। বিভ্রান্ত দারোগা ছুটল সেই দিকে…।

…পোলাণ্ড।

একটি ছোট বোর্ডিং-স্কুল। পঁচিশটি মেয়ে সারি সারি ব'সে আছে। কুৎসিত-দর্শনা একটি শিক্ষয়িত্রী পড়া নিচ্ছেন। দশ বছরের একটি মেয়ে, জেনী সক্লাডোওয়াস্কা পড়া ব'লে যাচ্ছে। পোলিশ ভাষায় পোলাণ্ডের একটি রাজার কাহিনী। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। টুঁ শব্দটি নেই। বে-আইনী কাজ হচ্ছে। জার-শাসিত পোলাণ্ডে পোলিশ ভাষায় কিছু পড়াবার হুকুম নেই। তবু কিন্তু পড়ানো হচ্ছে লুকিয়ে। স্কুলের দারোয়ান থেকে আরম্ভ ক'রে হেডমিস্ট্রেস পর্যন্ত সকলেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায় আইন মানবে না তারা।…হঠাৎ ইলেকট্রিক ঘণ্টাটা বেজে উঠল, জোরে নয় আস্তে। সঙ্কেত! চমকে উঠল সবাই। নিশ্চয় আসছে কেউ। নিমেষের মধ্যে চারটি মেয়ে ইতিহাসের বইগুলো কুড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ত্বরিতপদে। সেগুলো লুকিয়ে রেখে ফিরে এল আবার। সেলাই নিয়ে বসল সব, যেন এতক্ষণ সেলাই নিয়ে ছিল সবাই। রাশিয়ান ইন্‌স্পেক্টার ঘরে ঢুকলেন।

শিক্ষয়িত্রীটি উঠে বললেন, এ দু ঘণ্টা আমরা মেয়েদের সেলাই শেখাই…

আপনি কি যেন পড়াচ্ছিলেন একটা ?

ওদের গল্প প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম। এই যে—

রাশিয়ান হরফে ছাপা কেতাদুরস্ত একখানা গল্পের বই আগে থাকতে টেবিলে রাখাই ছিল, দেখালেন সেটা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেটা উলটে-পালটে দেখে রাশিয়ান ইন্‌স্‌পেক্টার তারপর পরীক্ষা শুরু করলেন। রাশিয়ার জারেদের নাম, তাদের জ্ঞাতিগুষ্টির নাম, তাদের প্রত্যেকের উপাধি কি কি, কটমট নামের বিরাট বিরাট তালিকা আবৃত্তি করতে হ'ল। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি ক'রে গেল সেই দশ বছরের মেয়েটি। মেরী সক্লাভোওয়াস্‌কা···ভবিষ্যৎ মাদাম ক্যুরি।

শত্রুর কাছে মিছে কথা বলায় পাপ নেই।

···না, না···।

আপনি কি দেখেছিলেন ?

আমি দেখেছিলাম যে, উনি বাইক ক'রে এসে ভলান্টিয়ার যোগাড় করছিলেন তার কাটবার জন্যে। আমাকেও যেতে বলেছিলেন।

আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অংশুমান। সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে যাচ্ছে। সে কিন্তু কিছু শুনছে না। তার মানসপটে শুধু জাগছে ছবির পর ছবি। আর কানে বাজছে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাব···। অদৃশ্য অপরা-তড়িৎ ক্রমাগত ব'লে চলেছে পরা-তড়িতের উদ্দেশে, যাব, যাব, তোমারই কাছে যাব···

হ্যাঁ যাবই, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাব···

এগিয়ে চলেছে জনতা। সামনেই থান। লাল-পাগড়িতে ভ'রে গেছে চারিদিক। খাকি-পোশাক-পরা মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে বেওনেট উঁচিয়ে। জনতা এগিয়ে চলেছে তবু।

ফায়ার···

শুরু হয়ে গেল গুলি। পতাকাধারী প'ড়ে গেল একজন। পতাকা পড়ল না কিন্তু···ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত বীরের মৃতমুষ্টিতে সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। মৃতজন প্রাণ ছিল, পতাকার মান রেখেছিল সে। গুলি চলছে···লোক মরছে।

সর্বাঙ্গে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক, গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে বুকের ভরে এগিয়ে চলেছে একজন। দুটো পা-ই জখম হয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই। কিন্তু তবু সে যাবে, মরবার আগে থানায় সে পৌঁছবেই। পণ সে রক্ষা করবেই···।

এসেছি, এসেছি এই দেখ, তোমরাও এস···

থানার বারান্দায় উঠে হাসিমুখে ব'লে উঠল সে। রগের উপর একটা গুলি বিঁধল এসে। মুখ থুবড়ে পড়ল। মুখে হাসি।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিস্পন্দ অংশুমান ছবির পর ছবি দেখছে শুধু, হঠাৎ জজ সাহেবের মুখটা চোখে পড়ল। দেশী জজ। যা শুনছে তাই লিখে যাচ্ছে, যে যা বলছে তাই টুকে যাচ্ছে। নির্বিকার। একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল। গল্প নয়, ইতিহাস। ট্রট্‌স্কির লেখা রাশিয়ান বিদ্রোহের ইতিহাসে আছে—চতুর্দিকে বিদ্রোহ যখন আসন্ন, অত্যাচারে অবিচারে ষড়যন্ত্রে রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত যখন ব্যতিব্যস্ত, ঘরে বাইরে কোথাও স্বস্তির চিহ্নমাত্র নেই, প্রলয়ের ঢেউ প্রাসাদের সিংহদ্বারে যখন ভেঙে পড়ছে, তখন জার নিকোলাস নাকি নিরতিশয় উদাসীন ছিলেন। প্রমাণ তাঁর তখনকার রোজ-নামচা। অনেকক্ষণ বেড়ালাম, দুটো কাক মারলাম, দিনের আলোয় ব'সে চা খাওয়া গেল, পাতলা কামিজ গায়ে দিয়ে বেরিয়েছি আজ, নৌকো বাইলাম, একটু পড়েছি—রোজনামচায় এই সব লেখা খালি। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কথা নেই, স্বাভাবিক ছন্দে জীবন ব'য়ে চলেছে যেন। সামান্যতম উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানীরা পোর্ট আর্থার দখল করেছিল যখন, তখনও তিনি নাকি এমনই নির্বিকার ছিলেন। তাঁর পারিষদ্বর্গ তাঁর অদ্ভুত আত্মসংযম দেখে অবাক হয়ে যেতেন, অনেকে বলতেন, এ ঔদাসীন্য আভিজাত্যের লক্ষণ। ট্রট্‌স্কি বলেছেন, এর আসল কারণ আধ্যাত্মিক দৈন্য। উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হতে হ'লে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, নিকোলাসের তা ছিল না। তিনি ছিলেন জড়-অসাড়। এ লোকটাও তাই নাকি···অংশুমান আর একবার জজ সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। যে জাল ছিন্ন করবার জন্যে দেশসুদ্ধ লোক বিদ্রোহ করেছে, সে জালে উনিও যে আবদ্ধ তার কোন বোধ ওঁর চোখে মুখে পরিস্ফুট নয়। মানুষ নয়, একটা

মুখোশ-পরা যন্ত্র যেন ব'সে আছে কোট প্যাণ্ট প'রে, যে যা বলছে টুকে যাচ্ছে…

মেঘ ক'রে আসছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের খানিকটা। পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন নীল মেঘে ছেয়ে ফেলছে চারিদিক। তাদের বাড়ির পাশে যে কদম-গাছটা আছে, তার পুষ্পকেশরে কি রোমাঞ্চ জেগেছে! চারিদিক কি স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে আসছে! কি নিবিড়! সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ… হঠাৎ মেঘদূত মনে প'ড়ে গেল। ত্বামারূঢ়ং পবন পদবীমুদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসন্ত…আজও কি পথিকবনিতারা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে অলকদাম উত্তোলন ক'রে পবনপথারূঢ় আষাঢ়ের মেঘের দিকে চেয়ে থাকে…দেশের কি সে অবস্থা আছে এখন আর? অতসী কোথায়, এখন কি করছে, কি ভাবছে, ডেপুটির গৃহিণী হয়ে সুখে আছে কি সে, তার মত মেয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব কি, জড়োয়া গয়নার কথা তার স্বামী কি টের পেয়েছে?…

দপ ক'রে ইলেকট্রিক আলো জ'লে উঠল। "যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোমারই কাছে যাচ্ছি, নানা বাধা বিঘ্ন বহু জটিল পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, কিন্তু তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছবই…"

অপরা-তড়িত পরা-তড়িতের কাছে যেতে চায়, তাই তো আলো জলে, পাখা ঘোরে, এরোপ্লেন ওড়ে, রেডিও বাজে। তার এ আগ্রহ না থাকলে থেমে যেত সব। সহসা অংশুমানের মনে হ'ল, এমনই এক-একটা আগ্রহের টানেই তো গ'ড়ে উঠেছে এক-একটা সভ্যতা। স্বর্গের টানে বৈদিক, ব্রহ্মের টানে ঔপনিষদিক, নির্বাণের টানে বৌদ্ধ, প্রেমের টানে বৈষ্ণব, অপরা-তড়িতের টানেও তেমনই গ'ড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। অতসীর টানে সেও হয়তো বড় কিছু একটা করবে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, কতটুকু ক্ষমতা তার, কি করতে পারে সে!

"…যখন দাদোজির সঙ্গে সহ্যাদ্রির শিখরে দাঁড়িয়ে ভগবানের সমক্ষে আমি শপথ করেছিলাম যে, ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্য আমি প্রাণপণ করব, তখন আমার ক্ষমতা কতটুকু ছিল! তখন আমার বয়স আঠারো বছর মাত্র…"

সপ্তদশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভেদ ক'রে ভেসে এল শিবাজীর কণ্ঠস্বর।

তুমি নয়, আমি নয়, জয়ী হয় ধর্ম। ধর্মের ধ্বজাবাহক আমরা, তাই আমাদের একমাত্র ভরসা। ধর্মই আমাদের শক্তি···

রাজদম্পতির প্রকাণ্ড যে তৈলচিত্রটা টাঙানো ছিল সামনে, তা অবলুপ্ত ক'রে ফুটে উঠল ছত্রপতি শিবাজীর ছবি, অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন শত্রুজয় করতে।

আর্তের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

শত্রুর কবলে মরণাপন্ন আমরা নিজেরই ঘরে বন্দী হয়ে আছি, শত্রুর প্রহরী পাহারা দিচ্ছে দ্বারে। অন্ন নেই, পানীয় নেই, কোথায় তুমি ত্রাণকর্তা, ছুটে এস···

ছুটে চলেছে মারহাট্টা বীর হাম্বীর রাও।

প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হ'ল একটা···চমকে উঠল আদালত।

যাবই আমি।—কে যেন বজ্রকণ্ঠে বললে, অংশুমানের মনে হ'ল।

আবেগ যদি প্রবল হয়, দুস্তর বাধাও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

অংশুমানের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল সহসা। অন্তরা, অন্তরা, কোথায় তুমি··· ? পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে। পরস্ত্রীর সম্বন্ধে এ কি চিন্তা! এ কি ভাবছি সর্বদা, ছি ছি! কেন এ দুর্বলতা, কেন, কেন, কেন? এই দুর্বল চরিত্র নিয়ে কোন্ সাহসে এই কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি! এতটুকু মনের জোর নেই, যুঝব কি ক'রে শেষ পর্যন্ত? এমন দুর্বল চরিত্র নিয়ে যুঝতে কি পেরেছে কেউ কখনও? সহসা শম্ভুজীর ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল—চরিত্রহীন মত্তপ শম্ভুজীর। ঔরঙ্গজেবের বন্দী শম্ভুজী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে মৃত্যু, রাজি হ'ল না শম্ভুজী। ইসলাম নয়, মৃত্যুকেই বরণ করবে সে। একে একে চোখ উপড়ে নেওয়া হ'ল, তপ্ত লোহার সাঁড়াশি দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা হ'ল জিব। চরিত্রহীন মত্তপটা বিচলিত হ'ল না তবু। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র ছিল যে, সারাজীবন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে সে। অন্ধ শম্ভুজী যেন চেয়ে আছে তার দিকে, ঠোঁট দুটো ন'ড়ে উঠল,···যেন বললে, তুমিও পারবে।

আপনি কি দেখেছিলেন?

ডেপুটি সাহেবকে মোটর থেকে জোর ক'রে নাবাচ্ছেন উনি।

আর কে কে ছিল?

অনেক লোক ছিল। আমিও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম, অংশুমানবাবু এগিয়ে গিয়ে ডেপুটি সাহেবের হাতটা চেপে ধরলেন।

সাক্ষীর পর সাক্ষী আসছে, যাচ্ছে।

সকলেরই মুখে এক কথা, স্বচক্ষে দেখেছি।

…আবার সেই নির্জন কারাগার।

সমস্ত মন অসাড় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সমস্ত ধ'সে গেছে যেন ভিতরে। খটাং ক'রে শব্দটা হতেই চমকে উঠল সে। জগদ্দল পাথরের মত অনড় অচল ভাষাহীন যে বোধটা নিদারুণ চাপে নিপীড়িত করছিল মনকে, সজাগ ভাবে যার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার উৎসাহ সে পায় নি এতক্ষণ, তালা-বন্ধ হওয়ার শব্দে ভেঙে পড়ল সেটা যেন খানখান হয়ে, ছড়িয়ে পড়ল টুকরোগুলো প্রত্যক্ষ চেতনার সামনে। তার স্বরূপ অগোচর রইল না আর। সব দেশী লোক! জজ দেশী, দারোগা দেশী, পুলিস দেশী, জেলার দেশী…দলে দলে তার নামে যারা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে গেল সব দেশী! সে নির্দোষ নয় তা ঠিক, কিন্তু এরা যা ব'লে গেল তা সব বানানো…কারও একটা কথাও সত্য নয়। কিসের লোভে মিথ্যে কথা বললে এরা!

তুমিও তো সত্য কথা বল নি। তুমিও মিথ্যা কথা ব'লে চলেছ ক্রমাগত…

অদৃশ্য বিবেকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। চমকে উঠল অংশুমান। নিত্তি ধ'রে এ লোকটা ব'সে আছে তো ঠিক, এত বিপর্যয়েও বিপর্যস্ত হয় নি একটুও। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যেই। পরমুহূর্তেই বলে উঠল, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। আমি মিছে কথা বলেছি বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, দুষ্টকে দমন করবার জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতা কামনায়। যুধিষ্ঠির থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষের জীবনেই এ রকম প্রবঞ্চনার উদাহরণ পাওয়া যাবে। নির্জন অন্ধকারে কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল। জোরে বলার কোন দরকার ছিল না তো! …পোড়া ডেপুটির মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল আবার। দাম্ভিক, বর্বর, পাষণ্ড! কাপুরুষ। শুধু যে কর্তব্যকর্মের অনুরোধে বাধ্য হয়ে মারীধর্ষণের হুকুম দিয়েছিল তা নয়, সেটা উপভোগও করেছিল। বহুবার ধর্ষিতা একটি মেয়ের

চেহারা মনে পড়ল। কি অসহায় করুণ দৃষ্টি তার চোখে! মুখে কথা নেই দাঁড়াতে পারছে না ভাল ক'রে, থরথর ক'রে কাঁপছে, উত্তর দিচ্ছে না কারও কথার···শুনতে পাচ্ছে না বোধ হয়, চেয়ে আছে শুধু। মনে হ'ল, শুধু একজন নয়, সারা দেশ জুড়ে সহস্র সহস্র নারী যেন চেয়ে আছে তার দিকে। এই সব অসহায় মূক বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে? অসংখ্য রক্তকণা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে সারা দেহে···অগ্নির ঝড় বইছে মাথার ভিতর। ন্যায়পরায়ণ বিবেক কোথায় উড়ে গেল সেই ঝঞ্ঝায়। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল অংশুমান। সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি কথাই স্পন্দিত হতে লাগল বারবার—এই সব অসহায় মূক বধিরদের মুখে ভাষা দেবে কে···আমি কি পারব?

না পারবার কি আছে!

হাস্যপ্রদীপ্ত একখানি মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেল। প্রদীপ্ত চোখ দুটি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধপধপে সাদা দাড়ি, সাদা চুল, সাদা ভুরু। সমস্ত মুখে কিন্তু ফুটে রয়েছে যৌবনের জয়-শ্রী। তারুণ্যের তিলক জলজল করছে প্রশস্ত ললাটের মধ্যস্থলে অদৃশ্য অগ্নিশিখার মত।

মূক-বধিরদের নিয়ে অনেককাল কাটিয়েছি। তাদের মুখে ভাষা দেওয়া সহজ। তারা জীবন্ত, তারা কথা কইতে উৎসুক। তার চেয়েও শক্ত কাজ আমি করেছি, জড় লোহাকে কথা কইয়েছি বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে। মড়ার কান চিরে যখন দেখলাম যে, সামান্য একটা পর্দার কম্পনই শ্রুতির কারণ, তখন মনে হ'ল, লোহার পাতলা পরদায় সে কম্পন সঞ্চার করা অসম্ভব হবে কেন বিদ্যুতের স্পর্শ দিয়ে? লেগে গেলুম···

হাসিমুখে চেয়ে রইলেন। পরমুহূর্তেই কিন্তু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

ওই দেখ, স্বভাব না যায় ম'লে! এখনও মনে হচ্ছে, আমি করেছি! পড়েইছ তো, আসলে ব্যাপারটা ভূতুড়ে কাণ্ডের মতো অদ্ভুত। ওয়াট্‌সনের ট্র্যান্‌সমিটিং স্প্রিং একটা বিগড়ে গেল, সে সেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করতেই আমি পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, মেক-ব্রেক পয়েণ্ট দুটো জুড়ে গেছে। বাস, টেলিফোন আবিষ্কারের খেই পেয়ে গেলাম। কি ক'রে জুড়ল, ঠিক ওই সময়ে জুড়ল কেন, আমারই বা কানে কেন গেল—সেইটেই রহস্য এবং সেইটেই বোধহয় আবিষ্কারের আসল কারণ।

সে যাক, কিন্তু there's a lesson for you—রহস্যটা নয়, ওয়াইলসের ওই গোলমাল ক'রে ফেলাটা—অপ্রত্যাশিতভাবে স্প্রিংয়ের মেক-ব্রেক পয়েন্ট ছুটো জুড়ে যাওয়াটা। প্ল্যান ক'রে বড় কিছু প্রায়ই হয় না, গোলযোগের মধ্যেই অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে যায়। হিমালয় বা প্রশান্ত মহাসাগর কোন ইঞ্জিনীয়ার প্ল্যান ক'রে করতে পারত না। সুতরাং বিদ্রোহ ক'রে দেশে বিশৃঙ্খলা এনেছ ব'লে তোমাদের খুব বেশি লাঞ্ছিত হবার কারণ নেই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু বহু বুদ্ধি খাটিয়ে যে সমুদ্রে পুল বাঁধতে পারে না সেই সমুদ্র একদিনে শুকিয়ে যেতে পারে খামখেয়ালী ভূমিকম্পের ধাক্কায়, মানে…well, I did not like to talk, but I am talking like a parrot…

হঠাৎ থেমে পিছনে ছু হাত দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরময়। অস্থির যে যুবক একদা বোস্টন য়ুনিভার্সিটিতে ভোকাল ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিল, সেই যেন আবার মূর্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ গ্রেহাম বেলের মধ্যে। হঠাৎ তিনি ছু হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠি ক'রে ধ'রে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে রইলেন। অংশুমানের মনে হ'ল, কি যেন খুঁজছেন তিনি।

আপনি খুঁজছেন না কি কিছু ?

হ্যাঁ, শান্তি। আলো নয়, অন্ধকার। শব্দ নয় নৈঃশব্দ্য। জীবনের শেষে ঘর থেকে টেলিফোন দূর ক'রে দিয়েছিলাম আমি। It is a nuisance… এখন দেখছি চিন্তার ডাকেও সাড়া দিতে হয়। There is no escape…

তারপর হেসে বললেন, তোমাকে আমার মত হতে বলছি না তা ব'লে। হতে পারবেও না। সেলেনিয়মের উপর আলো পড়লে তার resistance যেমন বদলে যায়, তোমার মনের উপরও তেমনই পড়েছে প্রেরণার আলো। নানারকম কারেন্ট পাস করবে এখন। আমার ফোটোফোনের কথা পড়েছ তো, তার নয়, আলোর রেখা বার্তাবহন করেছিল, মনে আছে ?

আছে।

তোমার মনের উপরও তেমনই ভেঙে পড়েছে অসংখ্য আলোর অসংখ্য রকম তরঙ্গ। অসহায় সোলার টুকরোর মত ভেসে বেড়াও এখন নানা তরঙ্গের শিখরে শিখরে। ডুবতে হবে, উঠতে হবে, ভাসতে হবে। ওর থেকেই কিছু একটা হয়ে উঠবে হয়তো, যদি হবার হয়। ভেবে চিন্তে প্ল্যান ক'রে

কিছু হবে না। বার্তাবহন ক'রে যাও ক্রমাগত, টিক-বেটিক যা হোক, আঃ সিকেনিং!

সমস্ত মুখ বিরক্তিতে ভরে গিয়ে হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠল আবার পরমুহূর্তেই। যেন সামলে নিলেন।

এই এখন তোমার একমাত্র কাজ। মূক-বধিরদের নিয়ে মাথা ঘামাও যদি এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। Carry on…আমি এখন চলি। আমাকে আর ডেকো না…please, I want peace, nothing but peace. Good night.

চ'লে গেলেন।

অংশুমান বিস্মিত হ'য়ে ব'সে রইল।

প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না?…

…গ্যাল্‌ভানি, অরস্টেড, বেকেরেল, রণ্টগেন…সারি সারি আরও অনেকে এসে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে সকৌতুক দৃষ্টি। এঁদের প্রত্যেকরই আবিষ্কার যুগান্তরকারী, কিন্তু প্রত্যেকটা আবিষ্কারই আকস্মিক। সকৌতুক দৃষ্টিতে নীরবে এই তথ্যটুকু নিবেদন ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সবাই আবার…।

কারাগারের সূচীভেদ্য অন্ধকার গাঢ়তর হ'য়ে উঠল। প্ল্যান ক'রে কিছু হবে না? আমাদের এই যে এত বছরের এত প্ল্যান এর কি মূল্য নেই কোনও? সব বিদ্রোহের মূলেই তো প্ল্যান থাকে। রাশিয়ার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান…বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর রাজনীতি এক নয়…গুলিয়ে ফেলছি আমি…বিজ্ঞান…

যে কোনও বিষয়ের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

অংশুমান ফিরে দেখলে, নির্নিমেষ একজোড়া চোখ তার দিকে চেয়ে আছে; বিরাট শ্মশ্রুসমন্বিত গম্ভীর মুখ। অনড় নিস্পন্দ। ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল।

যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। কোন নীতিই বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়, রাজনীতিও নয়। জ্ঞানমাত্রেই নিয়মের অধীন, পৃথিবীতে অনিয়ম ব'লে কিছু নেই। যা অনিয়ম ব'লে মনে হয়, আসলে তা জ্ঞানের অভাব, পর্যবেক্ষণ-শক্তির অপটুতা। নেপচুনকে দেখবার ঢের আগে অ্যাডাম্‌স তার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, হ্যালি ভবিষ্যবাণী করেছিলেন ধূমকেতুর

পুনরাবির্ভাবের, অনেক ধাতু আবিষ্কৃত হবার পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পেরেছেন বৈজ্ঞানিক মলিকিউলার ওয়েট থেকে। কি ক'রে সম্ভব হ'ল এসব? অঙ্ক ক'ষে। সমস্ত বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত ব'লেই অঙ্ক ক'ষে Electromagnetic wave-এর কথা আমি বলতে পেরেছিলাম, হারৎজ হাতে কলমে সেটা প্রমাণ করলেন অনেক পরে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খল কিছু নেই, থাকতে পারে না। মিস্টার বেলের ভূতুড়ে কাণ্ডটাও বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারেই ঘটেছিল। আমি আইনজ্ঞ উকিলের ছেলে, বে-আইনী কথা মানি না। মিস্টার বেলের কথায় দ'মে যাবার দরকার নেই, সহস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায় যে, একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ ক'রে প্ল্যান অনুযায়ী যাঁরা ঠিকমত চলতে পেরেছেন, তাঁরা অনেক বড় কাজ করতে পেরেছেন পৃথিবীতে। তারপর একটু ভেবে বললেন, এ···ধর না যেমন আল্‌ভা এডিসন। ওই বেলের টেলিফোনেরই কত উন্নতি করেছেন তিনি, গ্রামোফোন বানিয়েছেন, ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব তৈরি করেছেন, আরও কত কি করেছেন···

কি বলছ আমার নামে?

আল্‌ভা এডিসন এসে দাঁড়ালেন। গোঁফ দাড়ি নেই, ভারী মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশ্ন কৌতুক, বলিষ্ঠ নাকটা নীরবে যেন লোকটার ব্যক্তিত্ব ঘোষণা করছে। এডিসনের আবির্ভাবে ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের চোখে মুখে প্রাণ সঞ্চার হ'ল যেন। এতক্ষণ তাঁকে মূর্তিমান নিয়ম ব'লে মনে হচ্ছিল। একটু সসম্ভ্রমে তিনি বললেন, মিস্টার বেল এই ছেলেটিকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে গেছেন, ব'লে গেছেন যে, প্ল্যান-ট্যান ক'রে কিছু হবে না, ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে একটা কিছু আপনিই ঘটে উঠবে। আমি তাই একে বলছিলাম যে, ঘূর্ণাবর্তও বিশৃঙ্খল ব্যাপার নয়, তাও বিশেষ বিশেষ বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন। সেই নিয়মগুলো আগে থাকতে জেনে নিয়ে যদি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে সুবিধাই হয়, ফলাফল আগে থাকতে আন্দাজ করা যায়। এবং সেটা সম্ভব। সেই সূত্রেই আপনার কথা উঠেছিল। আমার মনে হয়, আপনার প্রত্যেকটি কাজ আপনি বেশ প্ল্যান ক'রে করেছেন। আপনার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার এমন জুৎসই যোগাযোগ দেখলে মনে হয় যে, অনেক ভেবে চিন্তে করেছেন সব। তাই এত করা সম্ভবও হয়েছে আপনার পক্ষে—নয়?

ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল।

এডিসন হেসে বললেন, আমার কি মনে হয় জান, গার্ডের হাতের চড় খেয়ে সেই যে আমি কালা হয়ে গেলাম, তাই হ'ল আমার উন্নতির কারণ। তারপর যতদিন বেঁচে ছিলাম বাইরের কিছু শুনতে পেতাম না, একাগ্র হবার সুযোগ পেয়েছিলাম…

দেখা গেল, ম্যাক্স্‌ওয়েল এডিসনের জীবনের এ ঘটনাটা জানতেন না। চড় মেরেছিল? আপনাকে? কোন গার্ড? কেন?…

রেলের গার্ড। ও, তুমি জান না বুঝি! গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলে আমি একটা খবরের কাগজ ছেপে বিক্রি করতাম। অবসর-সময়ে সেই ট্রেনেই সময় কাটাতাম কেমিষ্ট্রির এক্‌স্‌পেরিমেন্ট ক'রে। একদিন একটা ফস্‌ফরাসের জার প'ড়ে গিয়ে ট্রেনে লেগে গেল আগুন। গার্ড ট্রেন থামিয়ে কানের উপর প্রচণ্ড একটি চপেটাঘাত ক'রে দূর ক'রে দিলে আমায়। কানের ড্রামটি ফেটে কালা হয়ে গেলাম জন্মের মত। এখন অবশ্য শুনতে পাই, কারণ সে দেহটা তো এখন আর নেই। একটু হাসলেন, তারপর বললেন, এটা অবশ্য ঠিক যে, সত্যের প্রতি একাগ্র না হ'লে সে ধরা দেয় না কিছুতে। বধির হয়েছিলাম ব'লেই একগ্রতা বেড়েছিল, অন্যমনস্ক হবার সুযোগ ছিল না। আমার বধিরতার কারণ গার্ডের চপেটাঘাত, তার কারণ ফস্‌ফরাসের জার প'ড়ে যাওয়া, তার কারণ বোধ হয় ট্রেনের ঝাঁকানি এবং আমার অসাবধানতা, কোন্‌টা যে আসল কারণ তা কি ক'রে বলি বল, দুষ্টুমি-ভরা হাসিতে চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

আসল কারণ অবসর-সময়ে আপনার কেমিষ্ট্রি অধ্যয়নের আগ্রহ।—সসম্ভ্রমে বললেন ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল।

এডিসন চুপ ক'রে রইলেন স্মিতমুখে। তারপর বললেন, হ্যাঁ, সত্যকে জানবার আগ্রহটাই আসল জিনিস। সেই আগ্রহই নানা জনকে নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করে…

এডিসনের মুখে নিয়ন্ত্রিত কথাটা শুনে ম্যাক্স্‌ওয়েল পুলকিত হয়ে উঠলেন। অংশুমানের দিকে চেয়ে বললেন, শুনলে? নিয়ন্ত্রিত না হয়ে উপায় নেই। নিয়মই সত্য সত্যই নিয়ম। এ কথা মনে রাখলে মনে জোর পাবে। অনিয়ম সত্য নয়, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলারই মিথ্যারূপ। সত্য নিয়মের পরাধীনতাই সত্য স্বাধীনতা। সত্যকেই আঁকড়ে থাক এবং কি ক'রে তা পারবে তার উপায় চিন্তা কর প্রতি মুহূর্তে। এরই নাম প্ল্যান…

হঠাৎ জেলের পাগলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিকে।

মারো—মারো—মারো...

ওপর-ওলার হুকুমে কংগ্রেসী কয়েদীদের মারা হচ্ছে ঘরে ঢুকে ঢুকে। আর্তনাদ উঠতে লাগল অন্ধকার ভেদ ক'রে। অংশুমানের ঘরের কপাটটা খুলে গেল। ব্যাটন হাতে ঢুকল পুলিশ।

১৩

নিজের বৈঠকখানায় লাহিড়ী মশাই চিন্তিত মুখে তামাক টানছিলেন। ছেলের চাকরির জন্ত যে দরখাস্তটি করেছিলেন, তা নামঞ্জুর হয়েছে। অনেক তদ্বির করেছিলেন, তবু হ'ল না। আপিসের বড়বাবু তাঁর বন্ধু, তাঁরই খু ধিয়ে চেষ্টা করেছিলেন। একটু আগে বড়বাবু নিজে এসে বলে গেলেন, না হওয়ার আসল কারণ, সায়েব টের পেয়েছে অংশুমানের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব ছিল। ছিল, অস্বীকার করবার উপায় নেই। হতভাগা ছোঁড়াটা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে মজিয়ে গেছে। আঃ! চাকরি তো হ'লই না, এখন পুলিশে না ধরলে বাঁচি। পেন্সনটি সম্বল, সেটা বন্ধ ক'রে দিলেই বাস্! হুঁকোয় ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন, ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিপাশ, রগের শিরগুলো ফুলে উঠল, চোখ দুটো মনে হ'ল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এখুনি। বন্ধু পীতাম্বর প্রবেশ করলেন। গেঁটে-বাত-ওলা পাকা বুড়ো।

ওহে খবর শুনেছ?

কিসের খবর?

রামতারণের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ প্রায় পাকা ক'রে এনেছিলাম, কিন্ত হল না।

কেন?

রামতারণের মেয়েই বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিশের দারোগাকে বিয়ে করব না।

অ্যাঁ, বল কি?

হ্যাঁ হে। অতি ভয়ঙ্কর কাল এসে পড়ল, বোঝেছ?

খোঁড়াচ্ছ কেন?

হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। কদিন থেকে সমানে পুবে হাওয়া বা চালিয়েছে।

ভাবলাম, ব'সে ব'সে কি আর করি, লাহিড়ীর সঙ্গে একদান পাশা খেলে আসা যাক। তামাক রাখ, পাশাটা পাড়।

লাহিড়ী পাশা পাড়লেন। গোমড়া মুখ ক'রে দুজনে পাশা খেলতে লাগলেন। বাড়ির সামনে একটা গাছে অজস্র জবাফুল ফুটেছিল, তারাই হাসতে লাগল কেবল।

ক্রমশঃ

"বনফুল"

মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদ*

অতিমূল্যবাদই যে মার্ক্সীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ, সে বিষয়ে বোধ হয় সকলেই একমত। কিন্তু মার্ক্স ঠিক কোন্ অর্থে—এবং কেনই বা ঠিক সেই অর্থেই—'অতিমূল্য' (=Mehrwert=surplus value) কথাটি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট কোন ধারণা নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার মার্ক্সবাদী বন্ধুদের কয়েকজনের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা একাধিক বার করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা প্রতিবারই আলোচনা এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, যাঁহারা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মার্ক্সীয় 'অতিমূল্য' জিনিসটা যে কি, তাহা বুঝিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা কখনও করেন নাই, যদিও কথায় ও রচনায় এই 'অতিমূল্য'ই তাঁহারা নিরন্তর শস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মার্ক্সের *Das Kapital*ও কোনদিন তাঁহারা পড়েন নাই, কারণ এই গ্রন্থেই মার্ক্স বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তিনি কোন্ অর্থে 'অতিমূল্য' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন। Moore ও Aveling কৃত অনুবাদ হইতে এই অংশটি উদ্ধার করাই এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মনে করি :—

* এই প্রবন্ধে কতকগুলি শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :—(১) বিত্ত=capital, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে অন্ততঃ এক জায়গায় 'বিত্ত' কথাটি ঠিক 'capital' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) স্থিরবিত্ত=constant capital, (৩) চলবিত্ত=variable capital, (৪) মূল্য—value, (৫) অতিমূল্য=surplus value; (৬) শ্রম=labour, (৭) শ্রমমূল্যবাদ=labour theory of value, (৮) ক্ষেত্রবৃদ্ধি=rent (রিকার্ডোর), (৯) মুনাফা=profit, (১০) দাম=price (১১) সামগ্রী=commodity, (১২) হার=rate, (১৩) মজুরি=wages।

"If, for example, the capitalist have advanced £ 500, of which £ 400 is laid out in means of production and £ 100 in wages, and if the rate of surplus value be 20%, the rate of profit will be 20 : 500, i. e., 4% and not 20%" (p. 526)

এই বচনের সমর্থক আরও বহু বচন মার্ক্সের রচনাবলীর মধ্যে ছড়ানো রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করার কোনও প্রয়োজন দেখি না। বরং উদ্ধৃত বচনটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারাই অধিক কাজ হইবে মনে করি।

উদ্ধৃত বচনটি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মার্ক্সীয় অতিমূল্য সর্বক্ষেত্রেই মুনাফা হইতে অভিন্ন, কিন্তু মুনাফা ও অতিমূল্যের হার (rate) কখনও সমান হইতে পারে না। কোন সামগ্রী উৎপাদানে যাহা ব্যয়িত হয়, তাহা মার্ক্স প্রথমত দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—স্থিরবিত্ত ও চলবিত্ত। আমরা সাধারণ ভাষায় যাহাকে মজুরি (wages) বলি, মার্ক্সের 'চলবিত্ত' তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মার্ক্স সহজ ও সুবোধ্য 'মজুরি' কথাটি অবজ্ঞা করিয়া তৎপরিবর্তে এই দুর্বোধ্য mataphysical term 'চলবিত্ত' ব্যবহার করিলেন কেন? অবশ্য মার্ক্সের *Das Kapital* যখন একটি metaphysical work—এ-কথা *Das Kapital*-এর মূল বা অনুবাদ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন সকলেই অস্বীকার করিবেন—তখন তন্মধ্যে এই ধরনের শব্দের বহুল প্রয়োগ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু বিস্ময়কর নয় বলিয়াই যে কথাটি একেবারে স্বচ্ছ ও সুবোধ্য তাহাও নহে। এবং এ কথাও ঠিক যে আমাদের যুগে জন্মাইলে মার্ক্স কখনই 'মজুরি' অর্থে 'চলবিত্ত' কথাটি ব্যবহার করিতেন না। মার্ক্স লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ে মুনাফার হার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে মালিকরা সর্বাগ্রে যে উপায় অবলম্বন করিত, তাহা হইল সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যয়িত বিত্তের চলাংশ (অর্থাৎ wages) আরও কমানো, কারণ ব্যয়িত বিত্তের স্থিরাংশের (অর্থাৎ wages ভিন্ন অপর যাহা কিছু সামগ্রী উৎপাদনে ব্যয়িত হয় তাহার) হ্রাস ঘটানো তখন অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। আমাদের যুগের মানুষ হইলে মার্ক্স যে কখনই একমাত্র মজুরিকে বিত্তের চলাংশ বলিয়া অভিহিত করিতেন না, তাহা নিশ্চিত, কারণ আজিকার দিনে সামগ্রী উৎপাদনে ব্যয়িত বিত্তের মজুরি অংশের হ্রাস ঘটানোই যে অপেক্ষাকৃত সহজ—এ কথা জোর করিয়া কে বলিতে পারে? ইচ্ছামত মজুরি কমানো ভারতবর্ষেও আর

সম্ভব নয়, অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং মার্ক্সীয় পন্থায় কেবল মজুরিকে চলবিত্তরূপে গ্রহণ করা আজিকার দিনে অসম্ভব।

মার্ক্সীয় চলবিত্তের সহিত মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট। উপরে মার্ক্সের যে বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, এক শত টাকা চলবিত্তরূপে (অর্থাৎ মজুরিতে) এবং চারি শত টাকা স্থিরবিত্তরূপে (সর্বসমেত পাঁচ শত টাকার বিত্ত) ব্যয় করিয়া যে সামগ্রী প্রস্তুত হইল, তাহা যদি ছয় শত টাকায় বিক্রয় হয়, তবে অতিমূল্য দাঁড়াইবে শত-করা এক শত এবং মুনাফা দাঁড়াইবে শত-করা কুড়ি। জনসাধারণে যাহাকে মুনাফা বলে, মার্ক্স ঠিক তাহাকেই বলিয়াছেন। অতিমূল্য, অথচ মুনাফা ও অতিমূল্যের হার সমান হইতেছে না কেন? ইহার কারণ মার্ক্সের শ্রমমূল্যবাদে বিশ্বাস। দৈহিক শ্রম ভিন্ন আর কিছুর দ্বারা যে মূল্যসৃষ্টি সম্ভব, এ কথা মার্ক্স বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং সৃষ্ট মূল্যের যে অংশের নাম মুনাফা, তাহারও উৎপাদক মার্ক্সের মতে একমাত্র এই দৈহিক শ্রম, যাহার ধনমান হইল চলবিত্ত। মুনাফাসৃষ্টি যদি একটি রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, তবে স্থিরবিত্ত তাহার catalytic agent মাত্র, প্রকৃত agent হইল চলবিত্ত। সুতরাং এক শত টাকা যে মুনাফা দাঁড়াইয়াছে, তাহার হার নির্ণয়ে স্থিরবিত্তের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে।—এত স্পষ্ট-ভাবে এই কথা মার্ক্স কোথাও বলেন নাই। বোধ হয় ভাষায় কুলায় নাই। কিন্তু সমস্ত মার্ক্সীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ যে অতিমূল্যবাদ, তাহা ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা শ্রমমূল্যবাদের একটি corollary মাত্র। শ্রমমূল্যবাদে বিশ্বাস কিন্তু মার্ক্সও যে সর্বত্র সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, তাহা Bernsten দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি Henry de Man-এর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি যে, মার্ক্সীয় অতিমূল্যবাদ-রূপ পর্বত একটা মূষিক পর্যন্ত প্রসব করিতে পারে নাই, তবে আমার মার্ক্সবাদী বন্ধুগণ ক্ষুণ্ণ হইবেন কি?

মার্ক্স কেন মুনাফাকে অতিমূল্য বলিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল। কিন্তু মুনাফাকে অতিমূল্যরূপে গ্রহণ করার ফলে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইল, তাহার বিচার এখনও করা হয় নাই। সামগ্রীর দামকে (price) যত অংশেই ভাগ করি না কেন, তাহার প্রতি অংশকে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন না কোন প্রকারের 'মূল্য'(value)রূপে বিবেচনা করা যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন লাভ হইয়াছে তাহা বলা

যাইবে না। কারণ 'মূল্য' সর্বত্র সামগ্রীতেই নিহিত। এখন মুনাফাকেও যখন একটি বিশেষ প্রকারের মূল্য(অর্থাৎ অতিমূল্য)রূপে ধরা হইতেছে, তখন লাভের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? অথচ বিত্তপতিদের বিরাট বপুগুলি তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই! মার্ক্স এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমান সমাজে লাভের উৎপত্তি হইতেছে না এবং তাহা সম্ভবও নয়; যাহা সম্ভব এবং যাহা বাস্তবিকই ঘটিতেছে, তাহা হইল একজনের ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া লইয়া আর একজনের অতিভোজনের ব্যবস্থা করা, যাহার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তর একই সময়ে অথচ বিভিন্ন কারণে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু লাভের উৎপত্তি বর্তমান সমাজে সম্ভব নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মার্ক্স ফরাসী Physiocrat-দের দ্বারা উপস্থাপিত কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যকরূপে তাঁহাদের নিকট নিজের ঋণ যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। খজোবৃদ্ধিবাদ (rent theory) সম্বন্ধে মার্ক্স যেমন Ricardo-র নিকট ঋণ পঞ্চমুখে স্বীকার করিয়াছেন, ঠিক সেই-রূপেই তাঁহার স্বীকার করা উচিত ছিল যে Physiocrat-গণই তাঁহাকে শিখাইয়াছেন যে, আধুনিক বিত্তশাসিত (capitalist) সমাজে একের ক্ষতি ব্যতিরেকে অপরের লাভ সম্ভব নয়। Physiocrat-গণ এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই যে, সমাজে প্রত্যেকেই যখন ক্রেতা এবং প্রত্যেকেই আবার বিক্রেতা, তখন বিক্রেয় সামগ্রীর দাম বাড়ানোর ফলে সমগ্রত কখনই কোন লাভ দাঁড়াইতে পারে না। আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে এ কথা অবশ্য ঠিক খাটে না, কারণ নানা বিষয়ে একাধিপত্য (monopoly) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার ইষ্টের (interest) সাম্য আর অক্ষুণ্ণ নাই। কিন্তু মার্ক্সের সময়ে এ কথা বলা সম্ভব ছিল, কারণ একাধিপত্যের যুগ আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে মার্ক্সের পরে, এবং এই যুগের আবির্ভাব সম্বন্ধে মার্ক্স-ই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যদিও অর্থনৈতিক একাধিপত্য যে আবার যৌথ corporation প্রভৃতির উদ্ভবের ফলে এক প্রকারের unheroic communism-এর জন্মদান করিবে*—সেই কথা মার্ক্স আদৌ বুঝিতে পারেন নাই।

---

* এই সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য Berle ও Means প্রণীত "Modern Corporation and Private Property", বিশেষ ভাবে পৃ. ২৭৮।—এই unheroic communismকে কিরূপে পূর্ণ

সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া যদি লাভ করা সম্ভব না হয়, তবে লাভের একমাত্র উপায় উৎপাদনের ব্যয় কমানো। কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইল স্থিরবিত্ত ও চলবিত্তের সমষ্টি মাত্র। এতদুভয়ের প্রথমটি হইল সংজ্ঞানুসারে—by definition—অনিয়ন্ত্রণীয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে চলবিত্ত (অর্থাৎ মজুরি) হ্রাস না করিয়া লাভ করা যায় না, quod erat demonstrandum !

মার্ক্সের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ হয় নাই, কারণ মার্ক্সবাদিগণও আজকাল স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আধুনিক যুগে মুনাফা ও মজুরি এই দুই-ই বাড়িতেছে।* আমাদের এখন কেবল চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, মার্ক্সের মত পণ্ডিত ব্যক্তি কিরূপে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, চলবিত্তই চিরকাল মুনাফার খোরাক যোগাইয়া চলিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, মজুরের শ্রম মার্ক্সের নিকট একটি সামগ্রী মাত্র। সরবরাহের কমাবাড়া অনুযায়ী সামগ্রীর দামের যেমন বৃদ্ধিহ্রাস ঘটে, স্বাভাবিক অবস্থায় ঠিক সেইরূপেই মজুরদের সংখ্যার বিপরীত অনুপাতে মজুরির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু সামগ্রী বিনিময়ের ব্যাপারে স্বাভাবিক অবস্থা কাহাকে বলে? মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, যে-সামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহ দুইই পরিমিত তাহারই অবস্থা বিনিময়ের ব্যাপারে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রমিকের মেহনৎ-রূপ যে সামগ্রী তাহার অবস্থা স্বাভাবিক নহে, কারণ তাহার সরবরাহ অপরিমিত। ইহাই ছিল মার্ক্সের বিশ্বাস, এবং তাঁহার এই বিশ্বাসের মূলে ছিল Ricardo-র খতোবৃদ্ধিবাদ এবং Ricardo-র খতোবৃদ্ধিবাদের (rent theory) মূলে ছিল Malthus-এর জনসংখ্যাবাদ। Malthus হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, পৃথিবীতে যত লোকের স্থান আছে তত লোকের খাদ্য নাই; কাজেই পৃথিবীর অনেক মানুষকে চিরদিনই অনশনে ও অর্ধাশনে কাটাইতে হইবে। এই মতবাদে আরও ইন্ধন যোগাইয়া Ricardo দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে,

Communism-এ পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা Schumpeter তাঁহার স্বলিখিত গ্রন্থ 'Capitalism, Socialism, and Democracy'-তে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

* রাশিয়া সম্বন্ধে এই কথা ঠিক বলা যায় বলিয়া মনে করি না, কারণ মুনাফা রাশিয়ায় social dividend-এর আকারে মজুরদের হাতে ফিরিয়া আসায় ধরিয়া লইতে হইবে যে, মুনাফা ও মজুরির ভেদ সে দেশে লোপ পাইয়াছে।

অনাহারে মৃত্যু বরণ করা অপেক্ষা মানুষ নিশ্চয়ই অতি অনুর্বর জমিও চাষ করিবে, এবং তাহার ফলে উর্বরতর জমির মালিকদের লভ্যাংশ অসম্ভব রকম স্ফীত হইয়া উঠিবে; অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন অনশনীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে ঠিক সেই অনুপাতে—যেন অনশনীদের বাদ করিয়াই—জমির মালিকদের মুনাফা বাড়িতে থাকিবে। Malthus ও Ricardo-র আবিষ্কৃত এই অনশনের অনশনীদের অতিত্ববশতই মার্ক্সের মতে চলবিত্তের উত্তরোত্তর সঙ্কোচন সম্ভব হয় ও হইবে। সংখ্যাবৃদ্ধিবশত অনশনের ক্লেশ ইহাদের যতই বৃদ্ধি পাইবে, সামগ্রী উৎপাদনে ব্যয়িত বিত্তের মধ্যে চলাংশের অনুপাত সঙ্কুচিত করা ততই সহজ হইবে। অর্থাৎ মার্ক্সের বিশ্বাস ছিল যে, সর্বহারা নিরশনী পলে পলে তিলে তিলে শুকাইয়া মরিবে, কিন্তু কখনও বিদ্রোহ বা বিপ্লব করিবে না। এইরূপ কথা মনে স্থান দেওয়াও পাপ।

এরূপ কথা মনে স্থান দিবার কোন প্রয়োজনও নাই। কারণ Malthus-এর মত আজ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং Ricardo এবং মার্ক্সেরও আর দাঁড়াইবার কোন স্থান নাই।—ঠিক দশ বৎসর আগে, Carr-Saunders তাঁহার *World-Population* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে গণনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, রাশিয়া ছাড়া আর প্রায় সকল দেশেই জনসংখ্যা কমিতেছে বা শীঘ্রই কমিতে আরম্ভ করিবে। England সম্বন্ধে Carr-Saunders বলিয়াছেন :—"The population will have decreased by 2 millions in 1975 and to half its present size in a century" (p. 131)। মনে রাখিতে হইবে যে, Carr-Saunders এই উক্তি করিয়াছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পূর্বে।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

বুড়ীর বাড়ি

বুড়ীর বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। ভূতচতুর্দশীর দিন অনেক সময় পল্লী-অঞ্চলে পোকার বংশ নির্বংশ করিবার উদ্দেশে যে কৃত্রিম বুড়ীর বাড়ি পোড়ানো হইয়া থাকে, সে বাড়ি নহে। সত্য সত্যই বুড়ীর খ'ড়ো ঘরে আগুন লাগিয়াছিল।

কিন্তু তাহার আগে বুড়ীর সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। নদীর ধারে লোকবিরল অঞ্চলে বুড়ীর বাড়ি। বাড়ি বলিলে তাহাকে

বাসস্থানকে অহেতুক মর্যাদা দেওয়া হয়, আসলে মেটে দাওয়ার উপরে মেটে দেওয়াল, তাহার উপরে উলুখড়ের চাল। বাড়ির অবস্থা বরাবরই প্রায় একই রকম দেখিয়াছি। স্থানীয় অতিবৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনিয়াছি, বুড়ী নাকি ওই কুঁড়েতে অন্তত চল্লিশ বছর ধরিয়া বাস করিতেছে। মাঝে মাঝে আসন্ন বর্ষায় যখন উলুখড়ের দুর্বল আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের ভিতরে মাত্রাতিরিক্ত ধারাপাতের সম্ভাবনা দেখা যায়, বুড়ী এ বাড়ি ও বাড়ি চাহিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া জন-দুই সাঁওতাল মজুরের সহায়তায় ঘরটাকে আবার বাসোপযোগী করিয়া লয়। বাসোপযোগী অর্থে তাহার নিজের উপযুক্ত, আপনার আমার মত নহে।

কিন্তু এই গৃহসংস্কারও পাঁচ বছরে একবার। মধ্যবর্তী সময়টাতে অল্পস্বল্প জলের ছাদ ফুটা করিয়া প্রবেশ বুড়ী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। অভাব, রোগ ও বার্ধক্যের সমুদ্রে যাহার শয়ন, এটুকু শিশিরে তাহার ভয় করিলে চলিবে কেন?

বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে অসংস্কৃত চাল দিয়া মধ্যে মধ্যে সূর্যালোকের কয়েকটি বিন্দু ঘরে আসিয়া পড়ে। ভালই করে, কারণ বুড়ীর প্রবেশের মত অতি ক্ষুদ্র একটি দরজা ছিন্ন সূর্যালোক প্রবেশের আর কোন পথ নাই। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সেটি বন্ধ থাকে।

ফলে রৌদ্রের অনধিকার প্রবেশ হয় চোরের মত চুপিচুপি উলুখড়ের চালের এখানে সেখানে ছিন্ন অংশ দিয়া।

বুড়ীর সম্বন্ধে কেহ কোনদিন কোনও কৌতূহল প্রকাশ করে না। বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত সে পরিচিত ছিল ভগার অর্থাৎ ভগবানের মা নামে। কিন্তু যে ভগবানের নামে পরিচয়, সেও বহু বহু বৎসর আগে পাঁচ বছর বয়সে পরলোকগমন করে। তবু নামটা অনেককাল টিঁকিয়া ছিল, যদিও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই শব্দের "ভগার মা" অপেক্ষা এক শব্দের "বুড়ী" নামটা ঢের বেশি সহজ বলিয়া সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছে।

ভগার মায়ের নাকি ভগা ব্যতীত আরও দুই-তিনটা ছেলে মেয়ে ছিল। ঊনষাট সালের বসন্তের মড়কে তাহারা মরিয়াছে। এবং বছর চল্লিশ আগে,

কি রোগে জানি না, ভগার পিতারও কাল হইয়াছে। অতএব, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, বুড়ীর তিন কুলে কেহ নাই।

বুড়ীর জীবিকানির্বাহ হইত কি করিয়া, কেহ জানে না। এক ঘর-ছাওয়ার উলুখড়ের জন্য সে পাঁচ বছরে একবার অন্যের কাছে হাত পাতিত, কিন্তু বাকি সময়টা ছিল সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী। বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকের বাড়ি চাল ঝাড়িয়া, ডাল ভাঙিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিত, কিন্তু ইদানীং সম্পূর্ণ বেকার।

লোকে বলিত, ভগার বাবা কিছু টাকা করিয়া গিয়াছিল, কৃপণ বুড়ী সেটা তাহার মেটে ঘরের দাওয়ার তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, আবশ্যকমত ভাঙিয়া খায়। কিন্তু এসব কথা উঠিত নেহাৎ আমার মত অতি-কৌতূহলী কেহ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রদর্শন করিলে। নচেৎ নহে।

বুড়ী রোগের বাথান। তাহার বাত ছিল, চোখে ছানি ছিল, ম্যালেরিয়া ছিল, মাথায় উকুন ছিল এবং বার্ধক্যে সাধারণত ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে যে রোগগুলির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সবই ছিল। বুড়ী ভুগিত, কোঁকাইত এবং অসুখ একটু নরম পড়িলেই আবার উঠিত। সৌভাগ্যবশত ভদ্রপল্লী হইতে তাহার আবাস খানিকটা দূরে হওয়ায় তাহার রোগযন্ত্রণার আর্তনাদ বড় একটা কাহারও কানে আসিয়া পৌঁছিত না।

এমনই করিয়া গ্রামের জীবনযাত্রার মধ্যে ক্ষুদ্রতম অংশটুকু পর্যন্ত গ্রহণ না করিয়া বুড়ী এই গ্রামেই জীবনের সত্তরটা বছর কাটাইয়া দিল। রোগে ভুগিয়াই চলিল, তবু বাঁচিল, উঠিল এবং আবার রোগে পড়িল। কোনদিন কোন ডাক্তার কবিরাজ তাহার গৃহে পদার্পণ করিল না, সে নিজেও কোনদিন স্থানীয় জমিদার-বাড়ির দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধপ্রার্থী হইয়া গেল না। নেহাৎ গরিব বলিয়াই এতগুলি রোগভোগ করিয়াও বাঁচিয়া রহিল, নচেৎ অত বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি দশজন সাধারণ বুড়াবুড়ীকে অক্লেশে ভবপারে পাঠাইতে সক্ষম।

কিন্তু বিধাতার পরিহাসে সেই বুড়ী একদা গ্রামের সর্বাধিক আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

এ জায়গাটায় জীবন একটানা বহিয়া যায় একই ধরনের সুখদুঃখের আবর্তনের মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্য বলিয়া কিছু নাই। দূরবর্তী মহানগরীর কোন নাগরিক ছোঁয়াচ এখানে লাগে নাই, রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের

অস্তিত্বও নাই। ফলে সামান্য একটা কিছু অসাধারণ ঘটিলে গ্রামের লোক দিশাহারা হইয়া যায়, এবং এক মাস ধরিয়া তাহার জাবর কাটিতে থাকে।

গত ছয় মাসের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য আসে নাই। ছয় মাস আগে বিন্দী বাগদিনীর বিধবা মেয়েটা রায়বাবুদের সেজোবাবুর নবাগত শ্যালকের সহিত একই দিনে উধাও হইয়া গেলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, ছয় মাসে তাহা অনেকটা মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া যে দিন জানা গেল, সেজোবাবুর শ্যালক কোন অসদুদ্দেশ্যে মেয়েটাকে বাহির করিয়া লইয়া যায় নাই, নগরাঞ্চলে ঝি-চাকরের অপ্রতুলবশত নিতান্তই বাসন মাজাইবার জন্য মাসিক বেতন ও খোরপোশ দিয়া লইয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই ব্যাপারটা মুখরোচক আলোচনার বস্তু হিসাবে অনেকটা নিম্ন পর্যায়ে পড়িয়াছে।

মাসখানেক আগে আর একটু বৈচিত্র্য ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সাত মাইল দূরের শহরে একটা ভ্রাম্যমাণ বায়স্কোপের দল আসিয়াছিল ছবি দেখাইতে, গ্রাম ভাঙিয়া যত লোক সেখানে গিয়া হানা দিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় আলোই জ্বলিল না, ফলে যে নাটকের অস্তিত্ব আলো ও ছায়ার সহযোগিতায়, তাহার উপভোগ কাহারও অদৃষ্টে জুটিল না।

স্থানীয় অল্প লোকেই সিনেমা নামক দ্রব্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে বুড়ীর বাড়িতে আগুন ধরিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দিনকতক বৃষ্টি হইয়া বুড়ীর উলুখড়ের চাল বোধ হয় একটু ভিজা ভিজা ছিল, ফলে প্রথমটা ভাল করিয়া ধরিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ক্ষুধিত বৈশ্বানরের আহার্যে অল্পস্বল্প জল মিশ্রিত থাকিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, একটু পরেই ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বুড়ী ঘুমাইয়া ছিল, নিঃসন্দেহ পুড়িয়া মরিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবির মত সুন্দর গ্রামখানির মধ্য হইতে নিতান্ত দৃষ্টিকটু একটা মেটে ঘর বিনাকষ্টে ভস্মীভূত হইতে পারিত।

কিন্তু একদল লোকের বদঅভ্যাস খোদার উপর খোদকারি করা। আগুন ভাল করিয়া চাপিয়া বসিতে যতটুকু সময় লাগিয়াছিল, তাহারই মধ্যে পাড়ার কতকগুলি ছেলে হৈ-হৈ করিয়া আসিয়া নিকটস্থ একটি কূপ নিঃশেষ করিয়া বালতি-বালতি জল ঢালিয়া আগুন নিবাইল। অবশ্য বাড়ির বিশেষ কিছু

অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু একটি অতি উৎসাহী যুবক জলন্ত দরজা ঠেলিয়া ভিতর হইতে ভয়ে অর্ধমৃতা বুড়ীকে পাঁজাকোলা করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

বুড়ীর ঘরে কেহ আগুন লাগাইয়া দেয় নাই। বুড়ীর সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলও ছিল না, আক্রোশও ছিল না। কোন গ্রামহিতৈষী যুবক গ্রামের সৌন্দর্যসাধন করিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়া তাহার চালে প্রজ্বলিত টিকা নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাও অবিশ্বাস্ত।

আসল কথা, গৃহদাহ যখন হয়, তখন সাক্ষাৎ কারণের অনস্তিত্বেও হয়। কাহারও জলন্ত বিড়ি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বুড়ীর ঘরের চালে পড়া আশ্চর্য নয়। রোগজনিত শৈত্যনিবন্ধন অপরিণামদর্শী বৃদ্ধা ঘরে আগুন জ্বালাইয়া শুইয়াছিল, এটা হওয়াও অসম্ভব নহে।

মোট কথা, বুড়ীর বাড়ি নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও, পুড়িল। এবং গ্রামের বৃদ্ধগণ তামাক টানিতে টানিতে স্থানীয় যুবকগণের সৎসাহসের প্রশংসা এবং তাঁহাদের যৌবনে তাঁহারা অনুরূপ কি কি কার্য করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাস্ত, অর্ধ-বিশ্বাস্ত এবং সম্পূর্ণ-অবিশ্বাস্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে লাগিলেন।

বুড়ীকে লইয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত গ্রামের লোকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে নাই, একটা নোংরা ভগ্নপ্রায় কুটিরের মালিক হওয়ার ফলে সকলের চক্ষু তাহার উপরে গিয়া পড়িল।

রায়বাড়ির মেজোগিন্নী তাহার থাকিবার জন্ত গোয়াল-ঘরের পাশে একটা ঘর ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ীর চট ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানা আগুনে এবং জলে নষ্ট হইয়াছিল, সদয়া ছোটগিন্নী একটা পুরানো তোশক, একটা ছেঁড়া কম্বল এবং খান দুই ছেঁড়া কাপড় তাহার ব্যবহারের জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। বিধবা বড়-গিন্নী স্বহস্তে তাহার জন্ত সাবু প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, এবং মেজোগিন্নী সকালে বিকালে তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

ভগ্নার পিতার জীবিতকালে বুড়ীর অবস্থা কিরূপ ছিল জানি না, কিন্তু জোর করিয়া বলিতে পারি, সে মানুষটির মৃত্যুর পর বুড়ীর অদৃষ্টে কোনদিন এত ঐশ্বর্য, এত সৌভাগ্য আসে নাই। সৌভাগ্য চরমে উঠিল, যখন স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্যাম্বেল-পাস ডাক্তার আসিয়া স্বয়ং রোগীর চিকিৎসার ভার লইল।

এত সৌভাগ্য বুড়ীর দেহে সহ্য হইল না, সে মরিল। দিন পনরো অবিরত

ঔষধ ও সাবু গিলিয়া, তোশক কম্বলের বিছানায় শুইয়া একদিন বুড়ী আপনা-আপনিই রাত্রে মরিয়া রহিল। বুড়ীর করেরেখার কোন্‌খানে শেষ জীবনে সুখের মুখ দেখিবার কথা ছিল, কেহ জানে না, কিন্তু ছিল নিশ্চয়। বিধাতা-পুরুষের লিখন ভিন্ন অসম্ভব কবে সম্ভব হইয়া থাকে?

আগেই বলিয়াছি, বুড়ীর তিন কূলে কেহ ছিল না; এবং সে যে কি জাত, সে বিষয়েও সম্ভবত সন্দেহের অবকাশ ছিল। কিন্তু যে সৎসাহসী যুবকগণ তাহার কুঁড়ের আগুন নিবাইয়াছিল, তাহারাই তাহার অন্তিম কার্যের ভার লইল। বাঁশ কাটিয়া খাটুলি তৈয়ারি করিয়া হরিধ্বনি-সহকারে নদীর ধারে শ্মশানে লইয়া গেল, এবং যে ছেলেটি তাহাকে প্রজ্বলিত কুটির হইতে কোলে করিয়া বাহিরে আনিয়াছিল, সে-ই শেষকৃত্য করিয়া পুত্রের কর্তব্য পালন করিল।

বিধাতাপুরুষের অদৃশ্য লেখনী জন্মকালে কাহার ললাটে অদৃশ্য মসী দিয়া কি লিখিয়া দেয়, কে জানে! সে অপরিবর্তনের লিপির কাজ চলিতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত, কখনও বা মৃত্যুর পরেও। শ্মশানের অগ্নিতে সে লিপি পুড়িয়া ছাই হইলে তবে তাহার পরিসমাপ্তি।

কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। খোদার উপরে খোদকারি মানুষের পক্ষে অনধিকার-চর্চা বলিয়াই মনে হয়। ঘরে আগুন লাগিয়া যে রোগজীর্ণা বৃদ্ধার অক্লেশে মৃত্যু ঘটিতে পারিত, তাহাকে মারিবার জন্য ডাক্তার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে অনায়াসে যথাবিহিত পুড়িয়া ছাই হইতে পারিত, তাহাকে পোড়াইবার জন্য কাঠ খরচ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঝামেলারই বা কি সার্থকতা?

অথবা হয়তো তাহাই বিধিলিপি!

শ্রীআর্যকুমার সেন

পদচিহ্ন

উনিশ

রাধাকান্ত একটু হাসলেন। অত্যন্ত রহস্যময় মৃদু হাসি। বোর্ডিং ও ডিস্পেন্সারির দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে অমরচন্দ্র বক্তৃতা করছিলেন। সেই বক্তৃতা শুনে তিনি হাসলেন। বক্তৃতার মধ্যে রায়চৌধুরীর এখানে আসার কথা উল্লেখ করলেন এবং একটি শুভ ঘটনা ব'লে তুলে ধরলেন সর্বসমক্ষে। বিলেতফেরত রায়চৌধুরীর নবগ্রামে আসাটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা হ'লেও,

সমগ্র দেশ ও সমাজের জীবন-প্রবাহের গতিবেগের সঙ্গে যোগাযোগ সুস্পষ্ট এবং সে হিসেবে আকস্মিক নয়। রাধাকান্ত মনে মনে সেটা বিশ্লেষণ ক'রে অনুভব করলেন এবং স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু স্থির করতে পারলেন না, এর জন্য তিনি অপরাধী কি না! কালের লীলা—কলিযুগের অবশ্যম্ভাবী সংঘটন ব'লে তিনি এ ঘটনাটিকে ধ'রে নিলেন। কালের লীলায় সনাতনধর্ম ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং আসুরী জড়-বিদ্যার প্রভাবে ম্লেচ্ছ প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করবে—এই হ'ল ঋষি-বাক্য, প্রাচীনকালের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষিদের বাণী। মানুষ আধ্যাত্মিক তপোবলে আত্মিক শক্তিতে জীবনরহস্যের পরমমার্গে অগ্রসর হয়ে অবাঙ্-মানস-গোচর চরম লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছে, সেই চলার পথে সকল রহস্যের স্রষ্টা তাদের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে পথ হতে পথান্তরে চালিত ক'রে অগ্রগমনকে পশ্চাৎগমনে পরিণত করছেন। ভক্তিমার্গীর কাছে এটা ভগবানে ও ভক্তে লুকোচুরি-খেলা। এই খেলাতেই সৃষ্টি আদিঅন্তহীন আবহমানকাল বিচিত্র রহস্যে পরম মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। এর শেষ নেই, এর শেষেই সৃষ্টির শেষ। এই খেলার মধ্যে যখন সনাতনধর্মের বিলুপ্তির উপক্রম হয়, আস্তিকতা যখন নাস্তিকতার প্রভাবে মুমূর্ষু হয়, তখন সেই সকল রহস্যের স্রষ্টা মানবরূপে অবতীর্ণ হয়ে আসুরী-বিদ্যার সকল আয়োজন সকল বিস্তারকে ধ্বংস ক'রে নাস্তিকতাকে বিনাশ ক'রে সৃষ্টিকে আবার স্বপথে স্থাপিত করেন। আজ দেশে সেই আসুরী জড়-বিদ্যা আদৃত হয়েছে; ম্লেচ্ছ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেই বিদ্যা আয়ত্তের জন্য এ দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা আজ শ্বেতদ্বীপমুখী। শহরে শহরে বিলাত-ফেরতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। ক্রমে গ্রামের সমাজেও তারা আসবে বইকি। না এলে কালের লীলা পরিপূর্ণ হবে কেন? সুতরাং রায়চৌধুরীর নবগ্রামে আসাটা আকস্মিক মনে হ'লেও আকস্মিক নয়, স্থূল-দৃষ্টির অগোচর কালের লীলায় বিচিত্র ঊর্ণনাভ-জাল রচনার একটি সূক্ষ্মতম সুদীর্ঘ সূত্রে আবদ্ধ। তিনি রায়চৌধুরীকে প্রথম সম্বর্ধনা ও আতিথ্য জ্ঞাপন ক'রে সেই কালের লীলারই সাহায্য করেছেন। না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। কালের লীলায় বাধা দেয় মানুষ। সে মানুষ অসাধারণ মানুষ। সে অসাধারণত্ব তাঁর নাই। সাধারণ মানুষ যারা বাধা দিতে যায়, তারা বাধা দেয় যে যুক্তিতে সে যুক্তির অন্তরালে আছে গোপন কদর্য স্বার্থ। যেমন এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের ব্রাহ্মণ-শূদ্র-সমাজ, যারা এইজন্য আপত্তি তুলেছে। আজকের

আপত্তির উৎস—গোপন-হিংসা। হিংসা নয়, ঈর্ষা। সুদীর্ঘ কাল ধ'রে রাধাকান্তের উপর যে ঈর্ষা তাদের, সেই ঈর্ষা এই উপলক্ষ্য নিয়ে নিজেকে ফলবতী করবার চেষ্টা করছে। সমস্ত অন্তস্তল অনুসন্ধান ক'রেও রাধাকান্ত নিজের মনে কোন স্বার্থের সন্ধান পেলেন না। সুতরাং তাঁর অপরাধ কোথায়?

অমরচন্দ্র সুবক্তা। পণ্ডিত লোক। সমগ্র জনতা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল তাঁর বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে তাঁর আবেগ তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছিল এবং বাগ্‌ভঙ্গীর নূতনত্ব তাদের মনকে বুদ্ধিকে বিস্ময়ে এবং প্রশংসায় মুগ্ধ ক'রে তুলছিল। তিনি বলছিলেন—

"যার চোখ আছে, সে দেখতে পায়, এটা স্বীকার করি; কিন্তু দূরের জিনিস দেখতে যার চোখের উপর দূরবীক্ষণ আছে বা কাছের জিনিস দেখতে যার চোখে অনুবীক্ষণ আছে, তাদের চেয়ে তারা যে অনেক কম দেখে, এ কথাটা তো ভুল নয়। দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগালে জাত যায় ব'লে তাদের পতিত ক'রে সমাজ থেকে দূর ক'রে দিলে তাদের অসুবিধে খানিকটা ঘটে এটা ঠিক, এবং যাঁরা তাদের পতিত করেন তাঁদের দৃষ্টিগৌরব আপাত-অক্ষুণ্ণ থাকে বটে, কিন্তু আসল ক্ষতি হয় তাঁদেরই—অর্থাৎ যাঁরা পতিত করেন তাঁদেরই। সত্যকে অস্বীকার করেন তাঁরাই। আচার বজায় রাখতে বিচারের ন্যায়ধর্মকে উপেক্ষা করেন তাঁরাই। অন্ধ-বিশ্বাসের ছানিপড়া চোখে বিজ্ঞানের চশমা পরাকে অধর্ম ব'লে পরিত্যাগ ক'রে ছানিপড়া চোখের জন্যে তাঁরাই দেখেন পুতুলকে ঠাকুর, এবং ঠাকুরকে পুতুল ব'লে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেন।

এটা হ'ল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান। এই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হ'ল, অস্পষ্টকে স্পষ্ট করা, অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করা, অনুভব-সাপেক্ষকে অনুমান-সাপেক্ষকে ইন্দ্রিয়গোচর করা। আমাদের শাস্ত্রে বলে—জ্ঞানাঞ্জনশলাকা, এই হ'ল সেই জ্ঞানের কাজল। এই জ্ঞানের কাজলের অভাবেই আজ আমাদের চরম দুরবস্থা। চক্ষুর অগোচর ভগবান এবং ভূত—এই দুয়ের মধ্যে আমরা আজ ভূত নিয়ে মাতামাতি করছি। অথচ এই কাজল এককালে আমাদের ছিল। সে আমরা ভুলেছি। ইউরোপ আজ সে কাজল তৈরি করেছে। ইউরোপ হ'ল এই নতুন কাজলের জন্মভূমি—আবিষ্কার-ক্ষেত্র। এই আবিষ্কারের ফলে ইউরোপ আজ বিশ্ববিজয়ী। ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ড হ'ল শ্রেষ্ঠ দেশ। সেই

দেশের রাণী আমাদের ভাগ্যবশে আমাদের সম্রাজ্ঞী। তাঁদের অনুকরণে আজ আমরা সেই বিজ্ঞানের বিভাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি। তারই শক্তের জন্ত এখানে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আজ ছাত্রদের তপস্তার স্থান বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা হবে, এবং এ যুগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রবর্তনের জন্ত—সেই চিকিৎসায় এ দেশের লোকের মহৎ কল্যাণ সাধনের জন্ত ডিস্পেন্সারি প্রতিষ্ঠা হবে। আমাদের দেশে নতুন প্রভাত হচ্ছে। আমরা জেগেছি এবং বিজ্ঞানকে গ্রহণ করবার জন্ত উদ্যত হয়েছি। সবচেয়ে আনন্দের কথা, আমাদের দেশের, এই আশপাশ-গ্রামেরই মহৎ-বংশজাত এক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই কূয়োর ব্যাঙের সংকীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি ইংল্যাণ্ড গিয়ে নিয়ে এসেছেন বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে, এবং এই অঞ্চলের লোকের সম্মুখে নতুনকে গ্রহণের, শ্রেষ্ঠকে বরণের, সংকীর্ণতাকে পরিহারের মহৎ ও বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমি শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা রায়চৌধুরীর কথা বলছি, আপনারা অবশ্যই বুঝেছেন। তাঁকে আপনারা দেখেছেন। তাঁর পিতৃপুরুষ একদিন এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন; তাঁদের সে খ্যাতি সে কাহিনী দেশে অনেকেই জানেন, তাঁদের বাড়িতে তার ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে—সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমলের তাঁরই দেওয়া তামার পাতে খোদিত সনদ। কিন্তু সে দিন চ'লে গেছে। আজ সেই প্রাচীন বংশ শত খণ্ডে বিভক্ত, বংশগৌরবের কাহিনীর সংকীর্ণ গণ্ডির আবরণ দিয়ে তারই মধ্যে দরিদ্র জীবন যাপন করছেন; প্রাচীন কালের বিক্রম নাই, তার পরিবর্তে মুখের আস্ফালন সার করেছেন। সেই বংশের সন্তান জ্ঞানদাবাবু সকল সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে আধুনিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড থেকে বিদ্যা আহরণ ক'রে ফিরে এসেছেন, দেশকে সেই বস্তু দান করবার জন্ত। কিন্তু তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, তাঁর স্বগ্রাম তাঁকে গ্রহণ করে নি। ফিরিয়ে দিয়েছে। ঠাকুরকে পুতুল ভেবে দূরে ঠেলে দিয়েছে। নবগ্রাম তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এতেই প্রমাণিত হয়েছে, নবগ্রামের জাগরণ অলীক নয়, সত্য। নবগ্রামও আজ সেই মহান আদর্শ গ্রহণ করেছে—নূতনকে গ্রহণের, শ্রেষ্ঠকে বরণের, সংকীর্ণতাকে পরিহারের। তারই ফলেই নবগ্রামে গোপীচন্দ্রের মত কীর্তিমান কর্মী পুরুষের আবির্ভাব সার্থক হয়েছে। তিনি নিজের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবু প্রাচীন প্রতিষ্ঠাবান অভিজাত-সম্প্রদায়ের গ্রাম এই নবগ্রাম তাঁকে সমাদর ক'রে গ্রহণ করেছে, এইখানেই তার জাগরণের

প্রমাণ সুস্পষ্ট। নূতনকে সে গ্রহণ করেছে, শ্রেষ্ঠকে সে বরণ করেছে। অন্যথায় শ্রদ্ধেয় গোপীচন্দ্র হতেন শহরবাসী। নবগ্রাম বঞ্চিত হ'ত তাঁর কীর্তির আভরণের সৌভাগ্য থেকে। যার ফলে কমিশনার সাহেবের মত মহান রাজ-প্রতিনিধির শুভাগমন থেকেও সে বঞ্চিত হ'ত। এ আজ আমাদের মহতী সৌভাগ্য। নবগ্রাম আজ ধন্য হয়েছে, এত বড় সৌভাগ্য এ জেলার সদর এবং মহকুমা শহর ছাড়া অন্য কোনও স্থানের ভাগ্যে ঘটে নাই। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি, তিনি ছাত্রাবাসের এবং দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে আমাদের কৃতার্থ করুন।"

অমরচন্দ্র থামলেন একবার। তারপর তিনি কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট জজ প্রভৃতি গণ্যমান্য অতিথিদের দিকে চেয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। গণ্যমান্য অতিথিদের সকলেই অবাঙালী, কমিশনার খাঁটি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট আমেদ সাহেব বেহারের লোক, জজ সাহেব পার্শী। বাংলা অল্প-স্বল্প বুঝলেও অমরচন্দ্র যে ভাষায় বক্তৃতা করলেন, সে তাঁরা বুঝতে পারেন না। অমরচন্দ্র বাংলা বক্তৃতাই ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে গেলেন। সামান্য অদল-বদল হ'ল অবশ্য। যার ফলে জ্ঞানদা চৌধুরীর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত হ'ল এবং গোপীচন্দ্রের প্রসঙ্গ বিশদ হ'ল, রাজপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান রাজভাষাসম্মত "ইওর অনার", "গ্রেশাস প্রেজেন্স" ইত্যাদি শব্দের আনুকূল্যে হয়ে উঠল আরও সম্ভ্রমপূর্ণ এবং গুরুগম্ভীর।

এর পর কমিশনার সাহেব উঠলেন বক্তৃতা দিতে। ইংরেজীতে অল্প কিছু বললেন। এ দেশের কুসংস্কার এবং অজ্ঞান অন্ধকারের কথা উল্লেখ করলেন। সংকীর্ণ রক্ষণশীলতার অনুদারতার কথা বললেন। এবং বললেন, "মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর গভর্মেন্ট এই সমস্তকে দূরীভূত ক'রে এই দেশকে এক প্রগতিশীল দেশে পরিণত করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারই ফলে দেশে রেল-লাইন বসেছে এবং আরও বসবে, টেলিগ্রাফ-লাইন বসেছে, পোস্ট-আপিস বসেছে, নানা দিকে নানা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কতকগুলি উত্তরমস্তিষ্ক লোক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছে, হোমরুল চায় তারা। এর ফলে দেশের অর্ধশিক্ষিত যুবক-সমাজে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তারা উদ্ধত হয়ে উঠেছে, বিপথে চলবার উদ্যোগ করছে। এ অত্যন্ত দুঃখের কথা, আক্ষেপের কথা। এসব থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে, বিপথযাত্রীদের

শাসন করতে হবে, প্রয়োজন হ'লে কঠোর শাসনে পরাঙ্মুখ হ'লে চলবে না। আমি আশা করি, এ দেশের রাজভক্ত সমাজপতিরা জমিদারেরা তাঁদের সে কর্তব্য অবশ্যই পালন করবেন। এখানে এসে আমি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেছি। মিস্টার গোপীচন্দ্র মুকুর্জীর মত কীর্তিমান কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। নিঃসংশয়ে তিনি প্রশংসার পাত্র। সদাশয় গভর্মেন্ট তাঁর মত ব্যক্তিকে সমাদর করতে পশ্চাৎপদ হবেন না। এবং গভর্মেন্ট আশা করেন, এ অঞ্চলের আরও বহু উপকার তাঁর দ্বারা সাধিত হবে। গভর্মেন্ট তাঁকে সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন। অমরবাবু "রায়চৌধুরী"র কথা বললেন। এ অঞ্চলের একজন ব্যক্তি এমন উন্নত হয়েছে শুনে আমি খুব আনন্দলাভ করেছি। অনেক ভারতবর্ষীয়ের বিলেত গিয়ে মাথা বিগড়ে যায়। আশা করি, তিনি সে ধরনের লোক নন। তিনি আজ এই সভায় উপস্থিত থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। যাই হোক, আন্তরিক শুভকামনা নিয়ে এবং পরমেশ্বরের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা ক'রে আমি আনন্দের সঙ্গে ছাত্রাবাস এবং দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করব।"

অমরচন্দ্র আসনে উঠে তাঁকে প্রত্যুদ্গমন করবার ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। গোপীচন্দ্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই। অমরচন্দ্র চীৎকার ক'রে বললেন, আপনারা ভিড় করবেন না, গোলমাল করবেন না। সকলেই সভা থেকে সঙ্গে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমরা দ্বারোদ্‌ঘাটন শেষ ক'রে আবার এখানেই ফিরব। সভার কাজ এখনও বাকি আছে।

রাধাকান্ত উঠেছিলেন। তিনি মণ্ডপের বাইরে এসে কিন্তু আর অগ্রসর হলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। স্কুলটি চমৎকার হয়েছে। পূর্বকালের ছবি মনে পড়ল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে বন্ধ্যা প্রান্তর ধু-ধু করত, ইস্কুলের পাশেই ওই বটগাছটায় মড়া বেঁধে রাখত শবদেহবাহী গঙ্গাযাত্রীর দল। গভীর রাত্রে হুম-হুম পাখী ডাকত। তাদের বিচিত্র অনুনাসিক ডাক শুনে লোকে বলত, গাছটি প্রেতের আবাসস্থল। এ অঞ্চলে বড় হিংস্র জন্তু বিশেষ নাই, থাকবার মধ্যে আছে শেয়াল এবং হেঁড়োল, তারা ঘুরে বেড়াত, খেলা করত, কখনও কলহ-কোলাহলে মুখরিত ক'রে তুলত প্রান্তরের বুকের নিশীথ-রাত্রিকে। তাদের গর্জনে বিরক্ত হয়ে বিষাক্ত বড় বড় সাপ ফণা তুলে নিঃশব্দ-গর্জনে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ত। সেই প্রান্তর আজ মধ্যপ্রান্তের

পুণ্যতীর্থ বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, দাতব্য-চিকিৎসালয়ের অধিষ্ঠানভূমিতে পরিণত হ'ল। একেই বলে—কালের লীলা। সৃষ্টিকাল থেকে যে স্থান ছিল প্রান্তর—। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, তাই বা কেন? ওই তো অদূরেই টলমল করছে গোপীচন্দ্রের নতুন কাটানো দিঘি, ওই দিঘির বুক থেকেই উঠেছে বাসুদেব-মূর্তি। সুতরাং অনুমান হয়, একদা এই দিকেই ছিল নবগ্রামের শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধি। বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত কোন রাজবংশ, কোন রাজরাজেশ্বর এইখানেই তাঁর সকল কীর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—রাজার প্রাসাদ, দেবমন্দির, অতিথিশালা, বিদ্যাভবন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি কত কত কীর্তিধ্বজা! কাল তার নাম গ্রাস করেছে, পৃথিবী আপনার গর্ভের মধ্যে আত্মসাৎ করেছে কীর্তির কঙ্কালগুলিকে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও তিনি মৃদু হাসলেন। এই পৃথিবীতে মানুষ প্রতিষ্ঠা খোঁজে! সম্পদমূল্যে সেই প্রতিষ্ঠাকে কিনতে চায়!

দাঁড়িয়ে আছেন?

রাধাকান্তের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, মাখন কবিরাজ এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন। মাখন কবিরাজ জাতিতে কায়স্থ। আজ তিন পুরুষ ধ'রে চিকিৎসা-ব্যবসায় ক'রে আসছেন।

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ। ভাবছি, কালস্য কুটিলা গতি। পুরুষের ভাগ্যের কথা নাকি বলা যায় না, নারীর চরিত্র অনুমান করা যায় না, তেমনই মাটির পরিণতির কথাও কেউ বলতে পারে না। এই ধু-ধু করা পতিত প্রান্তর আজ কি হয়ে দাঁড়াল!

মাখন কবিরাজ বললেন, সে কথা সত্য।

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ভাবছেন বলুন তো? চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হেসে মাখন বললেন, ওই কথাই ভাবছি—অবশ্য নিজেদের কথার ভেতর দিয়ে। ভাবছি, বিলাতী ওষুধের ডাক্তারখানা হ'ল, এইবার আমাদের-মানে কবিরাজদের কাল একেবারেই গত হ'ল। গরিব গৃহস্থেরা ডাক্তারী ওষুধের দাম বেশি ব'লে কিনে খেতে পারত না, আমাদের পাঁচন বড়ি খেত। এবার দাতব্যের কল্যাণে—

কথা শেষ না ক'রেই তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, আপনারা—আমরাই মরলাম রাধাকান্তবাবু।

রাধাকান্ত হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, মরা-বাঁচার মীমাংসা কি এতই সোজা করবেন মশায়? আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র কোন কিছুতেই ওর মীমাংসা নাই। চ'ষে খুঁড়ে তুলে ফেলেও আমার বাগানের ঘাস আমি মারতে পারলাম না। আমরা মানুষ। ঘাস বাঁচে শেকড়ে, আমরা বাঁচি বংশের অনুক্রমে। এত ভাবছেন কেন? তা ছাড়া যাঁর লীলায় মরণ-বাঁচনের খেলা চলছে, সে যদি মারে, তবে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল।

মাখনবাবু কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ওদিক থেকে জনতা হুড়মুড় ক'রে স'রে এসে দু ভাগ হয়ে গেল। বোঝা গেল, দ্বারোদ্ঘাটন-পর্ব সেরে সায়েবরা সভামণ্ডপে ফিরছেন। রাধাকান্ত এবং মাখন কবিরাজ নিজেদের আসনের দিকে অগ্রসর হলেন। লোকজনেরা কি যেন গুঞ্জন করছে! সকলেই মৃদুস্বরে কিছু বলাবলি করছে। কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কিন্তু সুরটা ধরা যাচ্ছে। সুর শুনে মনে হচ্ছে, যেন বিশেষ কিছু একটা ঘ'টে গিয়েছে। কৌতুকের সঙ্গে সানন্দ ফিসফাস চলছে। প্রশ্ন ক'রে জানবার মত প্রবৃত্তি রাধাকান্তের নয়। তিনি চুপ ক'রেই ব'সে রইলেন।

কমিশনার সায়েব এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সায়েবেরা এসে মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। সায়েবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, পদক্ষেপ ঈষৎ দীর্ঘ এবং দৃঢ়। গোপীচন্দ্রকে দেখে মনে হ'ল বিব্রত। অমরচন্দ্রও বিব্রত। স্বর্ণবাবুও এলেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি গোঁফে তা দিচ্ছেন অভ্যাসমত, কিন্তু যেন ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে।

সকলে আসন গ্রহণ করতেই অমরচন্দ্র উঠে ঘোষণা করলেন—বোর্ডিং-হাউসের দ্বারোদ্ঘাটন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু অনিবার্য কারণে ডিস্পেন্সারি ওপ্‌নিং স্থগিত রইল। ডিস্পেন্সারির জন্য নতুন বাড়ি হবে। সেই বাড়ি ওপ্‌ন করবেন আমাদের এই মহামাননীয় কমিশনার সাহেব। ডিস্পেন্সারির জন্য যে বাড়ি তৈরি হয়েছে, সে বাড়ি আমাদের মনোমত হয় নি। সেই বাড়ি কমিশনার সায়েবের মত মাননীয় ব্যক্তির দ্বারা ওপ্‌ন করাতে আমরা নিজেরাই লজ্জা বোধ করছি। আমরা আগামী তিন-চার মাসের মধ্যেই এই নতুন বাড়ি তৈরি শেষ করতে পারব ব'লে আশা করছি।

স্বর্ণবাবু এসে ব'সে ছিলেন রাধাকান্তের পাশেই। তিনি একটু ঝুঁকে ফিস-ফিস ক'রে বললেন, সায়েব রেগে আগুন। ডিস্পেন্সারির চাবি ছুঁড়ে ফেলে

দিয়েছেন। বল্লেন, বোর্ডিং-হাউস কেউ রাজবাড়ি করে না, যা করেছ তাতেই হয়েছে, আমি ওপন্ করেছি; কিন্তু এই ডিস্পেন্সারি হয়েছে? এই আমি ওপন্ করব? বাবুদের মুখ চুন।

রাধাকান্ত কোন উত্তর দিলেন না।

কমিশনার সাহেব উঠে বললেন, আমি নিজে প্ল্যান পাঠিয়ে দেব। সেই প্ল্যানে ভবিষ্যতে যাতে চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেন্সারি হস্পিটাল হতে পারে, তার সংস্থান থাকবে। আমি আশা করি, গোপীবাবু ভবিষ্যতে তাতে হস্পিটাল করবেন।

গোপীবাবু আভূমি নত হয়ে সেলাম করলেন।

সভা শেষ হ'ল।

রাধাকান্ত বাড়ি এসে উঠতেই চাকর কেষ্ট বললে, থানাতে মামাবাবুকে আর কিশোরবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে।

থানাতে? কেন?

সদর থেকে কে একজন বড় পুলিস এসেছেন, তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। মা ডাকছেন আপনাকে বাড়িতে।

কাশীর বউয়ের চোখে অস্বাভাবিক প্রখরতা ফুটে উঠেছিল। তিনি বললেন, রবি আমাকে সব কথা খুলে বলে নি। কিন্তু খানিকটা আঁচ পেয়েছি। কোন সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রকারী দলের সঙ্গে তার যোগ আছে। কাশী থেকে সে এখানে এসেছে পুলিসের চোখ এড়াতে।

রাধাকান্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র! তাঁর মনে প'ড়ে গেল, মানিকতলার বোমার মামলার কথা। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল কানাই সত্যেনের ফাঁসি! অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বাঁড়ুজ্জে, হেম কানুনগো। বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় আশঙ্কায় থরথর ক'রে উঠল। মাথার দিকে যেন রক্ত চনচন ক'রে উঠে যাচ্ছে।

কাশীর বউ বললেন, থানায় যাবে একবার?

রাধাকান্ত বললেন, যাব বইকি। কর্তব্য করতে হবে তো। তিনি আর বাড়িতে দাঁড়ালেন না। ফিরে এসে বৈঠকখানায় মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত অসমসাহসী যুবকদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সংবাদে

উত্তেজনা আছে যথেষ্ট। খবরের কাগজ প'ড়ে সে উত্তেজনা তিনি বহুবার অনুভব করেছেন। কিন্তু বংশগত এবং এই সমাজগত সংস্কারে তিনি রাজানুগত্যকে ধর্ম ব'লে মনে করেন। বিশ্বাসগত সংস্কারে ইংরেজের শক্তিতে অগাধ আস্থা, তাকে মনে করেন অজেয় ব'লে। রাজশক্তির শাসনকে তিনি ভয় করেন। দুইয়ের প্রভাবেই রাধাকান্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। মাথা ধ'রে ব'সে রইলেন তিনি।

কোথাকার ঢেউ কোথায় এসে লাগল!

কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে নবগ্রাম। তার জন্য তিনিই হলেন উপলক্ষ্য! ভাগ্য, মানুষের ভাগ্য! নবগ্রামের নব সৌভাগ্যোদয়ের উপলক্ষ্য হ'ল গোপীচন্দ্র—ভাগ্যবান গোপীচন্দ্র। আর রাজদ্রোহ এবং রাজরোষের প্রবাহ এসে নবগ্রামের বুকে এসে স্পর্শ করলে, তার উপলক্ষ্য হলেন তিনি! অথচ তিনি এই নবকাল-নবপ্রবাহের বহু পশ্চাতে প'ড়ে রয়েছেন। ধরতে গেলে তিনি বিগত। আজই যখন কবিরাজ বলেছেন, মারা যেতে আমরাই মারা গেলাম। ঠিক তাই। মারা তিনিই গেলেন। রবি যে ধারা আনলে, তাতে তিনিই মারা গেলেন।

বাইরে জুতোর শব্দ উঠল।

কে?

সর্পবাবু হাসিমুখে গোঁফে তা দিতে দিতে ঘরে ঢুকলেন, আমি। ঘরের দরজাটা সর্পবাবুই বন্ধ ক'রে দিলেন। কেষ্ট চাকর জলকে নিয়ে আসছিল, সে দরজা খুলতেই রাধাকান্ত তাকে বললেন, থাক্, বাইরে যা তুই।

কেষ্ট বেরিয়ে এসে চাকরদের ঘরে ঢুকেছে, এমন সময় সর্পবাবু হাঁকলেন ত্রস্ত কণ্ঠে, কেষ্ট! কেষ্ট!

বাবু!

জল! জল! রাধাকান্ত অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেছেন।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকাপসারণ

অনেক সখালে, থামো থামো মহাশয়,
আগন্তুকেতে পূর্ণ যে যখালয়।
দেশ তো উজাড় করিয়া এনেছ প্রায়,
যে কটা রয়েছে নজর দিও না তায়,
সংহর ক্রোধ—করি সবে অনুনয়।

২

লোকাপসারণ দ্রুতই চলিছে যবে,
দুদিনে দেশটা নিজেই সাহারা হবে।
যখন জাতির রন্ধ্রেতে বসে শনি
অমঙ্গলকে বরে মঙ্গল গণি'
চৌদ্দভুবন ঘুরি নির্বাণ লভে।

৩

রচিতে চাহিছ যে বৃহৎ ব্যাসকাশী
ম'রে যা হইত, হবে তা সেখানে আসি।
বুদ্ধগয়ায় লেপচারা যেবে হামা
তিব্বত ছাড়ি আসিবে যাবৎ লামা,
হবে আমদানি টাসিলাম্পুর চাষী?

৪

রাজপুতানায় শক্ত ফলানো পান,
বরিশালে কি সে জন্মাবে জাফ্রান?
কঙ্কর-ভূমে ল্যাংড়া ধরানো দায়,
পেস্তা কিছুতে ফলিবে না পোস্তায়
স্বাদেশী কৃষি ইন্দ্রাশে হায়রান।

৫

দেশটাকে করা যায় না পিঁজরাপোল,
একীকরণেতে বৃদ্ধি গণ্ডগোল।
লোক ধান গম তিসির বস্তা নয়
একই গুদামে হয় না সমন্বয়
লেবে ডেকে এনে খাওয়ানোই হবে ঘোল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিহারে দেবীপক্ষ

চিরকাল সবাই ব'লে এসেছে, ভারত অতি বিচিত্র দেশ। ভারতে এখনও অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়, যার রহস্য কেউ উদ্ঘাটন করতে পারে না। এ রকম দেবদেবীর বাহুল্য অন্য কোনও দেশে বোধ হয় নেই। সে কথা যাক, সম্প্রতি দুর্গাপূজার কথাই বলা যাক। ভারতের সব শাক্তসম্প্রদায়ই দুর্গাপূজা ক'রে থাকেন। যেখানেই বাঙালী আছে, সেখানেই পূজার কয়দিন মহা ধুমধামে কাটে। যেখানে বাঙালী কম, সেখানেও পূজার পক্ষটি কম উৎসব-আয়োজনে কাটে না। বেহারের কথাই বলি। এখানে গ্রামে গ্রামে এ কয়দিন একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, বিশেষ ক'রে দশমীর দিন ও নবমীর রাত্রিতে পূজা ও আনন্দের শেষ থাকে না। কিন্তু এ পূজার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের।

সাধারণত দেবীপক্ষের আগে পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষকে পিণ্ডদান না করাটা বেহারীরা পাপ মনে করে। অতি দরিদ্র যে, সেও সামান্য আয়োজন ক'রে পিণ্ড দান করে। যারা একটু সঙ্গতিপন্ন, তারা গয়ায় গিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। প্রতি বৎসর পিতৃপক্ষে তাই গয়ার যাত্রীর ভীড় লেগেই থাকে। বেশির ভাগই বেহারী যাত্রী। এই তো গেল পিতৃপক্ষ। তারপর দেবীপক্ষে আরম্ভ হ'ল একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। যাঁরা শাক্ত এবং শিক্ষিত, তাঁদের মধ্যে অনেকেই দুর্গাপূজায় যোগ দেন। যাঁর সঙ্গতি আছে, তিনি নিজের বাড়িতেই প্রতিমা গড়িয়ে মহা ধুমধামে পূজা করেন। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে অনুষ্ঠান হয়, সেটা একেবারেই লৌকিক অনুষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রামে চিকিৎসক ও জনগণের উদ্ধারকর্তা হচ্ছেন ওঝারা। আর অমঙ্গলের উপদেবতা ডাইনী। শহরেও ওঝা ও ডাইনীর অভাব নেই। এদেশী লোকেরা এখনও ভূত ওঝা ডাইনী ইত্যাদিতে অগাধ বিশ্বাস রাখে। এদের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে, তা কতদূর সত্য জানি না।

এ দেশে সর্বসাধারণের বিশ্বাস যে, দেবীপক্ষের প্রথম দশ দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত ডাইনীদের দীক্ষা নেবার ও পুরাতন বিদ্যা পরীক্ষা করবার সময়। সারা বছর চুপ ক'রে থেকে ডাইনী হয়তো এই সময়ই তার গুণগুলি সব ঝালিয়ে নেবে, যাতে বহু লোকের অমঙ্গল ও প্রাণহানি হবে। নূতন যে ডাইনী দীক্ষা নেবে, তারাও এই সময় তাদের নূতন শিক্ষার পরীক্ষা দেবে, কাজেই এ দশ দিন গ্রাম্য লোকেদের পক্ষে একটু ভয়ের সময়। নূতন ও পুরাতন ডাইনীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে তো! ডাইনীদের হাত থেকে বাঁচায় ওঝারা। তাই এ সময়টাতে ওঝাদেরও উঠে-প'ড়ে লাগতে হয়। তারা ডাইনীর সন্ধানে ঘোরে এবং তাদের ওপর নিজেদের জারিজুরি ক্ষমতার ব্যবহার করে। নূতন ওঝারাও এই সময় দীক্ষা গ্রহণ করে

ডাইনীরাও পূজার আয়োজন করে, কিন্তু সেটা গোপনে। তারা যে কিসের পূজা করে, তা কেউ জানে না। তাদের সাধনার স্থান হচ্ছে শ্মশান বা নদীর তীর অথবা কোনও নিভৃত জায়গা। সেখানে নূতন ডাইনী দীক্ষা নেয় ও পুরাতনরা নূতন ক'রে ভক্ষণ করবে তারই চিন্তা করে। ছয় মাস বা এক বৎসর আগে যে সব শিশুকে ভর চাপিয়ে রেখেছিল—এ কয়দিন গভীর রাত্রে ডাইনীরা ওই সব শিশুকে জীবন্ত করে। বেহারে ছোট ছেলে দাহ করার নিয়ম নেই, মাটিতে পুঁতে রাখে। ডাইনী সেই মরা ছেলে খুঁড়ে বার ক'রে তার প্রাণ দিয়ে তাকে তেল মাখিয়ে কাজল পরিয়ে সাজায়। তারপর তাকে নিয়ে খেলা করে। নাচ-গান হয়। অনেক সময় ডাইনী তার পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে নাচ-গানে যোগ দেয়। ওঝারা এই সময় সর্বদা ডাইনীর খোঁজে থাকে। তারা ওই অবস্থায় ডাইনীকে দেখলেই নিজের শক্তির জোরে তাকে কাবু ক'রে ফেলে এবং ওই জীবন্ত শিশু ও ডাইনীর পরিধেয় বস্ত্রটি নিয়ে পালিয়ে আসে। শিশুটিকে তার বাপ-মার হাতে ফিরিয়ে দেয়। সেই কাপড়টি গ্রামে দেখিয়ে খোঁজ করা হয় যে, কার কাপড়। যে স্ত্রীলোকের ওই কাপড়, তার আর রক্ষা নেই। প্রমাণ হয়ে গেল যে, সে ডাইনী। এর পর হয় তার শাস্তির ব্যবস্থা। ডাইনীতে-মারা ছেলে আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে এসেছে—এ ঘটনা বেহারে যথেষ্ট ঘটেছে। অনেক বয়স্ক লোক তার দেহের দাগ বা ক্ষত দেখিয়ে বলে যে, সে একবার ডাইনীর হাতে ম'রে গিয়েছিল। বহুকাল মাটির নীচে পোঁতা থাকার দরুন তার গায়ে এমন ক্ষত হয়েছে। বহু দুঃসাহসী রাখাল ডাইনীর সামনে থেকে ছেলে উঠিয়ে পালিয়ে এসেছে। ডাইনী ফিরে চাইবার জন্য শত অনুরোধ করলেও তারা ফিরে চায় নি, জানে, তা হ'লে মৃত্যু অনিবার্য।

ওঝারা পঞ্চমীর দিন থেকে শুদ্ধাচারে থাকে। সমস্ত দিন উপবাসী থেকে নবমীর রাত্রে পূজার আয়োজন করে। বেদীর উপর ঘট স্থাপন ক'রে পূজা হয়। সেখানে হোম হয় ও ভজন হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা হয়। কোন ব্রাহ্মণ এর পৌরোহিত্য করে না। ওঝারা নিজেরাই পুরোহিত। এদের মধ্যে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা খুব কম। বেশির ভাগই নীচ জাতি। এই পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়। আগে মহিষ বলিও হ'ত, গান থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পূজার সময় কোন কোন ভক্তের দশা হয় এবং তার উপরেই দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়। নবমীর শেষ রাত্রে ওই ঘট নদীতে বিসর্জন দেওয়ার পর নাচগানসহকারে সবাই ঘরে ফিরে পূজার জায়গায় আবার প্রণাম ও উৎসর্গ ক'রে অনুষ্ঠান শেষ করে। এ অনুষ্ঠানকে 'কলসাভাসান' বলে। ভক্ত ও ওঝাদের গানগুলি সরল ভাষায় রচিত। এ গান মজঃফরপুর থেকে সংগৃহীত, তাই ভাষাটা মজঃফরপুরী। জেলাভেদে ভাষা ও গানেরও তফাত আছে।

কেউন দেবী হুকর কেলইত অবইছ ? কেউন দেবী হুবর হসইত অবইয় ? [illegible]

দেবী হয়্যা খেলইত অবইর। রাজদেবী হয়্যা হসইত অবইর। ভইসা যায় রেজি খর্পর সাজাইলি সিঁদুর (রুধির) করইব আহার। লোহির পিয়ইব দেবী লোহির পিয়ইব লোহির করাইব স্নান। পথলকে পূজইতে দেবী পথল গলিরই যে তুহ বড়া হৃদয়কে কঠোর।

কোন্ দেবী খেলতে খেলতে কোন্ দেবী হাসতে হাসতে আসছেন? চন্দ্রবতী খেলতে খেলতে ও রাজদেবী হাসতে হাসতে আসছেন। মহিষ মেরেছি খর্পর সাজিয়েছি। রুধির দিয়ে তোমার স্নান আহার সম্পন্ন হবে। পাথরকে পূজা করলে পাথরও গ'লে যায়, কিন্তু তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন।

দুর্গা দুর্গা রটইলে ভোর ভিহুগাবরা (প্রভাত)
দুর্গা মইয়া শুতল চতল নিচেত
আখিঁয়া কিনৌনা (নিমীলিত)

ভোর থেকেই দুর্গানাম জপ করি, কিন্তু মাতা নিশ্চিন্ত মনে নিমীলিত নেত্রে ঘুমিয়ে আছেন। এ রকম কালী শীতলা ভৈরব ব্রহ্মদেব সকলের নামে গান আছে। কালী বা দুর্গার গানগুলির যা মানে তা আমাদের দুর্গাপূজার সময়কারে ঘটনাগুলির মতই। কয়দিনের জন্য দুর্গার বাপের বাড়ি যাওয়া-আসার ব্যাপার বর্ণিত আছে এ গানগুলিতে।

শশুরাকে (শশুরবাড়ি) রুসল হে কালি
নই হরবা (বাপের বাড়ি) ভাগল যাইছ
যমুনা কিনার বা হে কালি
রোদন পসারল
নইয়া লাব তীনবা মলাহবা
নইয়া চঢ়ি উতরব যমুনা নদী পার
কথি কেরা নইয়া হে কালি কথি করুয়ার?
কথি চঢ়ি উতরব পার?
সোনেকেরা নইয়া যে তীনবা
রূপে করুয়ার নইয়া চঢ়ি উতরব
যমুনা নদী পার।

শশুরবাড়ি থেকে রাগ ক'রে কালী বাপের বাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন। যমুনা নদীতে গিয়ে চিৎকার ক'রে তীনবা মাঝিকে নৌকা আনতে বললেন। তীনবা এসে জিজ্ঞাসা করছেন, কেমন সে নৌকা, কি দিয়ে পার হবে? কালী উত্তর দিচ্ছেন, সোনার নৌকার রূপার দাঁড় তাই দিয়ে পার হব। আসল দিকটিতে যমুনা ও গঙ্গা দুই নদীর নাম

পাওয়া যায়। প্রকৃত শব্দগুলি অত্যন্ত বিকৃত হয়ে গেছে, তাই মানে উদ্ধার করা কঠিন। তারপর কালীর বাপের বাড়ি থাকা হয়ে গেল, তিনি এখন ফিরে যাবেন। কিন্তু দেখাশুনা সেরে তাঁর যাওয়ার সময় আর হয় না।

"তোর ভিনুসরবা মইয়া গহন বে চললু হে
মইয়া হে, কোই নহি হোয়ত সহায়।
দেশবা কে দূর চললু।
মিলইতে জুলইতে মইয়া দুপহরিয়া বিতাওল
ভেটবা করইতে ভেলো সাঁঝ
দেশবাকে দূর চলবু রে।"

ভোরে উঠেই গহন বনের মধ্যে দিয়ে তোমায় যাত্রা করতে হবে। এ পথে কেউ তোমার সহায় নেই। দেশ ছেড়ে বহু দূরে তুমি যাবে। তাই ত্বরা কর। সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে দ্বিপ্রহর কাটল। মা-বাপের কাছে বিদায় নিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মনে রেখো যে, দূর দেশে তোমায় যেতে হবে। তারপর কালীর যাত্রা শুরু হ'ল।

ঊঁচি মহবা হে কালি, নীচি হরবাজা
কচি কচি কাটলু খিড়কিঁয়া হে কালি।
কে কয়া অঙনা হে কালি ডাবরা পিসৌলী?
কে কয়া অঙনা হে কালি মাথা বন্ধইলি?
বাবা কে অঙনা বে ভকুতা ডাবরা পিসইলি
ভইয়া কে অঙনা বে ভকুতা মাথা বন্ধইলি
মইয়া সঙ্গে মিললু হে কালি বহিনিয়া সঙ্গে মিললু
মিলইতে জুলইতে হে কালি ভেল সবতুলবা
লাগি লাগি ডোলিয়া সবুজিরও ওহাটিয়া
লাগি গেল বত্রিশ কাহার
আগে আগে চলে কালি সাতম যোগিনীয়া
অহি পাছে চললু হে কালি।
ফিরে দেলে মাইছ কে কালি
কামরূপ দেশবা?
তোহরাকে দেলিঙউ ভকুতা বশকে যোটিরিয়া
যাহা যাহা তাহা তাহা মিলতউ বশকে যোটিরিয়া।

কার অঙ্গনে তুমি মাথা বাঁধবার মশলা ডাল বাটালে? কার অঙ্গনে বসেই বা চুল বাঁধলে? তোমার বাড়ি বেশ উঁচু এবং দরজা-জানালাও ভাল। কালী উত্তর

দিয়েছেন, তক্ত, আমার বাপের অন্নে তার বাটা হয়েছে, ভাইয়ের অন্নে ব'সে চুল বেঁধেছি। মা বোনেদের সঙ্গে দেখা ক'রে তুমি বিদায় নিলে। লাল পালকির সবুজ ওড়না বত্রিশ জন বেহারা কাঁধে নিয়ে চলেছে। তোমার আগে আগে সাত শ যোগিনী যাচ্ছে। কামরূপ দেশে যাবার আগে আমার কি দিয়ে যাচ্ছ? তোমাকে দিয়ে গেলাম ধনের ডালা। যেখানে সেখানে তুমি ধন কুড়িয়ে পাবে।

প্রত্যেক দেবতার নামে আলাদা গান আছে। প্রত্যেকেরই বিষয়বস্তু আলাদা। যে দেবতার যা বিষয় নিয়ে কারবার, সেই বিষয় গানেও পাওয়া যায়। এ গানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এ গানগুলি পূজার মন্ত্র। এই দেবদেবী ছাড়া আরও কতকগুলি গ্রাম্য দেবী আছেন। বোধ হয় তাঁরা লৌকিক দেবী। কতকটা আমাদের তান্ত্রিক দেবীর মত। তাঁদের ওঝারা শুধু দেবী নামেই ডাকে, কিন্তু তাঁদের নাম আছে, যথা, হয়মতী, দুলুলী, রাজদেবী ইত্যাদি। ভূত বা ডাইনী তাড়বার সময় বা কারুর অসুখ সারাতে হ'লে রোগী বা ওঝা এঁদের কারুর কাছে মানত করে। রোগ সেরে গেলে মানত না দেওয়া হ'লে ওঝার উপরই এঁর রাগ পড়ে। সেজন্য সময় সময় ওঝাকে নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে পূজা ক'রে দেবীকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। এখানকার ওঝাদের বাহুতে একাধিক ক্ষতচিহ্ন দেখেছি। স'ত্যিই রক্ত তারা দেয়। শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী ও নবমী এবং বৈশাখের নবমীতেও ওঝারা খুব ধুমধাম ক'রে পূজা করে। কিন্তু সবচেয়ে জমকালো পূজা হচ্ছে দুর্গা-নবমীর রাত্রে। সেদিন শেষ রাত্রি কলসী ভাসানোর পর পূজার উৎসর্গ করা ঘরের কড়িপাতা আবালবৃদ্ধবনিতা মাথায় ধারণ করে, কেউ টিকিতে বেঁধে রাখে।

এ তো গেল ওঝাদের কথা। ডাইনী তাড়াবার জন্য সাধারণ মেয়েরা একটা ব্রত করে, তাকে বলে ঝিঁঝিঁয়া, প্রতিপদ থেকে এ ব্রত শুরু হয়। একটা নূতন মাটির হাঁড়িতে ছোট ছোট ছিদ্র করা হয়। সন্ধ্যার সময় ওই হাঁড়ির মধ্যে বড় একটি প্রদীপ জেলে মেয়েরা মাথায় নিয়ে দল বেঁধে গান গেয়ে নেচে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়। দৃশ্যটি বেশ ভালই লাগে। প্রবাদ যে, ডাইনী চোখ তুলে ওই ঝিঁঝিঁয়ার হাঁড়ির দিকে তাকাতে পারে না। অনেক ডাইনী রাগের চোটে এসে হাঁড়ি ভেঙে দেয়। তাকে তো তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে ধ'রে সাজা দেওয়া হয়। ঝিঁঝিঁয়ার ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা নবমীর রাত্রে পূজা ক'রে শেষ রাত্রে ঝিঁঝিঁয়া ভাসানো হয়। ঝিঁঝিঁয়ারও বহু গান আছে। গানটাই মন্ত্র। তার দু-একটা উদাহরণ দিই—

ঊঁচ পোখরি চঢ়ি ডাইনী বকইছই (উঁকিয়ারা)
তব না কে বা পড়া লাগইছে গে।
তব না বোলাইব ডাইনী জন ছোড়াইব
চুম না কে চিকবা জগইব রে।

হাজাম বাজুটবো ডাইনী কেশ মুড়াইব
চুন বা কে টিকবা লগটব হে।
গাধা বা মঙটবো ডাইনী তোহরে কে চঢ়াইব
নগরে নগরে ঘুমটব হে!

উঁচু পুকুরের পাড় থেকে ডাইনী উঁকি মারছে। ওঝার বাড়ির ঠিকানা বের কর। ওঝা ডাকিয়ে ডাইনী তোমার গুণ কেড়ে নেব। নাপিত ডাকিয়ে তোমার মাথা মুড়িয়ে কপালে চুনের ফোঁটা পরাব। তারপর গাধার চড়িয়ে নগরে নগরে তোমাকে ঘোরাব। আমাদের দেশেও এর অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

কোদো কে ভাত ডাইনি কুতরা মছরিয়া
ডাইনীকে বেটা চিক্কন হোতই হে।
আপনা বেটবা খই হে গে ডাইনী
হমরা ভইয়া কে বচই হে গে!

কোদোর ভাত ও ছোট্‌কুচ্‌রা মাছ (কাতলা নয়) খেয়ে ডাইনীর ছেলে চিক্কণ হোক। তাকেই ডাইনী ভক্ষণ করুক, আমার ভাই বেঁচে থাকুক।

সাধারণত ভাই ও ছেলের মঙ্গলের জন্য এ ব্রত করা হয়। যাতে শিশু ও শস্যফুল উভয়ই রক্ষা পায়। এই হ'ল বেহারের দেবীপক্ষের উৎসব। আমরা দুর্গাপূজা করি শক্তির জন্য। এরা পূজা করে অমঙ্গল ও অপদেবতার ভয়ের জন্য। আধুনিক শহর ও নিভৃত ছায়া-ঘেরা পল্লীগুলি এ কদিন গানে নাচে বাজনায় মুখর হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে নজর দেওয়ার চল আছে, কিন্তু ডাইনী ইত্যাদির এতটা প্রতাপ শোনা যায় না। বেহারে যে কেন এটার প্রচলন হ'ল জানি না। হয়তো অজ্ঞতাই প্রধান কারণ। আমরা যখন শুনি যে, ডাইনীর মোটে আড়াই অক্ষরের মন্ত্র এবং সেই মন্ত্র পড়ে ভাঙা কলসীর টুকরার উপর কারুর নাম ক'রে চিহ্ন করলেই সে ব্যক্তি যত দূরেই থাক্‌ তার গায়ে আঁচড়ের দাগ হবে এবং দিন দিন তার রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকবে, তখন হেসেই উঠি আর বলি 'সব গাঁজা'। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শহরে ব'সেই আজ আধুনিক শাক্‌শান্ধিকের মধ্যে ডাইনী ও ওঝার কারবার অবাধে চলেছে দেখতে পাচ্ছি। এখনও ডাইনীতে রক্ত চুষে নিচ্ছে, ভূতও ঘাড়ে ভর করছে। অনেক লোক তার গায়ে অকারণ আঁচড়ের দাগ দেখিয়ে বলেছে যে, এ ডাইনীর কাজ। এসব যে কি ব্যাপার তা ওরাই জানে। আমাদের কাছে এটা একটু আজব ঠেকে, তাই আর সবাইকে জানাবার লোভ হয়। আমাদের পূজার সময়ই একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উৎসব যে হয়ে থাকে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ডাইনী ও ভূত করে যে ঘাড় থেকে নামবে তা জানি না, তবে এ সব ওঝা বাজা হবে না এটা ঠিক। এদের নামাতে হ'লে আরও শক্তিশালী ও অন্য ধরনের ওঝা চাই।

উর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

শেয়াল-রাজা

ভগবান ! তব অনুকম্পায় ভব-অরণ্য মাঝারে
আজো পরাজিত করে নি তো কেউ এই অনন্ত-বাজারে ?
মোর ফন্দির খানা-খন্দের তলে
ঠেলে ফেলি কত হোৎকা-হাতির দলে,
ষণ্ডের সেথা শিঙ ভাঙে আর গণ্ডার হয় শ্রান্ত,
ছুটোছুটি ক'রে বন্যবরাহ হয়ে যায় দিক্‌ভ্রান্ত ।
জগদীশ্বর ! আমি যে করেছি অতি অদ্ভুত পণ—
জয়-কুণ্ডল দখল করব, করব না কোন রণ ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব ;
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব ।

বড়দের লীলা করব পণ্ড, ছোটদের খেলা চুকাব,
কাঁকড়া-পাড়ায় নিরীহ-বিবরে লোমশ-লেজুড় ঢুকাব ;
মুখে ঝুলে-পড়া নরম খাবার ভেবে
অতিলোভে যেই কুটুস-কামড় দেবে,
তখনি হঠাৎ লেজটি তুলেই সজোরে ঝাপট ঝাড়ব,
মহাউল্লাসে সব ক'টাকেই আছড়ে আছড়ে মারব ;
পরমেশ্বর ! তোমারি প্রসাদ তারা যে আমারি তরে
চিবিয়ে চিবিয়ে খাব যে তাদের পরমানন্দভরে ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব ;
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব ।

ফাঁসি মেরে ফেলে ছাগলগুলোর চামড়ায় চুন মেখেছি,
তাই দেখিলেই টাঁকশাল-খাওয়া টাকার কুমীরে ডেকেছি
তার সাথে মোর সন্ধি-সন্ধি ভাব,
সেও ভাবে তার হবে খুব লাভ ;
পোষা-ছাগলের পাল পেয়ে যাবে, সুখে ভক্ষণ করবে ;
আমি জানি, সে তো চুন-ঠাসা ঠুলি খেয়ে অকালে মরবে ;

হে ইচ্ছাময় ! তোমারি ইচ্ছা তখন পূর্ণ হবে ;
তার পেটকাটা সোনারূপোগুলো সবি তো গর্ভে র'বে ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

তেড়াপল্লীতে লাফিয়ে পড়েছে, কিছু বুঝি খেতে পায় না,
হ্যাংলামি তার বড় বেড়ে গেছে, হয়েছে হায়না !
আমার কাছেই চালাকি শিখে সে
আমারি ঘাঁটিতে হানা দেয় এসে,
আক্কেল তার গুড়ুম করব, দেখাব ঘোড়ার অণ্ড,
তেড়াগুলো সব শেষ ক'রে তাকে খাওয়াব হাড়ের খণ্ড ;
বিপদবারণ ! তোমার বরেই হয়ে যাব আমি পার
বিপদের যত নালা-নর্দমা, বিপদের পারাবার ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

আমি পেচকীর নিশাচর সখা, আমি শকুনীর বঁধুয়া,
ভালুকীর সাথে ভাব ক'রে খাই মধুচক্রের মধুয়া।
অতি অনায়াসে মেনে গেছে পোষ
বুনো মুর্গী ও বুনো খরগোশ,
মোর প্রচারক কুকুর পাঠিয়ে শেখাই তাদের ধর্ম,
বোঝাই তাদের আমার উদার হুকাহুয়ার মর্ম ;
হে দয়ালপ্রভু ! তোমারি অপার দয়ায় তাদের পাই
তোমারি দয়ায় যখন তখন যেটাকে সেটাকে খাই ;
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

ছলে-কৌশলে সমরে নামাব ছুই মহাবল-পশুরে,
আমার স্বর্গ কেড়ে নিতে চায় শুধু ঐ ছুটো অসুরে।

তাদের শিরায় সংগ্রামশিখা জ্বালি
বর্ম কাড়ব সে-গুড়ে যেথায় বালি,
মোর লাঙ্গুল সঙ্কেতে তারা হবে যে ভীষণ ক্রুদ্ধ,
ভব-কান্তারে শুরু হয়ে যাবে সিংহ-বাঘের যুদ্ধ;
ভগবান! তারা করবে ধ্বংস দুইজনে দুজনাকে,
আমি পেয়ে যাব তাদের মুখের নধর হরিণটাকে
আমি চিরকাল শৃগাল হয়েই থাকব,
পাকাবুদ্ধির বাঁকাবাঁশবনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।

নিশিকান্ত

সংবাদ-সাহিত্য

সাহিত্য-চর্চা সাময়িক প্রয়োজনে বর্জন করিয়া আমাদের মত আদার ব্যাপারী যাহারা পলিটিক্সের জাহাজ চালাইবার প্রয়াস করিয়াছিল, গণপরিষদের গ্রুপ আর সেকশনের চড়ায় তাহাদের জাহাজীবুদ্ধি বানচাল হইতে বসিয়াছে,—১৬ মে আর ৬ ডিসেম্বর বিলাতের বৈঠক আর কংগ্রেস কার্যনির্বাহক-সমিতির বৈঠক, জিন্না আর গান্ধী; আসাম আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সব কিছু মিলিয়া মাথার মধ্যে এমন তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে যে এখন মনে হইতেছে, সেকশন নাইন্টিথি ই আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল। কংগ্রেস কাঃ নিঃ সঃ ৬ ডিসেম্বরের সিদ্ধান্তকে কেন মানিয়া লইতে চাহিতেছেন, গান্ধীজীই বা আসামকে গ্রুপ ভাঙিয়া স্বাধীন হইবার পরামর্শ কেন দিতেছেন, বাংলার শরৎচন্দ্র বসুই বা অভিমান করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন কেন, মুসলিম লীগই বা পাকিস্তান হইতেছে ভাবিয়া উল্লাস কেন করিতেছেন—এই সব কূট প্রশ্নের সমাধান যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারা আমরা নহি; আমরা একটি সহজ সরল সত্য শুধু অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিতেছি যে, আমরা হিন্দু বাঙালীরা গেলাম, লীগ-দরগায় জবেহ হইবার জন্য আমরা উৎসর্গ হইয়াই আছি; আসামীরা আমাদের সঙ্গে ফাঁসি যাইবে কি না তাহা লইয়াই গোল বাধিতেছে। বাংলা দেশে আমাদের ভাগ্যই এইরূপ! যে যুক্তিতে $\frac{১}{৪}$ মাইনরিটি মুসলমানেরা ভারতবর্ষে সেফগার্ড খুঁজিতেছে, ঠিক সেই যুক্তিতেই ৪৫ মাইনরিটি বাঙালী হিন্দুদের মৃত্যু অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে; ইহাই আমাদের বিধিলিপি এবং এই বিধিলিপি আমাদিগকে মানিতেই হইবে।

মানিতেই হইবে, কারণ বাঙালী হিন্দুর বর্তমানে কোনও সক্ষম নেতা নাই। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের সময় তাঁহারা যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন মরিতে মরিতেও আমাদের কিছুটা সান্ত্বনা এই ছিল যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হইয়া আমাদের নেতারা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ পরিষ্কার করিতেছেন, আমরাও মরিয়া হাজিয়া তাঁহাদের জয়যাত্রায় পথ সুগম করিতেছি। আমরা মরিলাম, তাঁহারাও মুক্ত হইয়া আসিলেন; কিন্তু বাংলা দেশের ভাগ্যে যে তিমির সে তিমিরই রহিয়া গেল। বাকি ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার অভিযানে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল, বাংলা দেশ তখন বঙ্গগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামকীর্তন করিয়া কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করিল। কিন্তু সে কাজ বেশিদিন করা যায় না, প্রত্যক্ষ কাজের বেলায় বাঙালীর যখন ডাক আসিল না, তখন আমরা হতাশ হইয়া পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিলাম, অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আসিয়া আমাদের সেই লজ্জাকে আরও বাড়াইয়া দিল। বাংলা দেশের হতভাগ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনের বল ফিরাইয়া আনিবার জন্য বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধী সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন, আমরা অনাথ-আশ্রমের বালকদের মত তাঁহার সঙ্গে ছবি তুলিয়া দৈনিক পত্রিকায় ছাপাইয়া গৌরব অনুভব করিলাম; কিন্তু এদিকে লীগের দৃঢ় ও অটুট শাসনে আমাদের ধর্ম কর্ম শিক্ষা সাহিত্য ব্যবসায় বাণিজ্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে নিপাত যাইতে বসিয়াছে। লীগ কর্তৃপক্ষ বিদায়ী ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া ল অ্যাণ্ড অর্ডার ও কন্ট্রোলের নামে এমন বিসদৃশ নিঃশব্দ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বেশিদিন এইভাবে চলিতে থাকিলে আমাদিগকে বাংলা দেশে আর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া চলিতে হইবে না; লীগের তাঁবেদারি না করিলে আমাদের দৈনিক অন্নবস্ত্রের সংস্থান হওয়াও কঠিন হইবে। চালে তেলে পরিধেয় বস্ত্রে সিমেন্টে লোহালক্কড়ে মায় বন্দুকে পর্যন্ত সরবরাহের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত বাংলা সরকার করিতেছেন যে, অদূরভবিষ্যতে ঘুষে ও ঘুষিতে সর্বস্ব খোয়াইয়া আমাদিগকে নেংটি পরিয়া সাঁওতাল পরগণা অথবা বিহারে পলাইয়া শেষরক্ষা করিতে হইবে।[৮] কারণ গোড়ায় গলদ নিবারণের জন্য আমাদের নেতারা কেহই আগাইয়া আসিলেন না। লীগের এই মারাত্মক শাসনে আমাদের দুরবস্থা, কি

করিতে পারি, প্রতিকার যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহারা তৎপর না হইলে সমস্তই বৃথা হইবে।

* * *

মিঃ শামসুদ্দীন আহ্‌মদ বর্তমান লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান, লীগের শাসনে বাংলা দেশের কৃষক-প্রজাদের কি সর্বনাশ সাধিত হইতে চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়া তিনিও সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুদের সর্বনাশ যে আরও গভীর ও ব্যাপক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি বলিয়াছেন—

"বিগত ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তদানীন্তন গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট বর্তমান লীগ মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্র-বাদী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যেমন একটা কলঙ্কের কথা, এই মন্ত্রিসভার কার্যতঃ ভারতের ইতিহাসেও তেমনি কলঙ্ককালিমাময় এক অধ্যায়েরই যোজনা করিয়াছে। কিরূপভাবে এই মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যাবলী দেশকে উৎসন্নের পথে নিয়া চলিয়াছিল, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। এই লীগ মন্ত্রিসভার অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থার ফলেই এত বড় একটা দুর্ভিক্ষ দেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে পারিয়াছিল। বর্তমানে দেশের জনসাধারণের সমর্থন হারাইয়াও কিরূপে এই প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্ট কার্য করিতেছে, তাহা গণতন্ত্রের এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সংগঠনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার এবং ইহাকে অনেকে greatest political fraud বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। তাহা হইলেও এই অদ্ভুত কাঠামোর ভিতরও যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই ইহার চলা উচিত ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা যেমন গণতন্ত্র-বিরোধী, অনাস্থামূলক প্রস্তাবে ইহার পৃষ্ঠপোষকতাও তেমনি সাধারণ সৌজন্যহীন। এইরূপ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থের খাতিরে এবং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহারা কোন রকমে বহাল তবিয়তেই দিন কাটাইতেছেন এবং পদে পদে ন্যায়পরায়ণতা কর্তব্যনিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীলতা বিসর্জন দিয়াই তাঁহারা চলিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ আচরণের একটা কারণ আছে। জনগণের উপর যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও কর্তব্য-পরায়ণতার নীতিবাক্য তাঁহাদের নিকট অর্থহীন। কারণ এই সকলের প্রতি কর্ণপাত করিতে গেলে যে চোরাবালির উপর তাঁহাদের আসন প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে ধসিয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ উৎকোচ ও অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা চলিয়াছেন—বিশ্ববাসীর নিকট সমগ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থপর অস্বাভাবিক প্রতিপন্ন করিবার কুৎসিত প্রয়াসও তাঁহারা বাদ দেন

নাই। তাঁহাদের অক্ষমতা, অদূরদর্শিতা এবং স্বার্থপরতাই যে দেশের চরম সঙ্কটের মূল কারণ—তাঁহাদের ভ্রান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির ফলেই যে লক্ষ লক্ষ লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, ইহা আমরা পরিষদকক্ষে, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চে এবং সংবাদপত্রে বহুবার প্রমাণিত করিয়াছি এবং দেশবাসীর নিকটও আজ আর ইহা অবিদিত নাই। জনসাধারণকে রক্ষা করা রাজধর্ম; ইহা ষ্টেটের কাজ—দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টের কাজ। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী পদে পদে সেই দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়াছেন—পদে পদে যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন।

সুশাসনের উপাদান কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রাচীন চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস বলিয়াছিলেন, "প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, অজিত সামরিক ক্ষমতা ও শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি দেশবাসীর আস্থা, এই তিনটিই সুশাসনের অপরিহার্য উপাদান। দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতা, আর সুশাসনের ব্যতিক্রম ঘটিলে সম্পদ ও সম্মানে লজ্জার বিষয়।" আমাদের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যেমন চরম দারিদ্র্য এবং দেশবাসীর চরম দুর্গতিতেও লজ্জিত নহেন, তেমনি নিজেদের সম্পদ ও সম্মানেও কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। দেশবাসীর যে আস্থা গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার মূলভিত্তি এবং যাহা সুশাসনের অন্যতম উপাদান, তাহা হারাইয়াও বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কাজেই ইহা জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট নহে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনরূপ সম্ভবও ইহার নাই; যে মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষমতার দায়িত্বহীন প্রয়োগের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী তাহাদেরই ক্রীড়নক মাত্র। এই মন্ত্রিমণ্ডলী এই অল্পকাল মধ্যেই দেশে কিরূপ বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিয়াছেন এবং দেশকে কোন্ দিকে লইয়া চলিয়াছেন, সেই বিষয় অবহিত হইয়া চলিবার দিন দেশবাসীর বহিয়া যাইতেছে। আমরা যাহারা রাজনৈতিক জগতে, এমন কি শাসন-পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কাজ করিতেছি, জনসাধারণকে এই অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করাইবার একটা দায়িত্ব আমাদেরও আছে বলিয়াই আমি মনে করি।

বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান দেশ—কৃষকেরাই এই দেশের মেরুদণ্ড। অথচ এই মেরুদণ্ডই আজ ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং সেদিকে গভর্ণমেণ্টের কোনই দৃষ্টি নাই। এই দুর্যোগের মুখোমুখী বসিয়াও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক তীব্রতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, নিজেদের বাহাদুরী প্রচারের জন্য নিত্য নূতন ফন্দি বাহির করিতেছেন। "ফসল বাড়াও" আন্দোলনে কি পরিমাণ জমি নূতন আবাদ করা হইয়াছে এবং কি পরিমাণ শস্য ইহাতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রচার করিতেই তাঁহারা ব্যস্ত। কিন্তু পল্লী-জীবনে বিপর্য্যয়ের ফলে কি পরিমাণ আবাদী জমি পতিত থাকিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি তাঁহারা দৃক্‌

স্বার্থের প্রতি উদাসীন, কৃষকদের কোনরূপ উন্নতি সাধন তো দূরের কথা, তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতেও অসমর্থ। তাঁহাদের এই অদূরদর্শিতা ও ঔদাসীন্যের ফলে বাংলার কৃষকগণ উৎসন্নের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কৃষিব্যবস্থায় বিপর্যয় আসিয়াছে এবং যে পুঞ্জীকৃত ঋণ-ভারে তাহারা বহুকাল পীড়িত, তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া তাহাদিগকে দ্রুত এবং নিশ্চিত বিনাশের দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে।

এই যে অবস্থা, এই যে নিশ্চিত বিনাশের মুখে তাহারা ছুটিয়া চলিতেছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার উপায় কি? বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে ইহার যেটুকু প্রতিকার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ইহার একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণের আস্থাসম্পন্ন দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা। এইরূপ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে হইলে যে মন্ত্রিমণ্ডলী এখন বাংলার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত বিরাজ করিতেছে, তাহার অবসান ঘটাইয়া সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা আশু কর্তব্য এবং বাংলার পল্লী-জীবনের সমস্যা-গুলির সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, বাঙালীকে বাঁচাইবার জন্য যাহাদের প্রকৃত প্রাণের দরদ আছে, বাংলা দেশকে যাহারা প্রকৃতই আপনার বলিয়া জানে, সেইরূপ লোকের মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া উচিত।"

* * *

এই অবস্থার প্রতিকার কিভাবে হইতে পারে, সমস্ত বাঙালী হিন্দুর এ বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। সম্প্রতি বাংলা দেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া "পশ্চিম-বঙ্গ" নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—

(১) যেহেতু বাঙালী হিন্দুর একটি বিশিষ্ট নিজস্ব সংস্কৃতি আছে এবং যে সংস্কৃতি জগতের কৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান দিয়াছে এবং বাঙালী হিন্দুরা আত্মোন্নতি ও আত্ম-প্রকাশের সুযোগ সুবিধা না পাইলে তাহাদের জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে এবং যেহেতু বাংলার মুসলিম লীগের সংখ্যাধিক শাসনাধীনে বাঙালী হিন্দুর ধন প্রাণ, স্বার্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও নারীর মর্যাদা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে, এবং যেহেতু বাংলার লোকসংখ্যাধিক্য কার্যকরী শাসনের পক্ষে অত্যন্ত বাধক হওয়ায় এবং সাম্প্রদায়িক নীতিতে শাসন-কার্যের জন্য লোক নিযুক্ত হওয়ায় সাধু, অপক্ষপাতী উপযুক্ত শাসন-প্রণালীর অভাব ঘটিয়াছে এবং যেহেতু বাংলার বর্তমান লীগ গভর্নমেন্ট সমগ্র জাতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ভারত গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতেছে না, তজ্জন্য এই সম্মেলন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয়

ভারতীয় ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের অধীনে পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হউক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগদ্বয়, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, রাজসাহী বিভাগের পশ্চিমাংশ ও বাংলা-ভাষাভাষী পূর্ব-বিহারের হিন্দু অংশগুলি লইয়া বাঙালী হিন্দুদের জন্য এই প্রদেশ গঠিত হউক।

যাহাতে বাঙালী হিন্দুর প্রতিভা ও সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশের স্থান পায় এবং নিকটবর্তী মুসলমানপ্রধান দেশে অবস্থিত হিন্দুগণও এই প্রস্তাবিত প্রদেশ হইতে সাহায্য পায়, সেইজন্য এই সম্মেলন উপরোক্তভাবে একটি স্বতন্ত্র পশ্চিম-বঙ্গ প্রদেশ গঠনের জন্য দাবি জানাইতেছে।

(২) এই সম্মেলন আরও দাবি জানাইতেছে যে, ভারতীয় গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনের সময়েই যেন এইরূপ একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়।

(৩) এই সম্মেলন আরও দাবি জানাইতেছে যে, বাংলা হইতে নির্বাচিত যে সমস্ত হিন্দু এবং জাতীয়তাবাদী সভ্য ভারতীয় গণপরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা যেন কোনমতেই "সি" সেকশনে যোগদান না করেন, যেহেতু সেখানে মুসলীম লীগ নিরপেক্ষ-সংখ্যাধিক্যের জোরে হিন্দুগণের গভীর স্বার্থের বিরোধী যে কোন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে।

(৪) এই সম্মেলন পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতি গঠন সমর্থন করিতেছেন।

(৫) এই সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক সমিতির গঠনতন্ত্র এই সম্মেলন অনুমোদন করিতেছেন।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি, ডক্টর প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তিরা এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সভ্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। কিন্তু আমরা কিছুতেই, সর্বনাশ আসিয়াছে বলিয়া অর্ধেক ত্যাগ করিবার এই পণ্ডিতী নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের ধনেপ্রাণে বলি দিয়া আজ পশ্চিম-বঙ্গের আত্মরক্ষা করিবার উপায় নাই। এই সর্বনাশা আন্দোলন না চালাইয়া অন্য উপায়ে বাংলা দেশকে সমগ্রভাবে রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে এই কার্যে বহু মুসলমানেরও সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। মিঃ শামসুদ্দীন আহমদের মত লোকও তো লীগে আছেন।

ডক্টর কালিদাস নাগ যদি কবি কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা "উপমা কালিদাসস্য" এই বাক্যটির পরিবর্তে "গবেষণা

কালিদাসত" বাক্যটি অর্জন করিতাম। বর্ত্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্মকথা" বিষয়ক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গবেষণার কিঞ্চিৎ স্বরূপ একটি ফুটনোটে উদঘাটিত করিয়াছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরের পত্রিকার একটি সংখ্যাকে প্রথম বৎসরের (১৮৬৮) একটি সংখ্যারূপে চালাইবার চেষ্টা গবেষক কালিদাস যে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া করিয়াছেন, সেই বুদ্ধি দলিলদস্তাবেজে প্রযুক্ত হইলে তিনি আজ সহজেই অর্ধেক কলিকাতার মালিক হইতে পারিতেন। মশা মারিতে কামান দাগার এই প্রয়াসে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

—

অব্যাপারেষু ব্যাপার করিতে গিয়া আমরা পুনরায় বিপন্ন হইয়াছি। নোয়াখালি শ্রীরামপুরে গান্ধী তাঁবু হইতে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু ৩১।১২।৪৬ তারিখে লিখিয়াছেন—

"তুমি অগ্রহায়ণ মাসের "সংবাদ-সাহিত্যে"র ১৫৫ পৃষ্ঠায় যা লিখেছ, তারপর একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। লীলা দেবীর National Service Institute এখানে ভাল কাজ করছেন, আমাদের আখড়া থেকে ১০ মাইল দূরে, অতএব সংবাদ খাঁটি। এটুকু তোমায় জানিয়ে রাখি।"

রিপোর্ট দৃষ্টে অবগত হইলাম. এন. এস. আই. কমপক্ষে এক হাজার লোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অপহৃতা নারীও আছেন। শ্রীমতী বীণা দাসের পক্ষেও একটি প্রতিবাদ পাইয়াছি। তাঁহার দলের শ্রীযুক্তা কমলা দেবী সেখানে অনেক কাজ করিতেছেন।

—

এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানির হিন্দুস্থান, পপুলার, জুয়েল ও পকেট ডায়েরি, এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেডের সরকার ও লিটল্ ডায়েরি এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের ডায়েরি দৈনন্দিন সর্ববিধ প্রকাশযোগ্য কাজে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইয়াছি। বাঙালী জাতির ঘরে ঘরে এই সকল ডায়েরির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে আশা করি

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাঠকগণের মনে মনীষীপ্রবর প্রিয়নাথ সেনের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার রচনার সহিত আধুনিক বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যিক অপরিচিত। এই পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁহার গদ্যরচনাবলী 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> "প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল।...তাঁর যেসব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে।...বাংলা সাহিত্যে আমি যখন তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য।...সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোরবয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি।..."

পরিশিষ্টে, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ছয়খানি ও রবীন্দ্রনাথের উনিশখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে, এগুলি এখনো অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। প্রমথ চৌধুরী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখিত প্রিয়নাথ সেনের চরিতকথাও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের কয়েকটি চিত্রে শোভিত, অ্যান্টিক কাগজে ছাপা, সুদৃঢ় বাঁধাই, পৃ. ৩২২, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বিশ্বভারতী

২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

কুন্তলশ্রীর স্নিগ্ধ মন্দাকিনী
কাঞ্চন
কাবেরী
বসন্ত মল্লিকা
প্রিয় কেশ তৈল
কোণার্ক কেমিক্যাল

সূচী

ফাল্গুন ১৩৫৩

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

ভৃঙ্গামলা ★

উচ্চাঙ্গের কেশ তৈল

ভৃঙ্গরাজ ও আমলা দুইটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপাদানের একত্রিভূত শক্তিশালী কেশ রসায়ন। ইহা একটী নবতম অবদান। প্রকৃত গুণ সম্পন্ন এই উচ্চশ্রেণীর কেশতৈল একাধারে ঔষধি ও প্রসাধনী। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও যাবতীয় শিরোরোগ ও কেশরোগ নিবারণে ইহা অতুলনীয়। ইহার মৃদু-মদির-সুরভি চিত্ত বিনোদক, দীর্ঘস্থায়ী। বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত।

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

তন্বী তরুণীর
তনুর মহিমা অতুলন করে
ক্যালকেমিকোর
রেণুকা
স্নিগ্ধ টয়লেট পাউডার
লাবনী
স্নো এবং ক্রীম
তুহিনা
কোমল অঙ্গের বিউটি মিল্ক
ক্যালকাটা কেমিক্যাল

এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন?
Saridon
সারিডন
মাত্র দশ মিনিটেই
সমস্ত বেদনা দূর করে

কুন্তলশ্রীর স্নিগ্ধ মন্দাকিনী
কাঞ্চন
কাংবরী
বসন্ত মল্লিক
প্রিয় কেশ তৈল
কোণার্ক কেমিক্যাল

জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যাণ্ড পাব্লিশার্স লি

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

ডায়াপেপসিন

ডায়াস্‌টেস্‌ ও পেপসিন্‌ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপসিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াস্‌টেস্‌ ও পেপসিন্‌ দুইটী প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান খাদ্যের সহিত চা-চামচের এক চামচ খাইলে একটি বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া সৃষ্ট হয় যাহা খাদ্য জীর্ণ হইবার প্রথম অবস্থা। ইহার পর পাকস্থলীর কার্য অনেক লঘু হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা

No ৫

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৩

সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী

১

সাহিত্যে যাহা স্থায়ী ও সঞ্চারী, জগতে ও জীবনে তাহাকে এক হিসাবে বলা যায়—শাশ্বত ও চলমান, অথবা স্থিতি ও গতি। শব্দ দুইটির সম্পর্ক হয়তো খানিকটা আপেক্ষিক, অর্থও হয়তো মানুষের যুগানুগ ধারণা-অনুযায়ী কতকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহা বলিলেই উহাদের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না; কিঞ্চিৎ বিশদ বিশ্লেষণের আবশ্যকতা থাকে।

স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? সঞ্চারী কি? অস্থায়ী ও সঞ্চারী না হইলে স্থায়ীর অভিব্যক্তি ও আস্বাদন সম্ভবপর কি? চলমানের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন শাশ্বতের প্রকাশ ও উপলব্ধি হইতে পারে কি? গতি না থাকিলে স্থিতি-তত্ত্বের অর্থ হয় কি প্রকারে? অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যু অতিক্রম করিতে না পারিলে বিদ্যা দ্বারা অমৃত-লাভ ঘটে কি? ভাবের ন্যায় রসেরও স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপ আছে কি? স্থায়ী ভাব হইতে রসোৎপত্তির ন্যায় সঞ্চারী অথবা ব্যভিচারী ভাব বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা হইতেও অবস্থাবিশেষে রসোৎপত্তি হইতে পারে কি? সঞ্চারী না থাকিলেও অবস্থাবিশেষে কেবল স্থায়ী ভাব হইতে রসাস্বাদন হয় কি? স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ ভাবের ন্যায় দীপ্তিগুণজাত রম্যার্থেও লক্ষ্য করা যায় কি? সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী সম্পর্কে এইরূপ অনেক প্রশ্নই উঠিতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়গুলি আলোচনার ভূমিকা রচনা করা হইতেছে মাত্র।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যকে বলা হইয়া থাকে, "the core and spirit of both history and philosophy"—ইতিহাস ও দর্শন উভয়েরই মর্মবস্তু এবং আত্মা। আধুনিক কবি ডি. এস. স্যাভেজ বলেন, "The mind and spirit of an age survive mainly in its literary expression, through books"—যুগের মন ও আত্মা তাহার পুস্তকগত সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়াই প্রধানত বাঁচিয়া থাকে। তাহা হইলে মানব-সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ তাহার সাহিত্যে। এই সাহিত্য শব্দার্থের আশ্রয়ে পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে।

আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ রামায়ণে ঘোষণা করা হইয়াছে—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।"

—যতকাল পৃথিবীতে পর্বতমালা ও নদনদী বর্তমান থাকিবে, ততকাল লোক-সমাজে রামায়ণ-কথাও প্রচারিত থাকিবে।

মহান্ এবং ভারবান্ মহাভারতের মহাকবি ওই বিপুল কাব্যগ্রন্থকে তুলনা করিয়াছেন ভারতবর্ষের মহাসমুদ্র ও হিমালয়-পর্বতের সঙ্গে,—

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা বা হিমবান্ গিরিঃ।"

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, "রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।" এই কাব্য-যুগলের কি সে মহিমা, যাহার বলে হিমালয়ের ন্যায় তাহারা শাশ্বত রূপ-বিশালতা লাভ করিয়াছে, জাহ্নবীর ন্যায় নিত্যকাল অক্ষয় রসধারা প্রবাহিত করিতেছে! এই কাব্য-যুগলের স্থায়িত্বের কারণ কোথায়? সেই যুগ আর এই যুগের মানব-সাধারণের চিত্ত-ভূমিকে সমান বলে আলোড়িত করিতেছে, সে কি শক্তি? দীর্ণ ভূমির অন্তর হইতে একই আনন্দ-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত করিতেছে, সে কোন্ সত্য? সে যুগ ও এ যুগের কবি ও সমাজ-চিত্তে তুল্যরূপী সহজ ধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি? মহাসমুদ্রের অবিরাম স্পন্দনের ন্যায় মহামানবের হৃৎস্পন্দন বলিয়া কিছু আছে কি? মহামানবের মহাপ্রাণের বিরাট স্পন্দন দূর—অতিদূর যুগে যেমন, আজও কি তেমন করিয়া স্পন্দিত হইতেছে? শুনিতে পান যিনি, তাঁহার হৃদয়ে সে স্পন্দনের প্রতিস্পন্দন জাগে? ধরিত্রীর বুকে ফোটে ফুল, বয় ঝরনা, শ্যামল শস্যাঞ্চল অঙ্গে থাকে লীন, ছয় ঋতুর নব নব সঞ্চারে অন্তরে জাগে নব নব পুলক-সঞ্চার। সে যুগেও যেমন, এ যুগেও তেমন। ধরণীর গূঢ় গভীর ভূমিষ্ঠ প্রাণশক্তির ন্যায় বিশ্বমানবের হৃদয়াভ্যন্তরে মানবের নিত্য স্ব-ধর্মরূপে এমন কি শক্তি রহিয়াছে, যাহাতে যুগে যুগে কাব্যে কথায় শিল্পে কলায় তাহাকে আমরা সহজেই আপনার বলিয়া চিনিতে পারি? বহু বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগের কবি আধুনিক পাঠককে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনাইয়া সেই শাশ্বত রাগিণীরই ইঙ্গিত করিতেছেন। দ্বিধা-ভিন্ন ধরণীর অন্তরে অদর্শন হইলেন জানকী। তারপর—

"সে সকল দিন সেও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।"

আবার দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পর মহাভারতের মহাঘটনার অবসান হইয়া গেল। কালক্রমে—

"কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমরসাগর

গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্‌,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে ॥"

স্বয়ং ভবভূতি তো তাঁহার কাব্য-সম্বন্ধে আপন যুগের নিষ্ঠুর বিমুখতা দেখিয়া তাকাইয়াছিলেন কেবল বিপুলা পৃথ্বী নয়, নিরবধিকাল, দূর ভবিষ্যতের দিকে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—ভারতবর্ষে একই ধর্ম, একই সমাজবোধ ও সংস্কৃতির বহমান ধারায় অতীত যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন রহিয়াছে। এই সকল অবস্থার পরিবর্তনে আমরা প্রাচীন সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে পারিব না। মহাকবি গেটে মহাকবি কালিদাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধর্ম ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতায় পুষ্ট হইয়া শকুন্তলা নাটকের রস অমন করিয়া গ্রহণ করিলেন কি করিয়া? কেবল কবিগত সাধর্ম্যের কথা বলিলেই ইহার উত্তর হয় না। তাহার চাইতেও গভীরে মানব-প্রকৃতির সহজ ও শাশ্বত ধর্মের কথা—মানবচিত্তের স্থায়ী ভাব ও বোধের কথা বলিতে হয়।

পাশ্চাত্য দেশে বলা হয়—Eternity is Homer—চিরন্তন হোমর। কোনও গ্রন্থকার বাঁচেন পাঁচ বা দশ বৎসর, কেহ বা পঁচিশ বৎসর; শতায়ুঃ যিনি, তিনি ভাগ্যবান্‌; কেবল হোমরই চিরন্তন। হোমরের যুগের সে পেগান ধর্ম নাই, সে যুগের দেবদেবী আজ পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া গিয়াছে। সে সমাজ-সংস্থিতিও নাই। কিন্তু কই ইলিয়ড কাব্যের আদর তো একটু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই! একিলিসের ক্রোধভাব আজিও ইউরোপের খ্রীষ্টধর্মী পাঠকবর্গের চিত্তে সমানভাবেই আলোড়ন তুলিয়া থাকে। ফেরদৌসির শাহনামা প্রাক্‌-মুসলমান যুগের কাহিনী। সে যুগের ধর্ম-বিশ্বাস সর্বপ্রকারেই ইসলামের ধর্মবোধকে আঘাত করে। কিন্তু আশ্চর্য! মহাকবি ফেরদৌসির জন্মভূমি কেবল পারস্য দেশের নয়, হিন্দুস্থানের মুসলমানগণও সে কাব্য-পাঠে উল্লসিত হয়, গৌরব বোধ করে। কাজেই বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর স্থায়ী কাব্য

মানবের এমন সাধারণ সহজ চিত্তভাব লইয়া রচিত হয়, যাহা মানবের স্পষ্ট ধর্ম ও সমাজ-রূপের ঊর্ধ্বে। এই ভাব বা বোধগুলি মানবের চিত্তে গূঢ়রূপে নিত্য বহমান, তাহারাই মানবের আসল মানবত্ব, মানবের সহজ ধর্ম বা স্বভাব, তাহারাই স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাব অবলম্বনে রচিত প্রকৃত সাহিত্যই স্থায়ী সাহিত্য।

দান্তে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে কবি শেলি মন্তব্য করিয়াছেন—"A great poem is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and age has exhausted all its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight."—মহৎ কাব্য যেন এক প্রস্রবণ, নিত্যকাল তাহা হইতে প্রজ্ঞা ও আনন্দের সলিল উচ্ছ্বসিত হইতেছে; এবং এক ব্যক্তি ও এক যুগ তাহার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করিলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—উহা এক অদৃষ্ট-পূর্ব এবং অচিন্তিত-পূর্ব আনন্দের উৎস।

কবি শেলির মন্তব্য যথার্থ, বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ব্যঞ্জনা-ধর্মেও যেখানে ব্যক্তি ও যুগের নব নব সম্বন্ধানুযায়ী কাব্যের নিবিড় আস্বাদন সম্ভবপর হয়, সেখানে এই অস্থায়ী ব্যক্তি ও যুগের সম্বন্ধের অতীত স্থায়ী বস্তু কিছু রহিয়াছে, তাহার আলম্বনেই কাব্যের এই বিচিত্র লীলা-বিলাস চলিতে থাকে। অভিসারিকা বা অভিমানিনী উভয়েই যেখানে তৃপ্তি পায়, সেখানে উভয়ের আলম্বন-ভূত স্থায়ী প্রেমভাবের কথা বুঝিতে হইবে।

মনস্বী কার্লাইল যেন শেলির উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"The latest generations of men will find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own human being.—মানবের দূরভবিষ্যৎ পুরুষও শেক্স্‌পীয়রের মধ্যে আবিষ্কার করিবে—নূতন অর্থ, তাহাদের নিজ মনুষ্যসত্তার স্বচ্ছ ব্যাখ্যান।

এখানেও আমরা বিশ্বমানবের মূলীভূত এক মহাভাবের আকর্ষণ উপলব্ধি

করি আগে, এই মহাভাবই স্থষ্টির স্থায়ী ভাব, তাহারই অবলম্বনে ব্যঞ্জনা-শক্তির নব নব উল্লাস ঘটিতে থাকে। কবি ডি. এস. স্তাভেজ তাঁহার *The Personal Principle* নামক সুলিখিত গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, শেক্স্‌পীয়রের সময়ে ব্যক্তিই ছিল সমাজের প্রকৃত কেন্দ্র, সভ্যতার অগ্রগতির সহিত কেন্দ্র এখন সরিয়া গিয়াছে, সমাজের বহির্গঠন এখন আর সাক্ষাৎভাবে ব্যক্তি-পুরুষের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শেক্স্‌পীয়রের নাট্যসমূহে আমরা এক 'living soul'-এর গভীর স্পর্শ পাই বলিয়া আজিও সে সকল আদরের সহিত পঠিত ও অভিনীত হইতেছে। এই সমালোচকের মতে খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসনবন্ধন শিথিল হইয়াছিল বলিয়াই এই 'living soul' বা জীবন্ত আত্মার প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। আমরা বলিব, তৎকালীন ধর্ম ও সমাজের এবং আরও নানা প্রকারের আরোপিত প্রভাব অতিক্রম করিয়া সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ চিত্ত লইয়া কবি শেক্স্‌পীয়র অন্তরে ও বাহিরে বিশ্বমানবত্বকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় কালজয়ী স্থায়ী লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কেও ওই একই মন্তব্য করা চলে।

বিষয়টি স্বচ্ছ করিয়া বুঝাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে। নিত্যকালের সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ। জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্ত গড়িয়া লইতেছে।...সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই স্বজনকর্তা।...জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।... সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমানকালের জন্ত নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাহাদের লক্ষ্য।... এইজন্ত বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্য নিবেশ করিতে হয়।"

আমরা বলিতে চাই, যে মানবত্ব অর্থাৎ বিশ্বমানবত্ব সাহিত্যের স্বজনকর্তা, সেই মানবত্বই সাহিত্যের স্থষ্টির বিষয়। নতুবা নানা দেশের নানা কালের

মানবের মনে কবির সৃষ্টি রসের আবেদন আনে কি করিয়া? কবির চিত্তে বহির্জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া প্রবেশ করে। কবিচিত্তের বিশ্বমন বা বিশ্বমানবমন আবার পাকা জহরীর ন্যায় তাহা হইতে সেই সমস্ত উপাদানই গ্রহণ করে, যাহা নিত্যকালের ভাণ্ডারে অক্ষয়রত্নস্বরূপ। তাহা হইলেই প্রশ্ন আসে, সেই সহজ মানবত্ব বা বিশ্বমানবত্ব কি? কারণ তাহাই সাহিত্যে স্থায়ী। স্থায়ী উপাদানেই স্থায়ী সাহিত্য রচিত হয়। মহাকালের পরিদর্শনশালায় যে যে মূর্তি রূপে রসে অভিন্ন হইয়া মানবমনে মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহাদের দিকে চাহিলেই রহস্যের সন্ধান মিলে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রধান কথাই এক অখণ্ডতাবোধ। ব্যক্তি-জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের নিবিড় যোগ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানবসত্তা, সমগ্র জীবসত্তা লইয়া এক বিপুল একাত্মবোধ, ইহাই তাঁহার অখণ্ডতাবোধ। প্রতিভাকে তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বমানবমন। সেই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'আমি'র পরিচয়ে—

"ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।"

এই সর্বত্রগামী প্রতিভা বৈদিক ঋষি গৌতমের সত্যনিষ্ঠাকে অনবদ্য আধুনিক রূপ দিয়াছে। যে প্রকৃতি বৈদিক ঋষির শুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণলাভ করিয়া বাল্মীকি ও কালিদাসের সাধনায় নব নব ভাবের বিচিত্র স্পন্দনে আভরণের আবরণে মোহিনী রূপসী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তিনি বিশ্ব জুড়িয়া এক চিদাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা শুধু ঐতিহ্য-ধারার কালানুগ পরিপুষ্টি নয়, অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণতা নয়, ইহা বীজরূপ এক শাশ্বত স্থায়ী চিত্তভাবের বহুধা বিকাশ।

জননী গান্ধারীর মর্ম-ব্যথা ও ধর্ম-দৃষ্টিকে তিনি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। দেবযানীর সাহসী প্রেমকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কবি কালিদাসের মদনভস্মের অনুপম বিবরণকে নব নব ভাব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া পরম পূর্ণতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। অতীতের স্থায়ী ভাব পুরাতন নহে, নববেশে বর্তমানেও তাহা স্থায়ী ও নবীন। রামেন্দ্রসুন্দর, মহাভারততুল্য

মহাকাব্যের আর উদ্ভব হইবে না—ইহা বুঝাইতে গিয়াও সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই।"

স্থায়ী সাহিত্যের ভিত্তিই মানব-সাধারণের অন্তর্গূঢ় ভাবরাশি, তাহারাই সাহিত্যে স্থায়ী ভাব বলিয়া পরিচিত। কড্‌ওয়েল কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একটি সূক্ষ্ম তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হইতেছে—"Poetry is the nascent self-consciousness of man, not as an individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion."—কাব্য মানুষের উদ্ভিদ্যমান আত্মচেতনা, কিন্তু তাহার ব্যক্তিস্বরূপে নয়, অন্য সকলের সহিত সাধারণ ভাবসমূহের অংশীদারস্বরূপে।

কড্‌ওয়েলের অভিমতে কাব্যের অবলম্বন হইতেছে মানব-সাধারণের সহিত তুল্যরূপে অনুভূত ভাবরাশি। সর্বমানব-সাধারণ এই ভাবগুলিকেই বলা হয়—স্থায়ী ভাব। মহৎ কাব্যমাত্রই এক সামাজিক রচনা, সহৃদয় সামাজিকবর্গই তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। ব্যক্তির বিশিষ্ট বোধকে লইয়া কাব্য এবং উৎকৃষ্ট কাব্যই রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব কালে স্থায়ী সাহিত্য হইবে কি না বলা কঠিন। স্থায়ী সাহিত্য সাধারণত বহুজনের চিন্তাশ্রিত বহুজন-সম্মত সাহিত্য এবং তাহাই কালজয়ী সাহিত্য। এখানেও কঃ পন্থাঃ—প্রশ্ন হইলে উত্তর হইবে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজন শব্দের অর্থ মহান্ জন বা মহাপুরুষ নহে, বহুজন বা অনেক পুরুষ। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ এখানে কালক্রমাগত প্রাচীন ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, "বহুজনসম্মত যেব মার্গমনুসরেৎ।"—বহুজনসম্মত পথই অনুসরণ করিবে। "নৈকো ঋষি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—একটি ঋষিও নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে, এই উক্তি পূর্বে থাকায় প্রসঙ্গবলেই মহাজন অর্থ মহান্ জন বা ঋষি জন হইতে পারে না। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে, অতএব তাহাও দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং মহাজন অর্থাৎ বহুজন বা বহুতর জন যে পথে চলেন, তাহাই অনুসরণীয় পন্থা। আমরাও বলিতে চাই, স্থায়ী সাহিত্যের জন্য একটি বিশিষ্ট ভাবুক মনস্বীর অতিবিশিষ্ট ভাবনা অপেক্ষা বহুতর জনের চিন্তাধারী স্থায়ী ভাবরাশিই সমধিক গ্রহণীয়।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজে। আপন আনন্দে আপন মহিমায় ভরপুর হইয়া

আমাদের গভীর অন্তরে পরমাত্মার বাঁশী বাজে। সেই গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ চিদানন্দমূর্তি, তাঁহার আনন্দবাঁশী নিত্যকাল বাজে। শুনিয়াছে যে সেই মোহন বাঁশী, ছুটিয়াছে সে অন্তরপুরুষের অভিমুখে আত্মহারা হইয়া, আত্মহারা হইয়া পাইয়াছে সে পরমাত্মার পরমানন্দ। ঘুচিয়াছে তাহার পরিচিত পরিমিত ব্যক্তিত্বের বন্ধন, ভাঙিয়াছে তাহার চিদাবরণ, গলিয়া গিয়াছে তাহার চিত্তের মোহচঞ্চল রূপ। সুখদুঃখ-লোভমোহের ঊর্ধ্বে তাহার শুদ্ধসত্তার আনন্দপ্রদীপের তখন বাধামুক্ত উজ্জ্বল প্রকাশ। এ আনন্দে আর কুলবন্ধন, লাজবন্ধন কোনও বন্ধন নাই, কোনও সংস্কার নাই। ঋষির ভাষায় তাহার "পিতা হ পিতা ভবতি, মাতা হ মাতা, লোকা অলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদা।"—পিতা অপিতা হইয়াছেন, মাতা অমাতা, নাই তাহার স্বর্গলোক সুখলোক, নাই দেবতা, বেদরাশিও নাই। সর্বসংস্কারমুক্ত আনন্দঘনমূর্তি সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। ব্রহ্মানন্দ বা কাব্যানন্দ উভয়ই আত্মানন্দ, মাত্রায় ভেদ মাত্র। আমরা সবাই এই আনন্দের উপাসক, আনন্দের ভিখারী। ব্রহ্মের সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও এই আনন্দের খেলা, স্বরূপত যেন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন নিষ্কাম আনন্দের বিলাস।

এই আনন্দই মানুষের সহজানন্দ, আসল স্থায়ী। মানুষ যে মুহূর্তে তাহা পায়, সেই মুহূর্তে থাকে না তাহার জাতি-কুল-মান, ব্যক্তিত্বের বিচিত্রবোধ বিগলিত হইয়া যায়। স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত সংস্কারের অতীত চিত্তভাব যখন অপর চিত্তকে তন্ময় করিয়া সংস্কারের ঊর্ধ্বে উন্নীত করে, তখন সহজ মানুষ বা শাশ্বত মানুষের আত্মপ্রকাশের ফলে জাগে আত্মবোধ বা আত্মানন্দ। কাব্যপাঠে জাত বলিয়া ইহাকেই বলা হয়—কাব্যানন্দ। আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন সাধারণীকরণ। পাশ্চাত্যের মনীষীগণও নানা ভাবে এই ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। বার্গসোঁ বলিয়াছেন, আর্টের লক্ষ্য হইতেছে "to put to sleep the active powers of our personality,"—আমাদের ব্যক্তিপুরুষের কর্মচঞ্চল শক্তিগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা। তখনই প্রকাশ পায় আত্মানন্দ, প্রাচ্যেরা যাহাকে বলিয়াছেন, 'সত্ত্বঃপরনির্বৃতি' 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর', পাশ্চাত্যেরা বলিয়াছেন 'supreme happiness', 'joy forever', 'pure and eleveted pleasure'। এই আনন্দে আমাদের শুদ্ধ সত্তা সর্বদা ওতপ্রোত থাকে। যে সাহিত্য আস্বাদনে 'vision' বা 'প্রতিভানে'র ফলে

আমাদের বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার নব প্রকাশ ও উদ্বোধন হয়, তাহাই স্থায়ী সাহিত্য। সাহিত্যের যত গুণই থাকুক, মনোলোকের অতীত বোধময় আনন্দ সত্তার গভীর স্পর্শ না পাইলে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। এই স্পর্শই এক আনন্দময় আত্মোপলব্ধি।

পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানবিৎ সাহিত্যিক পণ্ডিত ওয়েল্‌স্‌ মানবজাতির বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"When we come to look at them coolly and dispassionately, all the main religious, patriotic, moral and customary systems in which human beings are sheltering to day, appear to be in a state of jostling and mutually destructive movement, like the house and palaces and other buildings of some vast, sprawling city overtaken by a landslide." *The outlook for Homo Sapiens*—শান্ত এবং নিরাসক্ত ভাবে যখন আমরা উহাদের দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, আকস্মিক ভূমি-পতনে আক্রান্ত এক বিশৃঙ্খল নগরীর গৃহ, প্রাসাদ এবং ভবনসমূহের ন্যায় মানবজাতির বর্তমান আশ্রয়-স্বরূপ ধর্ম, দেশপ্রীতি, নীতি ও আচার-সম্বন্ধীয় প্রধান ব্যবস্থাগুলি পরস্পরকে আঘাত করিতেছে এবং ধ্বংস করিতেছে।

মনস্বী ওয়েল্‌সের এই দর্শন হয়তো যথার্থ-দর্শন। তথাপি সাহিত্যের স্থায়ী বস্তুর বিচারে আমরা বলিব, 'এহ বাহ্য'। আত্মবিৎ রাজর্ষি জনকের ন্যায়ই আমরা বলিব, 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং নমে দহ্যতি কিঞ্চন'—মিথিলা প্রদগ্ধ হইলেও আমার কিছু দগ্ধ হয় না।

কারণ, যাহা দগ্ধ হইতেছে, তাহা স্থায়ী ছিল না, তাহা বাহিরের উপাদান, অস্থায়ী। তাহা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। যাহা ভাঙিবে, তাহার স্থলে নূতন সৌধ গগনচুম্বী চূড়া লইয়া দেখা দিবে। তাহাও হয়তো একদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু সেখানেও দেখা দিবে মানবপ্রতিভার নবসৃষ্টির নবমহিমা। মহাকালের মধ্য দিয়া মানবতার জয়-যাত্রা চলিয়াছে। কিন্তু এই ভাঙাগড়ার অন্তরালে মানবের যে আদি প্রেরণা-শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। মানুষ কেন বলে—'ইহা চাই, ইহা এইরূপ চাই, ইহা চাই না'? মানবের সেই চিন্তাধারাই সাহিত্যের স্থায়ী বস্তু।

সেই চিত্তাবস্থা প্রাচীন যুগে যেমন ছিল, বর্তমান যুগেও স্বরূপ লক্ষণে প্রায় তেমনই। সর্বমানব-সাধারণ সেই প্রীতি, ক্রোধ, শোক, ভয়, উৎসাহ, বিস্ময় ভাব অনুকূল প্রতিকূল বহু ব্যাপারে মানুষকে সমানভাবে চালিত করিতেছে। পরিবর্তনশীল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূলে এই ভাবগুলি এবং মানবোচিত অন্য কয়েকটি ভাবই বিদ্যমান। আর বিদ্যমান একটা পূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা ও পরিতৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা। জীবনে ও সাহিত্যে ইহাই স্থায়ী।

তাই তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের ভাব নয়,—উপাদান-বিচারে বস্তু অবস্তু সকলকে সমান ঠাঁই দিয়াছেন। তাহারা উপাদান মাত্র! ধনঞ্জয় বলেন—

> "রম্যং জুগুপ্সিতম্ উদারম্ অথাপি নীচম্
> উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
> যদ্ বাপ্যবস্তু, কবিভাবক-ভাব্যমানং
> তন্নাস্তি যন্ন রসভাবম্ উপৈতি লোকে॥"

—রম্য, জুগুপ্সিত, উদার, কিংবা নীচ, উগ্র, চিত্তপ্রসাদকর, গহন, অথবা বিকৃত যে সকল বস্তু, এমন কি অবস্তু—এইরূপ কিছুই নাই, কবির ভাবনা-শক্তি দ্বারা ভাব্যমান হইলে যাহা লোকে রসভাব প্রাপ্ত না হয়।

শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন কবির চক্ষু সৃষ্টির উন্মাদনায় নিরীক্ষণ করে "from heaven to earth, from earth to heaven"—স্বর্গ হইতে ভূতল এবং ভূতল হইতে স্বর্গ। এবারক্রম্বি বলেন, 'the whole conceivable world'—মনুষ্যের বোধ-গম্য সমগ্র জগৎই কবির সৃষ্টির বিষয় হইতে পারে।

এই উপাদান অস্থায়ী, কিন্তু তুচ্ছ নয়; ইহারাই জগৎ ও জীবন। ইহাদের অবলম্বনেই স্থায়ী ভাব ও স্থায়ী সাহিত্যের প্রকাশ। আমরা স্থায়ীর বিচারে মূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া আপাতত ইহাদের মূল্য নির্ধারণ করিতেছি না।

তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অস্থায়ী উপাদানরাশির অন্তরালে থাকে ভাব—স্থায়ী ভাব এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। স্থায়ীর সূত্রে সঞ্চারী থাকে বাঁধা, স্থায়ী ও সঞ্চারীর মিলিত সূত্রে উপাদান বা বস্তুরাশি থাকে বাঁধা। সাহিত্যে এই উপাদান বা বস্তুই বিভাব, আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাব। বিভাব ছাড়া সাহিত্য বা রস হয় না, তথাপি মূল রস-বিচারে বিভাব অস্থায়ী, তাদের

উদ্বোধনেই তাহার প্রধান সার্থকতা। তুলনায় স্থায়ী হইতেছে ভাব। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবও এক হিসাবে বিভাবের ন্যায় অস্থায়ী, স্থায়ী ভাবের অতিশয়তা বা অতিসম্পন্নতা-সাধনেই তাহার সার্থকতা। স্থায়ী ভাবের অন্তরালে তাহা অপেক্ষাও স্থায়ী, চিরস্থায়ী আত্মা, তাহাই আনন্দ, বোধময় সহজানন্দ। হাঁ, এই বোধময় আনন্দই সাহিত্যপাঠের শেষ সার্থকতা। বস্তু ধরিয়া বস্তুর গভীরে ভাবকে স্পর্শ করিতে হইবে, ভাবরাশির গভীরে স্থায়ী ভাবকে লাভ করিতে হইবে, তাহাতে তন্ময় হইতে হইবে, তাহারও গভীরে—অতিগভীরে বোধময় সহজানন্দের সাক্ষাৎ মিলিবে। তাহাই আসল স্থায়ী। সুস্থ শান্ত চিত্ত লইয়া তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। আপনাকে আপনি কি করিয়া অস্বীকার করিব? মনস্বী ক্রোচে যথার্থ ই বলিয়াছেন,—'troublous emotion' বা ভাব-চঞ্চল অবস্থা পার হইয়া 'profound penetration' বা গভীর অন্তঃপ্রবেশের ফলে 'pure poetic joy' অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাব্যানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। বিশ্বাস না হয়, 'স্বয়ং পশ্য বিচারয়'।

তাহা হইলে আসল স্থায়ী আবরণে-ঢাকা বোধময় আনন্দ। তাহারই সাক্ষাৎ সম্পর্কে স্থায়ী সেই সকল চিত্ত-ভাব, যাহা প্রীতি-ক্রোধ-শোক-ভয়ের ন্যায় সর্বমানব-সাধারণ এবং সর্বকাল-সাধারণ। এই স্থায়ী ভাব-সমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে অন্য অনেকগুলি ভাব, তাহারাই সঞ্চারী বা ব্যভিচারী বলিয়া পরিচিত। চিত্তভাব সম্বন্ধে কিছু পরিস্ফুট ধারণা না হইলে স্থায়ী ও সঞ্চারীর স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায় না; স্থায়ী ও সঞ্চারীর লীলাবিলাসও প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে এক আশ্চর্য লীলা! সঞ্চারী স্থায়ীর অন্তরে, স্থায়ীর বাহিরে তো বটেই! সঞ্চারীর সম্পদেই স্থায়ীর অতিসম্পন্নতা ও বলভূয়িষ্ঠতা। এ যেন ঈশোপনিষদের কথিত বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলা! অন্ধতমসে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবল সঞ্চারী বা অবিদ্যাকে ভজনা করে। গাঢ়তর অন্ধতমসে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবল স্থায়ী বা বিদ্যাকে ভজনা করে। আসল বস্তু স্থায়ী বা বিদ্যা হইতেও ভিন্ন, সঞ্চারী বা অবিদ্যা হইতেও ভিন্ন। স্থায়ী ও সঞ্চারী বা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে যাহারা জানে, উভয়ের সাহায্যে তাহারা লাভ করে পরম অমৃত। বিদ্যা ও অবিদ্যার ঊর্ধ্বে পূর্ণ ব্রহ্মের ন্যায় স্থায়ী ও সঞ্চারীর ঊর্ধ্বে রহিয়াছে আসল স্থায়ী—পরম কাব্যামৃত।

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

পুরাতনের যৎকিঞ্চিৎ

জড়ধর্মী সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজের শাসনে ভারতবর্ষের স্বাধীন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-জীবনে ভাঙন ধরিয়া যে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন এখানে ওখানে হইয়াছে, তাহার ফলে আমাদের একূল ওকূল—দুইই যাইতে বসিয়াছে ; গ্রামও গিয়াছে, নগরও ঠিকমত গড়িয়া উঠে নাই। আমরা নগরে তো অতিশয় অসহায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিই, গ্রামও আর আত্মনির্ভরশীল নাই। আমাদের পরধর্মপ্রবণতার বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিণতি বর্ণনার অতীত। নগরের পথে ও বিপণিতে অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য অনশনক্লিষ্ট মানুষকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে, এদিকে একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগের সম্ভাবনা ক্রমশই সুদূরপরাহত হইয়া আসিতেছে। তেল, চাল, আটা, দুধ, কয়লা, কেরোসিন, যাহা না হইলে মানুষের জীবযাত্রা নির্বাহ হয় না, সরকারী কণ্ট্রোলের সুব্যবস্থায় সেগুলি সংগ্রহ করা যে কিরূপ সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ইহার উপর আমাদের বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও শাসনের শাকের আঁটি যুক্ত হইয়াছে, গলগণ্ডের উপর বিস্ফোটক ধর্মঘট তো আছেই। পশ্চিম হইতে আগত আমাদের বিবিধ বিপত্তির কথা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে একজন বিলাত-প্রবাসী বাঙালী সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান ঘোরতর সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতরূপে তাঁহার পুরাতন কথাগুলিই আজ নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি। এই বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসী বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা খ্রীষ্টপন্থী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মনীষী ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—(হিন্দু অর্থে ভারতীয় বুঝিতে হইবে)—

"এখানকার গৃহস্থদের জীবনে শান্তি নাই। এত বেশী জিনিস-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠতে পারে না। আর দিনকের দিন খুঁটি-নাটি বাড়ছে। এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধীরে স্বচ্ছে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলতে হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ দুর্দশা

দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে এক মুঠি অন্নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকণসই পরদা ও দারা-সুতের নিমন্ত্রণ খাবার পোষাকের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়। আমাদের যেমন এক মুঠি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস-বেশ—নইলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না। আর একটি বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্মজীবী লোকেরা বড়-মানুষদের উপর বড় চটা। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে এরা সামলে উঠতে পারে না। তাই এরা বর্ত্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠছে। আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জলে যায়। আমি এদের আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা অল্প স্বল্প বললাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছেড়ে কৌলিক কর্ম্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনে এরা বিস্মিত হ'ল কিন্তু তা যে শান্তিপ্রদ তা বার বার স্বীকার করলে। এরা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটা অঙ্গ। এতেই ধর্ম্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্ম্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উৎকণ্ঠিত করে তুলছে। এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটা শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। সহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য্য; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের অলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর—তাতে স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীতে অগ্নি নাই—এখানে ঘরে আগুন নইলে তিষ্টিবার জো নাই—বস্ত্র নাই আহার নাই। সকলে কাজ করবার জন্য লালায়িত কিন্তু সহরে কাজ কর্ম্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র। এই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছে। কি দুঃখের কথা—কি লজ্জার কথা—আবার এমনি চমৎকার আইন যে ভিক্ষা করবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখতে পাবে যে দীনহীন রমণীরা ছেলে কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপছে আর দুই একটা ময়লা কাপড়ের তোড়া বা তাজা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রী করবার ছল কোরে

ভিক্ষা চাইছে। সে দিন দুইটী স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সম্বরণ করতে পারি নাই। তারা দুটী বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে, আর একজন ক্ষুধার জালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচংএ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারি আমাদের কাজ নাই। জিগীষার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্ রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হয়ে কুল-ধর্ম্ম পালনে রত হোক।..."

"লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জলিতেছে। আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতিজয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না। হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্বসম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যের স্বামী। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া কি ফল, যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সে স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা—বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয় তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ। হিন্দুর প্রকৃতিজয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ

যিনি ভূমা অনন্ত সর্ব্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতি ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্য মাত্র। উহার থাকা না-থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্ব লাভ হিন্দুর আদর্শ। আজ হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্য্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্য্যের সমাধান হয়। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—সাদাসিধে চালচলন—নয়ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না। কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুরবিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা গণ্ডা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস। বিলাত দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার-ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে সাহিত্য শিখাইতেছে ও দর্শনশাস্ত্র উপদেশ দিতেছে।"

১৬

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ ক'রে শুনছিল।

হারৎজ্ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে বলছি যে, আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণমহিমায় সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধ'রে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা?

তোমার মনের ভিতরই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার ব'লে পূজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক শক্তি-বলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুতরমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপুজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বঁড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন···তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হারৎজ্।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা-বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা

আনন্দ-বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?…ঘনসন্নিবিষ্ট চাপ-দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরেই আলো চকমক ক'রে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক ক'ষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের বিভিন্ন রূপ…ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্‌স্ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অনুপরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে রেখেছে… এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ ব'লে মনে কর, খুব সম্ভব তাই ওরা… তা হ'লে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করতে বলছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তা হ'লে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হ'ল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে…ওই ওদের একমাত্র শক্তি…ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হ'লেই তোমার জয়। পারবে না কেন?… Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ ক'রে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হার্‌ৎজ্‌ চ'লে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ ক'রে বিমূঢ়ের মত ব'সে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। একটা হিংস্র পশুকে বন্দী ক'রেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কয়েকজন কয়েদী নাকি

জেলারকে তাড়া করে। ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতর ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে···একদণ্ড বিরাম নেই···অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে···উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে ব'লেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও। এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকার থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি ক'রে তাকে? হাবুৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি ক'রে সে? পারলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হ'ল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য অনুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতি-পরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার ক'রে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি? মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হাবুৎজ্ যে শক্তির কথা ব'লে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করে নি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে উঠে গেছে···হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল···নিজের অস্থি দান ক'রে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন···এটা কিসের রূপক?···অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হ'ল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয় নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু···অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার···

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তারপর সাহস হ'ল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভরযোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্ম-বিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হ'ল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও, অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে ব'লে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য ব'লে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি।

সত্য কি, তা কেউ কাউকে ব'লে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার ক'রে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেক মিথ্যা সত্যের মুখোশ প'রে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশি দিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহু রূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি···

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দূল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু তা শক্তির বিকাশ, এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন···তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন···

সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট…এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো সমস্ত অনুশীলন ক'রে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল ব'লে মনে হ'লেও অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।…

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমারই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে…

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন। ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

১৭

শেষ রাত্রি।

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার। বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে…চাদরটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হ'ল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী… কালের প্রবাহও থেমে গেছে…নিস্পন্দ অসাড় সব…বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস ক'রে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই ব'লে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারুশাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবালরেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিস্পন্দ স্পন্দিত হ'ল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্র কিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহ-আবরণ। স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে। ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অপরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়-রথ। প্রভাত হ'ল।

১৮

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি ক'রে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে···ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট ক'রে হাফপ্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল ক'রে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিয়েই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে···মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই ক'রে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হ'ল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন। পাগুলো ঝুলছিল···দশ-বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হ'ল···অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তারপর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কেন এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে? তাঁকে বদলি ক'রে আনবার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেন্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখাবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই তো···সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে···জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত।

দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন ক'রে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও, সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে···বেশ হয়েছে···ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত···আর একটু রাগবার চেষ্টা করলেন···কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে···দ্রুত-ধাবমান লরির পিছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হ'ল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করে নি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে। চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা ব'লে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে ব'লেই সে অনুতপ্ত। তার মৃত্যুর জন্যে সেই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী; অকম্পিত হস্তে সই ক'রে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা ভালমানুষ ব'লে মনে হ'ত। ভাবতেই পারা যায় নি তখন যে, এই লোক আগস্ট ডিস্টার্বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধ'রে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার ক'রে এসেছে··· হিমসিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করেছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না, ভয় নয়···আসলে ওরা···আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্স্‌পেক্‌টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি···একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করে নি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্‌ব্যালান্‌স্‌ড্‌ মাইণ্ড···এরাই

বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হ'ল…ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল ছিল নাকি…

আর কত দেরি হে?

এখনও বহুৎ দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে প'ড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে… আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে। ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন।…মালতীও মারা গেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশের দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন…ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ…কোথাও আশ্রয় নেই…মনে হ'ল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে আকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে পড়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরা চ'লে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই ব'লে যায় নি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

১৯

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অন্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন ওজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ ক'রে যাওয়াই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথম যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়েছিল, তা আজও অম্লান আছে…সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ

করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য ক'রে সে ও পথে সঙ্গী হতে পারবে না।···

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নীহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি স'রে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না ব'লে—এই সব লিখতে হবে।···আরও অনেক কথা লিখতে হবে।···

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তর্কপটু, রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার অন্তরা না থাকলে একদণ্ড চলে না তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাত-ঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হ'ল। কষ্ট হচ্ছে···কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতাই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হ'ল, তার আদর্শকে রূপ দেবে কে? অংশুমান? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে···দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় ব'লে মনে হ'ল। যেতে হবে···কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই···তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালবাসা চেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে

ব'লে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে…কিন্তু আসলে পায় নি কিছু। সত্যি যদি ভালবাসা পেত, তা হ'লে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হ'ত সে। ভালবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয় নি তা এখনও? কোথায় সে মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে…। একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে। যার পায়ে সমস্ত দেহ-মন উজাড় ক'রে দেব, তার মহত্ত্ব যেন মেকি না হয়…দুদিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে। বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, ধনী নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে…যার মহত্ত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হ'ল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে যে, এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে…এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়… কি ভাবে?…

আরে, রোকো রোকো—

গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন? কোথায় চলেছেন? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নাবলেন ইন্স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

একমুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তা হ'লে তো আরও সুবিধে হ'ল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টা-টাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভেবেছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালই হ'ল। আসুন তা হ'লে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা।…

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অভয়া। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

ব্যাপার ইন্টারেস্টিং… ধীরে-সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন, উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তারপর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ ক'রে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টার দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভাল ক'রে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভাল ক'রে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের উপর, ভালভাবে হাওয়া পাবেন ব'লে। তাঁর মনে হ'ল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য? কি রকম সাহায্য?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ ক'রে এক সেট জড়োয়া গহনা পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করে নি তারা।

আমার সে গয়নার 'সেট' চুরি গেছে।

কবে ?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন ?

না।

দেন নি কেন ?

পুলিসের উপর আস্থা নেই ব'লে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন ?

তিনি রাগারাগি করবেন এই ভয়ে তাঁকেও জানাই নি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কম্‌রেড মীনা দত্তকে এসব কথা লেখেন নি তো ?...সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।...

অন্তরার চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হ'ল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রিসিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।..

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটতে লাগল।

২০

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

...ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার ক'রে বাঘ যেমন সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে, এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে ব'লেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়ে নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।...

...গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

...হাত-পা-বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। ছুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

...প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হ'ল। আওয়াজটা হ'ল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাতলানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

...একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পোড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

...একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা-বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় ক'রে শব্দ হচ্ছে—তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব ক'রে দেওয়া হ'ল তাদের।

...মুসলমানের মুখে জোর ক'রে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তারপর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ফাঁসি দিয়ে, গুলি ক'রে, কামানের ভিতর পুরে, পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে,—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তারপর অপমান, তারপর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটি পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজার গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করছে···

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এদেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি ক'রে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয় নি

* *The Other Side of the Maled* by Edward Thompson

এদের। একজন লিখেছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তারপর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিলেন এঁরা গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা ক'রে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে ···। সহসা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে। কোথাও আলো নেই। চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি?···

শান্ত স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে ব'সে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।···আবার অন্ধকার···একটু পরে আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ-স্থায়ী···আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে ব'সে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে...স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ···কম্পিত শিখা স্থির হ'ল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।···

কে আপনি?

আমি অনির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।···

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃন্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে,

খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেকট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেকট্রন চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। যাহা আজও আমার অনুগামিনী…তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত…

নিস্তব্ধ হয়ে গেল সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল…যাচ্ছি…যাচ্ছি…তোমারই কাছে…অনিবার্য-গতিতে…সত্য পথে…

২১

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায় নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করে নি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয় নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হ'লে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে? মা বাবা? কি হবে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে? তারা তো খালি কাঁদবে। অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে? হঠাৎ মনে হ'ল…যদি…

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে ?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

২২

সেদিন পূর্ণিমা।···শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অস্ত্ররা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্য-সুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবী দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়— নৌকোর পাল···ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে···ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল···ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো···পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া···দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী···

শেষ

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

বললুম, নিশ্চয় মনে থাকবে।

ওদিকে আমাদের চারদিকে ভিড় ও সেই সঙ্গে কোলাহল বাড়তে আরম্ভ করলে। সেই তালে ভদ্রমহিলাও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষকালে আর থাকতে না পেরে আমার নাম ধ'রে ডেকে বললেন, দেখ তো বাবা, উনি গেলেন কোথায় ? বোধ হয় এই ইষ্টিশান-মাস্টারের ঘরে ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা পেলে আর কিছু মনে থাকে না। এই মানুষকে ফেলে গিয়ে কি ক'রে আমার দিন কাটে তা ভগবানই জানেন। ওদিকে বাবার যে কি কষ্ট! তোমরা যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি—বেঁচে গেছ। মেয়েমানুষের মনের কষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

যা হোক, মেয়েমানুষের কষ্ট বোঝবার আর অধিক চেষ্টা না ক'রে আমি

উঠে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘিরে রেল-কোম্পানির কালো কোট ও গোল টুপি পরা জন তিনেক লোক ব'সে আছে, আর আমাদের ইনি দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে হিন্দী ভাষায় তাদের কি সব বলছেন, আর তারা থেকে থেকে হাসিতে ফেটে পড়ছে।

দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়েই আছি, ভদ্রলোক একবার ফিরেও দেখেন না। হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই তিনি ঘরের ভেতর থেকেই চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই যে ভায়া!

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি বোধ হয় মনে করলে, শালা টিকিট দুখানা নিয়ে স'রেই পড়ল। আরে, সরব কোথায়, আমার সর্বস্ব যে তোমাদের কাছে জিম্মে ক'রে এসেছি। পালাবার কি আর পথ আছে!

ব'লেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললুম, না না, তা নয়। আমি সেজন্যে আসি নি, মানে, আপনার স্ত্রী ডাকছেন আপনাকে।

ও! ডাকছেন বুঝি আমাকে? বলগে, এক্ষুনি আসছি আমি, কোন ভয় নেই, ট্রেন খুব লেট।

আমি চ'লে আসছি, এমন সময় ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, শোন।

কাছে যেতেই বললেন, স্টেশন-মাস্টারকে টিকিট দুখানা দেখালুম, সে বললে, ঠিক আছে।

তারপরে কোটের ভেতর থেকে একটা ব্যাগ বের ক'রে আমাকে বললেন, এখান থেকে হাওড়ার দুখানা টিকিটের দাম হয় ছ-টাকা ক আনা। আমি তোমাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি ব্রাদার।

ব্যাগ থেকে পাঁচটি টাকা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন, কেমন, খুশি তো? এতে তোমাদেরও কিছু হয়ে গেল, আমারও কিছু লাভ হ'ল। ভাই, বিদেশে ডাকঘরে কেরানীগিরি করি, এই ক'রেই চালিয়ে নিতে হয়। রাগ করলে না তো?

বললুম, না না, রাগ করব কেন? আপনি আমাদের উপকারই করলেন।

ফিরে আসছিলুম, আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, আমার স্ত্রীকে এসব কথা ব'লো না যেন।

না না, কি দরকার!—ব'লে টাকা কটি ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে ফিরে এলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা পাঁচটি পেয়ে বুক যেন দশ হাত হয়ে গেল। প্রহার ও অনাহারজনিত শারীরিক গ্লানি যে কোথায় উবে গেল, কি বলব! অর্থ এমনই সালসা!

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, পরিতোষের বাঁ হাতের তেলোয় পর্বতপ্রমাণ লুচির ঢিপি, তার ওপরে চূড়োর মতন খানিকটা তরকারি। তার চোয়াল দুটো ঢেঁকির মতন উঠছে আর পড়ছে।

আমি কাছে আসতেই রাণুমা বললেন, তুমি তো বড় দুষ্টু ছেলে বাছা! সারাদিন খাওয়া হয় নি, এ কথা মাকে বলতে হয়! কি রকম ছেলে তুমি আমার?

দস্তুরমতন মিলিটারি সুরে আমায় হুকুম করলেন, ব'স এখানে।

পরিতোষের পাশে ব'সে পড়লুম। রাণুমা একটা বড় গোল পেতলের কৌটো-গোছের বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে এক তাড়া লুচি ও খানিকটা আলু-প্যাজের চচ্চড়ি তার ওপরে চাপিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, খাও।

সারাদিন অনাহারের পর সে খাবার যে কি ভাল লাগল, তা কি ক'রে বোঝাব! প্রতি গ্রাসে মনে হতে লাগল, যেন ছ মাসের পর পথ্যি পাচ্ছি।

রাণুমা বকবক ক'রে ব'কে যেতে লাগলেন। জানি না, এরই মধ্যে পরিতোষ তাঁকে কি বলেছিল! তিনি বলতে লাগলেন, শখ ক'রে এ কষ্ট ভোগ করা কেন? ভাল ঘরের ছেলে তোমরা, এত কষ্ট কি সহ্য হবে? আমি যদি এখানে থাকতুম, তা হ'লে নিশ্চয় ধ'রে নিয়ে যেতুম তোমাদের, ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে বাইরে প্ল্যাটফর্মে ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল। ওদিকে ঘরের ঘুলঘুলি গেল খুলে, আর সেখানে শুরু হ'ল গুঁতোগুঁতি আর হুড়োহুড়ি।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে রাণুমার স্বামী অর্থাৎ সম্পর্কে আমাদের রাজাবাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্যাপার দেখে স্ত্রীকে বললেন, কি লাগিয়েছ?

রাণুমা নির্বিকারভাবে বললেন, ছেলেগুলোকে খাওয়াচ্ছি। সারাদিন না খেয়ে আছে, তা বাছারা কি আমায় আগে বলেছে! কথায় কথায় বাস ক'রে নিলুম।

ভদ্রলোক মুখে একটা ঔদাস্যের ভাব এনে ফরাসী কায়দায় হাতের তেলো দুটোকে চিতিয়ে এক ভঙ্গী ক'রে মুটেদের দিকে ফিরে বললেন, এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—মেয়েমানুষ নিয়ে পথে বেরুতে নেই।

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে মুখ তুলে বললেন, তা নিয়ে বেরুলে কেন? একলা পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে মুটেকে বললেন, ওরে, এই বিছানাটা তুলে নে।

মুটের পেছু পেছু তিনিও প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকে গেলেন।

পরিতোষের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ক'রে গিলতে আরম্ভ করেছি দেখে রাণুমা বললেন, তাড়াতাড়ি ক'রো না বাবা, ধীরে-সুস্থে খাও।

মিনিট দু-তিন যেতে না যেতে আমাদের রাজাবাবা লাফাতে লাফাতে এসে বললেন, ওগো, উঠে পড়, সিগ্‌ন্যাল প'ড়ে গেছে।

রাণুমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, পড়ুকগে শিংগেল, পোড়ারমুখোরা এতক্ষণ করছিল কি! ছেলেগুলোকে খেতে দিয়েছি, এখন যত রাজ্যের শিংগেল পড়বার তাড়া লেগে গেল!

আমি ততক্ষণে বাকি দু-তিনখানা লুচি ও তরকারিটুকু ঠেলে মুখগহ্বরে পুরে দিয়ে সেগুলিকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

রাণুমা কিন্তু স্বামীর তাগাদায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আবার বালতিটা টেনে এনে তার ভেতর থেকে আর একটা কাপড়ে-মোড়া কৌটো বার ক'রে ন্যাকড়ার গাঁট খোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওদিকে ব্যাপার দেখে রাজাবাবা পাছা চাপড়ে একরকম নৃত্য করতে করতে গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক সরু ও করুণ সুর বের ক'রে গান শুরু ক'রে দিলেন। গানের ভাষা হচ্ছে—হায় হায়! আজ নেহ্‌ৎ ট্রেন ফেল করালে দেখছি—

রাণুমা নির্বিকার। স্বামীর নৃত্যগীতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ধীরে-সুস্থে ন্যাকড়ার গাঁট খুলে বড় কৌটোর ভেতর থেকে আর একটা ছোট কৌটো বের ক'রে সেটার ঢাকনা খুলে দুটো প্যাঁড়া বের ক'রে আমাদের দুজনের হাতে দিয়ে আবার কৌটো বাঁধতে লাগলেন।

রাজাবাবা আর সহ্য করতে না পেরে হেঁট হয়ে পরিতোষের একখানা

হাত ধ'রে বললেন, চল ভায়া, প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে তোমাদের জল খাইয়ে আনি।

আমরা দাঁড়িয়ে উঠলুম। ভদ্রলোক তাড়া দিয়ে মুটের মাথায় সেই বিরাট ট্রাঙ্ক তুলে দিয়ে বালতিটা টপ ক'রে হাতে নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে দৌড় দিলেন।

প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌঁছবার পূর্বেই বিরাট গর্জন করতে করতে ট্রেন এসে উপস্থিত হ'ল। জল খাওয়া তখনকার মতন বন্ধ ক'রে ছুটোছুটি ক'রে খালি কামরার খোঁজ করতে লাগলুম। ট্রেনে বেশি ভিড় ছিল না। একটা দু-বেঞ্চিওয়ালা সরু কামরা খালি আছে দেখে সেইটেতে তুলে দিয়ে আমরা দরজার কাছে দাঁড়ালুম। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, জল পরে খেলেও চলবে।

রাজাবাবা মুটে বিদেয় করতে করতে রাণুমা জিনিসপত্র গুছিয়ে জানলার ধারে এসে বসলেন।

আবার চং-চং ক'রে কতকগুলো ঘণ্টা পড়ল। রাজাবাবা আমাদের বললেন, ভাগ্যে ভায়ারা ছিলে, তাই তাড়াতাড়ি উঠতে পারলুম।

রাণুমা স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, ভায়া আবার কি! ওরা আমার ছেলে যে!

ওঃ, ছেলে নাকি? তা আগে বলতে হয়। জানো বাবা, তোমাদের এই মা একটু রাগী মানুষ বটে, কিন্তু মনটা বড় ভাল—

তুমি থাম।—ব'লে রাণুমা আমার নাম ধ'রে বললেন, কলকাতায় গিয়েই দেখা করবে, ওই পরিতোষ ছেলের কাছে ঠিকানা-পত্র সব লিখে দিয়েছি, রাণুমাকে ভুলো না যেন—

বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

রাণুমাকে ভুলি নি, নিশ্চয় ভুলি নি। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা আর হয়ে ওঠে নি। মাস দেড়েক বাদে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম বটে, কিন্তু পরিতোষের বাবার তখন খুবই অসুখ। বোধ হয় সপ্তাহখানেক বাদেই তারা চ'লে গেল পশ্চিমের এক শহরে হাওয়া বদলাতে। আমি যাই যাই করতে করতে দিন পনেরোর মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লুম একজ্বরে। অনভ্যাস-অত্যাচারের শোধ প্রকৃতি সুদে-আসলে তুলে ছাড়লেন। রোগশয্যা ত্যাগ করবার কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমাকে বেরুতে হ'ল পথের আহ্বানে।

রাণুমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হয় নি বটে, কিন্তু রাণুমাকে ভুলি নি। অতীত দুর্দিনের পটভূমিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অকস্মাৎ সূর্যোদয়ের মতন প্রসন্নময়ী সেই মাতৃমুখ মনের মধ্যে ফুটে উঠছে আর শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ছে। দূর অতীতের সেই এক সন্ধ্যায় প্রহারজর্জর, ক্ষুৎপিপাসাকাতর এই দুটি বালকের মুখে অযাচিত অন্ন দিয়ে যে রক্ষা করেছিল, তাকে কি কখনও ভুলতে পারি! জীবনের সেই দারুণ দুঃসময়ে হঠাৎ-পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া মাকে আজ আমি প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধু পরিতোষ আজ কাছে নেই, তার হয়েও আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জানি, আমাদের নিবেদন ব্যর্থ হবে না।

ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে টপটপ ক'রে আলোগুলো সব নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। প্ল্যাটফর্মের কলে আকণ্ঠ জল পান ক'রে আবার আমরা যাত্রীগৃহে ফিরে এলুম। বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই চারিদিক একেবারে নিষুতি হয়ে পড়ায় আমরা দুটো বেঞ্চি দখল ক'রে ঘুমের সাধনায় মন দিলুম।

ঘুম জিনিসটা প্রাণী-জগতে ঈশ্বরের এক অদ্ভুত দান। সন্ধ্যায় যে মাতা উপযুক্ত পুত্র হারিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে শেষরাত্রে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়ে—আমরা তো কোন্ ছার! সারারাত্রি কখনও ঘুম কখনও জাগরণ, এই করতে করতে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা দু-তিন কাপ চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে প্ল্যাটফর্মের কলে স্নান ক'রে র‍্যাপার প'রে ধুতি শুকিয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে চায়ের দোকান থেকে দুজনে আধ সের ক'রে দুধ মেরে বেরিয়ে পড়া গেল অনির্দিষ্ট যাত্রায়। ট্যাঁকে টিকিট-বিক্রয়লব্ধ পাঁচটি টাকা, কাছায় বাঁধা একটি আংটি আর পরিতোষের পকেটে কয়েক আনা, এই মাত্র সম্বল।

স্টেশনের সামনে যে রাস্তাটার খানিকটা রাত্রে দেখা যাচ্ছিল, সেটা বেশি লম্বা নয়। একটু ঘুরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু বেশ ভাল একটা উত্তর-দক্ষিণমুখো সড়কে প'ড়ে আমরা উত্তরমুখো চলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

ছোট্ট শহর। আমরা যে রাস্তা ধ'রে অগ্রসর হতে লাগলুম, তার দু দিকে কোন কোন জায়গায় ঘন খোলার চালের বসতি। কদাচিৎ দু-একখানা ইটের একতলা কি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার দু পাশেই চষা মাঠ, মাঝে মাঝে কোন ক্ষেতে ফসলও দেখা যাচ্ছে।

বাজার অর্থাৎ খান-তিন-চার-দোকানওয়ালা একটা জায়গায় এসে একজন মুরুব্বীগোছের লোককে জিজ্ঞাসা করলুম, এ রাস্তা কোথায় গিয়েছে?

লোকটা গম্ভীরভাবে বললে, গয়াজী।

পরিতোষকে বললুম, ভালই হ'ল, চল্, গয়াতেই যাওয়া যাক।

আরও কয়েক মাইল গিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ বাবা, এ রাস্তা কতদূর গিয়েছে?

লোকটি বললে, বিহারশরীফ তক।

কথাটা শুনে একটু দ'মে গেলুম। কারণ বিহারশরীফ মানুষের নাম, না জায়গার নাম, তা অনেক গবেষণা ক'রেও ঠিক করতে পারলুম না। বিশুদার ওখানে যতটুকু উর্দুজ্ঞান হয়েছিল, তাতে শরীফ কথাটি মানুষের মেজাজের প্রতিই প্রযোজ্য, সেটি যে জায়গার পেছনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে জ্ঞান আমাদের হয় নি, এইজন্যেই বলে—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী!

আরও কতদূর অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে ওই প্রশ্ন করায় সে বললে, পাটনাশরীফ তক।

এতক্ষণে শরীফ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, এখান থেকে পাটনাশরীফ কতদূর হবে?

লোকটি মনে মনে কি হিসাব ক'রে বললে, তা ষাট-সত্তর মিল হবে।

যা হোক, হিসাব ক'রে ঠিক করা গেল যে, এই রাস্তা হয় বিহারশরীফ, আর না হয় পাটনা, আর না হয় গয়া অবধি পৌঁছেছে, রাস্তা শেষ হতে এখনও ষাট-সত্তর মাইল বাকি আছে।

চলতে চলতে শহর গ্রাম পেরিয়ে গেলুম। দু পাশে শস্যক্ষেত্র, তারই মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মন্থরগতিতে, পথের শেষ কোথায় কে জানে!

ক্রমে মধ্যাহ্নসূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল। বোধ হয় সকাল থেকে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতোর অবস্থা আগে থাকতেই ছিল খারাপ, এতখানি পথ চলার ফলে তারা মুখব্যাদান ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে, ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি। তাদের প্রতি মায়াপরবশ হয়ে জুতো হাতে ক'রে চলতে শুরু করলুম। সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলুম যে, খালি পায়ে

সারাদিন পথশ্রমে দেহও বিশ্রাম চাইছিল। সকালবেলা ইষ্টিশানের সেই আধ সের দুধ কখন হজম হয়ে গিয়েছে, ক্ষিধের চোটে মনে হতে লাগল, পেটের মধ্যে যেন দধি-মন্থন চলেছে।

সম্মুখেই রাত্রি, কিন্তু আশ্রয় কোথায়! পথের দু দিকে মাঠের প্রান্তে, সেই একেবারে দিগন্তে বললেই হয়, সেখানে বোধ হয় গ্রাম আছে, কিন্তু সেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ পার হবার সাহস নেই। দেখলুম, রাস্তা দিয়ে দু-তিন দল রাখাল পাল পাল গরু নিয়ে চীৎকার ক'রে বেসুরো গান গাইতে গাইতে গেল, কোথায় গেল কে জানে! চলেছি তো চলেইছি, কিন্তু আর যে পা চলে না!

সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে, এমন সময় আমরা একটা গ্রামের মতন জায়গায় এসে পৌঁছলুম, অর্থাৎ দু-একটা লোক পথে দেখা গেল, একটা বলদের গাড়িও যেতে দেখলুম।

রাস্তার ধারেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় একটা ছোট পুকুর, বাংলা দেশের বড় ডোবার মতন হবে, তার চারদিকে ঘন তালগাছের সারি। একটা গাছ থেকে আর একটার ব্যবধান বোধ হয় দশ হাতও হবে না, কোথাও বা জোড়া জোড়া গাছ একসঙ্গে উঠছে। আমরা পথ ছেড়ে এই উঁচু জায়গাটাতে উঠে একজোড়া তালগাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

পুকুরটাতে জল নেই বললেই হয়। তবুও মুখ ধোবার জন্যে পাড় বেয়ে জলের ধারে গিয়ে দেখলুম, অত্যন্ত নোংরা জল। মুখ না ধুয়েই উঠে এসে আবার সেইখানে এসে বসলুম। জীবনে এতখানি পথ কখনও হাঁটি নি। অঙ্গের বেদনায় তালগাছের গুঁড়িতে দেহ এলিয়ে দেওয়া গেল।

ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, মাথার ওপর দিয়ে দু-তিন দল বক উড়ে গেল। একটু দূরেই রাস্তার দু ধারে দুটো বড় গাছ, তার মধ্যে পাখীদের কচ্‌কচিতে সেই নিস্তব্ধ জায়গাটা যেন ভ'রে উঠল, কিন্তু তা অতি অল্পক্ষণেরই জন্য, তার পরেই সব স্তব্ধ। দূরে পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেল। গোধূলির শেষ রশ্মিতে দেখলুম, পরিতোষের চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। অন্ধকার একেবারে ঘনিয়ে ওঠবার আগেই বৃক্ষমূলে সে দেহ বিছিয়ে দিলে।

চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে, ব'সে ব'সে আমার ভয় করতে লাগল, এই অন্ধকারে কি সারারাত্রি কাটাতে হবে! মুখ ধুতে যাবার সময় পুকুর-পাড়ে গোটাকয়েক শুকনো তালের পাতা দেখেছিলুম,

মনে হ'ল, সেগুলো টেনে নিয়ে এসে আগুন ধরালে মন্দ হয় না। কিন্তু কি জানি, সেখানে নামতে সাহস হ'ল না। পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু অদ্ভুত তার ঘুম! কি কতকগুলো বিড়বিড় ক'রে ব'কে সেই ধূলিশয্যায় পাশ ফিরে শুল।

অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে ব'সে আছি, মধ্যে-মধ্যে কাছে দূরে কড়কড় সড়সড় আওয়াজ হতে লাগল। দেশলাই জ্বালিয়ে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, তাই দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলুম—তারপরে শান্তিময়ী নিদ্রা এসে কখন কোলে তুলে নিলে জানতেও পারি-নি।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলুম—দিদিমণির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছি—রাজপুতানার পাহাড়ের কোলে স্বর্গের মতন সেই সুন্দর দেশে। পাহাড়ে হচ্ছে তুষার-বর্ষণ ও সেই সঙ্গে পড়ছে বড় বড় বাঁশের লাঠির মতন মোটা ও লম্বা মালাইয়ের কুল্পী। দু হাতে ক'রে সেই কুলপী-বরফ খাচ্ছি, কিন্তু পেট ভরছে না কিছুতেই। দিদিমণি ঘরের ভেতর থেকে চ্যাচাচ্ছে—খাবার তৈরি হয়েছে, এবার খেতে এস। কিন্তু খেতে যাওয়াটা যে কেন হচ্ছে না তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, পরিতোষের মতন আমিও ধূলিশয্যায় লম্বা হয়ে প'ড়ে আছি। কোন্ দূরে যেন কারা গান গাইছে! তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আবার পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে কোন সাড়াই দিলে না।

দেখলুম, মাথার ওপরে একটুখানি চাঁদ উঠেছে, রাস্তায় খানিকটা আলো ও খানিকটা অন্ধকার। বড় গাছ দুটোর লম্বা ডালপালার ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপরে।

রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। মধ্যে-মধ্যে একটা দমকা হাওয়া গাছগুলোর ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার সেই ঘুমন্ত ছায়ানটীদের মধ্যে সাড়া জাগছে। থেকে-থেকে ওপর দিয়ে নাম-না-জানা রাত-পাখীর দল চীৎকার করতে-করতে উড়ে যাচ্ছে, নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির বুকে করাত চালিয়ে দিয়ে। মনের মধ্যে একটার পর একটা চিন্তার ঢেউ উঠছে। রাজকুমারী, চাটুজ্জে, দিদিমণি, বদ্রিনাথ, বাঙাল-মা, বড়কর্তা, বিভঙ্গা, [illegible] গণ্ডগোল পাকাতে-পাকাতে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

এবারে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। কিসের একটা বিশ্রী উগ্র গন্ধে ঘুম ভেঙে যেতেই চোখ খুলে দেখি, প্রায় আমার নাকের ডগায় একটা জানোয়ারের মুখ! তার চোখ দুটো পড়ন্ত চাঁদের আলোয় জলজল করছে।

বাপ রে!—ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই জন্তুটা ভড়কে চার-পাঁচ হাত পেছনে হ'টে গিয়ে আবার জলজলে চোখ দিয়ে আমায় নিরীক্ষণ করতে লাগল।

শীতের রাত্রিশেষ! সারারাত রাস্তায় শুয়ে স্রেফ কাঁপুনির চোটে মুহুর্মুহু ঘুম ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই নতুন আপদের সম্মুখীন হয়ে দরদর ক'রে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ হ'ল। জানোয়ারটা তখনও আমার দিকে তেমনই ভাবে চেয়ে। ভয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেলেও চক্ষু সজাগ ছিল। দেখলুম, শেয়ালের মতন চেহারা হ'লেও সেটা শেয়াল নয়, শেয়ালের চাইতে অনেক বড়। ঘাড়ের চারিদিকে ঘন কেশর, মাথার দিকটা উঁচু অর্থাৎ সামনের পা দু-খানা অপেক্ষাকৃত বড় আর ল্যাজের দিকটা নীচু। মিনিটখানেক তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, হঠাৎ উঠে মারব দৌড়—এই রকম একটা সঙ্কল্প আঁটছি মনে মনে, এমন সময় খসখস শব্দ হতে পাশের দিকে চেয়ে দেখি, আরও চার-পাঁচটা জানোয়ার নিকটে ও দূরে ঘোরাফেরা করছে। অতগুলোকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে হ'ল, নিশ্চয় এ নেকড়ের পাল, কারণ নেকড়েরা যে দলবদ্ধ হয়ে শিকার খুঁজতে বেরোয়, সে কথা ছেলেবেলা থেকে বইয়ে প'ড়ে এসেছি। যাহাতক সেই কথা মনে হওয়া আর অমনই সেই উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নীচে প'ড়েই চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম, পরিতোষ উঠে পড়, আমাদের নেকড়ে বাঘে অ্যাটাক্ করেছে। পরিতোষ, বাঁচতে চাস্ তো এখনও ওঠ্ পরিতোষ, আমি পালাচ্ছি।

আমার ওই রকম চীৎকার শুনে জানোয়ারগুলো একটি ক'রে লাফ মেরে বাবলে দৌড় ওদিককার মাঠে, ক্ষীণ চাঁদের আলোতে দেখতে পেলুম, রামদৌড় দৌড়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার থেকে যে এত সহজে উদ্ধার পাব, তা কল্পনাও করতে পারি-নি। জানোয়ারগুলোর পলায়নের ধরন দেখে তৃতীয় পক্ষ হয়তো বুঝতেই পারত না, ভয়টা বেশি পেয়েছিল কে! আমি, না তারা?

যা হোক একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার উঠে পরিতোষের কাছে গেলম

আমাকে দেখে সে ধীরে-সুস্থে উঠে ধরাধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিলি কেন?

তার সেই নিশ্চিন্ত বে-পরোয়া ভাব দেখে রাগে আমার গা জ্ব'লে উঠল। বললুম, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোও, এখুনি যে নেকড়ের পাল এসেছিল, তার খোঁজ রাখ?

পরিতোষ সেই রকম ভাঙা গলায় বললে, এঃ, হেঁটে-হেঁটে তোর মাথাটা একদম গবুমে গিয়েছে দেখছি। স্বপ্ন দেখ্ছিলি বুঝি?

দেখলুম, তখনও তার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর একেবারে কাটে-নি। আমি রেগে সেখান থেকে স'রে একটু দূরে গিয়ে ব'সে রইলুম।

আকাশে চাঁদ ক্রমেই নিষ্প্রভ হতে থাকল। পূর্বদিগন্তে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। দূর থেকে দেখতে লাগলুম, পরিতোষ আবার শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে উঠে ধীরে-ধীরে এসে আমার পাশে ব'সে বললে, কি রে, রাগ করলি?

বললুম, না, রাগ করবে কেন? সারারাত কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোবে, তোমার এই ঘুমের জন্যে কোন্ দিন নেকড়ের পেটে চ'লে যাব, তবুও তোমার ঘুম ভাঙবে না।

পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, এর আগে নেকড়ে বাঘ কখনও দেখেছিলি?

বললুম, কেন, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নেকড়ের পাল আছে।

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। ব্যাপারটার ওপরে আরও খানিকটা গুরুত্ব চাপাবার জন্যে বললুম, শুনেছি, এই সব জায়গায় নেকড়ে বাঘের ভারি উপদ্রব।

এতক্ষণে ব্যাপারটি অনুধাবন ক'রে পরিতোষ বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতগুলো এসেছিল রে?

সত্যি কথা বলতে কি, কতগুলো যে এসেছিল তা দেখবার মতন মানসিক অবস্থা সে সময় আমার ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ-ছটা জানোয়ার দেখেছিলুম। তবুও অবস্থার গাম্ভীর্য বাড়াবার জন্যে বললুম, সে সময় কি আর গুনে দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল? তবুও দেখে মনে হ'ল, পঞ্চাশ-ষাটটা হবে।

পঞ্চাশ-ষাটটা নেকড়ে বাঘের কথা শুনে পরিতোষ এবার দস্তুরমতন দ’মে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ ক’রে ব’সে ও তারই মধ্যে বেশ এক পকড় ঘুম মেরে চাঙ্গা হয়ে পরিতোষ বললে, চল্, ওঠা যাক।

তখন বেশ রোদ উঠে গিয়েছে, রাস্তা দিয়ে দু-চারজন লোক ও একটা গরুর গাড়িও চ’লে যেতে দেখা গেল। আমরা পথে নেমে আবার চলতে শুরু করলুম। পথের শেষ কোথায়!

আধ ঘণ্টা অতীত হতে না হতে বেশ টের পেতে লাগলুম, কালকের মতন মনের উৎসাহ বা শরীরের শক্তি আজ আর নেই। খানিকটা পথ এগিয়ে যাই, আবার রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ ক’রে বিশ্রাম করি—এই ভাবে চলতে চলতে প্রায় মাইল আষ্টেক পথ অতিক্রম ক’রে আমরা গ্রাম অথবা সেই রকম একটা কোনও জায়গায় এসে পৌছলুম। কিছুদূর এগিয়েই একটা বাজার দেখা গেল। দু-তিনখানা একতলা ইটের আর বাকি সব খোলার বাড়ি। গোটাদুয়েক মুদীর দোকান, একটি মাত্র ময়রার দোকান, খাদ্যের মধ্যে দেখলুম এক তাল গুড়ের জিলিপি প’ড়ে রয়েছে একটা তেলচিটে ময়লা বারকোষের ওপর। জিলিপিগুলোতে বোলতা ও রাজ্যের গ্রামাপোকা লেপটে রয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো নিরামিষ কি আমিষ তা বিচার করবার প্রয়োজন হয়। দোকানের প্রায় সামনেই কতকগুলো বলদ ব’সে রোমন্থন ক’রে চলেছে, তারই কিছু দূরে খানকয়েক গরুর গাড়ি। চারদিকে এমন অনেক রকমের তরকারি ও শাক বিক্রি হচ্ছে, যা এর আগে কখনও দেখি নি। ক্রমশ

"মহাস্থবির"

সন্ধ্যায়

জীবনের শেষভাগে গোড়াকার রেশ লাগে
খুঁজে মরি ফেলে-আসা পথ।
হারানো দিনের সুর মন করে ভরপুর
বিপরীত চলে মনোরথ।
করেছি যতেক হেলা খেলেছি যতেক খেলা
অবেলায় মনে পড়ে সব।
শান্ত মোর নদীনীরে ছায়া ঘনাইয়েছে ধীরে

বিরূপাক্ষের চিঠি

'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক বরাবরেষু—

মশাই, আপনাদের কাছে কিছুদিন ধ'রে আমার ঝঞ্ঝাটের বিষয় জানিয়ে তো মহা ফ্যাঁসাদে পড়া গেল দেখছি! আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের একটু নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে দেবার জন্যে কিছুদিন এখান থেকে সরেছিলুম, কিন্তু ক্রমশ দেখছি, তাঁরা আমাকে নির্ঝঞ্ঝাটে অবস্থিত দেখলে বিশেষ সুখী হন না। ক্রমাগত ঝঞ্ঝাট তৈরি ক'রে ক'রে তাঁরা আমাকে আপনাদের মারফৎ পত্রাঘাত করতে শুরু করেছেন এবং আপনারাও আমাকে তার জবাব দেবার জন্যে অস্থির ক'রে তুলছেন—এ তো আর এক উৎপাত শুরু হ'ল দেখছি!

আপনাদের কি বলুন না, প্রাণে স্ফূর্তি আছে, কাগজ বার করছেন, রস দেশের লোকের ফুরিয়ে এলেও আপনাদের রসতত্ত্ব আলোচনা করতে বাধছে না, পাঁচটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বে-জায়গায় পা ফেলে পুলিসকোর্টে ছুটো মেয়ের বিয়ের টাকা জমানৎ দিয়ে আসছেন, দিব্যি কাটছে! কিন্তু আমার তো আর সে অবস্থা নয়!

একে আমি নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে পাগল হয়ে আছি, আবার আমায় যদি আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের সব উদ্ভট সাহিত্যের ঝঞ্ঝাট নিয়ে মাততে হয়, তা হ'লে তো রাত বারোটার পর ঘুমোবার টাইমটাও কাবার হয়ে গেল! আচ্ছা, আমি কি সাহিত্যিক যে সাহিত্যের সমস্যা মেটাব, না, বাংলা দেশের স্বদেশী নেতা যে সর্ববিষয়ে বাণী বিতরণ ক'রে ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াব?

আমি গরিব গেরস্থ লোক, যেদিন সকালে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে পারি সেদিন কিছু আনি, যেদিন পারি না সেদিন কর্পোরেশনের টিন্‌চারআইডিন্‌-গোলা কলের জল খেয়ে শুয়ে পড়ি, আমার কি এসব পোষায়? অত যদি লিখতে পারতুম, তা হ'লে এই দুর্মূল্যের বাজারে একখানা কাগজও কি আর সুবিধেমত লোককে ধ'রে ক'রে বার করতে পারতুম না? ঠিক পারতুম। ও-দিকে 'ইত্তেহাদ্' এদিকে আমার 'একহাত' বেরিয়ে, দেখতেন, বাংলা দেশে কি কাণ্ডটাই না করতে শুরু করেছে। পারি না ব'লেই—করি না।

এতদিন মনে করুন, হিসেব ক'রে কতখানি কাছা পেছনে কতখানি সামনে ঝুলিয়ে ভদ্রসমাজে চলাফেরা করা উচিত তাই ঠিক করতেই ঝঞ্ঝাট বড় কম পোয়াই নি, সম্প্রতি হিসেব মাফিক রেশনের কাপড় পেয়ে এই উভয়সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছি। কারণ যে কোন একদিকে ওটা গুঁজে দিলেই লেঠা চোকে, তা—আমার মত লোকের আবার সাহিত্যে মাথা খেলে?

আপনারা বলবেন, আমাদের খেলছে কি ক'রে? সে তো আগেই বলেছি, আপনারা তো বাস্তব জগতে বাস করেন না, মনোরাজ্যেই আপনাদের অপ্রতিহত আধিপত্য—দেশ ম'রে ভূত হ'লে তবে আপনারা ভূতসই গোছের প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আমাদের নিয়েই তো আপনাদের খোরাক! অতএব ও-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

কিন্তু আপনাদের সংস্পর্শে এলেও যে রেহাই নেই, এইটে সম্প্রতি মালুম পাচ্ছি। আপনাদের মারফৎ শ্রীহট্ট শ্রীভূমি থেকে শ্রীনন্দিতা সোম যে চিঠিখানি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি লিখছেন যে, বাংলায় নামের আগে শ্রী বসানো উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে তিনি বিশেষ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন, এবং আমায় তার একটা হদিশ বাতলে দিতে হবে ব'লে অনুরোধ জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন কি এই সব ঝামেলার সময়?

ইচ্ছে হয় আপনি নামের আগে শ্রী দেবেন, নয় দেবেন না—আপনার খুশি! আর কার কি বলবার এক্তার আছে? ও-কথা ছাড়ুন—এখন নামটাই কোনমতে বজায় রেখে যেতে পারলে বাঁচি, কারণ অবস্থা যা পড়েছে তাতে তো পিতৃপুরুষের নাম পর্যন্ত ভুলে যাওয়ার দাখিল, এখন তার আগে শ্রী দিলে বাহার খুলবে, কি না দিলে বিশ্রী দেখাবে, সেসব কি ভাববার সময় আছে?

অবশ্য এককালে এই নিয়ে সাহিত্যে অনেক মারপিট হয়ে গেছে, তা সে সময়ের কথা ছেড়ে দিন। তখন লোকে খেতে-দেতে পেত আর প্রাণ ভ'রে আবোল-তাবোল লিখত। কালিদাস বাঙালী ছিলেন কি কাবুলী ছিলেন—এই নিয়ে কতদিন কি উৎপাতই না গেছে! দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, নেড়ু চণ্ডীদাসের কেচ্ছা নিয়ে খেড়ু সাহিত্যিকরা কাগজ-কলমের শ্রাদ্ধ করেছেন, কিন্তু এখন তো আর সেদিন নেই! এখন এক চিন্তা—বাঁচি কি ক'রে রে বাবা! এই সময় পূর্বপুরুষদত্ত শ্রীকে নিয়ে টানাটানি না করাই ভাল।

আমাদের তো সবই গেছে, শুধু নামের আগে ওইটুকুই জ্বলজ্বল করছে, ওটাকে ছেঁটে আর এমন কি কম্পোজিটারদের মেহনৎ কমবে, বলুন? বরং ছাড়লেই ঝঞ্ঝাট! সে যে কি ঝঞ্ঝাট, তা আমি জানি। আরবারে আমার মেজ ছেলেটা টেস্টে গাড্ড, দিলে কেন জানেন? ওই শ্রী বাদ দেওয়ার জন্যে।

মশাই, তার ইস্কুলে অনুবাদ করতে দিলে—রমণী শান্তির সহিত ঝগড়া করিল। সে তাহাকে তাহার বাড়িতে থাকিতে দিল না। যামিনী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল, কারণ সে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত।—নাও ঠ্যালা!

তিন ঘণ্টা ধ'রে ছোঁড়াটা শুনলুম এই তিনটি নামের সর্বনাম 'হি' হবে, কি 'শী' হবে তাই পঞ্চাশবার খাতায় লিখে আর কেটে কেটে হিমসিম খেয়ে 'দুত্তোর' ব'লে হল থেকে বেরিয়ে এল। ফলে—নট অ্যালাউড।

আচ্ছা, এ-সব পরীক্ষকের বজ্জাতি নয়? একটা শ্রী লাগিয়ে দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত বলতে পারেন? একে তো ফ্যাশানের চোটে আজকাল চোখে দেখেও মেয়ে পুরুষকে ঠাওর করবার জো নেই, তার ওপর নামেও যদি না চেনা যায়, তা হ'লে কি ঝঞ্ঝাট বাধে ভাবুন তো।

বলবেন, রবীন্দ্রনাথ তো শেষবয়েসে আর শ্রী ব্যবহার করতেন না। না, তা করতেন না—শেষবয়েসে মানুষ অনেক কিছুই করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তো আর সেটা বলা চলে না? তিনি করতেন না, তার কারণ চেনা বামুনের আর পৈতের দরকার ছিল না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বের কবি। সকলেই তাঁকে আপন ভাবত, তাই তাঁর নামের আগে শ্রী বসবে, কি মিস্টার বসবে, কি ম্যঁসিয়ে বসবে, তা সব জাতের পক্ষে ঠিক করা সহজ ছিল না ব'লেই তিনি ওটা বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার আমার পক্ষে তো আর সে যুক্তি খাটে না?

আমাদের শ্রীযুত আর শ্রীমতীদের নিয়েই একটু সুখে শান্তিতে থাকতে দিন, আর বেশি কায়দার দরকার নেই। "ও যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভাল" ব'লে এই প্রথাটাই চালিয়ে যান—অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াবেন। ইতি

শ্রীবিরূপাক্ষ

নব-পরিচয়

যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক পরিচয়টা নেহাত মন্দ ছিল না। বেসরকারী স্কুলের হেডমাস্টার। মাসিক আয় 'আহা' 'উহু' করিবার মত না হইলেও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় কম নয়। গাড়ি-বাড়ি করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সস্তা-গণ্ডার বাজারে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া সংসার চালাইয়া আসিয়াছি। বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার-দোকানদার, ধোপা-নাপিত, ঝি-চাকর ইত্যাদি সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যাহাদের সম্পর্ক ও সংসর্গ অপরিহার্য, সকলেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত। কারণ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক স্তর-বিন্যাসের এখানে-সেখানে একটু-আধটু ভাঙা-চোরা ঘটিলেও আসল কাঠামোটা ঠিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রবল আলোড়নে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। আমরা মধ্যবিত্তেরা, যাহারা এতদিন সমাজদেহের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলাম, ছিটকাইয়া পড়িলাম। যাহারা উপরে ছিল, তাহারা আরও উপরে উঠিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। যাহারা নীচে ছিল, তাহারা উপরে উঠিল। আমরা ক্রমে দুঃখ-দৈন্যের ভারে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। ফলে যাহাদের সঙ্গে প্রতিদিনের পরিচয় ছিল, তাহারা একে একে ছাড়িয়া গেল।

পাড়ার রাঘব সরকার সরকারী কন্ট্রাক্টার ছিলেন। এঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, সরকার ও অফিসের কেরানী, সকলের ক্ষুধা মিটাইয়া বৎসরে যাহা ঘরে তুলিতেন, তাহাতেই শহরে দোতলা বাড়ি তুলিয়াছিলেন, এবং মফস্বলে ছোট-খাটো জমিদারি কিনিয়াছিলেন। পুরাতন একখানি ফোর্ডগাড়িও ছিল তাঁহার। তাহাতে চড়িয়া তাঁহার সালঙ্কারা গৃহিণী ও পুত্র-কন্যারা দামী কাপড়-চোপড় পরিয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইত। মোট কথা, পাড়াতে একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাহা হইলেও রাঘববাবু লোক মন্দ ছিলেন না। সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁহার। বিশেষ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মান করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় বসিতেন। আমি নিয়মিতভাবে সেখানে হাজিরা দিতাম ও চা-সিগারেট খাইতাম। ক্রমে এমনই একটি সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের মধ্যে যে, কোনদিন না গেলে ডাকিয়া

পাঠাইতেন। আমার অসুখ-বিসুখ হইলে নিজে আসিয়া আমার শয়নকক্ষে আড্ডা জমাইতেন। সময়ে অসময়ে সাহায্যও করিতেন। গৃহিণী স-পুত্র-কন্যা সিনেমা যাইবার বায়না ধরিয়াছেন; টিকিটের মূল্য ও গাড়ি ভাড়া একত্রে খরচটা মারাত্মক; রাঘববাবুকে ঠারে-ঠোরে ব্যাপারটা জানাইতেই তিনি নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। রাতদুপুরে গৃহিণীর কলিক-পেন চাড়া দিয়া উঠিয়াছে; রাঘববাবুর দ্বারস্থ হইলাম; তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের সরকারকে ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শোবার ঘরের কড়িকাঠে ঘুণ ধরিয়াছে; অবিলম্বে মেরামত না করাইলে গৃহিণী পুত্রকন্যাসমেত বাপের বাড়ি যাইবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন; হাতে পয়সার অভাব, অথবা হাঙ্গামা পোহাইবার ইচ্ছার অভাব; রাঘববাবুর শুধু একবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছি; রাঘববাবু তৎক্ষণাৎ অভয়দান করিয়াছেন ও লোকজন পাঠাইয়া মেরামত করাইয়া দিয়াছেন; আমি পরে সুবিধামত খরচ-পত্র দিয়াছি। এমনই ভাবে নানা সময়ে নানা রকমে তাঁহার কাছ হইতে উপকার পাইয়াছি। হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাঘববাবু মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট লইলেন। বৎসর দুইয়ের মধ্যে কাঁপিয়া ফুলিয়া তরতর করিয়া উপরে উঠিয়া ক্রমে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া গেলেন। আমাদের শহর আর তাঁহার পছন্দ হইল না। কলিকাতায় বিরাট অট্টালিকা বানাইয়া বসবাস শুরু করিলেন। বৎসরখানেক আগে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বাড়ির ফটকে সঙিনধারী দরওয়ান। বুঝাইয়া-শুঝাইয়া, তোষামোদ করিয়া, অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকিলাম। রাঘববাবুর ড্রয়িং-রুমেও ঢুকিবার অনুমতি পাইলাম। সুপরিসর ও সুপরিচ্ছন্ন কক্ষ; কৌচ, কেদারা, সোফা এবং আরও হরেকরকমের আসবাবপত্রে সজ্জিত। রাঘববাবুকে ঘিরিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া; তাঁহাদের বেশ-ভূষা, হাবভাব দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা কেউ-কেটা নন। রাঘববাবু অনেকটা বদলাইয়াছেন—আরও মোটা হইয়াছেন, কালো রঙ অনেকটা ফিকা হইয়াছে, মাথার সামনে টাক পড়িয়াছে। তবু রাঘববাবু আমাকে চিনিলেন। ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন, মাস্টার মশায় যে! কখন এলেন? বসুন, সব ভাল তো? আমি জবাব না দিয়া বসিলাম। রাঘববাবু ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে শুরু করিলেন। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমি এখন উঠি, পরে দেখা

করব। রাঘববাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, যাবেন? আচ্ছা, আসুন। বাহিরে আসিতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, রাঘববাবু শুধু উঠেন নাই, আমিও নামিয়াছি। আমাদের মধ্যে এতটা ব্যবধান যে, রাঘববাবুর সমাজে আমার পরিচয় পর্যন্ত অচল।

অভয় ডাক্তার বহুদিন ধরিয়া আমার বাড়ির ডাক্তার। চাকরি-সূত্রে এখানে আসা অবধি তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। তখন তাঁহার তত নামডাক ছিল না। রোজগারও ছিল কম। আমাদের পাড়াতেই একটি ছোট ডিস্পেন্সারি ছিল তাঁহার। সেইখানেই বসিতেন। আমাদের পাড়াতে নামমাত্র ফীতে সকলের চিকিৎসা করিতেন। আমার সঙ্গে ক্রমে তাঁহার বন্ধুত্ব গজাইয়া উঠে। শেষের দিকে আমার বাড়িতে ফী লইতেন না। কিন্তু যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন সময়ে ডাকিবামাত্র আসিতেন। এমন কি অনেক সময়ে বিনা প্রয়োজনেও আমার বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া যাইতেন। এই সময়ে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার করালী কর হঠাৎ মারা গেলেন। অভয় ডাক্তারের কর্মক্ষেত্র প্রসার-লাভ করিতে শুরু করিল। শহরের অন্যান্য পাড়া হইতে রোগী আসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম হইতেও ডাক আসিতে লাগিল। ব্যবসা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য অভয় ডাক্তার শহরের মধ্যে ডিস্পেন্সারি তুলিয়া লইয়া গেলেন। তখন আর হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হইত না; অবসর হইলে ডিস্পেন্সারিতে গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। তবে কোন প্রয়োজনে ডাক দিলে ডাক্তার নিশ্চয়ই আসিতেন। তারপর যুদ্ধ বাধিল। ঔষধ দুষ্প্রাপ্য হইল। এক টাকা মূল্যের ঔষধ দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। তা ছাড়া জমিদার, ব্যবসাদার ও চাষীদের হাতে পয়সা জমিল। ডাক্তাররা মরসুম দেখিয়া তাহাদের ফী চারগুণ বাড়াইয়া দিল। অভয় ডাক্তার বৎসরখানেকের মধ্যেই বাড়ি ও গাড়ি করিলেন। রোগীও জুটিল বিস্তর। ঝকঝকে নূতন গাড়িতে চড়িয়া অভয় ডাক্তার শহর ও মফস্বল চষিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার গৃহিণী হঠাৎ রোগে পড়িলেন। পেটে ও পিঠে বেদনা। ঔষধ-পথ্যের দাম ও ডাক্তারদের হাল-চালের কথা ভাবিয়া প্রথমে ডাক্তার ডাকিলাম না। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শানুসারে মালিশ ও সেক চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু কোন কাজ হইল না। শেষে অভয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিলাম। এক রবিবার সকালে ডাক্তারের বাড়ি গেলাম।

নূতন তৈয়ারি দোতলা বাড়ি; সামনে অনেকখানি জায়গা রেলিং দিয়া ঘেরা। দুই পাশে দুইটি গেট। বাড়ির সামনে রাস্তায় মোটর, ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্‌শার ভিড়। বাড়ির বারান্দায় অনেক লোক এলোমেলোভাবে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। কোনমতে পথ করিয়া ডাক্তারের বসিবার ঘরে ঢুকিলাম। সেখানেও বিস্তর লোক। যাহারা সুবিধা করিতে পারিয়াছে, বেঞ্চি বা চেয়ারে বসিয়াছে; যাহারা পারে নাই, দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। এক-একজন রোগী সামনে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র ডাক্তার তাহার বুকে-পিঠে এখানে-সেখানে বারকয়েক স্টেথিস্কোপ বসাইতেছেন, পেটের এপাশ-ওপাশ টিপিতেছেন, জিবটা একবার দেখিতেছেন, দরকার হইলে চোখের নীচে আঙুলের চাড় দিয়া এক চোখ দেখিয়া লইতেছেন, সবসুদ্ধ পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিতেছে না, তারপর খচখচ করিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখিয়া টেবিলের উপরেই ছুঁড়িয়া দিতেছেন। রোগী প্রেস্‌ক্রিপ্‌শানটি ভক্তিভরে তুলিয়া লইয়া, ফী চার টাকা গনিয়া দিয়া, কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া বিদায় লইতেছে। টেবিলে একটা ট্রের উপর টাকা জমিয়া উঠিতেছে।

এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভিড় একটু পাতলা হইলে সহসা ডাক্তার-বাবুর চোখ আমার উপরে পড়িল। হাসিয়া কহিলেন, কি খবর? কতক্ষণ এসেছেন? বসুন।

একটু আগাইয়া গিয়া গৃহিণীর রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলাম। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ শুনিয়াই কহিলেন, বুঝেছি, এক কাজ করুন, ব্লাড আর ইউরিনটা একবার দেখিয়ে রিপোর্টটা কাল আনবেন। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান ক'রে দেব।

কহিলাম, একবার গিয়ে দেখবেন না?

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, আজকালের মধ্যে যেতে পারব ব'লে মনে হয় না, তবে— চোখ বুজিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, কিছুক্ষণ ভাবিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, নাঃ, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সময় হবে না; তবে দেখুন, যাবার দরকার হবে না; রিপোর্টটা দেখলেই সব বুঝতে পারব। ওষুধটা ব্যবহার ক'রেও যদি কোন ফল না হয় তো পরে একবার দেখে এলেই হবে। চুপ করিয়া রহিলাম। ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। ব্লাড

আর ইউরিনটা আজই দেখিয়ে ফেলুন গে। নমস্কার।—বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান একজন রোগীর প্রতি দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

বারান্দায় রোগীর ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গেটের পাশেই গ্যারেজ। ডাক্তারের নূতন-কেনা ঝকঝকে মোটর গ্যারেজ হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লোক—ডাক্তারের কোন চাকর বোধ হয়—কড়া গলায় হাঁক দিয়া কহিল, দাঁড়ান, যাবেন না, গাড়ি বার হচ্ছে। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। পিছন ফিরিয়া ডাক্তারের বাড়ির দিকে তাকাইলাম। দোতলার বারান্দায় ডাক্তারের ছেলেমেয়েরা প্রভাতী আড্ডা জমাইয়াছে। পরিপুষ্ট চেহারা, পরিচ্ছন্ন পরিপাটী পরিচ্ছদ। নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, ডাক্তারও নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাড়িতে আসিয়া গৃহিণীকে সব পরিচয় দিলাম। গৃহিণী কহিলেন, দরকার নেই ওতে; দশ-বারো টাকার কমে তো ওসব হবে না, কোথায় পাবে এত টাকা? তার চেয়ে বরং সদয়বাবুকে ডাক; পরেশবাবুর গিন্নী বলছিল, বেশ চিকিচ্ছে করে। রামসদয়বাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। কেরানীগিরি করনে। যুদ্ধের বাজারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন। ফী লাগে না; ঔষধের দামও কম। পাড়ার গরিব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করায়। কেহ বাঁচে, কেহ মরে। কিন্তু বাঁচা-মরা তো ভগবানের হাত, ডাক্তার নিমিত্ত মাত্র। আধ্যাত্মিকতায় আপ্লুত হইয়া উঠিলাম। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রামসদয়কে ডাকিবার জন্য বাহির হইলাম। ভগবানের কৃপাতেই হোক, বা রামসদয়ের চিকিৎসার গুণেই হোক, গৃহিণী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর হইতে রামসদয়ই আমার বাড়ির চিকিৎসা করিতেছেন। অতয় ডাক্তারকে ডাকিবার স্পর্ধা আর করি নাই।

পরান দে আমার অনেক দিনের পরিচিত দোকানদার। চাল ডাল নুন তেল মসলাপাতি ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় দরকারী জিনিস বরাবর সেই সরবরাহ করিত। বাজারের অন্যান্য দোকানের তুলনায় তাহার দোকানটি ছোটই ছিল। তবে সে নিজেই দোকান চালাইত, এবং লাভের লোভ তাহার বেশি ছিল না। কাজেই জিনিসপত্রের দাম অন্য দোকানের তুলনায় কম হইত। তা ছাড়া খাতির করিত খুব। দোকানে গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার

করিত, টিনের চেয়ারটি ঝাড়িয়া বসিতে দিত, এবং পান ও সিগারেট আনাইয়া খাওয়াইত। কোন জিনিস তাহার দোকানে না থাকিলেও অন্য দোকান হইতে আনাইয়া বিনা লাভে সরবরাহ করিত। যুদ্ধের বাজারে চালের কারবারে মোটা লাভ করিয়া পরানের মেজাজ গেল বিগড়াইয়া। দোকানে গেলে আর নমস্কার করিত না, বসিতেও বলিত না, জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া বলিত এবং দরকষাকষি করিলে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া শুনাইয়া দিত অন্ত-ম্যাজিষ্টরের বাড়িতে এই জিনিস যাচ্ছে, এই দামই দিচ্ছেন তাঁরা; আপনার সুবিধে না হয় তো অন্য দোকানে দেখুন।—বলিয়া অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করিত। পরানের হাব-ভাব দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতাম কিছুক্ষণ; তারপর সুবিধামত দরের আশায় অন্য দোকানে ছুটিতাম। পরানের মতি-গতি দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার দোকান ছাড়িয়া দিলাম এবং অন্য একটি নেহাত ছোট দোকান হইতে জিনিসপত্র লইতে শুরু করিলাম।

শুধু পরানের নয়, কাপড়ের দোকানদার ভব দত্ত ও স্টেশনারি দোকানদার নিতাই কুণ্ডু, ইহাদের মেজাজও একদম বিগড়াইয়া গেল। আমি যে তাহাদের একদিন বাঁধা খরিদ্দার ছিলাম, সে কথাটা তাহারা যেন ভুলিয়া গেল। দোকানে গিয়া দাঁড়াইলে বসিতে বলা দূরে থাক্, মুখ ফিরাইয়া তাকাইতও না। অনেক ডাকাডাকি করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের পর কোন জিনিস চাহিলে, হয় 'নাই' বলিয়া বিদায় করিয়া দিত, কিংবা এমন দাম হাঁকিয়া বসিত যে, আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইত না। অথচ খাতির করার প্রক্রিয়াটা যে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। একদিন নিতাই কুণ্ডুর দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া এক শিশি হর্‌লিক্‌সের জন্য তাহাকে অনুনয়বিনয় করিলাম। নিতাই সেই যে প্রথম হইতেই 'এক ফোঁটা নাই' বলিয়া ঘাড় নাড়িতে শুরু করিল, আধ ঘণ্টা পরেও তার রকমফের হইল না। হঠাৎ একটা জিপ আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল। নিতাই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক লাফে নীচে নামিল এবং ছুটিয়া জিপের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, গাড়িতে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে—শক্ত-পোক্ত চেহারা, ভারী মুখ, মাথায় চকচকে টাক, পরিধানে খাকী প্যাণ্ট ও মিলিটারি কোট। দোকানের একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি সাপ্লাই বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

ভদ্রলোক নিতাইকে কি বলিতেই সে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দোকানে উঠিয়া একেবারে দোকানের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং মিনিট কয়েক পরে দুই হাতে দুইটা শিশি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ির দিকে ছুটিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হর্‌লিক্‌সের শিশি। অফিসারকে শিশি দুইটি দিয়া নিতাই চরিতার্থতার হাসি হাসিতে লাগিল। অফিসার আরও দুই-চার কথা নিতাইকে বলিয়া চলিয়া গেলেন; নিতাই ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধাবমান গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিতেই কহিলাম, ওঁকে হর্‌লিক্‌স দিলে, অথচ আমাকে—। নিতাইয়ের ভাবাবেশ তখনও কাটে নাই। গম্ভীর মুখে, ভারী গলায় কহিল, ওই দুটি শিশিই ছিল, কোনমতে ওঁর জন্যে রেখেছিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত কহিল, উনি কে জানেন? সাপ্লাইয়ের বড় সাহেব। ওঁর সঙ্গে— কি যে বলেন তার ঠিক নেই! জবাব না দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে নিতাইয়ের দোকান হইতেই অন্য লোক দিয়া চড়া দামে একশিশি হর্‌লিক্‌স আনাইয়াছিলাম। নিজে আর তাহার দোকানে যাই নাই।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কাপড়ের দাম চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভব দত্তর মেজাজও কড়া হইয়া উঠিল। দোকানে গেলে পাত্তাই দিত না। তারপর শুরু হইল কণ্ট্রোল। কেমন করিয়া জানি না, ভব দত্ত কাপড়ের বড় সাহেবের পরম প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিল। কাপড়ের বড় সাহেব ভাল ভাল ধুতি-শাড়ি বিক্রয়ের অধিকার তাহাকেই দিলেন। ফলে হাকিম-সম্প্রদায়, শহরের ধনী কণ্ট্রাক্টর, ডাক্তার, উকিল ও ব্যবসায়ীরা তাহার খরিদ্দার হইল। কারণ ভাল ধুতি ও শাড়ির 'পার্‌মিট' দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বড় সাহেবেরই। কিন্তু তাঁহার সম্মুখীন হওয়া আমাদের মত ক্ষীণজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্য নয়। কাজেই ভব দত্তর দোকানের পাশ মাড়াইবারও উপায় রহিল না আমাদের। ইহা সত্বেও একবার একজন হাকিম-ঘেঁষা বন্ধুর সাহায্যে বড় সাহেবের কাছ হইতে খানকয়েক ভাল ধুতি ও শাড়ির 'পার্‌মিট' সংগ্রহ করিলাম। পার্‌মিটটি পকেটে লইয়া ভব দত্তর দোকানে গেলাম। দোকানে অনেকগুলি সরকারী কর্মচারী বসিয়া ছিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া পুলিস কর্মচারী বলিয়া মনে হইল। ভব তাহাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল। আমার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। এক পাশে একটা রঙচটা টিনের চেয়ার পড়িয়া

ছিল। তাহাই টানিয়া লইয়া বসিলাম। দোকানের কর্মচারীরা অফিসারদের ধুতি শাড়ি বাঁধাছাঁদা করিতে ব্যস্ত দেখিলাম। অফিসারগুলিকে বিদায় দিয়া ভব দত্ত আমার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কহিল, আপনি? হাসিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, আমিই। তা ভাল ধুতি শাড়ি তোমার দোকানে অনেক আছে শুনলাম, আর শুধু শুনলামই বা কেন, চোখেও দেখলাম, ওই ভদ্রলোকগুলি নিয়ে গেলেন এক-একজন অনেকগুলি ক'রে; আমারও কিছু দরকার; খানকয়েক যদি—। ভব দত্ত বাধা দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, এমনই তো হবে না, পারমিট চাই, বড় সাহেবের পারমিট। মৃদু হাসিয়া কহিলাম, আছে পারমিট, এই যে। বলিয়া পকেট হইতে পারমিটটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে পারমিটটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া, মুখ হাঁড়ি করিয়া, ভারী গলায় কহিল, হুঁ, বড় সাহেবেরই বটে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ওঁদের কি! যাকে তাকে পারমিট ঝেড়ে দিচ্ছেন! এদিকে আমি যে কোথা থেকে কাপড় দিই—! কহিলাম, তোমার দোকানে শুনলাম যথেষ্ট কাপড় এসেছে। মুখ ভেংচাইয়া ভবতোষ কহিল, যথেষ্ট কাপড় এসেছে! আপনারা তো সবই শুনছেন! সত্যি কথা ব'লে দিচ্ছি আপনাকে, বিশ্বেস করুন আর নাই করুন, ভাল কাপড় আর একখানিও নেই। যা ছিল সব দিয়ে দিলাম আপনার চোখের সামনে। ঢোক গিলিয়া কহিল, তবে এমনই সাধারণ কাপড় চান তো দিতে পারি এই পারমিটের ওপরেই। কহিলাম, থাক্, দরকার নেই। তা তুমি এক কাজ কর, এই পারমিটের ওপর লিখে দাও যে, কাপড় নেই। ভাবিয়াছিলাম, ভবতোষ ইহাতে কাবু হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাহা হইল না। বরং সোৎসাহে কহিল, বেশ তো, লিখে দিচ্ছি। বলিয়া খচখচ করিয়া 'কাপড় আর নাই' লিখিয়া দিল। পারমিটটি আবার পকেটে পুরিয়া দোকানের বাহির হইতেই দেখি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাপরাসি বাইক হইতে নামিতেছে। ভবতোষ এক গাল হাসিয়া আপ্যায়ন করিয়া কহিল, এই যে ভাই খলিল, এস, বস, কি খবর? চাপরাসী দোকানে উঠিয়া গেল। আমি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিলাম।

বাজারের শেষাশেষি আসিয়া পৌছিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাপরাসী বাইকে চড়িয়া পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। পিছনে ক্যারিয়ারে বাঁধা এক মোট কাপড়।

পারমিটটি লইয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। কিন্তু কোন ফল

হইল না। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, কাপড় আছে জানিয়াই তিনি পারমিট দিয়াছিলেন, কিন্তু কাপড় যদি ফুরাইয়া গিয়া থাকে তো তাঁহার করিবার কিছুই নাই।

সেই দিন হইতে কণ্ট্রোলের বাজারে মিহি কাপড় পরিবার ও গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের পরাইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

কয়লার আড়তদার বগলা-নন্দীর ব্যবহারেই বিগলিত হইলাম বেশি। বগলা আমার ভূতপূর্ব ছাত্র। যখন কয়লার ব্যবসা শুরু করে, তখন আমার কাছ হইতে আশ্বাস ও আশীর্বাদ যথেষ্ট পাইয়াছিল। প্রথম হইতেই আমাকে মাসে মাসে আমার আবশ্যকমত কয়লা বাড়িতে পৌছাইয়া দিত। যুদ্ধের সময়ে গাড়ির অভাবে আমদানি কম হইতেই কয়লার দাম চড়িয়া গেল। বগলা নিয়মিতভাবে কয়লা পাঠানো বন্ধ করিল। বারংবার চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে বা নিজে গিয়া দেখা করিলে তবে দিত, তাও পুরাপুরি নয়। অন্য আড়তদারদের ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের দুই-তিন গুণ বেশি দাম দিয়া বাকি কয়লা সংগ্রহ করিতে হইত। হঠাৎ কয়লাখাদে কুলি-ধর্মঘটের জন্য কয়লার আমদানি দিন কয়েকের জন্য একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। আড়তদারেরা রাতারাতি কয়লা আড়ত হইতে সরাইয়া ফেলিল। কয়লার গুঁড়া গোটার চেয়ে বেশি দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। আমি বগলার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া ছিলাম, সবটা না দিক, কিছু তো দিবেই। গৃহিণীর তাড়নায় একদিন বগলার কাছে ছুটিলাম। রেল-স্টেশনের কাছেই কয়লার আড়ত। একটা খড়ের চালার নীচে একটা তক্তাপোশের উপরে উবু হইয়া বসিয়া মুদ্রিতচক্ষে সিগারেট টানিতেছিল বগলা। আশেপাশে কয়লার গুঁড়ার স্তূপ। একটা লোক তাহাই বস্তায় বাঁধিয়া রাখিতেছিল, এবং তাহাই লইবার জন্য জন-কয়েক লোক অনুনয়বিনয় করিতেছিল। বগলা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে সিগারেট টানিতেছিল।

ডাক দিতেই বগলা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িল, এবং ধূম্রজালের ভিতর দিয়া আমাকে দেখিয়া ধীরে সুস্থে সিগারেটটি নিবাইয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, কি বলছেন?

সোদ্বেগে কহিলাম, আমার কয়লা?

বগলা ধূলিরাশির দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই তো দেখছেন, ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যান।

ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, ও যে ধুলো! ওতে রান্না হবে কি ক'রে?

বগলা বেপরোয়াভাবে কহিল, তা আমি কি করব? ও ছাড়া আর নেই। প্রার্থী লোকগুলাকে কহিল, দু টাকা ক'রে মণ, পারবে তো নিয়ে যাও।

তা হ'লে রিক্‌শা ডেকে নিয়ে আসি বাবু।—বলিয়া লোকগুলা শহরের দিকে ছুটিল।

বগলাকে কহিলাম, সত্যি কি কয়লা নেই? বগলা গম্ভীর মুখে কহিল, না।

কহিলাম, কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

উত্তরে বগলা ডান হাতের পাতা চিত করিয়া দিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?

বগলা কহিল, যা আছে তা নিজের জন্যে, আর কিছু এস. ডি. ও. সাহেবের জন্যে; ওঁর কয়লা কিছু বেশি লাগে। সানুনয়ে কহিলাম, আমাকে যদি এক মণ অন্তত—। বগলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মাস্টার মশায়, পারব না, অনুরোধ করবেন না আমাকে।

চলিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে বগলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সম্ভব হইলে একে তাকে ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের বেশি দাম দিয়া কয়লা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, না হইলে কাঠ। গৃহিণী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রান্না করিতে লাগিলেন।

শুধু ব্যবসাদারদের কাছে নয়, নাপিত ধোপা চাকর ও ঝিদের কাছেও আমার পরিচয় মর্যাদাহীন হইয়া পড়িল।

চারু নাপিত শহরের সেরা নাপিত। হাকিম ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার একচেটিয়া ব্যবসা। তাহার ছেলে আমার স্কুলের ছাত্র ছিল বলিয়া আমার বাড়িতেও আসিত। তাহার রেট ছিল সাধারণ নাপিতদের চেয়ে বেশি—বড়দের ছয় আনা, ছোটদের চার আনা। গৃহিণী এই নবাবিয়ানার জন্য গঞ্জনা দিতেন। তবু চারুর হাতে ক্ষৌরীকৃত হওয়ার আভিজাত্যের লোভ সামলাইতে পারিতাম না। পাড়ার কালী নাপিত রাস্তার ধারে বসিয়া পাড়ার সাধারণ লোকদের চুল কাটিত। আমাকে দেখিলেই সে আমার মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইত। কিন্তু তাহার হাতে কোনদিন মাথা ছাড়িয়া

দিব, এ আমার উৎকট কল্পনারও অগোচর ছিল। যুদ্ধের বাজারে চারু রেট দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। গৃহিণী বাঁকিয়া বসিলেন—মাসে মাসে শুধু চুল কাটার জন্য ছ টাকা খরচ করা চলিবে না। শেষে একদিন নিজে কালীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছেলেদের চুল ছাঁটাইয়া দিলেন। আমি কিন্তু চারুর কাছেই চালাইতে লাগিলাম। দিন কয়েক পরে চারু নিজেই আসা বন্ধ করিল। যুদ্ধের মরসুমে শহরে অনেক হালি বড়লোক গজাইয়া উঠিয়াছে; অনেক নূতন-নূতন হাকিমেরও আমদানি হইয়াছে। সকলেই চারুকে চায়। এই নূতন মক্কেলদের ভিড়, তা ছাড়া আমার কাছে পাওনাও নেহাত কম; কাজেই চারু বোধ হয় আসিবার সময় করিতে পারিল না। আমি অগত্যা একদিন কালীকে ডাকিয়া তাহার কবলেই মাথা সঁপিয়া দিলাম।

ধোপার অবস্থাও তথৈবচ। শহরের সেরা ধোপা উপেন বরাবর কাপড় কাচিত। দুধের মত সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিয়া উড়ানি উড়াইয়া স্কুলে যাইতাম। সহকর্মীরা ঈর্ষাকুটিল চক্ষে আমার দিকে তাকাইতেন। পয়সা কিছু বেশি খরচ হইত বটে, তবু এই সামান্য বিলাসটুকু বর্জন করিতে পারিতাম না। যুদ্ধ বাধিতেই ধুতি-শাড়ি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল; বিশেষ করিয়া মিলের ধুতি-শাড়ি। সরকার বাহাদুর আপামরসাধারণের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন—মোটা, খাটো, একই রকমের পাড়। ফুড কমিটির কর্তাদের ধরিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। মনিব-চাকর, গিন্নী-ঝি—কোন তফাৎ রহিল না। তবু উপেনের হাতে ধুইয়া আসিলে ওই কাপড়েরই বাহার খুলিত। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। শহরের কাছে মিলিটারি ক্যাম্প বসিল। উপেন সেখানকার কাজে নিযুক্ত হইল। হাকিম বা বড়লোকদের কাপড় না কাচিলেই নয়, তাই কোনমতে কাচিয়া দিত। কিন্তু আমাদের মত লোকদের কাপড়গুলির উপরে তাহার শিক্ষানবিস ছেলেরা হাত পাকাইত। ফলে কাপড় তেমন পরিষ্কার হইত না, ছিঁড়িতও বেশি। গৃহিণী অনুযোগ করিলে উপেনের ছেলেরা স্পষ্ট বলিয়া দিত, স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় এর বেশি সাদা হবে না। গৃহিণী একদিন বলিলেন, সাদা না হোক, ছিঁড়ছে কেন? ভাড়া খাটাস নাকি? উপেনের ছেলেরা তারপর হইতে কাপড় কাচা বন্ধ করিল। পাড়ায় একজন ধোপা ছিল—কানাই। পাড়ার সাধারণ গৃহস্থদের কাপড় সেই কাচিত। কানাইয়ের কাচা কাপড়ের একটি বিশেষত্ব ছিল।

এমন একটি পাকা কিংবা নীল রঙ ধরিত যে, শত চেষ্টাতে ছাড়িত না। কাজেই ময়লা হইত কম। এত স্ববিধা সত্ত্বেও কানাইকে কোনদিন ডাকি নাই। এইবার তাহাকে ডাকিতে হইল। নীলরঙ জামা ও কাপড় পরিয়া সাধারণের সামতন্ত্রে নামিয়া আসিয়াছি—ইহা বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে সর্বসমক্ষে চলা-ফিরা করিতে লাগিল।

চাকর ও ঝিদের কাছেও মনিবত্বের মাপকাঠিতে অনেক ছোট হইয়া গেলাম। সংসার-পাতার শুরু হইতেই একজন চাকর ও একজন ঝি বরাবর ছিল। ঝি-চাকরের মাহিনা বেশি ছিল না, কাজেই আয় খুব বেশি না হইলেও কুলাইয়া যাইত। যুদ্ধ শুরু হইতেই ঝি ও চাকর দুইজনেই মাহিনা বাড়াইবার বাহানা ধরিল। আমার মাহিনা না বাড়িলেও তাহাদের দুই-এক টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলাম। দিন কয়েক ঠাণ্ডা রহিল; তারপর আবার টালমাটাল ভাব,—বিশেষ করিয়া চাকরটির। কাজে মন নাই। যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া দেয়; দুপুরে আড্ডা দিতে বাহির হইলে চারটার আগে বাড়ি ফিরে না; গৃহিণী ধমক দিলে মুখের উপর জবাব দেয়। উত্তরদায়ক ভৃত্য না রাখাই শাস্ত্রীয় বিধি। গোপনে চাকর খোঁজ করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, চাকর দুষ্প্রাপ্য। কেহ আর সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে চাকরি করিতে প্রস্তুত নয়। সরকার বাহাদুর পাঁচ-সাত রকমের নূতন আপিস খুলিয়াছেন। সকলেই সরকারী আপিসে পিয়নের কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত। দোষও তাহাদের দেওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসই এত দুর্মূল্য যে, পূর্বের আয়ে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সবারই। সরকারী আপিসের পিয়নদের মাহিনা বেশি না হইলেও মাগগি ভাতা আছে—বকশিশ আছে। সব মিলাইয়া এক-একজন প্রায় চল্লিশ টাকা রোজগার করে। অবস্থা দেখিয়া গৃহিণীকেই মেজাজের রাশ টানিবার জন্য উপদেশ দিলাম। চাকরটি নিজের মর্জিমত কাজ করিতে লাগিল, গৃহিণী আমার উপদেশমত মুখ বুজিয়া রহিলেন। এমনই করিয়া দিন কয়েক চলিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, চাকরটা মাটিতে লুটাইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে, এবং গৃহিণী তাহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেই চাকরটা উঠিয়া বসিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া-

চিঠি আসিয়াছে কি না প্রশ্ন করিতেই, চাকরটা কান্না থামাইয়া কহিল, চিঠি কে লিখবে বাবু? নেকাপড়া জানে কি কেউ?

তবে খবর পেলি কি ক'রে?

বাজারে আমাদের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, তার মুখেই শুনলুম। আবার হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল, কি করব বাবু? বাড়িতে আর মরদ বলতে কেউ নাই। এখুনি যেতে হবেক আমাকে। ছাদ্দ-ছান্তি সেরে, ঘরের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে, আবার আসব।

সাবেক বাকি-বকেয়া সমেত সব মাহিনা উশুল করিয়া লইয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য দশ টাকা অগ্রিম লইয়া এবং যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া চাকরটি বিদায় লইল। আমরা তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গনিতে লাগিলাম।

দিন কয়েক পরে বাজারের মধ্যে হঠাৎ চাকরটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পরিধানে সরকারী আপিসের চাপরাসীর পোশাক, বুকের উপর তকমা। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া চট করিয়া পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর, চাকর আর জুটাইতে পারিলাম না। নিজে ও গৃহিণী মিলিয়া, অর্থাৎ গৃহিণীই প্রায় সবটা, আমি সময়ে অসময়ে কতকটা, সংসারের কাজ চালাইতে লাগিলাম।

ঝিটাকে ভাঙাইল সরকার নহে, সরকারের শত্রু জাপান। কলিকাতায় হঠাৎ গোটাকয়েক বোমা ফেলিয়া দিল। কলিকাতাবাসীরা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলাইল। প্রত্যেক শহরে কলিকাতাবাসীদের জোয়ার আসিল। বাড়িভাড়া চড়চড় করিয়া বাড়িয়া গেল। ভাঙা প'ড়ো ঘরেও লোকে মোটা ভাড়া দিয়া মাথা গুঁজিয়া থাকিতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের পাড়াতে এক ভদ্রলোক আসিলেন। মস্ত বড়লোক। কলিকাতায় বিরাট ব্যবসা। পাড়ায় সোরগোল পড়িয়া গেল। কলিকাতাবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, হাব-ভাব দেখিয়া তাক লাগিয়া গেল সবার। ভদ্রলোকের মস্তবড় পরিবার। ঝি বেশি সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া ঝিয়ের খোঁজ করিতে লাগিলেন। এক যা মাহিনা দিতে চাহিলেন, তাহাতে সকল বাড়ির ঝিরাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঝিয়ের বয়স কিছু কাঁচা ছিল, চেহারাও নেহাত মন্দ ছিল না।

তাহাকেই পছন্দ হইল ভদ্রলোকের। ঝিটি বিনা নোটিসে কাজ ছাড়িয়া দিল। তখন হইতে ঝিয়ের কাজও গৃহিণীর ঘাড়ে পড়িল। আর ঝি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কারণ চাকরের মত ঝিও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহাদের বয়স অল্প, তাহাদের কাজ করিবার দরকার নাই; জানি, বড়লোকদের কৃপায় তাহাদের মাসিক বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। পড়ন্তি বয়সের মেয়েদের অবশ্য কাজ করা ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু এমন বেতন হাঁকে যে, আমার মত লোকের ছেলেমেয়ের পেট না কাটিয়া দেওয়া চলে না।

এমনই করিয়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সমাজ-সোপানের নীচের ধাপে নামিয়া আসিলাম। আহার-বিহারে, বেশ-ভূষায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালীতে সাধারণের সমপংক্তি হইয়া উঠিলাম। অর্থ ও পদমর্যাদার সামনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা বাতিল হইয়া গেল। চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চাকা ঘুরিয়া গেল। আমার এক শ্যালক শহরের সাপ্লাই আপিসের বড় সাহেব হইয়া আসিল। আসিবার আগে আমাকে একটি বাড়ির জন্ত লিখিল। আমাদের পাড়ায় একটি ভাল বাড়ি খালি হইয়াছিল; সেইটি ঠিক করিয়া দিলাম। যথাসময়ে শ্যালক সপরিবারে আসিল ও ওই বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইল। আমি ও আমার গৃহিণী দুইজনে সব গুছাইয়া দিলাম।

রাঘববাবুর চিঠি আসিল। অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠি। সপরিবারে কেমন আছি—জানিবার জন্ত দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরিশেষে জানাইয়াছেন, ব্যবসা সম্পর্কে সাপ্লাই অফিসারের সঙ্গে দেখা করা তাঁহার বিশেষ দরকার। ইহার জন্ত তাঁহাকে নিজেই আসিতে হইত। কিন্তু আমি যেহেতু এখানে রহিয়াছি এবং সাপ্লাই অফিসার যেহেতু আমার শ্যালক, সেইজন্ত আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমি যেন তাঁহার হইয়া সাপ্লাই অফিসারকে বলিয়া কাজটি করিয়া দিই।

অভয় ডাক্তারের মেয়ের বিবাহ। কাপড়, চিনি ও আটা চাই। একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে পদার্পণ করিলেন। গৃহিণী কেমন আছেন জানিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল বলিয়া বোধ হইল তাঁহাকে। আমি যে তাঁহার কাছে যাই নাই, সেইজন্ত অভিমান ও অনুযোগ করিলেন। সর্বশেষে আসল কথাটি প্রকাশ করিলেন।

শ্যালকের জিপে চড়িয়া নিতাই ও ভব'র দোকানে একদিন গেলাম। আমাকে সাপ্লাই অফিসারের গাড়িতে দেখিয়া দুইজনেই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর সাপ্লাই অফিসারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিচয় পাইয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া নমস্কার করিল। নিতাই নিজে হইতে কহিল, হর্লিক্‌স কয়েক বোতল এসেছে, চাই নাকি? আমি মনে মনে হাসিয়া কহিলাম, দরকার হ'লে নেব।

অনেক দিন দোকানে পায়ের ধূলো দেন নি— বলিয়া নিতাই আকুল চক্ষে আমার দিকে চাহিল। নিয়মিতভাবে পায়ের ধূলা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিলাম। ভব দত্ত আমাকে আড়ালে ডাকিয়া আন্তরিক অন্তরঙ্গতার সহিত কহিল, অনেক ভাল ভাল ধুতি-শাড়ি এসেছে দোকানে, চাই তো একটা পারমিট—। বলিয়া কথাটা শেষ করিল না, শ্যালকের দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিল।

আচ্ছা হবে এখন ।—বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

হঠাৎ একদিন সকালে কয়লার আড়তদার বগলা নন্দী বাড়িতে আসিয়া হাজির। একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কহিলাম, কি খবর বগলা? কয়লা এসেছে নাকি? বগলা সাগ্রহে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ক মণ চাই বলুন, কালই পাঠিয়ে দেব। কহিলাম, বেশ, টাকাটা দিয়ে দিই তা হ'লে, কেমন? বগলা শশব্যস্তে কহিল, টাকার জন্তে তাড়া কি? আগে পাঠিয়ে দিই, পরে দেবেন এখন।

বগলা বিপদে পড়িয়াছে। কাহাকে কালো দরে কয়লা বিক্রয় করিয়াছে। কালো কয়লার অবশ্য কালো দরেই বিক্রয় হওয়া উচিত। কিন্তু সাপ্লাই অফিসার অত্যন্ত বেয়াড়া-বুদ্ধির লোক; যুক্তিটা মাথায় ঢুকে নাই। ফলে, বগলার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছে। বগলা যুক্তহস্তে অশ্রুপূরিত নয়নে কহিল, দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা করুন মাস্টার মশায়। এ বাজারে ব্যবসাটি গেলে ছেলেপিলে নিয়ে পথে দাঁড়াব

চুপ করিয়া সব শুনিয়া যথাবিধি ব্যবস্থা করিবার আশা ও আশ্বাস দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। যাইবার সময়ে আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গেল বগলা।

উপেন ধোপা তো সাপ্লাই অফিসারের বাড়িতে আমাকে দেখিয়া অবাক।

কোন রকমে সামলাইয়া কহিল, হুজুর, আপনি এখানে? হাসিয়া কহিলাম, সাহেব যে আমার শালা। তা তোমার মিলিটারির কাজ কেমন চলছে? উপেন হাত জোড় করিয়া কহিল, সে গেছে আজ্ঞে। তা আপনকার কাপড়চোপড় এখন যাচ্ছে কোথা? কহিলাম, পাড়ার ধোপার কাছেই দিচ্ছি। কি আর করব বল? তুমি তো আর কাচলে না। উপেন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ও কথা যেতে দেন আজ্ঞে। নেহাত বেজে প'ড়ে গিছলাম, না হ'লে আপনাদের মত খদ্দের আবার ছাড়ি! তা গিন্নীমা কি এখানে, না বাড়িতে? কাপড়গুলো তা হ'লে আজকেই—। কহিলাম, এবার থাক্। কাপড় ফিরে আসুক। পরের বার নেবে এখন।

চারু নাপিতও আবার আসিতে শুরু করিয়াছে।

আমার পুরাতন চাকরটি একদিন আসিয়া আমাকে ও গৃহিণীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জুট আপিসে চাকরি করিতেছিল, মাস কয়েক আগে চাকরিটি গিয়াছে। কহিলাম, চাকরি-বাকরি করবি? সে দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, গেরস্থ বাড়িতে চাকরি করতে আর মন সরছে নাই, বাবু। শুনলম, মামাবাবুর আপিসে পিয়নের চাকরি খালি আছে। আপনি একটু ব'লে দিলেই হয়ে যায়। কিরপা ক'রে এইটি ক'রে দেন এজ্ঞে! ছেলে-পিলে নিয়ে বড় কষ্ট! আপনার চাকরের ভাবনা হবেক নাই যতদিন আমি আছি। আমার ছোট ভাইটা বেশ বড়সড় হইছে তাকেই গতিয়ে দিব আপনকার কাছে।

তাহার চাকরি করিয়া দিলাম। পরিবর্তে সে আমার ভৃত্যসমস্যা সমাধান করিয়া দিল।

ঝিয়ের সমস্যা সমাধান করিল পরান। আবার অত্যন্ত ভক্তি করিতে শুরু করিয়াছে। শ্যালকের ও আমার—এই দুই বাড়িতেই ডাল তেল নুন ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছে। আমার পুরাতন ঝিটির কলিকাতার বাবু কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর, ভরণপোষণের ভার পরানই লইয়াছিল। শ্যালকের বাড়িতে ঝিয়ের প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকেই সেখানে বহাল করিয়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও একটি ঝি সংগ্রহ করিয়া দিল।

সমাজ-সোপানের আগেকার ধাপ ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া আসিয়াছি। সংসারযাত্রা অনেকটা সুগম হইয়াছে। তবে পরিচয় বদলাইয়াছে। আগে

সকলে বলিত, 'মাস্টার মশায়'; এখন বলে, 'জামাইবাবু'। এমন কি, আমার সহকর্মীরাও নাকি আমার পিছনে আমাকে জামাইবাবু বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। তবে এ-কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যাহারা আমার পূর্ব-পরিচয়ের মূল্য দিতে একদিন কার্পণ্য করিয়াছিল, তাহারাই আমার নব পরিচয়ের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতেছে।

শ্রীঅমলা দেবী

পদচিহ্ন

কুড়ি

স্বামীর শিয়রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন কাশীর বউ। রাধাকান্ত চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বৈঠকখানায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। স্বর্ণবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, কেষ্ট কেষ্ট! জল,—জল আন। রাধাকান্তদা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেছেন। কেষ্ট জল নিয়ে ছুটে গেল। মাথায় মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে অল্প শুশ্রূষাতেই তাঁর চেতনা ফিরল বটে, কিন্তু থরথর ক'রে তিনি কাঁপছিলেন তখনও। অ্যালোপাথি মতে চিকিৎসক কয়েকজন এখানে আছে। তাদের মধ্যে একজন কেবল পাস-করা ডাক্তার। বাকি সকলেই হাতুড়ে। পাস-করা ডাক্তারটি নবগ্রামে এসে প্রথমে রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই, আশ্রয় না হোক, আস্তানা নিয়েছিলেন। কিছুদিন তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াও করেছিলেন। লোকটি সরলপ্রকৃতির, একটু উচ্ছ্বসিত ধরনের মানুষ। সামান্য কৌতুকেই প্রচুর হাসেন, হাসিরও একটি অদ্ভুত ভঙ্গী আছে—'এ' শব্দে প্রথমে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়ে খি-খি-খি-খি ক'রে হেসেই চলেন, হেসেই চলেন। রাধাকান্তকে তিনি শ্রদ্ধাও করেন, ভালও বাসেন। তিনি কিন্তু আজ খবর পেয়েও আসতে পারেন নি সঙ্গে সঙ্গে। গোপীচন্দ্র যে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন আজ হতে গিয়েও হতে পারল না, কমিশনার সাহেব রুষ্ট হয়ে রক্তমুখে চাবি ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন, সেই চিকিৎসালয়ে তিনি মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। ডাক্তারখানার দ্বারোদ্ঘাটন না হ'লেও ডাক্তারের উপর ভার পড়েছিল অপ্রত্যাশিত দায়িত্বের। কমিশনার সাহেবের প্রস্তাব, তিনি নতুন নক্‌শা পাঠিয়ে দেবেন, সেই নক্‌শা অনুসারে নতুন বাড়ি হবে, এবং গোপীচন্দ্রের

সবিনয় আনুগত্য ও আকূতিপূর্ণ প্রতিশ্রুতির আলোচনার মধ্যে গোপীচন্দ্র, কমিশনার সাহেব ছাড়া ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অমরচন্দ্র। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডাক্তার সেই দরজায় ছিলেন দ্বাররক্ষক। এতে অবশ্য একালের ডাক্তারেরা নিজেদের অপমানিত বোধ করবেন, কিন্তু সেকালের ডাক্তারেরা করতেন না। সেকালের শতকরা নিরেনব্বই জনই করতেন না। বরং ছদ্মবেশী কালপুরুষের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের গোপন আলোচনাকালে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত লক্ষ্মণের মতই নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। এই কারণেই রাধাকান্তর অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও তিনি আসতে পারেন নি। হাতুড়ে ডাক্তারদের কাউকে ডাকতে দেন নি কাশীর বউ। রাধাকান্তও বলেছিলেন, না, কাউকে ডাকতে হবে না। আমি সুস্থ হয়েছি।

কাশীর বউ তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে, বিশ্রাম করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাধাকান্ত বলেছিলেন, আমায় একবার থানায় যেতে হবে যে।

কাশীর বউ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না।

'না' নয়। রাধাকান্ত উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

কাশীর বউ আবার বললেন, না। তারা যা করেছে, তার ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠতে পাবে না।

স্বর্ণবাবু অপেক্ষা করছিলেন বাইরে—দরদালানে। রাধাকান্ত ও তাঁর স্ত্রীর কথাবার্তা সবই তাঁর কানে আসছিল। তিনি বললেন, আমি যাচ্ছি থানায়। তুমি বিশ্রাম কর রাধাকান্তদা। বউদি ঠিক কথাই বলেছেন।

কাশীর বউ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই ঘর থেকে জবাব দিলেন, না।

রাধাকান্ত সবিস্ময়ে তাকালেন কাশীর বউয়ের দিকে, ঘরের ভিতর থেকেও স্বর্ণবাবুর কথায় তিনি জবাব দিচ্ছেন বেশ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে—এটা তাঁকে বিস্মিত করলে। এটা তাঁর কাছে স্ত্রীস্বাধীনতার একটা স্পর্ধিত দৃষ্টান্ত ব'লে মনে হ'ল।

কাশীর বউ কিন্তু 'না' ব'লেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ব'লেই গেলেন, যাদের ধরেছে, তারা সাধারণ চোর-ডাকাত নয়; সাধারণ চোর-ডাকাতে সাধারণের অনিষ্ট করে, এরা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে, হয়তো বা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আর যারা সদর কি কলকাতা থেকে তাদের ধরতে এসেছে, তারাও

আপনাদের পরিচিত পুলিস নয়। তারা গোয়েন্দা-বিভাগের লোক। যে গোয়েন্দারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অপরাধ তদন্ত করে, এরা তারাই। তা ছাড়া আপনার যাওয়ার কোন হেতুও নাই। গেলে আপনার অনিষ্ট হতে পারে। আপনি জমিদার; গভর্মেণ্ট এর জন্তে অসন্তুষ্ট হবেন, আপনার উপর কৈফিয়ৎ চাইবেন, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। যাওয়া তো মিথ্যে হবেই, তার উপর আমার ভাইয়ের জন্তে আপনার অনিষ্ট হোক, এ আমি চাই না। সুস্থ থাকলে ইনি যেতেন—সে যেতেন শুধু ব্যাপারটা জানবার জন্ত।

স্বর্ণবাবুও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কথাগুলি শুনে। তাঁর স্ত্রী অতম্ভা মুখরা, অত্যন্ত কলহ প্রিয়া, প্রচণ্ড দম্ভ তাঁর। তাঁর রজনীদিদির কথাবার্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সে কথাবার্তায় মর্যাদার মিষ্ট আবরণের মধ্যে থাকে মর্মান্তিক প্রদাহক জ্বালা, সেও তিনি অনেক শুনেছেন। কিন্তু এই মেয়েটি সরল সহজ ভাষায় যে ভাবে তাঁকে তুচ্ছ ক'রে দিলে, এমন আর কখনও কেউ করে নি তাঁকে। তিনি উত্তর খুঁজে পেলেন না। ক্ষোভের মধ্যে তিনি একটি মাত্র পথ এবং উত্তর পেলেন, তাঁর সামনেই সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল, সেই দিকে পা বাড়িয়ে তিনি বললেন, তা হ'লে আমি চললাম রাধাকান্তদা।

রাধাকান্ত স্বর্ণের কথাব জবাব দিলেন না। দিলেন না নয়, দিতে পারলেন না। তিনি স্তম্ভিতবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাশীর বউ যখন প্রথমে স্পষ্ট কণ্ঠে 'না' ব'লে স্বর্ণবাবুর কথার জবাব দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, শহরের মেয়ের শিক্ষাদীক্ষাসম্ভূত স্পর্ধিত স্বভাবের এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বর্ণের মত সম্মানিত ব্যক্তির কথার উত্তরে, তিনি উপস্থিত থাকতেও, এ ধারায় সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূর জবাব দেওয়া লজ্জাহীনতার লক্ষণ; শহরের এক শিক্ষকের কন্তার সে সম্ভ্রমজ্ঞান না থাকাই প্রমাণিত করলেন কাশীর বউ এবং পরমাশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁর সমক্ষেই সে কথা প্রমাণ করলেন তিনি। কিন্তু পরের কথাগুলি শুনে সে বিস্ময় তাঁর শতগুণ বড় হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, নীরব লজ্জাশীলতার গৌরব ও সে প্রথার প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত বংশের যে সম্ভ্রম, সে গৌরব এবং সম্ভ্রমকে অতিক্রম ক'রে কাশীর বউ তার চেয়ে বড় গৌরব এবং সম্ভ্রমের অধিকারিণী ব'লে প্রমাণ করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু স্বর্ণ নন, তিনিও নিজেকে যেন ছোট ব'লে মনে করলেন শহরের এই শ্রীমতী মেয়েটির কাছে। কটি কথা এখনও তাঁর

কানের কাছে বাজছে।—'এরা গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে, হয়তো বা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।' দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করতে পারে এখানকার জমিদারেরা, সামাজিক বিরোধেও পারে, সমস্ত সমাজের সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারে, সরকারের সঙ্গে স্বত্ববিরোধ নিয়ে মামলা করতে পারে, কিন্তু স্বপ্নেও তারা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পনা করতে পারে না। কাশীর বউ অকম্পিত কণ্ঠে, ম্লান হ'লেও ঈষৎ হাসি হেসেই, কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে গেলেন। তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে যাচাই ক'রেও এই মেয়েটির শিক্ষা এবং দীক্ষাকে অসত্য বা উচ্ছৃঙ্খল মনে করতে পারলেন না। নিন্দার কিছু খুঁজে পেলেন না, শাসন করবার মত ঔদ্ধত্যের সন্ধান পেলেন না। তাঁর মনে হ'ল, আজ তিনি কাশীর বউকে নতুন ক'রে চিনছেন।

কাশীর বউ তাঁর স্থির বিস্মিত দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এতক্ষণে, বললেন, আমার উপর রাগ করলে?

রাধাকান্ত ঘাড় নেড়ে জানালেন, না।

কাশীর বউ বললেন, না ব'লে আমার উপায় ছিল না। তারপর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, কিছু মনে ক'রো না, এখানে ওসব আন্দোলন নাই, এখানকার লোকে ঠিক বুঝতে পারেন না সব। দেশ, স্বাধীনতা—এ সবের কোন ভাবনাই কখনও ভাবেন না, সায়েব-সুবোর একটু খাতির করলেই হাতে স্বর্গ পান, ইংরেজ-রাজত্বকে অদৃষ্টের বিধান মনে করেন। স্বর্ণ-ঠাকুরপো থানায় গিয়ে রবিকে কিশোরকে হয়তো পীড়াপীড়ি করতেন দোষ কবুল করতে। হয়তো তাদের তিরস্কার করতেন।

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, তুমি সত্য বলেছ।

হঠাৎ নীচে জুতোর শব্দে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চকিত হয়ে উঠলেন। কয়েক-জনেরই জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বাড়ির উঠানে; প্রথামত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সাড়াও দিলেন আগন্তুকেরা। মুশকিলের কথা, চাকর কেষ্টও বাড়িতে নাই, সে গিয়েছে কবিরাজ মাখন দত্তের কাছে। ডাক্তারকে না পেয়ে কাশীর বউ কেষ্টকে পাঠিয়েছেন কবিরাজের সন্ধানে। রাধাকান্ত নিজেই উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কাশীর বউ বললেন, না। এ অবস্থায় তোমার ওঠা উচিত নয়।

রাধাকান্ত বললেন, কিন্তু কে এলেন, দেখতে হবে তো!

এখান থেকেই সাড়া দাও। আর যদি কিছু মনে না কর, তবে আমি জানলা থেকে কথা বলতে পারি।

রাধাকান্ত ভাবছিলেন। ঠিক এই সময়েই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাধাকান্ত-মামা!

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। গোপীচন্দ্রের কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকণ্ঠের জবাব শোনা গেল, বাবার অসুখ করেছে। শুয়ে আছেন। গৌরীকান্তর কণ্ঠস্বর। গৌরী বোধ হয় নীচে রয়েছে।

অসুখ! কি প্রকার অসুখ? কি নাম তোমার? হ্যা হ্যা, রাধাকান্তস্য পুত্র, গৌরীকান্ত বুঝি! এই তো সভায় ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে কি অসুখ করল?—বংশলোচনের কণ্ঠস্বর।

বাবা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন।

বলিহারি বলিহারি! তা বলি, ভয়ে নাকি হে? না বাবা শিখিয়ে দিয়েছে ওই কথা বলতে?

না। বাবা শুয়ে আছেন। মা মাথায় বাতাস করছেন।

তুমি মিছে কথা বলছ হে। ডাক তোমার বাবাকে।

গৌরীকান্ত এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠল, না। আমি মিথ্যে কথা বলি না। মা বারণ করেছেন। কেন মিথ্যে কথা বলব আমি?

রাবণের বেটা মহিরাবণ, তার বেটা অহিরাবণ—মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে প'ড়েই যুদ্ধ করেছিল। বলিহারি বলিহারি!

চুপ করুন লচুকাকা। ছি, করছেন কি? বালকের সঙ্গে এ কি করছেন?—কণ্ঠস্বর গোপীচন্দ্রের।

রাধাকান্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কাশীর বউ লক্ষ্য ক'রেই খাট থেকে নেমে প'ড়ে বললেন, তুমি উঠো না। আমি দেখছি। ওঁদের কি ডাকব?

রাধাকান্ত বললেন, ডাক। কাশীর বউ বধূ হয়ে কথা বলতে উদ্যত হয়েছেন, এতে তিনি আর আপত্তি করলেন না।

কাশীর বউ জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন, সেখান থেকে অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, গৌরীকান্ত, ওঁদের উপরে নিয়ে এস। তাঁর নীচে নামবার শক্তি নাই এখন।

বংশলোচন থেকে গোপীচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বধূটির এই

তাকে কথা বলা শুনে। লজ্জাহীনতার জন্য নিন্দা করবার জন্য অন্তর শতমুখী হয়ে উঠেছে সকলের, এই সমাজপ্রচলিত রীতিপদ্ধতি লঙ্ঘন করার ঔদ্ধত্য এবং স্পর্ধাও যেন এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে আগুনের উত্তাপের মত, অথবা আগুন-ধরা দাহ্যবস্তুর ধূমায়মান অবস্থায় ধোঁয়ার মত, জ্ব'লে উঠে সে আগুন চারিদিকে ছড়াবে—এমন শঙ্কাও মনে উঁকি মারছে সমাজপতিদের। কিন্তু তবু কোথায় রয়েছে সমস্ত কিছুর অন্তরালে অথবা সমস্ত কিছুকে ঢেকে এমন একটা মর্যাদার মহিমা, যাকে নিন্দা করা যায় না, শাসন করা যায় না, শুধু সম্ভ্রম ক'রে মান্য করতে বাধ্য হতে হয়। তার উপর বধূটি যে পরিবারের বধূ, সেই পরিবারের সম্ভ্রম আছে। অন্য কোন সাধারণ পরিবারের বউ হ'লে, যতই মর্যাদা থাক্ না কাশীর বউয়ের কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ভঙ্গীতে, তাতে প্রাচীনতম জমিদার-বংশের বংশধর বংশলোচন তাকে শাসন করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

কাশীর বউ আবার বললেন, তুমি আগে আগে এস গৌরী, সিঁড়িটা অন্ধকার।

ঠিক এই মুহূর্তেই কেষ্ট চাকর এসে বাড়িতে ঢুকল, তার পিছনে কবিরাজ মাখন দত্ত। দত্তকে দেখে গোপীচন্দ্র চমকে উঠলেন। বংশলোচন ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে চঞ্চল হলেন। রাধাকান্তের অসুখ তা হ'লে সত্য।

দত্ত বললেন, কেমন আছেন এখন?

গোপীচন্দ্র একটু ইতস্তত ক'রেই উত্তর দিলেন, এই আসছি আমরা। তবে বোধ হয় সুস্থই আছেন। কি অসুখ?

আমিও তো এই আসছি। শুনলাম, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হয়েছে। সেইটাই সুসংবাদ। নইলে—। মাথা নেড়ে দত্ত বললেন, ওটা খারাপ। অনেক সময়—

বংশলোচন বললেন, বার বার বলি আমি রাধাকান্তকে, ওহে, ভীমের মত মেজাজ নিয়ে যুধিষ্ঠির সাজতে যেও না। ক্রোধকে চেপো না। রাগ চাপতে গিয়েই এমন হয়েছে। বুঝেছ কিনা, এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।

গোপীচন্দ্র বললেন, চলুন চলুন, দেখবেন চলুন। ডাক্তারকেও ডাকলে হয় না। সে তো ওখানে রয়েছে।

কেষ্ট বললে, আজ্ঞে, তাঁকে ডেকেছিলাম প্রথমেই। তিনি আসতে পারেন নি। সায়েবরা রয়েছেন—

মাখন দত্ত বললেন, যাঁরা চিনি খান, তাঁদের চিন্তামণি ভরসা গোপীচন্দ্রবাবু। দীনবন্ধু দীনদরিদ্র নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরই বা অবসর কোথায়, আর চিনিখোরদের তাঁকে ডাকলেই বা চলবে কেন? চলুন, দেখি, আমিই দেখি আগে।

গৌরীকান্ত বললে, আসুন।

গোপীচন্দ্র হঠাৎ তাকে কোলে তুলে নিলেন, পরম সমাদর ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, গৌরীকান্ত, মিথ্যা কথা বলে না, আমি জানি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

* * * *

শেষ রাত্রে বিছানায় উঠে বসলেন রাধাকান্ত। অনুভব করলেন, অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। দত্ত কবিরাজ তাঁকে ঘুমাবার ওষুধ দিয়েছিলেন। কবিরাজ হ'লেও মাখন দত্ত অ্যালোপাথি ওষুধ ব্যবহার ক'রে থাকেন। বংশানুক্রমিক চিকিৎসক তাঁরা। তাঁদের পূর্বপুরুষের আবিষ্কৃত অথবা বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে সংগৃহীত অনেক অব্যর্থ ফলপ্রদ নিজস্ব ওষুধও আছে। নাড়ীজ্ঞান এবং রোগনির্ণয়ে অসাধারণ বোধ। এ সব সত্ত্বেও শহরে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ এবং বিদেশী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মাখন দত্ত বাংলা ভাষায় কয়েকখানি অনুবাদ-বই কিনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিজেই শিখেছেন। শহরের ঢেউ নবগ্রামে এসে লাগবেই। এখানকার ভদ্র সম্ভ্রান্ত সমাজ এ অঞ্চলের সর্বাগ্রে শহরের ধারাধরনকে গ্রহণ ক'রে থাকেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ হয়েছে, স্কুল হয়েছে, সেখানকার পাস-করা ডাক্তারেরা শহর এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেখে এসে বসতে আরম্ভ করেছে, কাজেই নবগ্রামে তাঁকে চিকিৎসক হিসাবে বেঁচে থাকতে হ'লে এ শিক্ষা তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে, এ বুদ্ধি তাঁর সহজেই হয়েছিল। রাধাকান্তকে দেখে তাঁকে তিনি ঘুমাবার ওষুধই দিয়েছিলেন—অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ। এবং ঘুম যতক্ষণে আপনি না ভাঙে, ততক্ষণ তাঁকে ডেকে জাগাতে নিষেধ করেছিলেন।

রাধাকান্ত ঘুমিয়েছিলেন ঠিক সন্ধ্যার পরেই। জেগে উঠলেন শেষ রাত্রে। তাঁর খাটের পাশের জানলাটির সম্মুখে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পাক খেয়ে ঘুরে ঝুলে পড়েছে। গ্রামের চারিপাশের গাছপালাগুলির মাথায় ভোরের বাতাস লেগেছে মনে হচ্ছে। মৃদু মর্মর শব্দ জেগেছে যেন। পূর্ব দিকের আকাশ দেখা যায় না এদিক থেকে; ওদিকে এতক্ষণে পূর্বদক্ষিণ কোণে

শুকতারা উঠেছে, পলে পলে সে দিগন্ত থেকে আকাশের উপরের দিকে উঠছে। খাটের উপরে কাশীর বউ এবং গৌরীকান্ত প্রগাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কাশীর বউ অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত জেগে ব'সে ছিলেন স্বামীর শিয়রে। তাঁর দিকে চেয়ে রাধাকান্তের মন ব্যথায় ভ'রে উঠল। তাঁর জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে রাজরাণী হবার যোগ্য এই মেয়েটি শুধু দুঃখই পেলে। বহুবার এ কথা তাঁর মনে হয়েছে। তাঁর ডায়েরির মধ্যে প্রতি মাসে অন্তত একবার ক'রে কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই সেদিন বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষ্যে কাশীর বউ তাঁর কাছে এক শো টাকা চেয়েছিলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল, গ্রামের সকল ছেলেদের তিনি খাওয়াবেন এবং ছোট বাঁশের লাঠিতে লোহার ফলা লাগিয়ে প্রত্যেককে এক-একটি বর্শা বা বল্লম দেবেন। রাধাকান্তের কাছে প্রস্তাবটা প্রথমে কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল; এই মেয়েটির অধিকাংশ কাজকর্ম, কথাবার্তা, কল্পনা রাধাকান্তের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, কিন্তু পরে ভেবে-চিন্তে বুঝে সেগুলি তাঁর কাছে বড় ভাল লাগে। মেয়েটির কল্পনার অভিনবত্ব, দীপ্তিময় তীক্ষ্ণতা তখন নূতন বিস্ময়ে তাঁকে অভিভূত করে। বীরাষ্টমী ব্রতে এই প্রস্তাব প্রথমে রাধাকান্তের কাছে উদ্ভট মনে হ'লেও পরে তাঁর কাছে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু হাতে টাকা ছিল না, স্ত্রীর সাধ তিনি সেইজন্য পূর্ণ করতে পারেন নাই। সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "নিজের অক্ষমতার জন্য সমস্ত জীবনই দুঃখভোগ করিতে হয়। তাহার জন্য দুঃখ নাই। ভাগ্য বিরূপ, কি করিব? কিন্তু কোনমতেই দুঃখকে সম্বরণ করিতে পারি না, লজ্জা অনুভব না করিয়া পারি না যে, বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রকে আমার দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করিতেছি। আমার পত্নীর মত সর্বগুণান্বিতা নারী এ অঞ্চলে নাই। সে রাজরাণী হইবার উপযুক্ত। রাজরাণী হইলে তাঁহার গুণরাজি পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিত। আমার গৃহে যে কল্যাণ করিতে পারে, সেই কল্যাণ সে সমগ্র রাজ্যের ঘরে আনয়ন করিত। দরিদ্রের ঘরে সোনার প্রদীপ আসিয়া পড়িলে ঘৃত দূরে থাক্ তৈলাভাবেও তাহাতে আলোক প্রজ্বলিত হয় না; সোনার প্রদীপ আক্ষেপ করে না, কিন্তু দরিদ্রের মনোবেদনা কি উপায়ে নিবারিত হইবে? নিবারণ যিনি করিতে পারেন, তাঁহারই চরণ আমার ভরসা। তাঁহাকেই নিবেদন করিতেছি।" পূজার পরই তিনি কলকাতায় এক বন্ধুর কাছে পাঁচ

টাকা পাঠিয়ে বিলাতী ঘোড়দৌড়ের লটারির একখানি টিকিট কিনতে লিখেছেন।

আজও সেই কথাই তাঁর মনে জেগে উঠল। মেয়েটির ভাগ্যদোষ এবং ভাগ্যহীনতার মধ্যেও এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, তাঁর সঙ্গে ওর ভাগ্য এবং জীবন জড়িয়ে গিয়েছে। শুধু তাঁরই নয়, নবগ্রামেরও সৌভাগ্য ব'লে তাঁর মনে হ'ল। মেয়েটির সর্বাঙ্গে লেগে কাশীর পুণ্যময় মৃত্তিকা এসে নবগ্রামের মৃত্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। ওর শানিত শিক্ষার দীপ্তি ও ক্ষুরধারের সংঘর্ষে এখানকার মানুষের মনের লোহার মরচের স্তরে একটা ঘর্ষণ লেগেছে। তিনি নিজে—নিজেই কি তিনি কম দীপ্তি পেয়েছেন কাশীর বউয়ের কাছে?

তাঁর মনে পড়ল এখানকার একটি প্রৌঢ়া স্বৈরিণীর কথা। কাশীর বউকে বিবাহ করবার পূর্ব থেকেই অবশ্য তাঁর মনে নবগ্রামসমাজপ্রচলিত ভোগ-বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন। কাশীর বউকে বিবাহ ক'রে তিনি সত্য বল পেলেন। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্র নিয়ে পড়লেন। তাতেও প্রেরণা দিয়েছিল কাশীর বউয়ের পড়ার নেশা। তখন ওই স্বৈরিণীটি দেখতে এসেছিল কাশীর বউকে। বলেছিল, দাঁতাল হাতীর পিঠের মাহতকে দেখতে এসেছি।

তাঁর সম্পদ থাকলে আজ ওই মেয়েটিকে পাশে নিয়ে নবগ্রামের মুখ ফেরাতে পারতেন এই দক্ষিণপাড়ার দিকে। যে মুখ আজ ফিরল ওই পতিত প্রান্তরের দিকে গোপীচন্দ্রের অর্চনায়, সে মুখ এই দিকে ফিরত। কিন্তু সে হ'ল না। পৃথিবীর সেবায় পার্থিব মূলধন নাই তাঁর। তবু তাঁর জীবনে অপার্থিব বস্তুর দিকে অনুরাগ এসেছে। সেও এই এরই কল্যাণে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তিনি চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে আলো ফুটছে, আকাশের তারা মিলিয়ে আসছে। পাখিরা কলরব ক'রে একবার ডেকে উঠল। আবার ডাকল। মনে মনে তিনি স্তবপাঠ শুরু করলেন। হঠাৎ খাটের উপর শব্দ হতেই পিছন ফিরে দেখলেন, গৌরীকান্ত উঠে ব'সে তাঁর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে আছে। রাধাকান্ত সস্নেহে হাসলেন। স্তবপাঠ তিনি ভুলে গেলেন। মনে হ'ল, তাঁর এবং কাশীর বউয়ের মিলিত জীবনধারার থেকে এই নূতন ধারাটি, এ কি নবগ্রামে সার্থকতা লাভ করতে পারবে না? পারবে, নিশ্চয় পারবে।

বরং গোপীচন্দ্র আজই তাঁর কাছে ব'লে গেছেন সে কথা। শুধু হয়েই শুয়ে ছিলেন রাধাকান্ত, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেককে লক্ষ্য করছিলেন। গোপীচন্দ্র কথাটা বলার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন, এ কথা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে। অন্যের চোখ এড়ালেও তাঁর চোখ এড়ায় নাই।

গোপীচন্দ্র কিছু বলবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা দেখে সে কথা গোপন ক'রে বললেন, আপনার অসুখ শুনেই এলাম।

বংশলোচন কিছু বলতেই চেয়েছিলেন, তিনি নিরস্ত হতে চান নি, গোপীচন্দ্র ইঙ্গিতে তাঁকে নিষেধ করেছেন—সেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তা ছাড়া, তাঁকে দেখতেই যদি এসেছিলেন, তাঁর অসুস্থতার সংবাদই যদি জানতেন, তবে বংশলোচন গৌরীকান্তকে 'বাবার অসুখ, বাবা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে নাকি হে?' এ কথাই বা বললেন কেন? বক্তব্য নিশ্চয় কিছু ছিল। এবং সে বক্তব্য অবশ্যই অপ্রিয়, কারণ প্রিয় বক্তব্য হ'লে বলতে বাধা ছিল না। গোপীচন্দ্রের ভাবে ভঙ্গীতে কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক গুরুতাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। কথাটা যে কি, অনুমান করতে গিয়ে বার বার তাঁর মনে হয়েছে, কথাটা রবিকে নিয়ে নিশ্চয়। রবি তাঁর সহস্তী, তার অপরাধের জন্য সম্ভবত তাঁকেই কিছু বলতে এসেছিলেন। তিনি ছাড়া আর কাকেই বা বলবে লোকে? কিন্তু কি বলতে এসেছিলেন? এমন ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখানোই রীতি ও বিধি। অথচ সহানুভূতির সুর তো সমস্ত আলাপের মধ্যে ক্ষীণতম ধ্বনিতেও বেজে উঠল না! আরও একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বংশলোচন ব'লে গেছেন কথাপ্রসঙ্গে; কমিশনার সাহেব গোপীচন্দ্রকে বলেছেন, এখানকার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তোমার, গোপীচন্দ্রবাবু। আমরা দায়ী করব তোমাকে। গোপীচন্দ্র বলে, ভাল করবার ভার নিতে পারি, মন্দ কেউ করলে তার দায় আমি পুরব কি ক'রে? আমি বলি, তা পুরতে হবে। রামচন্দ্রের রাজত্বে শূদ্র তপস্যা করেছিল, সেই পাপে ব্রাহ্মণের ছেলের অকালমৃত্যু ঘটল। ব্রাহ্মণ দায়ী করলে রামচন্দ্রকে। রামচন্দ্রকে প্রতিকার করতে শূদ্র তপস্বীকে বধ করতে হয়েছিল। তোমাকেও তাই করতে হবে।

গোপীচন্দ্র বংশলোচনকে নিরস্ত করেছিলেন, না হ'লে বংশলোচন কথাটা বলতেন। কথাগুলি তখন শুনে রাধাকান্তের মনে হয়েছিল, গোপীচন্দ্রের

ম্যানেজারবাবু মনিবের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছেন। কমিশনার সাহেব তাঁর দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ঘর দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বারোদবাটিক্স করেন নি, রূঢ়ভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, সেই কথাটা ঢাকছেন এমন ধারার বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হ'ল, না। কথাটার অর্থ আছে। হয়তো—

শূদ্র তপস্বী ব'লে গেলেন বংশলোচন তাঁকেই। ধারণাটা মুহূর্তে তাঁর মনে সত্য হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভিতরটা যেন ঝিমঝিম ক'রে আবার ঘুরে গেল। তিনি দু হাতে জানলার গরাদে ধ'রে আত্মসম্বরণ করলেন। তিনি ডাকতে যাচ্ছিলেন কাশীর বউকে, কিন্তু তার পূর্বেই কেউ বাড়ির নীচের রাস্তা থেকে তাঁকে ডাকলে, কে দাঁড়িয়ে? রাধাকান্তবাবু?

সামলে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, কে?

আমি, ডাক্তার। কেমন আছেন? কাল কোন রকমেই আসতে পারলাম না।

ডাক্তার! এই ভোরবেলা কোথায় গিয়েছিলে?

বাবুকে দেখতে।

বাবুকে? ও, গোপীচন্দ্রবাবুকে! সে কি! কি হ'ল তাঁর?

ডায়রিয়া। খুব বেশি রকমই হয়েছে।

ডায়রিয়া?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা শক্ত। কাল খাওয়াদাওয়ার অনাচার হয়েছে।

রাধাকান্ত উত্তর দিলেন না। চুপ ক'রে রইলেন। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গরের একটি কলি তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিল, মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং।

ডাক্তার বললেন, এখন চলি। সকালে আসব। বলব, অনেক কথা আছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা ব'লে যাই। গলা চেপে তিনি বললেন, কলকাতার সি. আই. ডি. আজ সকালে আপনার এখানে আসবে। সম্ভবত—

কি?

সম্ভবত বউঠাকরুণের একটা এজাহার নেবেন। একটু সাহস দিয়ে তাঁকে তৈরি ক'রে রাখবেন।

রাধাকান্ত ধীরে ধীরে ব'সে পড়লেন জানলার গরাদে ধ'রে। গৌরীকান্ত

খাট থেকে ঝুলে প'ড়ে নেমে তাঁর কাছে এসে ছোট দুটি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধ'রে ডাকলে, বাবা! বাবা!

*　　　*　　　*

দিন পনরো পর।

রাধাকান্ত সেই জানলাটির ধারেই ব'সে ছিলেন। সবল বিশাল দেহখানি তাঁর শীর্ণ হয়ে গিয়েছে এই কয়েকদিনের মধ্যেই। আবারও তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সেদিন ভোরে। কাশীর বউ সম্পর্কে মনকে তিনি যথাসাধ্য উদার ক'রেও, কলকাতার সি.আই.ডি. এসে তাঁর এজাহার নেবে—এ কল্পনা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কোন রকমে তিনি বেঁচে উঠেছেন বটে, কিন্তু কবিরাজ আশঙ্কা করেন, হয়তো কর্মক্ষম আর হবেন না তিনি। এ ভাঙা শরীর আর সুস্থ হবে না। এ কয়েকদিন বিছানাতেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন, আজ উঠে এসে জানলার ধারে বসেছেন। আজ দিনটি নবগ্রামে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুদিন আগে থেকেই একটা বাদলা নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। চৈত্রের শেষ। বসন্তের বাতাস মোড় ফিরিয়ে উত্তর দিক থেকে বইছে, নতুন ক'রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। তবু এরই মধ্যে লোকজনের ভিড়ের আর অন্ত নাই। উৎসুক হয়ে মেয়েরা এসে জমেছে রাধাকান্তের বাড়ির পাশের চণ্ডীমণ্ডপে। পুরুষেরাও আসছে, কিন্তু তাদের বলা হচ্ছে, পুরুষেরা ফুলডাঙায় যাও।

অসুস্থ গোপীচন্দ্র চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন। ডায়রিয়ার আক্রমণ থেকে কোন রকমে তিনি বেঁচে উঠলেন, কিন্তু তা থেকে আমাশয় আরম্ভ হয়েছে। সে আমাশয় কোন রকমেই কমছে না। এখানকার চিকিৎসকেরা শঙ্কিত হয়েছেন, নিজেদের চিকিৎসায় রাখতে ভরসা করছেন না। তাই কলকাতায় যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ট্রেন রাত্রে, কিন্তু যাত্রার শুভক্ষণ সকালেই সর্বোত্তম ব'লে এখনই যাত্রা ক'রে তিনি ভিতর-বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিনটা বিশ্রাম করবেন তাঁর নিজের কীর্তিভূমি ওই ফুলডাঙায়। সেখান থেকে রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রা করবেন ট্রেন ধরতে। এ যাত্রার মধ্যে চারিদিকে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে উঠেছে। লোকে দলে দলে তাঁর যাত্রা দেখতে আসছে, যেন তিনি আর ফিরবেন না। তাই রাধাকান্তও আজ এসে বসেছেন এই জানলার ধারে। গোপীচন্দ্র মহাভাগ্যবান, ভগবানের অনুগৃহীত, বহু পুণ্যে

পুণ্যবান ব্যক্তি। মহাপুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। এ নবগ্রামের ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপুরুষ। তাঁকে দেখবেন বইকি।

আকাশ মেঘম্লান।

রাধাকান্তের মনে হ'ল, নবগ্রামের ভাগ্যাকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আকাশে। নীচে মৃদু কলরব উঠছে। সমবেত লোকেরা মৃদু গুঞ্জনে নবগ্রামের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করছে। তিনি যেদিন যাবেন, সেদিন নবগ্রাম কতখানি বেদনা প্রকাশ করবে, কে জানে? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্তম্ভের সূচনা হয়েছিল সেই দিনটিতেই, কুলীনপাড়ার কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা করেছিলেন সেদিন। বর্ষার শেষ ছিল সময়টা। শরতের প্রারম্ভ। শরতের প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল। মধ্যে মধ্যে লঘু মেঘ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ছায়ার বিষণ্ণতায় বিষণ্ণ ক'রে তুলতে পারে নি। মানুষও এসেছিল দলে দলে, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। হিন্দু এসেছিল, মুসলমান এসেছিল। প্রত্যেকেরই মুখে ওই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। মৃত্যুর মধ্যে যে অভয় অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জে, পার্থিব সমস্ত কিছুর নশ্বরতার অতীত অবিনশ্বর মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের যে স্পর্শ পেয়েছিলেন সেকালের সে বৃদ্ধ, তারই প্রতিবিম্ব যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সকল পটভূমিতে, সকল পাত্রের সর্ব অবয়বে—সেদিনের উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্যন্ত সকল ক্ষণটি পরিব্যাপ্ত ক'রে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের জ্যোতির প্রতিচ্ছটা যেমন তীরবর্তী তরুশীর্ষকে উজ্জ্বলতর উষ্ণতর ক'রে তোলে, তেমনই ভাবে।

রাধাকান্তের একান্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে, তিনি যেন তেমনই প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় অভয় দীপ্তি মানুষের মুখে ফুটিয়ে তুলে যেতে পারেন। যেতে তাঁকে অচিরেই হবে। সে তিনি যেন অনুভব করছেন।

"যেতে তাঁকে অচিরেই হবে"? ব্যাকরণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে। তাঁর নিজের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। আর ভবিষ্যৎ কাল কেন? এই কি বর্তমানতার লক্ষণ? মৃত বনস্পতির কাণ্ডটা মানুষ কবে কেটে অগ্নিসাৎ করবে, তারই অপেক্ষায় বনস্পতিকে কি বর্তমান বলা যায়?

মনে পড়ল মাখন দত্তের কথা—মরতে আমরাই মরলাম রাধাকান্তবাবু।

গীতায় মোহগ্রস্ত পার্থকে পার্থসারথি বলেছিলেন, ওই যে কুরুসৈন্য, যাদের বধ করতে হবে ব'লে তুমি শোকপরায়ণ হয়েছ, তাদের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তারা আমা কর্তৃক পূর্ব থেকেই বিগতপ্রাণ হয়ে রয়েছে। তারা মৃত।

কাল তাঁকে, শুধু তাঁকে নয়, এই নবগ্রামের বর্তমানকেই নিঃশেষিতপ্রাণ করেছে তাদের অজ্ঞাতসারে। অরণ্যের মৃত বৃক্ষকাণ্ডগুলি শুধু মৃত্তিকালগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চিত্রকরের আঁকা চিত্রের অরণ্যের মত। মৃত বৃক্ষের মূলজাল শুধু মাটির মধ্যে নবজাতকদের মূল বিস্তারে বাধা দিচ্ছে। কোন কোন গাছে হয়তো দু-চারিটি পাতা এখনও অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আর কিছু নাই, বৃদ্ধিও নাই, ফুলও ধরে না, ফল তো দূরের কথা। তারাও কি জীবিত, তাদের ব্যাকরণ-নির্ণয়ে বর্তমান বলা চলে?

নীচে চণ্ডীমণ্ডপে অকস্মাৎ সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতার আকস্মিকতায় রাধাকান্তের চিন্তামগ্ন মন চকিত হয়ে উঠল। এই স্তব্ধতাই গোপীচন্দ্রের যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। তাঁকে নিশ্চয় দেখা গেছে। সম্ভবত বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি পাল্কি এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াল। পাল্কির মধ্যে গোপীচন্দ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ হাতখানি দেখতে পেলেন রাধাকান্ত।

পাল্কি নামানো হ'ল। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন পাল্কি থেকে। কীর্তিচন্দ্র ও ছোট ছেলে পবিত্রের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সকলকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন। দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করলেন। পাড়ার মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলেন এক দিকে, তাঁদের মধ্য থেকে স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী দুর্দান্ত অমূল্যের মা এগিয়ে এসে একটি আশীর্বাদী ফুল তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, শিগগির শিগগির ভাল হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আশীর্বাদ করুন আপনারা।

আশীর্বাদ করছি অহরহ। শতবার। অসুখ শুনে থেকে দেবদেবীকে ডাকছি, বলছি, ভাল ক'রে দাও মা, ভাল ক'রে দাও বাবা, নবগ্রামের আশা-ভরসা নবগ্রামের কল্পবৃক্ষ আমাদের গোপীচন্দ্র—তাঁকে সুস্থ ক'রে দাও। ইস্কুল করেছ, ডাক্তারখানা করলে, বোর্ডিং করলে, তুমি বেঁচে থাকলে আরও অনেক

গোপীচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন, ইচ্ছে অনেকই আছে দিদি। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ফিরি তো হবে।

ফিরবে বইকি। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণ ভ'রে ডাকছে ভগবানকে। তিনি কি শুনবেন না!

গোপীচন্দ্র বললেন, তাঁর ইচ্ছা। তবে যদি না ফিরি, তবু আটকে থাকবে না। ছেলেদের ব'লে গেলাম। যাবার আগে, গ্রামের সকলকে ডেকে, সকলের সামনে তাদের ব'লে যাব।—আমার বাবার নামে টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে।

রজনী-ঠাকরুণ এবার এগিয়ে এসে বললেন, ওই ব্যবস্থাটি করবেন না দাদা। লেখাপড়ার সঙ্গে শহরের ফ্যাশান এসে ঢুকবে, মেয়েরা ছুই মিলিয়ে চতুর্ভুজ হবে। চতুর্ভুজ হ'লে যে কি হয়, সে তো স্বচক্ষে দেখলেন।

রজনী-ঠাকরুণ আঙুল দিয়ে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিলেন রাধাকান্তের বাড়ি, কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি কাশীর বউয়ের কথা বলছেন। গোপীচন্দ্র ওই নির্দেশে রাধাকান্তের বাড়ির দিকে চাইতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল রাধাকান্তের উপর।

রাধাকান্ত একটু হাসলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, রাধাকান্তমামা, আমি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন। যদি—। ম্লান হেসে তিনি থেমে গেলেন। তারপর বললেন, তা হ'লে ছেলেরা রইল, দেখবেন।

রাধাকান্ত গরাদে ধ'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেঁচে থাকলে দেখব বইকি। তবে, বনের সিংহই দেখে অপর জীবদের, সিংহের পরে সিংহশাবক শিশু হ'লেও তাকে দেখবার যোগ্যতা তাদের থাকে না। ছেলেদের বরং ব'লে যান, যদিই কোন আশঙ্কা হয় মনে, যেন তারা গ্রামবাসীদের দেখে।

গোপীচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

রাধাকান্ত বললেন, কায়মনোবাক্যে কামনা করছি, আপনি অচিরে সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র গিয়ে পাল্কিতে চড়লেন। পাল্কি উঠল। দূরে গাজনের ঢাক

ঢাকের বাদ্যসমারোহের মধ্যে, যেন একটা খণ্ড কালের মহেশ্বরের মত। হাতের জপমালা ঘুরিয়ে এখানকার প্রতিটি দিনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাঁর সাধনায় তাঁর কীর্তির জটাজাল বেয়ে এই যুগের ধারা নবগ্রামের বুকে সব পাপ-মোচনের মহিমায় মহিমময়ী গঙ্গার মত প্রবাহিত হয়ে রইল।

কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন।

রাধাকান্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন, কিছু বলছ?

মৃদুস্বরেই কাশীর বউ বললেন, ষোড়শী এসেছে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কে? ষোড়শী? ষোড়শী?

হ্যাঁ। সেই।

রাধাকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন, না না।

সেই মুহূর্তেই ষোড়শী ঘরের দোরের মুখে এসে দাঁড়াল। বললে, তাড়িয়ে দিলেও তো আমি যাব না বাবা। আপনি ছাড়া তো আমার এ কাজ হবে না। সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল বিনা অনুমতিতেই। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললে, ছোঁব না আপনাকে। কিন্তু পায়ের ধুলো নিতে বড় সাধ ছিল।

কাশীর বউ বললেন, ও কিছু টাকা নিয়ে এসেছে। কিশোরদের মকদ্দমায় খরচের জন্যে দিতে এসেছে। টাকাটা তোমার হাতে দিতে চায়।

রাধাকান্ত ষোড়শীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমরা স্বাধীন হইব, মুখ-থ্যাঁতলানো ব্রিটিশ-সর্পের সুনিবিড় লেজ-বন্ধন ওই সময়ে সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িবে। হাতে সময় আর বড় বেশি নাই, মাত্র এক বৎসর চার মাস। আমাদিগকে খুব দ্রুত তালিম লইতে হইবে। স্বামী-শ্বশুরপরিত্যক্তা মাতৃহীনা অনাথা প্রফুল্লকে রাজরাণী দেবী চৌধুরাণী বানাইতে দস্যুনেতা গুরু ভবানী পাঠকের পুরা পাঁচ বৎসরের কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল; তাহার পর কর্মশিক্ষা অর্থাৎ প্র্যাকৃটিকাল ট্রেনিং চলিয়াছিল পাঁচ বৎসর। গত পৌষে চার বছর

ধরিয়া আমাদেরও রাজাগিরির তালিম আরম্ভ হইয়াছে। প্রফুল্লের অরণ্য-পরিবেশ ছিল। গত তেতাল্লিশ সাল হইতে আমাদেরও আশেপাশে চতুর্দিকে হিংস্র শ্বাপদসম্প্রদায় যে ভাবে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, আমাদেরই বা অরণ্যের বাকি কি আছে! আধুনিক দস্যুনেতা ভবানী পাঠকের সম্প্রদায় আমাদিগকে কৃচ্ছ্র শিখাইবার যে "বাধ্যতামূলক" বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বাদশাহী পুরস্কার আরও ত্বরান্বিত হইবার কথা। সম্ভবত আমাদের দাসত্ব-সংস্কার অধিকতর মজ্জাগত বলিয়া শিক্ষা তেমন দ্রুত ফলবতী হইতেছে না। বিশ্বাস না হয়, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে প্রফুল্লের শিক্ষার কারিকুলাম আজিকার শিক্ষাপদ্ধতির সহিত মিলাইয়া দেখুন। আমরা তুলিয়া দেখাইতেছি।

"প্রথম বৎসর আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। দ্বিতীয় বৎসরে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইবে।"

আইনত চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের অর্থাৎ আমাদের "উপাদেয় ভোজ্য খাইবার" কথা, কিন্তু আমাদের নুনলঙ্কাভাতই চলিতেছে, ভাতে আবার অর্ধেক কাঁকর। নিশিরা কিন্তু যথানির্দিষ্ট ঘৃত মাখন ছত্রিশ ব্যঞ্জন পাইতেছে।

"পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটাগড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়।"

তাহাই করিয়া আসিতেছি, কিন্তু চতুর্থ বৎসরের "পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে" জুটিতেছে না।

"কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল।"

আমরাও মাথা মুড়াইয়াছি, কিন্তু "ভবানী ঠাকুরের আদেশে কেশ গন্ধতৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত" করিতে পাইতেছি না। "প্রথম বৎসরে তুলার তোষক তুলার বালিশ, দ্বিতীয় বৎসরে বিচালীর বালিশ, বিচালীর

বিছানা, তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা।" এখনও ভূমিশয্যাই চলিতেছে, "কোমল দুগ্ধফেননিভশয্যা" জুটিল না।

না জুটুক, তবু আমরা রাজা হইব। চারচিলের অশুভ চীৎকারসত্ত্বেও আমরা রাজা হইব; সমগ্র দেশব্যাপী আমাদের এই বিপুল কৃচ্ছ্র সাধনা কখনই বিফলে যাইবে না। মায়েরা ডিস্‌পোজালের এগ-বীফ-হ্যাম-চীজ-বাটার-বিস্কিট লইয়া আমাদিগকে যতই প্রলুব্ধ করুক, এই কয়েক বৎসরের কঠোর শিক্ষার পর আমাদের আর মার নাই।

—

আমাদের দেশে নানাভাবে শিক্ষা-সংস্কার আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় সার্জেণ্ট সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী একটা ওলট-পালট হইবার কথা। বাংলা দেশেও ইসলামিক শিক্ষার জন্য বিপুল বরাদ্দের কথা শুনিতেছি। অদ্যকার (৮.৩.৪৭) সংবাদপত্রে দেখিলাম, গতকল্য রাজসাহীতে বাংলার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসরে মুসলিম শিক্ষার জন্য দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, আগামী বৎসরে উহা বাড়াইয়া পনরো লক্ষ করা হইবে। দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞানদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টাকে বাংলা দেশের আপামরজনসাধারণ সানন্দে সমর্থন করিবেন; কারণ কোনও শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত অনিষ্টকর হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে কঠোর শিক্ষা আমাদের বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে একান্ত প্রয়োজন তাহার জন্য কোনও বরাদ্দই আমাদের সহৃদয় ও চিন্তাশীল শাসনকর্ত্তারা করেন নাই। সে শিক্ষা ব্যতিরেকে বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের বাঁচিবার কোনও উপায় নাই, ইহাই হইবে আমাদের সত্যকার প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিতান্ত শিশুবয়স হইতেই "বাধ্যতা-মূলক"ভাবে দেশের যাবতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে এই শিক্ষা দিতে হইবে। 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়ে'র সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহাতে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারি, এখন সর্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

যে শিক্ষার কথা আমরা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও আধুনিক, গত পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে নগরবাসী সকলেই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগতভাবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও কৌশল অনুযায়ী নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। ফলে কাজ কিছু

অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষা সর্বত্র নিয়মানুগভাবে এক পদ্ধতিতে না হওয়াতে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ইহাকেই নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া গবর্মেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় একটা নাম বা শিরোনামায় গৌরব দিয়া অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেই দেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হইতে পারে। বিখ্যাত অপরাধ-বৈজ্ঞানিক পঞ্চানন ঘোষাল মারফৎ আমরা অবগত হইয়াছি যে, গাঁটকাটা ও পকেটমারেরা তাহাদের বিদ্যাকে এমন সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ইহা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামভুক্ত বিষয় হইতে পারে। রাজাবাজার ও গ্যাঁড়াতলা; বড়বাজার ও জগুবাবুর বাজার আজকাল সর্বত্র একই পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে এবং কুত্রাপি অনধিকারচর্চাজনিত সংঘর্ষ হয় না। সমাজের ক্ষতিকর বিষয়ও যদি শিক্ষার মর্যাদা লাভ করিতে পারে, যাহাতে নিঃসংশয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবে, তেমন শিক্ষা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার বিষয় হইবে।

আমরা এতক্ষণ ধান ভানিতে শিবের গীত গাহি নাই। ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু পাঠকেরা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষার দিকেই আমরা এতক্ষণ ইঙ্গিত করিতেছিলাম। যেখানে কণ্ট্রোল আছে এবং যেখানে কণ্ট্রোল নাই, উভয় ক্ষেত্রের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই আমাদের এত ক্লেশ, এত লাঞ্ছনা, এত হেনস্থা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ঘুষি ও ঘুষ, হাত ও পায়ের যথাযথ প্রয়োগ শিখিতে হইবে, উপরন্তু হাতসাফাই শিখিতে পারিলে ভাল। ভোরের শীতার্ত আবহাওয়া হইতে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর উত্তাপ পর্যন্ত থলি বোতল অথবা পারমিট কার্ড হস্তে লাইন দিয়া পথে দাঁড়াইবার অভ্যাস এই শিক্ষার প্রথম পর্ব; মধ্যাহ্ন মধ্যরাত্রির দিকে গড়াইয়া গেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে চলিবে না। ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি কনুই-প্রয়োগ এই শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব; বদজোয়ান চিমটি ও চাটি হজম করিবার শক্তি তৃতীয় পর্বে অর্জনীয়; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই শিক্ষার পরীক্ষা মাথা কাটাফাটি পর্যন্ত গড়াইতে পারে। অ্যালজেব্রা-মেড-ঈজির মত ঈজি পথও বুদ্ধিমানেরা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহারও শিক্ষা আছে। থলি বা বোতল রাস্তায় আড়াআড়ি বসাইয়া বা শোয়াইয়া শ্যামবাজারের চৌমাথা হইতে কলিকাতা রেসকোর্সে চার ইভেন্ট রেস খেলিয়া আসিয়া আবার যথারীতি লাইনে দাঁড়াইতেও বিচক্ষণ লোককে দেখা গিয়াছে। ধুতি-শাড়ির কণ্ট্রোল-দোকানে এই শিক্ষার চরম পরীক্ষা। উপরি উপরি ষোলো দিন কিউ-রূপী অজগর সর্পের লেজ হইতে মুখ অবধি পৌঁছিয়াও একজনকে বিফলমনোরথ হইতে

দেখিয়াছি। বারো ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর দোকানীর মুখের "আজ নয়, কাল" উপর্যুপরি পনরো দিন হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হইলে ইহারাই ডক্টরেট পাইবেন। ওজন-বহনরূপ সহিষ্ণুতার শিক্ষা ইহারই আনুসঙ্গিক, পাঁচ সের হইতে আধ মণ কয়লা বহন করিবার জন্য প্রত্যেককে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কণ্ট্রোলের শিক্ষা প্রায় এই জাতীয়। যাঁহারা ঘুষের উপাসক তাহাদিগকে ভিন্নভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিখিতে হইবে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ গোপনীয়। চিবাইয়া কাঁকর হজম করা, কাঁইবীচির রুটি খাইয়া প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতির পরস্পর জোড়লাগা নিবারণ করা, অজৈব ঘিয়ের জন্য প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে জৈব রক্ত মোক্ষণ করা, এক শিশি হর্লিকসের জন্য জামাই ও শ্বশুরে গোপন প্রতিযোগিতা—শিক্ষার এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির একীকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, সেই সংস্কৃতির ধারক আধুনিক মানুষকে জীবন-যুদ্ধে প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহারা কি আগাইয়া আসিবেন না?

কণ্ট্রোল বিভাগে আমাদের তবু কতকটা অশিক্ষিতপটুত্ব জন্মিয়াছে, কিন্তু কণ্ট্রোল এখনও যেখানে "দংষ্ট্রা করালানি" বিস্তার করিতে পারে নাই, সেখানে অবিলম্বে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক। ইহার জন্য প্রত্যেক স্কুলে কলেজে জিমন্যাস্টিক ও অ্যাক্রোব্যাটিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাসের দরজার হাতল ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে ঝুলিতে অবলীলাক্রমে সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করা, দুই হাতে র্যাশনের আধমণী দুইটি থলি লইয়া চিঁড়াচ্যাপ্টা অবস্থায় চলন্ত বাসের উপরে দাঁড়াইয়া ব্যালেন্স রক্ষা শুধু নয়, পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া কণ্ডাক্টারের হাতে আনি ও আধআনি প্রদান, পিছনের বাম্পারের এক 'অ' প্রস্থের উপর আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকা, তিনটা বাঁধাকপি, এক জোড়া জুতা, ছাতা ও লাঠি লইয়া এক ফুট ব্যবধানে এক গ্রোস লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলন্ত গাড়িতে চাপা যে রীতিমত শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও গবর্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহা স্বীকার করিবেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা-বিল প্রবর্তনের জন্য এতখানি তোড়জোড় না করিয়া ইহারা দেশের জনসাধারণের প্রভূততম কল্যাণের মুখ চাহিয়া যদি আমাদের নিমিত্ত এই প্রাথমিক শিক্ষা-বিলটি পাস করিয়া দেন, তাহা হইলে [illegible] জয়জয়কার হইবে। এই শিক্ষা উপযুক্তভাবে প্রদত্ত হইলে যে

সাম্প্রদায়িক সমস্যারও অচিরাৎ সমাধা হইয়া যাইবে, ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। যে-ইজ্জৎ হইবার শিক্ষা আমরা দীর্ঘ সহস্র বৎসর ধরিয়া লাভ করিয়াছি, এতদিনে পথে-ঘাটে আরোহণ ও অবতরণকালে আমরা এত ঘন ঘন বে-আব্রু হইতেছি যে, মনে হয় ইংরেজ শেষ পর্যন্ত লজ্জাবশেই ইণ্ডিয়া কুইট করিতেছে। একটা সুমহান ও সুপ্রাচীন জাতি যে কতখানি সহ্য করিতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হইবার পূর্বেই সহ্যশক্তির অভাবেই ইংরেজ বিদায় লইতেছে, সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদিগকে ইলেভেন-এ থ্রি টু-এ অথবা তেত্রিশ নম্বর রুটে বাসযোগে বিদায় লইতে হইবে না।

—

কাব্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাল্যকালে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে যে বিরূপ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে বারংবার বিবিধ কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের কাছে তাঁহার বিরূপতার মৌলিক কারণস্বরূপ গৃহশিক্ষকের একটি আকস্মিক চড়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'কবিতা'-সম্রাট বুদ্ধদেব বসু আজ প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথের বাল্যের ভুলটারই সাফাই গাহিতেছেন,—মধুসূদনকে গালি গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের চাটুবাদ। যে চড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মানসিক অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, প্রৌঢ়ের সুস্থতার জন্য সেরূপ একটি চড়ের প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব বসু মধুসূদনের চূড়ান্ত শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

"মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। তাঁর নাট্যরাজি অপাঠ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ। তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। প্রহসন দুটিও কাঁচা হাতের রুগ্ন নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। মেঘনাদবধ কাব্য বানিয়ে-তোলা জিনিস। সমগ্র কাব্যটি হয়েছে ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী ; অন্তঃপুরে অনধিকারী ; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি নেই যা প'ড়ে মনে হয় কবি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব বলতে গেলে শূন্য, এমন কি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যমেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হয়েই রইলো ; মাইকেলের [illegible] আসবাবপত্র। মেঘনাদবধ কাব্য গতিহীন [illegible] একটি অনবদ্য

উদাহরণ। তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন যাদেরই সমকক্ষ, যার ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা যুক্তিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। শুধু যে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বোঝেন নি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু একথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেন নি; বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রকৃত শক্তির প্রকৃত অপব্যয়ের হেতু চারিত্রগুণের অনটন।"

এই সকল অর্বাচীন অশ্রদ্ধেয় উক্তি প্রতিবাদের অযোগ্য, বুদ্ধদেবকে যাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহাদের কাছে মাত্র এই সকল আপ্তবাক্য মর্যাদা-লাভ করিতে পারে। আসল সত্য ইহাই যে, বসু মহাশয় তাঁহার জন্ম ও শিক্ষার দোষে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি একেবারেই ধরিতে পারেন নাই, তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

—

বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করার বিরুদ্ধে আমরা গত দুই সংখ্যায় কিছু সেন্টিমেন্টাল মন্তব্য করিয়াছিলাম, কিন্তু লীগ-শাসনের রোলার আমাদের বুকের উপর যে ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে যতই মনে মনে বিভাগের স্বপক্ষে যুক্তি গজাইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আমরা বিস্তৃততর আলোচনা করিব। শুধু নাম লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছি, যদি কেহ সমাধান করিতে পারেন উপকৃত হইব। বাংলা দেশকে কার্জন সাহেব যখন বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করিয়াছিলাম তাহার বিরুদ্ধে। আজ বাংলা দেশকে ভাগ করিবার জন্য যে আন্দোলন হিন্দু-বাঙালীরা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কি নাম হইবে?

—

আমরা পূর্বে "সংবাদ-সাহিত্যে" "দেবল-সংহিতা"র উল্লেখ করিয়াছিলাম। ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী অনুগ্রহপূর্বক 'দেবল-সংহিতা'র সম্পূর্ণ ও সটীক অনুবাদ পাঠাইয়াছেন, আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস ঃ কলিকাতা-৪

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

মহাস্থবির জাতক

প্রথম পর্ব। 'শনিবারের চিঠি'তে বর্তমানে প্রকাশিত "মহাস্থবিরে"র আসল কথা। চার টাকা

স্বর্গের চাবি

'মহাস্থবির জাতকে'র মতই কৌতূহলোদ্দীপক সরস গল্প-সমষ্টি। তিন টাকা

*

"বনফুলে"র

বনফুলের কবিতা

হাসির কবিতা। আড়াই টাকা

দ্বৈরথ

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

অনুপম টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

কিছুক্ষণ

ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

জঙ্গম

প্রথম খণ্ড। উপন্যাস। চার টাকা

বৈতরণী-তীরে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধাত্রী দেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। চার টাকা

জলসাঘর

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

দুই পুরুষ

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন-প্রশংসিত নাটক। সাত সিকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চিত্র। আড়াই টাকা

সন্দীপন পাঠশালা

উপেক্ষিত শিক্ষক-জীবনের কাহিনী। সাড়ে তিন টাকা

রসকলি

মনের উপর দুষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাতজনিত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

রাইকমল

প্রেমিক বৈষ্ণবীর দুঃখময় প্রেম-কাহিনী দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই টাকা

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমাবেশ

শ্রীপার্থকুমার সেনের

অভিনেতা

নূতন ধরনের গল্প-সংগ্রহ। নয় সিকা

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর

প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাঠকগণের মনে মনীষীপ্রবর প্রিয়নাথ সেনের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার রচনার সহিত আধুনিক বাঙালী পাঠক ও সাহিত্যিক অপরিচিত। এই পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁহার গদ্যরচনাবলী 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে একত্র সমাহৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> "প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ছিল।...তাঁর যেসব লেখা এই বইয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই আমার রচনা নিয়ে।...বাংলা সাহিত্যে আমি যখন তরুণ লেখক, আমার লেখনী নূতন নূতন কাব্যরূপের সন্ধানে আপন পথ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন তীব্র এবং নিরন্তর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। সেই সময়ে প্রিয়নাথ সেন অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে আমার সাহিত্যিক অধ্যবসায়কে নিত্যই অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বয়সে এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক প্রবীণ ছিলেন। নানা ভাষায় ছিল তাঁর অধিকার, নানা দেশের নানা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবারিত আতিথ্যে তাঁর সাহিত্যরসসম্ভোগ প্রতিদিনই প্রচুরভাবে পরিতৃপ্ত হত। সেদিন আমার লেখা তাঁর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল। তাঁর সেই ঔৎসুক্য আমার কাছে যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা বলা বাহুল্য।...সেদিনকার অপেক্ষাকৃত নির্জন সাহিত্যসমাজে শুধু আমার নয়, সমস্ত দেশের কিশোরবয়স্ক মনের বিকাশস্মৃতি এই বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করছি।..."

পরিশিষ্টে, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ছয়খানি ও রবীন্দ্রনাথের ...নিশখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে, এগুলি এখনো অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত ...য় নাই। প্রমথ চৌধুরী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ...খিত প্রিয়নাথ সেনের চরিতকথাও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের কয়েকটি চিত্রে শোভিত, অ্যান্টিক কাগজে ...পা, সুদৃঢ় বাঁধাই, পৃ. ৩২২, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

[illegible]

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

প্রথম প্রণাম

বাংলার সমাজসমস্যা-মূলক অপূর্ব্ব উপন্যাস।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রে উচ্চ প্রশংসিত

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

—•—

দ্বিতীয় অর্ঘ্য

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী প্রণীত

গোধূলী

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

—•—

তৃতীয় অর্ঘ্য

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

নূতন উপন্যাস

তৃষিত মরু

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

সূচী

চৈত্র ১৩৫৩

ডাক্তারেরা বলেন-
ব্লাড-ভিটা
দুর্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগে আদর্শ টনিক ও রক্ত পরিশোধক!
অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী
পি, ২৩, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা

কেশ-বিন্যাসে প্রাচ্য

ভারতবর্ষ মালাবার

মালায়ালী মেয়েদের সব চেয়ে গর্ব্বের জিনিষ হ'ল তাদের লম্বা কালো চকচকে চুল। তাই নানাভাবে খোঁপা বাঁধতে তারা ভালবাসে। সাপের ফণার মত এবং শেষে গাঁট দেওয়া খোঁপা তাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত।

মালায়ালী যুবতীদের মাথাভরা চকচকে চুল এবং পরিচ্ছন্ন মাথার ত্বক এমনিই হয়নি। এ দুটি জিনিষের পিছনে আছে নিখুঁত নিরবিচ্ছিন্ন যত্ন এবং সব চেয়ে বড় কথা, ভাল কেশতৈলের নিয়মিত ব্যবহার। **বাথগেটের সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েলের** ব্যবহার আজ **একশো বছরের** উপর ভারতের পশ্চিম উপকূলের সব জায়গায় চলে আসছে। এই বিখ্যাত কেশতৈলই মালাবার ও কেরালা দেশের মেয়েদের সব চেয়ে প্রিয়।

বাথগেটের সু

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

গত আগষ্ট-আন্দোলনের রোজনামচা। সবরকম পোশাকী আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত, সহজ অনাড়ম্বর স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। আমাদেরই মতো নানা সুখ-দুঃখের সমস্যা জড়িত একটি পরিবারের খুঁটি-নাটি ঘরোয়া খবর আমরা শুনি আর তারই মধ্যে শুনতে পাই দেশব্যাপী গণজাগরণের সাগরকল্লোল। পণ্ডিত-পরিবারের বিভিন্ন আলোকচিত্রে সজ্জিত। সুন্দর প্রচ্ছদসজ্জা। দাম ৩৲
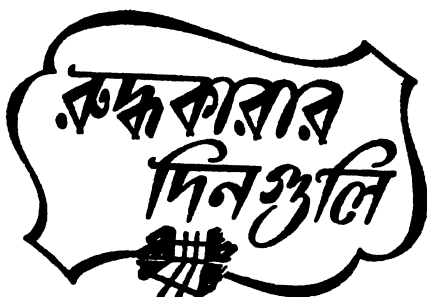
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ইদানীং যা লিখছেন তার তুলনা নেই। তাঁর হালের প্রত্যেকটি লেখা দেশের দুর্দিনের এক-একটি অমূল্য দলিল। তিনি খুঁজে পেয়েছেন সত্যিকার দেশকে, সত্যিকার দেশবাসীকে। তাঁর এই সত্যদৃষ্টির প্রথম পরিচয় 'যতন-বিবি'। দুর্ভিক্ষের চিতার উপর বাঙলাদেশ যে জ্বলছে তারই ইতিহাস। যা আজকালকার তাকে তিনি চিরকালের কোঠায় নিয়ে গিয়েছেন। এ-বইয়ের আরেক সম্পদ উডকাট ধরনে আঁকা দশখানি চমৎকার ছবি। ছবির সংযোগে গল্পের ব্যঞ্জনা আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। উচ্চশ্রেণীর ছাপা ও বাঁধাই। দাম ২॥৹

অস্‌কার ওয়াইল্ড

ছোটোদের জন্য অস্‌কার ওয়াইল্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, যে অদ্ভুত সৌন্দর্যপ্রিয় সরল হৃদয় তাঁর ছিল তারই পরিচায়ক। স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল প্রতিটি কথা। নানা রঙে রঙীন, খাম-খেয়ালি, কোমল-মধুর এই গল্পগুলি ইংরিজি শিশু-সাহিত্যের অপরিহার্য সম্পদ—বাঙলায় অনুবাদ করে বুদ্ধদেব বসু রসিক সমাজের সম্মান লাভ করেছেন। সচিত্র। শোভন ত্রিবর্ণ মলাট। পাইকায় ঝরঝরে পরিষ্কার ছাপা। দাম ২॥৹

প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২০

রক্তজবা
সুগন্ধি আলতা
“রক্তরেণু” সিন্দুর
“রক্ততিলক” কুমকুম

মাত্র দশ মিনিটে
10 Saridon
ANALGESIC TABLETS
Saridon
সারিডন
সর্ব্বপ্রকার বেদনা নিরাময় করে

"অর্থ এক বিশ্বজনীন শক্তির স্থূল চিহ্ন। এই শক্তি যখন পৃথিবীর উপরে প্রকাশ পায় তখন তার ক্রিয়া হয় প্রাণের ও জড়ের স্তরে; বাহ্য জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য এ শক্তিটী অপরিহার্য্য।"

—শ্রীঅরবিন্দ

স্নিগ্ধতায়...
কেশবর্দ্ধনে...
সংরক্ষণে...
প্রসাধনে...
ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
ওঁআমলা ★
উচ্চাঙ্গের কেশ তৈল
ভৃঙ্গরাজ ও আমলা দুইটি আয়ুর্বেদোক্ত উপাদানের
একত্রিভূত শক্তিশালী কেশ রসায়ন। ইহা একটি নবতম
অবদান। প্রকৃত গুণ সম্পন্ন এই উচ্চশ্রেণীর কেশতৈল
একাধারে ঔষধি ও প্রসাধনী। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও
যাবতীয় শিরোরোগ ও কেশরোগ নিবারণে ইহা
অতুলনীয়। ইহার মৃদু-মদির-সুরভি চিত্ত বিনোদক,
দীর্ঘস্থায়ী। বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতার জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত।
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৩

সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী

২

কবি সত্যেন্দ্রনাথ মহম্মদের বাণী অনুবাদ করিয়াছেন—

"বাজারে বিকায় ফল-তণ্ডুল সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয়প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল, দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা।"

মানুষের দেহের ক্ষুধা আছে, হৃদয়ের ক্ষুধাও আছে। দেহের পুষ্টি চাই, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের পুষ্টিও চাই। তথাপি স-হৃদয়জন হৃদয়ের ক্ষুধা যাহাতে নাশ করে, তাহাকেই সুধা বলিয়া থাকেন। এই সুধা ফুলের ন্যায় বর্ণ ও সৌরভ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত এক অলৌকিক আনন্দ দেয়, তাহাকে তাই যত পাই তত পাই না, আরও পাইতে চাই। খাঁটি সাহিত্যের ইহাই লক্ষণ। সে ফল-তণ্ডুলের ন্যায় কেবল বাহিরের ক্ষুধা মিটাইয়া নিজের প্রয়োজন শেষ করে না, ঔদরিক পূর্ণতার সহিত তাহার পূর্ণ অবসান আসে না। সে এমন এক ফুল, পারিজাতের ন্যায় চির-অম্লান যাহার রূপ, চির-অনিন্দ্য অক্ষয় যাহার সৌরভ, নব নব শক্তি ও আনন্দের অফুরন্ত উৎস। জোয়ারের জলে যাহা ভাসিয়া আসে, ভাটার টানেই তাহা চলিয়া যায়। যুগধর্মে কত গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ রচিত হইতে থাকে, যুগপরিবর্তন বা যুগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে সাহিত্যের কোন চিহ্ন থাকে না, অস্থিরধর্মী চলতি সাহিত্য তাহা, তাহা অস্থায়ী। আর এক প্রকার সাহিত্য আছে, স্থায়ী সাহিত্য, তাহাতেও যুগধর্ম পরিস্ফুট হয়, যুগের প্রয়োজন নিবৃত্ত হয় এবং এই অর্থে তাহা নিশ্চয়ই যুগধর্মী বা যুগানুগ। কিন্তু তাহা যুগানুগ হইয়াও যুগাতীত বা যুগতিগ। তাহাতে যুগের সঞ্চারী লক্ষণ-সমূহ এবং স্থূল ও প্রত্যক্ষ রূপনিচয় কেবল প্রকাশ পায় না, তাহা অতি গভীরে প্রবেশ করিয়া বিশিষ্ট যুগধর্মের সহিত শাশ্বত মানবধর্ম—মানবসমাজের চিরন্তন সত্যকে দৃষ্টিপ্রদীপে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। তাহা সংবেদনশীল কবিচিত্তের গভীর জীবনবোধকে আশ্রয় করিয়া এক আনন্দময় আত্মোপলব্ধি আনয়ন করে। তাহা কেবল মনোলোকের সুখদুঃখময় অস্থির বিলাস নয়, তাহা কেবল বিষয় অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের হিসাব ও পরিমাপ গ্রহণে শেষ হয় না, তাহা ভাবানুভূতির বলে উর্ধ্বস্থ বিজ্ঞান ও আনন্দময় সত্তায় আলোড়ন তুলিয়া

জীবনবোধকে আত্মবোধ বা আত্মোপলব্ধিতে পরিণত করে। যাহা অতীত বা বর্তমান, তাহা মহাকাল অর্থাৎ নিত্যকালেরই অংশবিশেষ। অতএব যাহা বর্তমানের সত্য পরিচয়, তাহা একান্তভাবে নিত্যকালের লক্ষণশূন্য হইতে পারে না, এবং নিত্যকালের কোন বর্ণনা বর্তমান-রূপ তাহার যুগাবরণকে অস্বীকার করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপে সামান্য বা সাধারণ যাহা, তাহা বিশেষেই অভিব্যক্ত হয়; এবং বিশেষও আবার সামান্য বা সাধারণ-লক্ষণের পঞ্জরেই মূর্তিলাভ করে। নিত্য ও বর্তমান অথবা সামান্য ও বিশেষ—ইহাদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই বিবাদ বা প্রতিবাদ নাই, বরং রহিয়াছে পরস্পরের এক সহজ ও সুগভীর স্বীকৃতি। এখানে বলা চলে, যাহা কালধর্মে নিত্য এবং বস্তুধর্মে সামান্য বা সাধারণ, তাহাই স্থায়ী, অপরটি অর্থাৎ বর্তমান বা বিশেষ—সঞ্চারী।

স্থায়ী সাহিত্য বিচার করিবার পূর্বে সাহিত্য অর্থাৎ খাঁটি সাহিত্য কি, সংক্ষেপে বিচার করা দরকার। স্থায়ী সাহিত্য হইতে হইলে খাঁটি সাহিত্য হইতে হইবে। অবশ্য সকল খাঁটি সাহিত্য হয়তো স্থায়ী সাহিত্য হইবে না।

আমরা এমন অনেক কাহিনী বা কবিতা পড়ি, কিছুদূর পড়িবার পর যাহার আর কোন আকর্ষণ থাকে না, অথবা আগ্রহভরে শেষ পর্যন্ত পড়িলেও পুনরায় পড়িবার প্রবৃত্তি জাগে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাহাদের স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চের ভিতর দিয়া একেবারেই দশম দশা আসে। কেন এমন হয়? এই প্রশ্নের বিচারে আমরা সম্প্রতি মাত্র দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিব। এই দুইটি বিষয় ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দিক হইতে ব্যাখ্যাত হইলেও একই সত্যের ইঙ্গিত করে।

যে সাহিত্য পাঠে আত্মবোধ বা আত্মোপলব্ধি না ঘটে, মনোলোকের অতীত বোধময় আনন্দসত্তার গভীর স্পর্শ না পাওয়া যায়, তাহা খাঁটি সাহিত্য নহে, অন্তত খাঁটি কাব্য-সাহিত্য নহে।

ওল্ড টেস্টামেন্টে একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন আছে,—"Where there is no vision, the people perish."—যেখানে দিব্য দর্শন নাই, সেখানে লোকের মহতী বিনষ্টি। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সমাজ—মানুষের সকল সৃষ্টি-কর্ম বিষয়েই কথাটি সত্য। লেখক যেখানে সত্য, মহৎ ও মঙ্গলের স্রষ্টা নন, সেখানে তাঁহার সৃষ্টি স্থায়ী সার্থকতা লাভ করে না। সরল সহজ

সত্য দৃষ্টিই সুষমাময় আনন্দ-দৃষ্টি। বস্তুর পরিধি বা পরিমাপ যাহাই হউক, এই প্রতিভান-ময় দৃষ্টির দ্যুতিতে বস্তু অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের খণ্ডরূপও এক অপরূপ সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠে এবং মর্ম-সত্য মুহূর্তে আবিষ্কৃত হয়। এই প্রতিভান ও আবিষ্কার জাগায় এক আশা ও আশ্বাস, হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করে এক গভীর বিশ্বাস ও আনন্দ। এই বিশ্বাস মানবপ্রকৃতি বা বিশ্বমানবপ্রকৃতির উপরে বিশ্বাস। একান্ত স্থূল রূঢ় বাস্তবের চিত্রকরও যদি সত্যদ্রষ্টা হন, তাহা হইলে বর্তমানকে দেখিতে গিয়া অতীতের ন্যায় আসন্ন ভবিষ্যৎ, কখনও বা দূরভবিষ্যৎও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। চিরন্তন মানবপ্রকৃতির উপরে তাঁহার আস্থা থাকিলে ঐ রচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ কেবল কুৎসিত ক্লিন্নতা, নিদারুণ ব্যর্থতা, অথবা মর্মঘাতী সংশয় ও নৈরাশ্য-বোধ আসিতে পারে না। সে বর্ণনাও মানুষের অন্তরের গূঢ় মানবত্বকে প্রবুদ্ধ করিয়া নবীন আশ্বাস ও উৎসাহ এবং মহৎ কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে। যে রচনার ফল ইহার অন্যরূপ, তাহা মন দিয়া গ্রহণ করিয়াই শেষ করি, তাহা আবার পড়িতে ইচ্ছা হয় না, তাহাই চলতি সাহিত্য। vision বা দিব্যদর্শন না থাকিলে খাঁটি সাহিত্য হয় না। জগৎ ও জীবন লইয়া সাহিত্য—এ কথা আজকাল বালকের মুখেও শোনা যায়। কিন্তু এজীবন কি? নিত্য উদ্ভিদ্যমান যে জগৎ, তাহাই বহিঃপ্রকৃতি। আর রহিয়াছে প্রতিক্ষণ প্রকাশমান মানবের অন্তঃপ্রকৃতি। উভয়ের বিচিত্র সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া সুখ-দুঃখ, বিরোধ-মিলন ধ্বংসও সৃষ্টির দ্বন্দ্বক্রমে জয়ী হইতেছে শাশ্বত শুভ মানবপ্রকৃতি। মানবের জাগ্রত সাধনায় মানবতা বা বিশ্বমানবতা যুগপর্যায়ে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই বিশ্বমানবতাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূমা। যাহা বৃহৎ, তাহাই 'বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম', তাহাই ভূমা এবং তাহাই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বভূতে বর্তমান, তাই একহিসাবে বিশ্বমানবই ঈশ্বর। প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কোথায়? কুরুক্ষেত্র-রণে শরশয্যায় শয়ান রহিয়াও ভীষ্মদেব নূতন শর বরণ করিয়া মস্তক স্থির ও উন্নত রাখিয়াছিলেন, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কখনও টলিতে দেন নাই। সমাদর করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া তিনি 'ব্রহ্ম গুহ্য' বা বৃহৎ রহস্য শুনাইয়াছিলেন—

"ন মানুষাত্ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিত্"

—মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

মানুষের প্রতি বিশ্বাস যাহাদের দুর্বল, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে যাহারা দোলায়িত, তাহারা কদাচ শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যকে ধারণ বা প্রকাশ করিতে পারে না। মানব-মনে তাহাদের লেখনী কোন গভীর চেতনা সঞ্চার করিতে অসমর্থ।

এই বিশ্বাস বুদ্ধি বা মনের কেবল মননময় চিন্তনকার্য দ্বারা জন্মানো সম্ভবপর নয়। ইহা গাঢ় অনুভূতি দ্বারা পাঠকের গভীরতর চেতনায় সঞ্চারিত করিতে হয়। ইহাকেই বলা হয়, মনোলোকের অতীত বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার আলোড়ন। এই বিশ্বাসেরই সহচর আশা, আশ্বাস ও আনন্দ। আশা ও আনন্দের উপলব্ধিও এক আত্মোপলব্ধি।

শেলির প্রমীথিয়স কঠিন ও কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত ও অত্যাচরিত হইয়াও অনির্বাণ আশার প্রেরণায় নিজের এবং বিশ্বমানবের মুক্ত নবজীবন আনিয়াছিল। প্রমীথিয়সের আশাই শিল্পস্রষ্টার সঞ্জীবন সৃষ্টি-মন্ত্র। প্রাচীন আদর্শবাদীদের উক্তি উদ্ধার করিয়া লাভ নাই। আধুনিক কালের মার্ক্সীয়-দৃষ্টিসম্পন্ন জড়বাদী গণও সাহিত্যের শাশ্বত লক্ষণ বিচারে বিশেষ ভুল করেন নাই। তাঁহাদের কথিত সমাজচেতনা, মানবতা বা বিশ্বমানবতাও সাহিত্যের বিচারে নূতন কথা নয়। আর তাঁহারা যে আশা ও আদর্শের কথা বলেন, যে Illusion ও Reality-র ব্যাখ্যা করেন, তাহা আমাদের মনে আশ্বাসেরই সঞ্চার করে। *Marxism and Poetry* নামক পুস্তিকায় আলোচনা শেষ করিয়া জর্জ টম্‌সন সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

"The artist is always striving after the impossible, like Goethe's Euphorion, soaring into the sky until he bursts into flame and vanishes ; but in the end, thanks to his inspiration, the baseless vision becomes a solid reality. The artist leads his fellowmen into the world of fantasy, where they find release, thus asserting the refusal of human consciousness to acquiesce in its environment, and by this means there is collected a hidden store of energy which flows back into the real world and transforms fantasy into fact."

—শিল্পী সর্বদাই অসম্ভবকে পাইতে চান, এ যেন গেটের ইউফরিয়ান, অগ্নিশিখায় ফাটিয়া পড়িয়া অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত গগনে উড়িতেই থাকে। তাঁহার প্রেরণাকে ধন্যবাদ, পরিণামে সেই ভিত্তিহীন কল্পনা সুদৃঢ় বাস্তব হইয়া উঠে। শিল্পী তাঁহার সমধর্মী গণকে কল্পনার জগতে লইয়া যান, সেখানেই তাঁহারা পান মুক্তি, এবং আবেষ্টনীকে মানিয়া লইতে তাঁহাদের মানবীয় বুদ্ধি

দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এই উপায়ে এক গূঢ় শক্তির ভাণ্ডার সঞ্চিত হয় এবং তাহাই বাস্তব-জগতে পুনরায় প্রবাহিত হইয়া কল্পনাকে সত্যে পরিণত করে।

পূর্ববর্তী ক্রিস্টোফার কড্ওয়েল কাব্যের উৎপত্তিতে বা পরিণতিতে যে Illusion ও Reality—বা মায়া ও বাস্তবের খেলা দেখাইয়াছেন, তাহাও এই মতেরই পরিপোষক। তিনি বলেন—

"But only by means of this illusion can be brought into being a reality which would not otherwise exist."

—কিন্তু কেবলমাত্র এই মায়া রচনার সাহায্যেই এমন এক বাস্তবের সৃষ্টি সম্ভবপর, অন্য উপায়ে যাহার অস্তিত্ব অঘটন হইত।

বর্তমান দোষত্রুটিপূর্ণ বাস্তব দেখিয়া স্বপ্নদ্রষ্টা কবিগণ আদর্শ বাস্তবের মায়ারূপের সৃষ্টি করেন। মায়াবাস্তব নব আদর্শের উদ্বোধনে আমাদের চিত্তে বলাধান করিয়া যে শক্তি উৎসারিত করে, তাহারই ফলে জন্ম লয় পরিশুদ্ধ নবীন বাস্তব। মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রেই আগে এই মায়া বা স্বপ্ন রচনা চলে, তাহারই পশ্চাৎ প্রস্ফুট হয় স্বপ্নদর্শনের অভিনব বাস্তব রূপ—পূর্ণতর ও শুদ্ধতর বাস্তব।

জন গান্থারের লেখায় পড়িয়াছি, কয়েক বৎসর আগে রাশিয়ার ডিক্টেটর স্টালিন রাশিয়ার একদল লেখককে ডাকিয়া এইরূপ একটা কথা বলিয়াছিলেন, তোমাদের লেখা পড়িতে ভাল লাগে না কেন? প্রাচীন গ্রীস বা রোমের শক্তিশালী কবিগণের বা ইংলণ্ডের শেক্স্পীয়রের রচনা, কাব্য বা নাটকগুলি তো বার বার পড়িতে ইচ্ছা হয়, দুইয়ের গুণে এত পার্থক্য হয় কেন? স্টালিন নিশ্চয়ই সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক রূপের কথা এখানে উল্লেখ করেন নাই। এই জাতীয় প্রশ্ন সকল কালের সকল দেশেরই অধিকাংশ লেখকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে চলে। রচনা যেখানে মুখ্যত জ্ঞানের বিষয় হয়, জগৎ ও জীবনের বর্ণনা ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও মানসজ্ঞানের ঊর্ধ্বে আর উঠে না এবং প্রচার ও বক্তৃতায়ই যাহার সার্থকতা ঘটিয়া থাকে, তাহা তৎকালে এক শ্রেণীর লোকের কাছে যত বাহবাই পাক, তাহা টেঁকে না, সময়ের স্রোতে ভাসিয়া যায়, 'মহাকালের চালুনির মধ্য দিয়া ছোট তাহা, গলিয়া ধূলায় পড়িয়া ধূলা হইয়া যায়'। যে মুহূর্তে তাহারা মনের জ্ঞানের বিষয় হইয়া যায়, সেই মুহূর্তেই

তাহাদের সম্বন্ধে কৌতূহল হয় নিবৃত্ত, তাহা হইয়া যায় প্রায় পুরাতন পত্রিকার ন্যায় পুরানো।

কথাটা এই : ইন্দ্রিয় সহ মনের বা বুদ্ধির জ্ঞান-গোচরতায় যাহার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা, তাহা খাঁটি সাহিত্য নয়; তাহা বিজ্ঞান হইতে পারে, বার্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, ধর্মনীতি হইতে পারে, ইতিহাস বা দর্শনও হইতে পারে। সাধারণ গল্প কবিতা, বিবিধ প্রচারমূলক রচনা, বর্তমান বা চলমান সমাজের বর্ণনাত্মক এক প্রকার উপন্যাসও প্রায় ওই শ্রেণীর। তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হইয়া মনোলোকেই স্থায়ী হয়। thought, observation, discrimination বা discernment—অর্থাৎ চিন্তন, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ বা বিবেচন লইয়াই যেখানে কারবার, vision, intuition এবং emotional apprehension—প্রত্যক্ষ-দর্শন বা প্রতিভান, সহজ বোধি এবং ভাবময় উপলব্ধি যেখানে প্রবল নয়, সেখানে খাঁটি সাহিত্য নাই।

খাঁটি সাহিত্যে বিষয়কে জানিয়া, বিষয়কে ধরিয়া, বিষয়কে উপলক্ষ্যরূপে অন্তরালে রাখিয়া আমরা উপলব্ধি করি আপনাকে—আত্মাকে। উপলব্ধি মাত্রই ভাবময় বা প্রত্যক্ষবোধময়। মানসসত্তার ঊর্ধ্বে আমাদের শুদ্ধ বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তায় এই আত্মোপলব্ধি ঘটে। যাহা আমি অনুরাগ বা প্রীতির সহিত আত্মসাৎ করিয়াছি, যাহা আমার চেতনার অঙ্গ হইয়া আনন্দস্বরূপকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমার, অথবা তাহাই এক আমি। এই আমার বা আমির উপলব্ধিই এক আত্মোপলব্ধি, তাহা সাধারণত ঘটে ভাব দ্বারা ও বোধি দ্বারা। এই আত্মোপলব্ধিরই অপর নাম আত্মানুভূতি, আত্মপ্রসাদও উহার নাম। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত। বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে।" এই আপন উপলব্ধিই আত্মোপলব্ধি। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেঁকে—যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমন করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায়, তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন।" এখানে বলা হইয়াছে সর্বজনীন আত্মোপলব্ধির

কথা; যে সাহিত্যে তাহা আছে, তাহাই সর্বদেশে ও সর্বকালে স্থায়ী। জড়বাদী পণ্ডিতগণও নিজেদের যুক্তি অনুসরণ করিয়া ওই আত্মোপলব্ধি একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। মনস্বী কড্‌ওয়েলের *Illusion and Reality* নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির সমাপ্তিতে চরম-বাক্যরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে,—

"Thus art is one of the conditions of man's realisation of himself, and in its turn is one of the realities of man."

—এইরূপে আর্ট হইতেছে মানুষের আত্মোপলব্ধির অন্যতম অবস্থা বা উপায় এবং পালাক্রমে উহাই পুনরায় মানুষের অন্যতম বাস্তব মূর্তি।

এই আর্ট বা কাব্যে কড্‌ওয়েলের মতেও relative changelessness and eternity—আপেক্ষিক পরিবর্তনশূন্যতা এবং নিত্যস্থায়িতা বর্তমান। কাব্য আস্বাদনে প্রাচীনদের মতে আত্মোপলব্ধির সময়ে যে পরিমিত ব্যক্তিত্ব-বোধের বিগলন হয়, তাহাকে তিনি বলিয়াছেন, emotional communion with his fellowmen—সহধর্মীদের সহিত ভাবাত্মক মিলন।

আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার স্ফুরণই এক বিশিষ্ট আত্মোপলব্ধি, এবং উহাই প্রকৃত সাহিত্যের একটি স্থির লক্ষণ। আপনাকে পাইবার বা উপলব্ধি করিবার মধ্যে এক বিশিষ্ট আনন্দ ও সার্থকতা আছে। সেই জন্যই যে সাহিত্য বা শিল্পে আমাদের অন্তর্লোকের স্ফুরণ হয়, আমাদের নির্বিশেষ বোধময় সহজ আনন্দ লাভ হয়, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ও আস্বাদন করিতে চাই—আপনাকে আমরা হাজার রকমে জানিতে ও পাইতে চাই। স্থির আমি এবং চঞ্চল বা নিত্য প্রকাশশীল আমি, এই উভয় নিত্য ওতপ্রোত। দুই সখা দুই সুপর্ণবিহঙ্গের সে এক আশ্চর্য লীলা। যেন আকাশ ও বায়ুমণ্ডলের লীলা। বিদ্যুৎস্ফুরণ, ঝড়ের গর্জন, ধারাবর্ষণ, আবার সব শান্ত, প্রসন্ন ও নির্মল। তাই এই বোধময় আনন্দ চির-নূতন, ক্ষণে ক্ষণে তাহার নব নব আস্বাদন। আমরা পুনঃ পুনঃ তাহাই পাইতে চাই।

এই জন্যই সাহিত্য বা আর্টের বিচারে সকল দেশেই পরম আনন্দ বা supreme joy-কে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পূর্বযুগের সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিকগণ সাহিত্যে জগৎ ও জীবন-সম্পর্কে যে অন্ধ ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা পঙ্ক ও সলিলের উপরে পঙ্কজের ন্যায় সাহিত্য-পাঠের পরম

কলের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই আনন্দ আসে আত্মোপলব্ধি হইতে। এই আত্মোপলব্ধি যখন শুদ্ধ সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়, তখন বৈশিষ্ট্যময় সীমাবদ্ধ ব্যক্তিপুরুষের উপলব্ধি থাকে না, তাহা জাগতিক বা জীবনগত খণ্ডরূপের উপলব্ধিও হয় না, তাহা অন্তর্মুখী ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইলেও ব্যক্তিবোধের বিগলনে তখন এমন এক আনন্দসত্তার উপলব্ধি হয়, যাহার মধ্যে বহু বক্তি বহু জাতি বহু রূপ মিশিয়া নির্বিশেষ একত্ব ও নির্বিকার স্থির মহিমা লাভ করে। তাহা সৃষ্টি হইতে পলায়ন নয়, তাবৎ সৃষ্টির সর্বকাল ও সর্বস্থল ব্যাপী মূলগত অনাদি সত্যের উদ্ভাসন। ইহাকে এক দৃষ্টিতে সমগ্র পুরুষীয় সত্তার উদ্বোধনও বলা চলে। ব্যক্তিতে আনন্দ নাই, ব্যষ্টিতে স্থিতি নাই, তাহার ঊর্ধ্বে পরম মিলনের অদ্বৈত ভাবেই পরা স্থিতি ও পরম আনন্দ। তির্যক ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইলেও কড্‌ওয়েলের মন্তব্য আমরা সাধারণভাবে স্বীকার করি। তিনি টিপ্পনী করিয়াছেন—

"Hence when the bourgeois poet supposes that he expresses his individuality and flies from reality by entering into a world of art in his inmost soul, he is in fact merely passing from the social world of rational reality to the social world of emotional commonness."

—তাই যখন বুর্জোয়া কবি মনে করেন যে, তাঁহার আত্মার অতি গহনে আর্টের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেন এবং বাস্তব হইতে পলায়ন করেন, প্রকৃত পক্ষে তখন তিনি কেবল মাত্র বুদ্ধি-আশ্রিত বাস্তব সত্তার সামাজিক লোক অতিক্রমপূর্বক ভাবাশ্রিত সাধারণ সত্তার সামাজিক লোকে যাইতেছেন। *Vision and Design* গ্রন্থে রোজার ফ্রাইও আর্টের চরম প্রকাশে এই সামাজিক বা সাধারণ রূপের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমাদের আসল বক্তব্য এই,—খাঁটি সাহিত্য হইতে হইলে তাহাতে vision বা দিব্যদর্শন থাকিবে এবং তাহা মনোলোকের জানা ক্রিয়ায় নিঃশেষ না হইয়া অন্তরের গহনলোকে ভাব ও বোধময় আনন্দের স্পর্শ দিবে। ইহাকেই এক কথায় বলা হইয়াছে—আত্মোপলব্ধি। যে সাহিত্যে উহা প্রকাশ পায়, তাহা মনুষ্যজাতির এক স্থায়ী সম্পদ—'Possession for ever'।

এখন প্রশ্ন এই—রচনাগুণে খাঁটি সাহিত্য হইলেই কি তাহা স্থায়ী সাহিত্য হইবে? ইহার উত্তর পাইতে হইলে, সাহিত্যের প্রত্যক্ষ আবেদন ব্যক্তি-মনে, না সমাজ-মনে অর্থাৎ বহুজনের চিত্তে, তাহা বিচার করা দরকার। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বহুজনের চিত্তে যে আসন, তাহা স্থায়ী আসন এবং তাহাই

রাজোচিত সিংহাসন। লিরিক কাব্য আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সকল দেশেই যে জাতীয় রচনার আদর ছিল, তাহা সাধারণত সমগ্র দেশ ও সমাজ-মন লক্ষ্য করিয়াই রচিত। শুনিতে বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও এ কথা ঠিক যে, লিরিক কাব্যে, এমন কি অনেক শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতায়ও ব্যক্তিমনের বিলাস অপেক্ষা সমাজমনের বিলাস সমধিক, তাহা সকলেরই আস্বাদনের যোগ্য। এপিক ও লিরিকের মূলগত পার্থক্য এই যে, এপিক কাব্যে দেশ ও জাতি অর্থাৎ জগৎ ও জীবন হয় মহিমান্বিত, কবি-চিত্ত থাকে অন্তরালে বাহন মাত্র ; লিরিক রচনায় জগৎ ও জীবনকে বাহন করিয়া কবি-চিত্ত স্বয়ং হয় মহিমান্বিত। এই কারণেই রামায়ণ-মহাভারতকে ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় 'যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই—ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র', এবং এই কারণেই শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভা 'genius of humanity' বা বিশ্বমানবের প্রতিভা বলিয়া হয় বন্দিত। অপর দিকে বলা যায়, লিরিক কাব্যে একদল চিদ্‌বিলাসী নয়, চিত্ত-বিলাসী কবির আবির্ভাব হইয়াছে, সর্বজনীন জীবনানুভূতি বর্জন করিয়া তাঁহাদের কল্পনা প্রায় সর্বক্ষণেই অতিশয় অন্তর্মুখী, আত্মভাবপন্থী হইয়া থাকে। তাঁহাদের উগ্র ও একক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বিশাল জগতের সুপ্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া বিরল বনের বঙ্কিম রেখা ধরিয়া বিচরণ করে। গুণপণায় ও শক্তিপরিচয়ে হয়তো তাঁহাদের কবিকর্ম ও বাঙ্‌ নির্মিতি তুচ্ছ করিবার নয়, কিন্তু সে রচনা কেবলমাত্র তুল্য মানসধর্মী মুষ্টিমেয় মনোবিলাসীর অভিমান চরিতার্থ করিতে পারে, বৃহৎ জগৎ ও জীবনের সহিত তাহার কোন যোগ থাকে না। এই জাতীয় কবিগণ সাধারণত সর্বমানবচিত্তের অধিকারী বা প্রতিনিধি নহেন, এবং তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধেই সন্দেহ হয়, তাহা হয়তো স্থায়ী সাহিত্য হইবে না।

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে এবং আধুনিক কালেও বহুজনের মনোরঞ্জনের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃতে নাট্যাভিনয়, রামায়ণগান, পুরাণপাঠ, বাংলার যাত্রাভিনয়, পাঁচালীগান, কবিগান প্রভৃতি মুখ্যত সমাজচিত্ত তোষণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইত, অবশ্য ব্যক্তিবিশেষ অনেক সময় উপলক্ষ থাকিতেন। এই ব্যক্তিবিশেষও জনপদের মধ্যে বহু-জনের সহিত বাস করিয়া জনচিত্তের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ রাখিতেন এবং

অনেক সময়ে তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় হইতেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মূল বিচারপদ্ধতি হৃদয়বত্তাকে মান্য করিয়া এই বহুজনের চিত্ত-যোগকেই মুখ্য করিয়াছে। প্রাচীনগণ কাব্য-পাঠককে বা নাট্য-দর্শককে বলিতেন, সহৃদয় সামাজিক। সমাজ-চিত্তের সহিত যাঁহার সুনিবিড় যোগ আছে, সমাজের সুস্থ রুচি যিনি নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করেন, তিনিই সামাজিক। কাব্যের আবেদন এবং রসের প্রকাশ হয় এই সামাজিকের চিত্তে। আরিস্টটল্‌ও আদর্শ প্রেক্ষক বা শ্রোতার লক্ষণ দিয়াছেন,—"who is a man of educated taste and represents an instructed public'—যিনি মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়। তারপর কাব্যাস্বাদনের পথে শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া সাধারণীকরণের ব্যাখ্যায় ব্যাপারটি অনেকখানি বিশদ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

মূল কথা সর্বকালের সর্বমানব-সাধারণ চিত্তভাবই সাহিত্যের স্থায়ী উপাদান। প্রাচীন অলঙ্কারাচার্যগণ এই রহস্য বুঝিয়াছিলেন এবং সুকুমার সাহিত্যবোধ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রজ্ঞা লইয়া বিষয়টির চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্ব অস্বীকার করা সম্ভবপর নয়। কড্‌ওয়েল কেবল কাব্যকেই এক হিসাবে পরিবর্তনহীন নিত্য স্থায়ী বলেন নাই; মানুষ সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,' he has desires as ancient and punctual as the stars'—তাহার চিত্ত-বাসনা নক্ষত্রমালারই ন্যায় প্রাচীন এবং নিয়মানুবর্তী। তাহার পর প্রেমের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'these are qualities of being as enduring as man'—এই ভাবসমূহ মানবের ন্যায়ই স্থায়ী। সর্বশেষে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই বলিলেন, "man too must pass away." "উৎপন্ন বস্তুমাত্রই ক্ষয়শীল"—বুদ্ধদেবের এই বাণীরই যেন উহা প্রতিধ্বনি।

মানুষ বিনাশ পাইবে, গ্রহতারকাও থাকিবে না, মহাপ্রলয় আসিবে—এ কথা ঠিক। কিন্তু যতদিন তাহা না ঘটে, ততদিন মহাকোলাহলে মানুষের অভিযাত্রা চলিবে। এই যাত্রা-কোলাহলের মূলে রহিয়াছে মানবের এক চিত্তাবস্থা—যাহা গতিশীল এবং নিয়তপ্রকাশশীল; যাহা পূর্ণতা চায়, প্রতিষ্ঠা চায় এবং প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি চায়।

মানুষের এই চিত্তাবস্থার মূল প্রকৃতিস্বরূপ কোনও একটি ভাব—একটি বীজ-ভাব বলিয়া কিছু আছে কি? অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রাচীন আচার্যগণ

প্রসঙ্গক্রমে ইহা লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা নিরর্থক হইবে না।

পণ্ডিত নারায়ণ মনে করেন, এক চিরন্তন বিস্ময় ভাব—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় 'wonder spirit'—তাহাই কবিচিত্তের, অতএব মানবচিত্তের বীজ-ভাব। কাব্য-আলোচনায় এই মত বিশেষ আদরণীয়। মূলস্থায়ী বিস্ময় ভাব আশ্রয় করিয়া জাগে অদ্ভুতরস এবং অদ্ভুতরসই শৃঙ্গার বীর বা রৌদ্র নানা রসে বিলসিত হইতে থাকে। এই জন্ম নারায়ণ 'রস' বলিতে একমাত্র অদ্ভুতরস-কেই মান্ত করিয়া থাকেন। নারায়ণের মত আমরা সুরি ধর্মদত্তের বচন হইতে পাইয়াছি। ধর্মদত্ত বলেন, চমৎকার না হইলে রস কি? রসের সার হইতেছে চমৎকার। সাহিত্য ক্লাসিক্যাল হউক বা রোমান্টিক হউক, অথবা নিছক রিয়ালিষ্টিক বা বস্তুতান্ত্রিক হউক, অন্তরে কোন বিশিষ্ট ভাবাশ্রয়ে বিস্ময় জন্মাইতে না পারিলে কবিচিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল কেন, এবং পাঠকচিত্তই বা আকৃষ্ট হইবে কেন? ধর্মদত্তের প্রসিদ্ধ বচনটি হইতেছে,—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতোরসঃ॥
তস্মাদ্ অদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥

—রসের সার হইতেছে চমৎকার, উহা সর্বত্রই অনুভূত হয়, সেই চমৎকারের সার সর্বত্রই অদ্ভুতরস বলিয়া স্বীকৃত হয়। অতএব পণ্ডিত নারায়ণ অদ্ভুত-রসকেই একমাত্র রস বলিয়া মনে করেন।

ধারাপতি ভোজদেব সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থে প্রথমে অভিমান বা অহঙ্কারকে এবং পরেই প্রেমকে সর্বভাব ও সর্বরসের মূলপ্রকৃতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। অহঙ্কার তো সৃষ্টির যাবতীয় ব্যাপারেরই মূল কারণ, দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া সাহিত্য-শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ মাত্র চলে। অনাদি প্রেমই মূল বীজ-ভাব—কথাটি শুনিতে সুন্দর এবং আধুনিকও বটে, কিন্তু যে যুক্তি দিয়া তিনি উহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, তাহা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। লোকে বলে, রতিপ্রিয় রণপ্রিয়, পরিহাসপ্রিয় বা অমর্ষপ্রিয়; অতএব প্রিয় হইতে গুণবাচক বিশেষণ প্রীতি বা প্রেম সর্বত্রই অনুস্যূত রহিয়াছে এবং সকল ভাবই প্রেমভাবে পর্যবসিত হইতেছে,—ইহাই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া মনে হয়।

অগ্নিপুরাণের অভিমতও অনেকটা একই প্রকার—সহজানন্দের প্রকাশ

চমৎকার রস। প্রথম বিকার অহঙ্কার, তাহা হইতে অভিমান, তাহা হইতে রতিভাব ও শৃঙ্গাররস ইত্যাদি।

বাঙালী আলঙ্কারিক শ্রীপরমানন্দদাস সেন অর্থাৎ কবিকর্ণপূর গোস্বামীর সূক্ষ্ম মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য। তিনি মনে করেন, চিত্তের স্থায়ী ভাব স্বরূপত মাত্র একটি, তাহা চিত্তের আনন্দস্বভাব অবস্থাবিশেষ। উহার নাম দিয়াছেন তিনি, আস্বাদাঙ্কুরকন্দ। প্রত্যেক স্থায়ী ভাবের মধ্যে যে অবিশেষ স্বাদনাত্মক ধর্ম বা রসানুকূল স্বভাব অনুস্যূত আছে, তাহাকে তিনি 'আনন্দাত্মক বৃত্তি' বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহাই সর্বরসাস্বাদের মূল-ভূত একমাত্র স্থায়ী ভাব, তাহাই বিভাবাদির সংযোগে অন্যধর্মবিশিষ্ট হইয়া রতি উৎসাহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে। ইহার পরেই তিনি একমাত্র প্রেমরসে সকল রসই বিদ্যমান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই।

মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটকে তমসার মুখ দিয়া যে শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই কবির মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াছেন —করুণরসই রস, অন্যান্য রস উহার বিকৃতি বা পরিণাম মাত্র। এই মতে এক চিরন্তন বেদনা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—একটি বেদনাময় চৈতন্যই, কবিচিত্তের মূল স্থায়ী ভাব। মন্তব্য মহাকবির উপযুক্ত বটে এবং সুধীসমাজে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার্হ। মহাকবির করুণরস-প্রশস্তিটি হইতেছে—

"একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্ত-বুদ্বুদ-তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎসমগ্রম্॥"

—একই করুণরস নিমিত্তভেদহেতু ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, জল যে প্রকার আবর্ত বুদ্বুদ ও তরঙ্গরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুত সমস্তই সলিল থাকে।

নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনি শান্তভাবকে মূল প্রকৃতি এবং অন্যান্য ভাবকে বিকৃতি বলিয়াছেন, শান্তভাবেই সমুদয় ভাবের উদয়-বিলয়। ভাষ্যকার আচার্য অভিনব-গুপ্তও ভাষ্যে এই মত বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অনেকের মতে নাট্য-শাস্ত্রে মূলের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তী যোজনা; আমাদেরও তাই মনে হয়। যাহা হউক, ভরতমুনির না হইলেও কতিপয় পণ্ডিতের যে এইরূপ অভিমত ছিল,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পন্থা অনুসরণ করিয়া আমরাও বলিতে পারি, বীররসই মূলরস, অন্য সকল রস তাহারই বিলাস মাত্র। রণবীর, রতিবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর, শ্রেষ্ঠ ভাবের বাহন মাত্রই এক এক বীর। উৎসাহ উহার স্থায়ীভাব এবং এই উৎসাহ ছাড়া জগৎ ও জীবনের কোন ব্যাপারই সম্পন্ন হইতে পারে না। বলিতে পারি, উৎসাহ ভাবেই সকল ভাব অন্তর্ভূত। আশা আশ্বাস উদ্দীপনা লইয়াই তো উৎসাহ; উৎসাহই প্রকৃতিস্থানীয় হইয়া চিত্তের আদিভূত মূল ভাব।

তাহা হইলে বিস্ময়, প্রীতি, বেদনা, আনন্দ, শান্তি অথবা উৎসাহ সকলেই মূল ভাব? আসল কথা এই, সমুদয় ভাবই পরস্পরসম্পর্কযুক্ত, বিচিত্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-ধর্মে এবং বিচিত্র হেতু ও প্রতিবেশ-প্রভাবে এক সাধারণ চিত্তাবস্থার নানা রূপ মাত্র। মন বা চিত্ত এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা, ভাবগুলি সেখানে নানা কারণে ভিন্নরূপ বলিয়া দৃশ্যমান হইলেও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ঐক্য রূপকেই প্রমাণিত করে। সকলের অতীত সর্বভূমিক চিত্তাবস্থাই প্রকৃতি স্থায়ী মূল।

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও 'ঐতিহাসিক চিত্র'

১৩০৫ সালের প্রথম ভাগে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় রাজশাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রের প্রস্তাবনাপত্র প্রচারিত হয়। এই প্রস্তাবনা হস্তগত হইলে রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত 'ভারতী' পত্রে ("প্রসঙ্গ কথা" ভাদ্র ১৩০৫) এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি (পৌষ ১৩০৫) মাসে 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই এরূপ পত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথমে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই "প্রস্তাবে ও সহায়তায়" 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র জন্ম হয়। অক্ষয়কুমার আত্মকথায় লিখিয়া গিয়াছেন:—"রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতী' পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে [১৩০৫ সাল], তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে, ঐতিহাসিক চিত্র নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক', ১৩১১ সাল, পৃ.৭৪৬)। রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র "সূচনা" লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

"সূচনা।

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদকদত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোন প্রকারের অধিকারের দাবী রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাহাতে অনধিকারপ্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহ সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোন শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না;—সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্য্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে

যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকার স্তে মা ফলেষু কদাচন,"—অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্ম্মকর্ত্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্ম্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে। সম্পাদকমহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, তাহার ফল বাঙ্গলার—এবং আশা করি অন্য দেশের—পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্ব্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধজলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল,—একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাঙ্গালার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার প্রথম প্রমাণ

হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাষ্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ' 'চন্দ্রশেখর' 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্য-প্রাসাদের বড় সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্র অদ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদকমহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন—"নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙ্গালী রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই ত প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্ত্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে ঐতিহাসিক চিত্র দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না,—সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সঙ্কীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি ঐতিহাসিক চিত্রের মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না; কিন্তু বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন, এবং বাঙ্গালার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ঐতিহাসিক চিত্র তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা,—এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, তাহা

কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানব-মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্য্যে ঐতিহাসিক চিত্র সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে—বন্ধ্যা এবং অবন্ধ্য (Productive এবং Unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্যা বলা যায়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, ঐতিহাসিক চিত্র যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্যা হইবে না, কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে—একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্যলাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এদেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়;—তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোন মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন, তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু কি বাণিজ্যে কি সাহিত্যে—ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোন কাজেই লাগিবে না?

ঐতিহাসিক চিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার মূলধন বেশী জোগাড় হয় নাই, ইহার কলবলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য, যে মহৎ অভাব মোচনের আশা করা যায়, তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্ম্মিত পণ্যের দ্বারা

নোয়াখালির হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীর পরে হিন্দুসমাজকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে আজ নূতন ক'রে চিন্তা করতে হচ্ছে। সকলেই জানেন যে, অতীতে আমাদের সমাজ এই সব নিরপরাধ-নিরপরাধাদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করেন নি, এবং সম্পূর্ণ বিনা দোষে এঁদের ত্যাগ করেছেন। অবশ্য বর্তমানে নিখিল-ভারত হিন্দুমহাসভা বিধান দিয়েছেন যে, এঁদের কোনরূপ পাপ হয় নি ব'লে এঁদের ত্যাগ করা তো চলবেই না; এমন কি, এঁদের কোন প্রায়শ্চিত্তেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যুগযুগান্তব্যাপী সংস্কারের অন্ধ তমিস্রায় আজও আমাদের মন এরূপ সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, সমাজের সুস্পষ্ট বিধান সত্বেও অনেকে আজ নিজেদের অশুচি মনে ক'রে মর্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করছেন। তাঁদের মানসিক শান্তির জন্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এঁদের জন্য গঙ্গাস্নান বা নামজপ প্রভৃতি নামমাত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন।

বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নরনারী ও বলপূর্বক বিবাহিতা বা ধর্ষিতা নারীদের অন্যায্য পরিত্যাগই তৎকালীন হিন্দুসমাজের সাধারণ নিয়ম হ'লেও, আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে কয়েকজন সুস্পষ্ট বলেছেন যে, এঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, সুতরাং বিনা দোষে এঁদের ত্যাগ করা নিতান্তই অনুচিত। অন্য কয়েকজন অতদূর উদার না হ'লেও, যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্তের পরে এঁদের অনিচ্ছাকৃত পাপ ক্ষালন হ'লে এঁদের সমাজে সসম্মানে গ্রহণ করা যেতে পারে, তা স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হন নি। এরূপ স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে 'দেবল-স্মৃতি' শ্রেষ্ঠ। এই ক্ষুদ্র স্মৃতিতে বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ ও ধর্ষণ সম্বন্ধে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে; এবং এই সব প্রায়শ্চিত্ত একেবারেই কঠোর বা দুঃসাধ্য নয়, উপরন্তু যথেষ্ট লঘু ও সহজসাধ্য। অবশ্য যুক্তি ও ন্যায়ধর্মের দিক্ থেকে দেখতে গেলে, পশুবলের নিকট পরাজিত হয়ে যে নরনারী নিরুপায় হয়েই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন, অথবা যে অসহায়া নারী বলপূর্বক ধর্ষিতা বা তথা-কথিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ; এবং সেজন্য তাঁদের লঘুগুরু কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তেরই প্রয়োজন নেই। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনেকে প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে মানসিক শান্তিলাভ করবেন না। কেবল তাঁদের জন্যই শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির বিষয়ে বর্তমানে আলোচনা ও প্রচার আবশ্যক। দেবলস্মৃতি অধুনা দুষ্প্রাপ্য, এবং এর বাংলা অনুবাদও অদ্যাপি

প্রকাশিত হয় নি। সেজন্য সাধারণের অবগতির জন্য এই স্মৃতির বঙ্গানুবাদ এ স্থলে প্রদান করা হ'ল।(১)

বঙ্গানুবাদ

সিন্ধুতীরে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল সুখাসীন হয়ে ছিলেন। (সেই সময়ে) সকল মুনিগণ সমবেত হয়ে তাঁকে এই কথা বললেন, "ভগবন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যাঁরা বিধর্মি কর্তৃক (বলপূর্বক) নীত (বা অপহৃত) হয়েছেন, তাঁরা যথাক্রমে কিরূপে শুদ্ধিলাভ করবেন? তাঁদের কিরূপ স্নান, কিরূপ শৌচ, কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, কিরূপ আচারব্যবহার করা কর্তব্য? সবিস্তারে আমাদের এ বিষয়ে বলুন"। (শ্লোক :—৩)

দেবল বললেন, "হে মহর্ষিগণ! আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রায়শ্চিত্ত বলছি (শ্লোক ৫)। যিনি বিধর্মি কর্তৃক নীত হয়ে অপেয় দ্রব্য পান, অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ ও অগম্যা স্ত্রী গমন করতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ হন, তা হ'লে তাঁর কিরূপে শুদ্ধিলাভ হবে, সে কথা আমি বলছি। এক বৎসর এই অবস্থায় থাকলে, ব্রাহ্মণকে একটি চান্দ্রায়ণ(২) ও একটি পরাক(৩) ব্রত, ক্ষত্রিয়কে একটি পরাক ও একটি পাদকৃচ্ছ্র ব্রত(৪), এবং শূদ্রকে পাঁচদিন উপবাস করতে হবে। চতুর্বর্ণেরই প্রায়শ্চিত্তকালে নখ ও লোম কর্তন করতে হবে, অন্যথা তাঁদের শুদ্ধিলাভ হ'বে না। তাঁদের দেহ প্রায়শ্চিত্তবিহীন অবস্থায় থাকলে, মেখলা ও দণ্ড বর্জন করে দেহসংস্কার করা কর্তব্য" (শ্লোক ৭—১০)।

কাহারও দণ্ড ও মেখলা বিধর্মি কর্তৃক অপহৃত হ'লে, তিনি (উপনয়ন, বিবাহাদি) সংস্কারপ্রমুখ সকল কার্যেই যথাবিধি অধিকারী থাকবেন। শুদ্ধিলাভেচ্ছুক হ'লে (উক্ত) সংস্কারকার্যের পরে তাঁকে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা, গাভী,

(১) যে কয়েকটি শ্লোকে অন্যান্য বিষয়ের বিধান দেওয়া আছে, নিষ্প্রয়োজন বোধে সেগুলি বাদ দেওয়া হ'ল।

(২) কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে চতুর্দশ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ত্রয়োদশ গ্রাস, এরূপে ক্রমশ এক এক গ্রাস হ্রাস করে অমাবস্যায় সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে। পুনরায়, শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এরূপে ক্রমশ এক এক গ্রাস বৃদ্ধি ক'রে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করতে হবে। এই ব্রতের নাম 'চান্দ্রায়ণ'।

(৩) সংযতচিত্তে দ্বাদশ দিন উপবাস করার নাম "পরাক" ব্রত।

(৪) প্রথম দিন দিনে একবার মাত্র ভোজন, দ্বিতীয় দিন রাত্রে একবার মাত্র ভোজন, ও

ভূমি ও সুবর্ণ দান করতে হবে। তৎপরে তিনি কুটুম্বগণের সহিত পংক্তি-ভোজনে প্রবৃত্ত হতে পারেন। তিনি যথাবিধি স্বীয় পত্নীগমন করলে শুদ্ধ হবেন (শ্লোক ১১—১৪)।

যদি (উক্ত ব্রাহ্মণাদি) কেহ বৎসরাধিক কাল বিধর্মিকর্তৃক অপহৃত হয়ে (উক্ত কার্যাদি করতে বাধ্য হন), তা হ'লে তিনি (উক্ত) প্রায়শ্চিত্ত করবার পর গঙ্গাস্নান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন (শ্লোক ১৫)।

"যাঁরা বিধর্মী, চণ্ডাল ও দস্যু-কর্তৃক বলপূর্বক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হন; এবং গবাদি প্রাণিহিংসাপ্রমুখ অশুভ কর্ম, উচ্ছিষ্টমার্জন, উচ্ছিষ্টভোজন, খচ্চর, উষ্ট্র ও গ্রাম্য বরাহের মাংসভক্ষণ; বিধর্মী প্রভৃতির স্ত্রীদের সঙ্গ ও ঐ সকল স্ত্রীদের সহিত ভোজন করতে বাধ্য হন, তাঁরা প্রাজাপত্য ব্রত(৫) দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন। যাঁরা আহিতাগ্নি(৬), তাঁদের চান্দ্রায়ণ ও পরাক ব্রত পালন করতে হবে। এক বৎসর এই অবস্থায় থাকলে (দ্বিজাতিগণের) চান্দ্রায়ণ ও পরাক (উভয়) ব্রতই পালন করা কর্তব্য। এক বৎসর এই অবস্থায় বাস করলে শূদ্রের পক্ষে অর্ধমাসকাল যবমিশ্রিত জল পান করা প্রয়োজন। এক মাস মাত্র এই অবস্থায় বাস করলে, শূদ্র কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হন। এক বৎসরের অধিক (চতুর্বর্ণের) কেহ এই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হ'লে, তাঁর জন্য (অন্যান্য) প্রায়শ্চিত্তের বিষয় চিন্তা করা দ্বিজোত্তমগণের কর্তব্য। কেহ যদি চার বৎসরকাল এই ভাবে থাকেন, তা হ'লে তিনি তদ্ভাব (ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল ও দস্যুভাব) প্রাপ্ত হন(৭) এবং তাঁর পাপের হ্রাস হতে পারে না। দুরাত্মাদের প্রায়শ্চিত্ত মস্তক, ভ্রূ, বক্ষ প্রভৃতির কেশোৎপাটন। একটি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করলে, সেটি সমাপ্ত করা কর্তব্য। (প্রায়শ্চিত্তকারীর) তিন বেলা স্নান করা কর্তব্য। তাঁকে ধৌত বস্ত্র পরিধান ও হস্তে কুশ গ্রহণ করতে হবে, এবং জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী হ'তে হ'বে—এই হ'ল দেবলের মত" (শ্লোক ১৬-২৪)।

(৫) প্রাজাপত্য ব্রত দ্বাদশদিনব্যাপী। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র প্রত্যূষে, দ্বিতীয় তিন দিন একবার মাত্র সন্ধ্যায়, তৃতীয় তিন দিন অযাচিত ভিক্ষালব্ধ অন্ন, এবং শেষ তিন দিন সম্পূর্ণ উপবাস করতে হবে।

(৬) যিনি পূর্ত যজ্ঞাগ্নি আমরণ প্রজ্বলিত করে রাখেন।

(৭) শ্লোক ১৬—২২, বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা টীকায় আপস্তম্বের নামে উদ্ধৃত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মিতাক্ষরা টীকা, ২য় সংস্করণ, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৬, পৃঃ ৪৬০—৪৬১, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, ২৮৯ শ্লোক।

"যিনি এক বৎসর, বৎসরার্ধ, এক মাস, অথবা মাসার্ধকাল বিধর্মিকর্তৃক বলপূর্বক নীত বা অপহৃত হয়ে থাকেন (কিন্তু উক্ত দাসত্ববরণ প্রভৃতি কার্যে বাধ্য হন না), তাঁর কি প্রকারে শুদ্ধিলাভ হবে?" (উত্তর) "শূদ্র এক বৎসর এই অবস্থায় থাকলে চান্দ্রায়ণ, বৎসরার্ধ থাকলে পরাক, তিন মাস থাকলে অর্ধ পরাক, এবং এক মাস থাকলে পাদকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁকে নখ ও রোম কর্তন করতে হবে। এক মাস এই অবস্থায় থাকলে ক্ষত্রিয়কে এক পাদ কম পাদকৃচ্ছ্র ও বৈশ্যকে অর্ধ পাদকৃচ্ছ্র ব্রত পালন করতে হবে(৮)। প্রায়শ্চিত্ত অবসানে দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা দান করা কর্তব্য। তৎপরে কুটুম্বগণের সহিত উপবেশন করলে দোষের হয় না (শ্লোক ২৫—২৯)।

অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ, ঊনষোড়শ বর্ষ বালক, স্ত্রী অথবা রোগীর পক্ষে অর্ধ প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। পাঁচ থেকে দশ বৎসরের বালকবালিকার ক্ষেত্রে, ভ্রাতা, পিতা অথবা যিনি লালনপালন করেছেন, বা অনুরূপ অন্য কেউ প্রায়শ্চিত্ত করবেন। (অন্যান্য ক্ষেত্রে) স্বয়ং ব্রত পালন করা কর্তব্য, নতুবা শুদ্ধিলাভ হ'তে পারে না। (প্রায়শ্চিত্তকারীকে) তিলহোম প্রদান ও অতন্দ্রিত হয়ে জপ করতে হবে (শ্লোক ৩০—৩২)।

অতঃপর আমি এই শুভ প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলছি। নারীরা বিধর্মিকর্তৃক অপহৃতা হয়ে বলপূর্বক ধর্ষিতা হ'লে; এবং ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা অন্ত্যজ (পতিত ব্যক্তি) কর্তৃক অপহৃতা হ'লে, ব্রাহ্মণী (ও অন্যান্যদের) কিরূপ ন্যায্য প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হবে? (উত্তর) যদি ব্রাহ্মণী অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন,(৯) তা হলে তিনি একটি পূর্ণ পরাক ব্রত, এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা যথাক্রমে এক এক পাদ কম পরাক ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করবেন (শ্লোক ৩৬—৩৮)।

যাঁরা ধর্ষিতা হন নাই এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন নাই, তাঁরা ত্রিরাত্র ব্রত(১০) দ্বারা শুদ্ধা হন (শ্লোক ৩৯)।

"ঋতুমতী নারী বিধর্মী বা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্টা হ'লে, ত্রিরাত্র উপবাসের পরে স্নান ও পঞ্চগব্য গ্রহণ ক'রে শুদ্ধিলাভ করেন" (শ্লোক ৪০)।

"(ব্রাহ্মণী প্রমুখ যে নারী) এক বৎসর বা বৎসরাধিককাল স্বেচ্ছায় গ্রহণ,

---

(৮) এই স্থানের পাঠ অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ।

(৯) পাঠ অশুদ্ধ।

(১০) তিন রাত্রি উপবাস পালন।

ম্লেচ্ছসংস্পর্শে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি ত্রিরাত্র ব্রত দ্বারা বিশুদ্ধা হন" (শ্লোক ৪৪)।

"চতুর্বর্ণের যিনি বিধর্মী বা চৌর-কর্তৃক অপহৃত হয়ে বন অথবা বিদেশে নীত হয়েছেন, এবং ক্ষুধার্ত বা ভয়ার্ত হয়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করেছেন, তিনি স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হ'লেই নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ স্থলে ব্রাহ্মণ একটি কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয় অর্ধ কৃচ্ছ্র, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে তার এক এক পাদ কম কৃচ্ছ্র ব্রত পালন করবেন" (শ্লোক ৪৫—৪৬)।

"অপহৃতা নারী যদি বলপূর্বক বিধর্মিকর্তৃক গর্ভবতী হন, তা হ'লে তিনি (কেবল) ত্রিরাত্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করতে পারেন না। অন্যান্য সকলে (যাঁরা গর্ভবতী হন নাই) ত্রিরাত্র দ্বারাই শুদ্ধা হন। যে নারী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিধর্মিকর্তৃক সন্তানসম্ভাবিতা হয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা বা বর্ণেতরা যাই হোন, তাঁর শুদ্ধি সম্ভব কিরূপে? (উত্তর) কৃচ্ছ্র সান্তপন(১১) ব্রত পালন ও ঘৃতলেপন দ্বারা তাঁর শুদ্ধিলাভ হয়" (শ্লোক ৪৭—৪৯)।

"অসবর্ণ কর্তৃক যে নারী সন্তানসম্ভাবিতা হয়েছেন, তিনি সন্তানজন্মের পূর্ব পর্যন্ত অশুদ্ধা থাকেন। কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করলে বা রজোদর্শনের পরে তিনি বিমল কাঞ্চনেরই ন্যায় শুদ্ধা হন" (শ্লোক ৫০)।

"যিনি বিধর্মিকর্তৃক বলপূর্বক গৃহীত বা অপহৃত হয়েছেন (কিন্তু পূর্বোক্ত দাসত্ববরণ, উচ্ছিষ্টমার্জন, গবাদিবধ প্রভৃতি কার্যে বাধ্য হন নাই), তিনি পঞ্চ থেকে বিংশতি বৎসর এই অবস্থায় থাকলে, তাঁর শুদ্ধির বিধান দিচ্ছি(১২)। দুইটি প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা তিনি শুদ্ধিলাভ করেন—ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধি আর নেই" (শ্লোক ৫৩—৫৪)।

"যিনি বিধর্মীর সঙ্গে পঞ্চ থেকে বিংশতি বৎসর পর্যন্ত একত্র বসবাস করেছেন, তিনি দুটি চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন। তাঁকে মস্তক, ভ্রূ, শ্মশ্রু, কক্ষ প্রভৃতির রোম ও হস্ত-পাদের নখ কর্তন করতে হবে" (শ্লোক ৫৫—৫৬)।

---

(১১) প্রথম দিন সম্পূর্ণ উপবাস, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ দিন যথাক্রমে কেবল গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, গোদধি ও গোঘৃত গ্রহণ, এবং সপ্তম দিনে কেবল কুশোদক পান—এই হ'ল কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত।

(১২) উপরে শ্লোক ১৭—২২ দেখুন।

"যিনি পাঁচ দিন বিধর্মীর সঙ্গে বসবাস, সহভোজন প্রভৃতি করতে বাধ্য হন, তিনি পঞ্চগব্য গ্রহণ ও দান দ্বারা শুদ্ধি প্রাপ্ত হন (শ্লোক ৭৪)।(১৩) এক থেকে পাঁচ দিন এই সব করলে যথাক্রমে পঞ্চগব্যের এক থেকে পাঁচটি গ্রহণ করতে হবে। যদি পাঁচ, সাত, দশ দিন, অথবা পনেরো থেকে বিশ দিন এইভাবে বসবাস করতে হয়, তা হ'লে দ্বিজাতিগণের দেহশুদ্ধি কি প্রকারে হবে, আমি তা বলছি। পাঁচ দিন হ'লে পঞ্চগব্য গ্রহণ করতে হবে (শ্লোক ৭৪ দেখুন), দশ দিন হ'লে পাদকৃচ্ছ্র, পনেরো দিন হ'লে পরাক, এবং বিশ দিন হ'লে অতিকৃচ্ছ্র (১৪) ব্রত পালন করতে হ'বে" (শ্লোক ৭৬—৭৮)।

"যদি কোন ব্রাহ্মণ বিধর্মিকর্তৃক নীত বা অপহৃত হয়ে পঞ্চ, সপ্ত, অষ্ট, দ্বাদশ বা বিংশতি দিন সেই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন (কিন্তু পূর্বোক্ত সহভোজন প্রভৃতিতে বাধ্য হন না), তা হ'লে তিনি পঞ্চগব্য গ্রহণ দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করেন" (শ্লোক ৮০)।

শ্রীরমা চৌধুরী

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

ক্ষিধের চোটে তখন আমাদের প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার মতন অবস্থা। মোদকের দোকানে ঢুকে খাবার-দাবারের অবস্থা বিচার ক'রে দু পয়সার চিঁড়ে ও চার পয়সার দই কিনে কাঁচা শালপাতায় তো মাখা গেল। কিন্তু সে দই কি টক রে বাবা! আবার পয়সা দুয়েকের একেবারে ধুলো রঙের চিনি কিনে তাতে মাখলুম, কিন্তু তাতে মিষ্টি কিছুই হ'ল না, টকের তীব্রতা একটু কম পড়ল মাত্র।

যা হোক, সেই খাদ্য উদরস্থ ক'রে মোদকের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে খেয়ে সেইখানেই রাতটা কাটানো যেতে পারে কি না তারই জল্পনা করতে লাগলুম।

(১৩) শ্লোক ৭৫-র পাঠ অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ।

(১৪) প্রাজাপত্য ব্রতের মত এই ব্রতও দ্বাদশদিনব্যাপী, তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন প্রাতঃকালে মাত্র এক গ্রাস, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে মাত্র এক গ্রাস, তৃতীয় তিন দিন মধ্যাহ্নে মাত্র এক গ্রাস, এবং শেষ তিন দিন উপবাস করতে হবে।

মোদককে বললুম, দেখ, আমরা পরদেশী লোক, আশ্রয়হীন। তোমার এখানে রাতটা কাটাতে পারি কি? সেজন্যে ভাড়া যা লাগবে, তা আমরা দেব।

আমাদের প্রস্তাবটা শোনামাত্রই মোদক বললে, না বাপু। আমার এখানে পরদেশী লোক রাখি না, তোমরা অন্যত্র ব্যবস্থা কর।

মোদক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলছিল, কিন্তু থাকতে দেবার প্রস্তাব শুনেই সে গম্ভীর হয়ে পড়ল। ভাবলুম, আজও বোধ হয় আমাদের জন্যে পথের ধারেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। শরীর এমন ভেঙে পড়েছিল যে, মনে হ'তে লাগল, আজ রাতে বাইরে শুলে ঠাণ্ডায় ম'রে যাব, তার ওপরে নেকড়ের পাল কি আজও মুখের শিকার ফেলে পালিয়ে যাবে!

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, এখান থেকে রেলের ইষ্টিশান কত দূরে?

মোদক হিসেব ক'রে তিনটে স্টেশনের নাম করলে। তার প্রত্যেকটির দূরত্ব সেখান থেকে আট-দশ মাইলের কম নয়। একটু চিন্তা ক'রে সে আবার বললে, এখান থেকে সকালবেলা রওনা হ'লে বিকেল নাগাদ সেখানে পৌছনো যায়।

তখন বোধ হয় বেলা তিনটে হবে, কোনও স্টেশনের দিকে রওনা হওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। তার ওপরে দু দিন ধ'রে অতখানি ক'রে হেঁটে দেহ ও মনের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। কি করব, কোথায় যাব, সেই চিন্তায় অভিভূত হয়ে পড়লুম। আবার মোদককে জিজ্ঞাসা করা গেল, আচ্ছা, রাতের মতন এখানে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে কি?

মোদক কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে, এই দেহাতে কোন্ গৃহস্থ অজানা পরদেশীকে ঘরে থাকতে দেবে, বল? এ কি শহর?

একজন আধাবয়সী লোক সে সময় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সেই শ্যামা-পোকার তবক-চড়ানো জিলিপি কিনছিল ও আমাদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাচ্ছিল। মোদকের কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

মোদক তাকে বললে, এরা পরদেশী, রাত্রে এখানে থাকতে চায়, তা এখানে থাকবার জায়গা কোথায়? অজানা লোককে আশ্রয় দিয়ে কি শেষে ফ্যাসাদে পড়ব?

লোকটি জিলিপির ঠোঙা হাতে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা আজ রাতে কি এখানে থাকতে চাও?

বললুম, আমরা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, দু দিন অনবরত হেঁটেছি, আজ আর নড়বার শক্তি নেই। যদি আজকের রাত্রের জন্য কোথাও একটু আশ্রয় পাই তো বেঁচে যাই।

লোকটি আমাদের কথা শুনে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললে, এর জন্য কি হয়েছে! তোমরা পরদেশী, আমাদের গ্রামে এসে কি পথে প'ড়ে থাকবে?

তারপরে মোদককে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এ ব্যাটা বেনিয়ার বাচ্চা, দাঁও না দেখলে কি ও জায়গা দেবে! এখানে আমাদের জমিদারের কাছারি আছে, সেখানে গিয়ে শুয়ে থাক, কেউ কিছু বলবে না।

কোথায় তোমাদের জমিদারের কাছারি বাবা?

উঠে এস, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

এত বড় আশ্বাস পেয়ে তখুনি তড়াক ক'রে উঠে পড়া গেল। লোকটি আমাদের নিয়ে চলল এ গলি সে গলি দিয়ে। চলতে চলতে সে বলতে লাগল, আমাদের মালিক অর্থাৎ জমিদার, সে একেবারে দেবতা। হুকুম আছে যে, তাঁর এলাকার মধ্যে কোনও লোক আশ্রয়হীন বা অনাহারে না থাকে। তাঁর রাজ্যে কোন পরদেশী আশ্রয়হীন হয়ে পথে প'ড়ে আছে শুনলে সে দেশের সবাইকে তার ফল ভোগ করতে হবে। ও ব্যাটা বেনের বাচ্চা তোমাদের ভড়্‌কি দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল! মেহমানের ইজ্জৎ ও কি ক'রে বুঝবে?

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের জমিদার কে?

লোকটি ভক্তিভরে দেড়গজী লম্বা কি একটা নাম বললে, গোড়ায় নবাব ও শেষে বাহাদুর ছিল, এইটুকু মনে আছে।

যা হোক, আমরা বড় একটা ইটের গোলাবাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। বাড়ির সামনে ঘাসবিহীন মাঠে এক জায়গায় বিস্তর গরুর গাড়ি পাশাপাশি সাজানো। বোধ হয় পঞ্চাশ-ষাটটা বলদকে এক দিকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, মাটির ছোট ছোট উঁচু ঢিপি পাশাপাশি লাইন বাঁধা, ঢিপির প্রত্যেকটাতে একটা ক'রে মাটির গামলা বসানো। এই গামলাগুলোতে বলদদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, আর তারা মিলিটারি কায়দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সশব্দে খেয়ে চলেছে।

লোকটি আমাদের নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। গেট পেরিয়ে প্রকাণ্ড

উঠোন, লম্বা-চওড়ায় প্রায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উঠোনের সমান হবে, তবে বাঁধানো নয়। সেখানে বোধ হয় সারাদিন শস্ত ঝাড়া হয়েছে। সে সময়ে পনেরো-ষোলটি স্ত্রীলোক মিলে শুকনো তালপাতার গোছা দিয়ে সেই বিরাট উঠোন পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল। আমরা নাকে কাপড় দিয়ে কোন রকমে সেই মাঠ পার হয়ে একটা সরু গলিপথ দিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট উঠোনে এসে পড়লুম। এ জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। উঠোনের তিন দিকে সারি সারি ঘর, কোন কোন ঘরে লোকজন ব'সে কাজ করছে, দেখলেই বোঝা যায় জমিদারী সেরেস্তা।

এই রকম গোটাকয়েক ঘর পেরিয়ে এসে আমাদের অনুগ্রাহক একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এই ঘরের ভেতরে ফরাশের বদলে চেয়ার টেবিল দেখা গেল বটে, কিন্তু সে আসবাবের বয়েস নির্ণয় করতে হ'লে প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয়। লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে উঁকি দিয়ে যেন কাকে খুঁজতে লাগল। বারান্দা দিয়ে একটা চাকর-গোছের লোক যাচ্ছিল, তাকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, পাঁড়েজী কোথায় ?

লোকটা চীৎকার ক'রে উত্তর দিলে, ওই যে ভেতরে রয়েছে, যাও না চ'লে।

চাকর চ'লে যেতেই লোকটি ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে ব'লে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরে চেয়ার-টেবিলের গলি-ঘুঁজি ও দু-পাঁচটি লিখনরত কর্মচারীকে পেরিয়ে আমরা সেই নায়েব-নাজিমের সম্মুখীন হলুম।

দেখলুম, এক বৃদ্ধ, মাথা ন্যাড়া, সেই শীতে আদুড় গায়ে চোখে ডাল-ভাঙা চশমা লাগিয়ে একটা প্রকাণ্ড খাতার মধ্যে মুখ জুবড়ে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কি দেখছে। লোকটির সেই ন্যাড়া মাথা থেকে আরম্ভ ক'রে কোমর অবধি ও দুই হাতের আঙুলের ডগা অবধি চন্দনের ছাপে রামনাম লেখা। সেই দৃশ্য দেখে পরিতোষ আমার কানে কানে বললে, এ যে চিতেবাঘের খপ্পরে এনে ফেললে !

পরিতোষের একখানা হাত জোরে টিপে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলুম। আমাদের সঙ্গের লোকটি কিছুক্ষণ সেই দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ যেন ডুকরে উঠল, গোড়্ লাগে পাঁড়েজী।

কথাটা কানে যাওয়া মাত্র পাঁড়েজী খাতা থেকে মুখ না তুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক, রামজী তোমার কল্যাণ করুন।

আরও খানিকটা বিড়বিড় ক'রে কি বললেন, সেগুলো অভিশাপ না আশীর্বাদ তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপরে ধীরে-সুস্থে সেই বিরাট খাতা বন্ধ ক'রে চশমা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি?

আমি শিউরতন। এই দুটি ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

বৃদ্ধ আমাদের দিকে চাইতেই আমরা ঘাড় নীচু ক'রে অতি বিনীতভাবে নমস্কার করলুম। আবার তুবড়ির মতন খানিকটা আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে হাসি-হাসি মুখে আমাদের দেখতে লাগলেন।

শিউরতন বললে, অমুক:বেনের দোকানে এরা রাত্রিটুকুর মতন আশ্রয় চাইছিল, তা আমি এখানে নিয়ে এসেছি।

বৃদ্ধ আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেশ?

কলকাতায়।

কলকাতা শুনে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের নিরীক্ষণ ক'রে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, খাস কলকাতায়?

আজ্ঞে, খাস কলকাতায়।

তা বিছানাপত্তর সঙ্গে আছে তো?

এ কথার আর কি জবাব দেব, চুপ ক'রে রইলুম। বহুদর্শী লোক, আমাদের অবস্থা বুঝতে বিশেষ দেরি হ'ল না। সঙ্গের লোকটিকে বললেন, আচ্ছা, তা হ'লে ওঁদের মুসাফিরখানায় নিয়ে যাও।

শিউরতন আবার তাঁকে ভক্তিভরে নমস্কার ক'রে আমাদের বললে, আসুন।

আবার সেই চেয়ার টেবিল পেরিয়ে বাইরে এসে সামনের উঠোন পেরিয়ে এপারের দরদালানে এসে একটা ঘরের ভেজানো দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে শিউরতন আমাদের বললে, এই হচ্ছে মুসাফিরখানা। এই সারের পাশাপাশি যতগুলো ঘর দেখছ, সবই মুসাফিরদের জন্যে। এই ঘরটাই সবার চেয়ে ভাল ঘর, তোমরা এই ঘরে আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও।

ঘরের মধ্যে দুটো তক্তাপোশ প'ড়ে আছে। তক্তাপোশের তক্তাগুলির মধ্যে ব্যবধান অন্তত এক বিঘত ক'রে হবে। অসাবধানে শুলে হাত পা গ'লে নীচে প'ড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু খাটে শোওয়া আরামদায়ক হবে কি না, সে কথা বিচার করবার মতন অবস্থা আমাদের ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাথার ওপরে আচ্ছাদন পেয়েই খুশি হয়ে উঠলুম।

একটু ব'সেই শিউরতন উঠে বললে, আচ্ছা ভাই, আমি এখন তবে চলি। কাল তোমরা কখন বেরুবে?

বললুম, আমাদের বেরুতে করতে অন্তত দশটা বেজে যাবে।

আচ্ছা, তোমরা যাবার আগে আমিই আসব 'খন।

শিউরতন চ'লে গেল। আমরা দুজনে দুখানা তক্তাপোশে গিয়ে বসলুম। ঘরখানা বেশ বড়। মেঝে মাটির, কিন্তু দেওয়াল ও ছাত পাকা। ঘরের এক কোণে একরাশ, প্রায় ছাদ অবধি তাড়-করা কাঁচা কাঠ চেলা ক'রে রাখা হয়েছে, তা থেকে তীব্র একটা মদির গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই গন্ধের আকর্ষণে রাস্তার চকোলেট ও হলদে রঙের বড় বড় ভীমরুলের আমদানি হয়েছে। ভীমরুলদের অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জনে ঘরের মধ্যে একটা অতিপ্রাকৃত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ঘরের আর এক দিকে একটা আলমারির মতন বড় কুলুঙ্গি। সেই কুলুঙ্গির মধ্যে ফুট দুয়েক উঁচু চারটে লোহার পা-ওয়ালা চৌকো কাঁচের দীপাধার ও তার ভেতর গেলাসের মধ্যে জল ও রেড়ির তেলের দীপ রয়েছে। ঘরের আর এক দিকে একটা বিরাট ঢেঁকি বংশপরম্পরা ধ'রে উইয়ের দল খেয়ে চলেছে, কিন্তু তখনও সেটার আধখানাও তারা শেষ করতে পারে নি।

আমরা খাটের ওপর ব'সে থাকতে থাকতেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল। দেশলাই দিয়ে সেই বাতি জ্বালিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় বৃদ্ধ পাঁড়েজী খড়ম পায়ে খটখট ক'রে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলুম, বৃদ্ধের সেই রামনাম অঙ্কিত দেহ একটা মোটা গাঢ়তর চাদরে আবৃত হয়েছে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ প্রশ্নাদি ক'রে বললেন, তাই তো, তোমাদের সঙ্গে বিছানা-পত্র নেই, শীতে তো বড় কষ্ট হবে।

গত কাল যে আমরা রাস্তায় কাটিয়েছি, সে কথা আর তাঁকে বললুম না। তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে উপরি-উপরি দু-চারটে হাঁক ছাড়লেন। একটা চাকর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক হুকুম দিলেন, মেহমানদের জন্যে দুটো কম্বল এনে খাটে বিছিয়ে দাও।

চাকর চ'লে গেল। পাঁড়েজী জিজ্ঞাসা করলেন, আহার করবেন তো?

বিকেলবেলা বাজারে সেই যে ধুলো দিয়ে চিঁড়ে-দই মেখে খেয়েছিলুম, তাঁরা ততক্ষণে পেট থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মহা হাঙ্গামা শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ক্ষুধা তো দূরের কথা, বিবমিষায় দেহ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল।

পাঁড়েজীকে বললুম, বাজারে চিঁড়ে-দই খেয়েছিলুম, এখন আর খাবার কোনও আকাঙ্ক্ষাই নেই।

পাঁড়েজী বললেন, আচ্ছা, দুধ খানিকটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, রাত্রে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয় তো খেও। আমাদের মালিকের হুকুম আছে, মেহমানদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়। তা ছাড়া এখানে মহিষের দুধ অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়, তোমাদের কোনও সঙ্কোচ করবার কারণ নেই।

ইতিমধ্যে একজন চাকর দুটো কালো 'ঘোড়ার কম্বল' নিয়ে উপস্থিত হ'ল। পাঁড়েজী বললেন, খাট দুখানায় পেতে দাও।

চাকর কম্বল পেতে দিয়ে চ'লে যেতেই পাঁড়েজী বলতে লাগলেন, এই যে কম্বল দেখছ, এ অতি অদ্ভুত জিনিস। কোনও জানোয়ার, তা বিচ্ছুই বল আর সাপ কি বিষখোপরাই বল, এই কম্বলের ওপর কিছুতেই উঠতে পারবে না। দিনের বেলা হ'লে পিঁপড়ে ছেড়ে দেখিয়ে দিতুম, তারা এর ওপর দিয়ে চলতেই পারবে না, পা আটকে যাবে। এইজন্য সন্ন্যাসী উদাসীরা এই কম্বল সঙ্গে রাখে। রাতবিরেতে জঙ্গল পাহাড় পথে ঘাটে তাদের ঘুরতে হয়, এই কম্বল পেতে শুয়ে পড়ে, কিছুতেই কিছু করতে পারে না।

আমরা ছেলেবেলা থেকে বাঘ ভালুক সিংহ নেকড়ে সাপ কাঁকড়াবিছে প্রভৃতি সাংঘাতিক চতুষ্পদ ও সরীসৃপের কথা শুনেছি এবং বইতেও পড়েছি, কিন্তু বিষখোপরা মালটির কথা কখনও শুনি নি।

পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, বিষখোপরা কি?

ভদ্রলোক একটু বৈদান্তিক হাসি হেসে বললেন, সে ভগবানের তৈরি এক জানোয়ার, সাপের মতনই দেখতে, তবে তার পা আছে।

ভয়ের চোটে জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেলুম, কটা পা আছে?

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা মহাভারত পড় নি বুঝি?

বললুম, নিশ্চয় পড়েছি।

পাঁড়েজী বললেন, আশ্চর্য! তা হ'লে বিষখোপরার কথা পড় নি? আরে, ওই বিষখোপরাই তো পরীক্ষিৎ রাজাকে ডেঁশেছিলেন। বিষখোপরা ডাঁশলে লোকে একবার মাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, আ-ই মুঝে বিষখোপরা নে ডাঁশা। বাস্, তারপরেই শেষ হয়ে যায়।

অদূরভবিষ্যতেই নিজের ঘুম সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পরিতোষ চকিতে প্রশ্ন করলে, এই ঘরে বিষখোপরা আছে নাকি?

পাঁড়েজী অত্যন্ত উদাসীনভাবে বললেন, এ ঘরে আছে কি না জানি না, তবে মাঝে মাঝে তাঁর ডাক শুনতে পাই এদিকটায়।

পাঁড়েজী আমাদের ভরসা দিতে লাগলেন, কোনও ভয় নেই, রামজীর নাম করতে করতে শুয়ে পড়। ব্রহ্মশাপ না হ'লে বিষখোপরা কখনও কামড়ায় না।

ভদ্রলোক যাবার সময় আবার বললেন, আমি এক লোটা দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাই খেয়ে রামনাম ক'রে শুয়ে পড়।

পাঁড়েজী খটখট ক'রে বেরিয়ে চ'লে গেলেন। আমরা সামনা-সামনি সেই খাট দুটোতে দুজনে উবু হয়ে মুখোমুখি ব'সে রইলুম। নতুন বিপদে প'ড়ে বাবা বিশ্বনাথের নাম জপতে জপতে হঠাৎ পাঁড়েজীর উপদেশ মনে প'ড়ে গেল। মনে মনে বিশ্বনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললুম, বাবা বিশ্বনাথ! কিছু মনে ক'রো না বাবা। তুমি গোখরো কেউটে নিয়ে ঘর কর, বিষখোপরা সামলাতে পারবে না। এই রাত্রিটুকুর মত দায়ে প'ড়ে ইষ্টনাম একটু অদলবদল ক'রে নিতে হচ্ছে।

মিনিটে সত্তরটা হিসাবে রামনাম জপ করতে শুরু ক'রে দিলুম।

উবু হয়ে ব'সে আছি। থেবড়ে বসতে ভয় হচ্ছে, পাছে কোথা দিয়ে বিষখোপরা এসে ডেঁশে দিয়ে যাবে, তারপর একবার 'আ-ই মুঝে বিষখোপরা নে ডাঁশা' ব'লেই কেতরে পড়ব।

একটু পরেই পরিতোষ একটা 'উঃ' আওয়াজ ক'রে বললে, কি বরাত রেখেছিস আমাদের! ডাইনীর কবল থেকে খুনের কবলে, খুনের কবল থেকে আধমরা হ'য়ে বেঁচে নেকড়ের কবলে, নেকড়ের হাত থেকে যদি বা বাঁচা গেল তো বিষখোপরা—

বাকিটুকু ভয়ে আর তার মুখ দিয়ে বেরুলই না।

ভাবতে লাগলুম, এর চেয়েও যে রাস্তায় নেকড়ের পালের মধ্যেও প'ড়ে থাকা ভাল ছিল বাবা! নেকড়েদের মতন ইনিও যদি একটু শুঁকেই ছেড়ে দেন, তবে এ যাত্রা রক্ষা পাই, জয় রাম, —জয় রাম, জয় রাম—

দুজনে মুখোমুখি ব'সে আছি। ঘরের দরজাটা খোলা, বাইরে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ঘরের আলোটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরের

কোণের কাঁচা কাঠের মধুপিয়াসী ভীমরুলদলের সেই অবিশ্রান্ত গুঞ্জন সুরু হয়েছে। ব'সে ব'সে ভাবছি,—সে আকাশ-পাতাল ভাবনার কি সীমা আছে? মাঝে মাঝে পরিতোষের মুখে দিকে চাইছি, তার চোখ দুটোর সমস্ত স্পষ্ট দেখতে না পেলেও যতখানি দেখা যায়, তাতেই মনে হচ্ছে, অত্যন্ত অস্বস্তিকর চিন্তায় সে কাতর হয়ে পড়েছে।

নিস্তব্ধতাটা ক্রমেই যেন পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল, এমন সময় পরিতোষ হঠাৎ 'বাপ রে' ব'লেই সেই উবু হওয়া অবস্থা থেকেই কি রকম ক'রে লাফ মেরে ব্যাঙের মতন মেঝেতে পড়ে গোঁ-গোঁ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

কি রে! কি হ'ল?—ব'লে খাট থেকে নেমে তাকে ধরলুম। সে সেই গোঁ-গোঁ অবস্থাতেই বললে, কিসে যেন পশ্চাদ্দেশে ডেঁশে দিলে!

বলিস কি রে!

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে তার শরীরে বিষের ক্রিয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। রামনামের গতি অজ্ঞাতসারেই দ্বিগুণ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে পরিতোষ দাঁড়িয়ে উঠে কাতরভাবে বললে, জায়গাটা ফুলে উঠেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দুজনে মিলে সেই গন্ধমাদন প্রদীপ উঠিয়ে নিয়ে এসে পরিতোষের খাটের ওপরে রেখে দংশনকর্তা অথবা কর্ত্রীর সন্ধান করতে লাগলুম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। পরিতোষ বললে, আলোটা এই দুই খাটের মধ্যিখানে একটা উঁচু জায়গায় রাখতে পারলে ভাল হ'ত। আলো থাকলে শুনেছি তারা আসতে পারে না।

একটা উঁচু টুলের মতন কিছু পাওয়া গেলে ভাল হ'ত। কিন্তু ঘরের চারদিক খুঁজে পেতে সে রকম কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। শেষকালে পরিতোষ প্রস্তাব করলে, একরাশ ওই চেলাকাঠ খাট দুটোর মধ্যিখানে রেখে তার ওপরে আলোটা রাখতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারা যেত।

প্রস্তবটা সমীচীন মনে হওয়ায় ঘরের কোণের সেই চেলাকাঠের পাহাড় থেকে যেমন একখানা কাঠ টানা, অমনই রাজ্যের ভীমরুল বোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ক'রে উড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলুম। আমার তো সেই শীতে একেবারে ঘাম ছুটতে লাগল, কারণ ইতিপূর্বে ভীমরুল-দংশনের অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল কিনা!

ভয়াল সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে ক'রে আজ একাধারে হাসি পাচ্ছে আর পরিতোষের কথা মনে পড়ছে।

যা হোক, বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে একবার দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে উৎকর্ণ হয়ে ভীমরুলের গুঞ্জন শোনবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলুম না। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খাটের ওপরে সেই রকম উবু হয়ে বসা গেল।

একটু বাদেই একজন একটা মাঝারি-গোছের এক লোটা দুধ ও একটা কাঁসার গেলাস নিয়ে এসে মেঝেতে রেখে বললে, দুধ রেখে গেলুম, যখন ইচ্ছা হয় খেও।

দরজার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে সে বললে, দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ো, নইলে কুকুর ঢুকে বিরক্ত করবে।

লোকটা বেরিয়ে যেতেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটে এসে বসলুম। বিষখোপরার চিন্তা তখনও মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে রয়েছে। স্মৃতির গভীরে ডুব মেরে হাতড়াচ্ছি, ব্রহ্মশাপ কখনও হয়েছে কি না! মনে হতে লাগল, ভাগ্যে আমি জন্মাবার আগেই বাবা ব্রহ্মণ্যের 'ন'কারটি লুপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন! নইলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই তো আমাকে মানুষ হতে হ'ত, আমি যা ছেলে, কখন কোন্ ব্রাহ্মণ কি শাপ ঝেড়ে দিত কে জানে!

একবার পরিতোষের দিকে চোখ পড়তে সে বললে, আচ্ছা, কাশী স্টেশনে কোনও পাণ্ডা আমাদের শাপ-টাপ দিয়েছিল রে?

অনেক ভেবে-চিন্তে বললুম, কই ভাই, কিছু মনে তো পড়ছে না।

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে পরিতোষ বললে, পূর্বজন্মের ব্রহ্মশাপও এ জন্মে ফ'লে যেতে পারে। রোহিতাশ্ব বেচারীকে যে শাপে কামড়েছিল, সে তো পূর্বজন্মের ব্রহ্মশাপের ফলে।

তারপরে সে ঘটি থেকে গেলাসে দুধ ঢালতে ঢালতে গম্ভীরভাবে বললে, নিয়তি যদি থাকে তো কেউ বাঁচাতে পারবে না।

এক গেলাস সেই আগুন-গরম দুধ চোঁ-চোঁ ক'রে মেরে দিয়ে গেলাসটা ঘটির ওপর রেখে পরিতোষ বললে, বেড়ে দুধ রে, খেয়ে ফেল্।

ভয় ও উৎকণ্ঠারূপ দুই সড়কির তাড়নায় বিকেলবেলাকার সেই সাংঘাতিক চিঁড়ে-দইয়ের বিপ্লবাত্মক আর্তনাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিছু ক্ষুধারও উদ্রেক

হচ্ছিল। গেলাসে খানিকটা দুধ ঢেলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চুমুক দিতে লাগলুম। ও দিকে পরিতোষ কম্বলের ওপর লম্বা হয়ে পড়ল। গেলাসটা শেষ হবার আগেই সে ঘুমের অভয় অঙ্কে ঢ'লে পড়ল।

খাটের ওপরে সেই রকম উবু হয়ে ব'সে আছি চক্ষুকর্ণ সজাগ ক'রে। পরিতোষের দিকে মধ্যে মধ্যে চোখ পড়ছে, তখন সন্ধ্যারাত্রি, বোধ হয় নটাও বাজে নি, ওরই মধ্যে দেহ তার ধনুকে পরিণত হয়েছে। বাইরে মাঝে মাঝে লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল, ক্রমে তাও বন্ধ হ'য়ে গেল। মাথার মধ্যে পাঁচ-সাত-দশজন থেকে থেকে ডুকরে উঠছে, আ-ই মুঝে বিষ-খোপরা নে ডাঁশা। পরিতোষের নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে ঈর্ষা হচ্ছে।

ক্রমে চারিদিক একেবারে নিষুতি হয়ে গেল, ঘরে বাইরে ঝিল্লীর ঝঙ্কার শুরু হ'য়ে গেল—ঝম্ ঝম্ ঝম্।

লোটা থেকে বাকি দুধটা গেলাসে ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে মেরে দিয়ে শোবার যোগাড় করতে লাগলুম। ভয়ানক জলতেষ্টা পেতে লাগল, কিন্তু জল কোথায়!

বিছানার ওপর গা ঢেলে দেওয়ার বোধ হয় মিনিটখানেকের মধ্যে তিড়-বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠলুম। বাপ রে, এ যে কণ্টক শয্যা! সত্যিই অদ্ভুত সেই কম্বল! সাপ বিছে বিষখোপরা তো দূরের কথা বাঘ ভাল্লুক পর্যন্ত তাতে পা দিতে পারে না। আমার গেঞ্জি শার্ট ধুতি ফুঁড়ে তার রোঁয়াগুলো ছুঁচের মতন দেহে বিঁধতে লাগল। একবার উঠে বসি, আবার শুয়ে পড়ি—এই করতে করতে সেই কণ্টকশয্যাতেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সারারাত স্বপ্নের ঘোরে বিষ-খোপরা, পরীক্ষিৎ ও রোহিতাশ্বের সঙ্গে তর্ক করতে করতে কেটে গেল।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, পরিতোষবাবুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ তো দূরের কথা, তিনি একেবারে বেনের পুঁটুলি মেরে গেছেন, সেই পুঁটুলির গেরো খুলতে খুলতে আমার দম বেরিয়ে গেল।

যা হোক, অনেক বায়নাক্কার পর তিনি গাত্রোত্থান ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কত বেলা হয়েছে রে?

দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি, প্রকৃতির ঘুম তখনও ঘন কুয়াশার অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন, অথচ কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে, দু-একজন লোকও চলা-ফেরা করছে। যা হোক, মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে আবার রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত

হলুম। যাবার আগে পাঁড়েজীর কাছে বিদায় নেবার জন্যে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। দেখলুম, সেই ভোরেই পাঁড়েজী স্নান সেরে সর্বাঙ্গে রামনাম দেগে খালি গায়ে ব'সে সেই বিরাট খাতায় মুখ জুবড়ে হিসাবপত্রের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। অন্যান্য কর্মচারীরাও সেই ভোরে এসে নিজের নিজের জায়গায় ব'সে গিয়েছে। আমরা পাঁড়েজীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, কিন্তু তিনি হিসাবপত্রে এমনই তন্ময় যে, তা বুঝতেও পারলেন না। দু-এক মিনিট অপেক্ষা ক'রে ব'লেই ফেললুম, গোড়্ লাগে পাঁড়েজী।

সেই অবস্থাতেই পাঁড়েজী তুবড়ির মতন বড়বড় ক'রে আশীর্বাদ বর্ষণ করতে করতে মুখ তুলে চশমা খুলে বললেন, কি, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে ভালই ঘুমিয়েছি। এবার আমরা যাই, আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এই শীতের রাতে আশ্রয় দিয়ে আপনি যে উপকার করলেন, এ জীবনে তা ভুলব না।

আমাদের কথা শুনে পাঁড়েজী দু হাতে দু কান চেপে ধ'রে বললেন, আরে, না না। আশ্রয় দিয়েছেন আমাদের মালিক, যাঁর আশ্রয়ে আমি আছি। আমাদের জমিদার, তিনি গরিব ও নিরাশ্রয়ের মা-বাপ। একবার যদি তাঁর কাছে গিয়ে তোমাদের দুঃখ জানাতে পার তো সারাজীবনের হিল্লে হয়ে যাবে।

কি একটু চিন্তা ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় যাবে?

পাটনা।

পাটনায় কি কোন খাস কাজ আছে?

বললুম, না, পাটনায় খাস কাজ কিছু নেই। আমরা দুঃখী লোক, চাকরির উমেদার, যেখানে দু মুঠো খাবার ব্যবস্থা হবে সেখানেই প'ড়ে থাকব। আমাদের উম্মিদও এমন কিছু বেশি নয়। আমরা একেবারে মূর্খও নই, কিছু ইংরেজী লেখাপড়াও জানা আছে।

আমাদের কথা শুনে বোধ হয় পাঁড়েজীর মনে একটু দয়া হ'ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের আপনার জন কে আছে?

বললুম, কেউ নেই হুজুর, আমরা একেবারে অনাথ।

পাঁড়েজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা দুজনে কি ভাই হও?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসতুতো ভাই।

আমার কথা শুনে পরিতোষ ফিক ক'রে হেসে ফেললে। কিন্তু তখুনি গম্ভীর হয়ে পাশের সেই পাহাড়-প্রমাণ উঁচু খাতাপত্রের দিকে চেয়ে রইল।

পাঁড়েজী কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, দেখ, আমি তোমাদের একটা পরামর্শ দিচ্ছি, বৃদ্ধের পরামর্শ বিপদকালে সর্বদা গ্রহণীয়। তোমরা সোজা চ'লে যাও আমাদের মালিকের কাছে। কোন রকমে তাঁর কাছে গিয়ে য'দি নিজেদের দুঃখ জানাতে পার তো একটা হিল্লে তোমাদের হয়েই যাবে। সেখানে য'দি বিফলমনোরথ হও তো আমার কাছে ফিরে এস, কোন রকমে খেয়ে প'রে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা হয়েই যাবে। মাথার ওপর রামজী আছেন, তাঁর নাম করতে করতে চ'লে যাও।

যা হোক, রামজী আমাদের মনোমত দেবতা না হ'লেও আপৎধর্ম হিসাবে রামজীর নামই স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল। বাজারে কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা হব ঠিক ক'রে সেদিকে কিছুদূর অগ্রসর হতেই কালকের সেই শিউরতনের সঙ্গে দেখা। শিউরতন বললে, আমি তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলুম। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম যে, তোমরা আজ সকালেই চ'লে যাবে।

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা সেই মোদকের দোকানে এসে উপস্থিত হলুম। দেখলুম, প্রায় দশ-বারোজন লোক দোকানের ভেতরে ব'সে খাচ্ছে। কেউ বা চালছোলা-ভাজা, কেউ বা ভুট্টার খই দিয়ে জলপান করছে। অপেক্ষাকৃত বিলাসী যারা, তারা চিঁড়ে-দই খাচ্ছে। শিউরতনের মুখে শুনলুম, এরা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তা না হ'লে ময়রার দোকানে এসে সকালবেলা জল খাবার সাধ্য এখানকার অল্প লোকেরই আছে।

দোকানে ঢুকে এক কোণে বসতেই সকলে জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। শিউরতন সাধারণভাবে আমাদের পরিচয় দিলে, এরা বাংগাল দেশের লোক। ঘরে কেউ নেই, ভাগ্য টেনে এনেছে এখানে। নিরাশ্রয় পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি কাল কাছারিতে নিয়ে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম।

এতখানি ব'লে শিউরতন একবার সগর্বে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলে, পাঁড়েজী এদের বলেছে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে, আমিও তাই বলেছি।

একটা লোক, ভুট্টার খইয়ে তার মুখ ভরতি, পাছে তার আগেই কেউ

কোনও মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফেলে, সেজন্য অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে 'মরি কি বাঁচি' ক'রে অর্ধচর্বিত খাদ্যের তাল গিলতে গিলতে আমাদের ব'লে ফেললে, আমাদের মালিক মানুষরূপী দেবতা, তাঁর কাছে একবার যদি পৌঁছতে পার তো সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

বলতে বলতে সেখানে যতগুলি লোক ব'সে ছিল, তারা সকলেই গদগদ হয়ে মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

যা হোক, আবার সেই ধূলোরূপী চিনি দিয়ে সামান্য কিছু চিঁড়ে-দই গলাধঃকরণ ক'রে শিউরতনের কাছ থেকে মালিক-গৃহের পথ-নির্দেশ নিয়ে রামনাম স্মরণ ক'রে যাত্রা করা গেল।

পথ চলতে চলতে কানের মধ্যে বাজতে লাগল, 'কোশল নৃপতির তুলনা নাই, জগৎ জুড়ি যশোগাথা, দীনের তিনি সদা স্মরণ-ঠাঁই, ক্ষীণের তিনি পিতা-মাতা।'

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বাংলা ভাষার সমস্যা

আমরা যেভাবে সাহিত্যকে বুঝে এসেছি, ঠিক সেইভাবে বোঝবার সময় দিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যত বড় বড় কথাই আওড়াই, সাহিত্যকে —বিশেষ ক'রে রস-সাহিত্যকে—যা নিয়ে আমাদের কারবার—সেটাকে আমরা যৌবনের বিলাস ব'লে দেখতেই অভ্যস্ত। এটা ছিল বাড়ির হট্টগোলের পাশে একটু বাগান, বেশি না হয়—উঠানের পাশে এক ফালি জমি বের ক'রে গোটাকতক ফুলগাছের সমাবেশ। এখন এসেছে 'গ্রো মোর ফুড'-এর যুগ, এই সামান্য বাগানটুকুর অস্তিত্ব লোপ পেতে বসেছে। জায়গাটা আছে, তবে সেটা ফুলের জায়গায় শাকে শস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ রসের জায়গায় প্রয়োজনের তাগিদই জীবনে দিন দিন প্রাধান্য লাভ করছে—নিতান্তই উদরের প্রয়োজন, বাহ্য শরীরের প্রয়োজন। জীবন হয়ে পড়েছে জটিল; অবশ্য জীবনের জটিলতা সাহিত্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের আমদানি ক'রে তাকে চিরকাল পুষ্টই ক'রে এসেছে, কিন্তু সে এ-জাতীয় জটিলতা নয়। সভ্যতার সংঘর্ষে, ধর্মের দ্বন্দ্বে, সমাজের আলোড়নে মানুষের জীবনে যে

জটিলতার সৃষ্টি করে, সেইটেই সাহিত্যের উপজীব্য ব'লে জেনে এসেছি আমরা; কেন না, তাতে মানুষের মনে নব নব রসচেতনার উন্মেষ হয়ে এসেছে। এখন দেশের মানুষ একেবারেই নূতনতর জটিলতার সামনে এসে পড়েছে—পেটে এক মুঠো ভাত, কোমরে এক খণ্ড বস্ত্র, ঘরে একটু আলো, এর জন্যে মুনাফা-রাক্ষসদের চোরাবাজার, এবং তার চেয়েও ভয়াবহ সদাশয় গবর্মেণ্টের পারমিট-কার্ডের সামনা-সামনি হয়ে জীবন সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধারণা একেবারেই ওলটপালট হয়ে গেছে। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়, নগ্নতার লজ্জায় হন্যে হয়ে উঠেছে,—এ অবস্থায় নিজের পিঠ বাঁচিয়ে তাদের কাছে কি ধরনের রসের অবতারণা করা যায়, সে সম্বন্ধে আমার গবেষণা এখনও শেষ হয় নি। শেষ হবে কি না কখনও তাও বলতে পারি না, সব দেখে-শুনে থ হয়ে গেছি,—একটা চলতি বাংলা কথার অবতারণা ক'রে বলা চলে, গবেষণা করতে গিয়ে গবেট মেরে গেছি।

সাহিত্য বলতে তার রসের দিকটাই আগে মনে আসে। আমি কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে এদিকটা এড়িয়ে যেতে চাই। এড়িয়ে যাওয়ার আর একটা কারণ এই যে, নূতন 'পরিস্থিতি'র মধ্যে সাহিত্যের ধারা কোন্ দিকে বইবে বা বওয়া উচিত, শুধু তারই যে হদিস পাচ্ছি না এমন নয়; সে ধারা আর কতদিন সচল থাকবে এবং থাকলে কিভাবে সচল থাকবে, সেইটেই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণটা একটু বিশদ ক'রে বলবার চেষ্টা করি:

ভাব আর ভাষা নিয়ে সাহিত্য। ভাবের বাহন ভাষা, এখন সেই ভাষা নিয়েই প'ড়ে গেছে দুর্ভাবনা। তার মধ্যে একটি—বাংলা লেখকদের মেজাজ এবং ব্যক্তিগত অভিরুচি নিয়ে, দ্বিতীয়টি—বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে, এবং তৃতীয়টি—ভারতের রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে। আমি সাধ্যমত এক একটি ক'রে তিনটির আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

বাঙালী-চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ, সে একনেতৃত্ব বরদাস্ত করতে পারে না। তাই না হয় একের জায়গায় একটা মাণিকসই সংখ্যায় বহুনেতৃত্ব চলুক, তাও নয়, পাড়ায় পাড়ায় নেতৃত্ব গ'ড়ে দল পাকাতে পারলেই সে থাকে ভাল, এবং সেটাকেও ভেঙে যদি ঘরে ঘরে নেতা খাড়া করতে পারে কিংবা আরও একটু চারিয়ে দিয়ে ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে, তো সে মনে করে, স্বাধীনতার একেবারে

চরম হ'ল। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে সাহিত্যে এই স্বাধীনতার অরাজকতা কি অনিষ্ট করছে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

প্রথমত বানানের কথা ধরা যাক ;—বানান আর সেই সঙ্গে উচ্চারণ। এর যে কত রকমফের আমাদের ভাষায়, তার হিসেব ক'রে ওঠা যায় না; এ ছাড়া দিন দিনই নিত্য-নূতনের উদ্ভব হচ্ছে। তেঁতুলের অঙ্কুর যেমন নিজের বিচি মাথায় নিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, বাংলা লেখকেও তেমনই নিজের নিজের বানান কলমের ডগায় নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে দেন দেখা; তফাৎ এই যে, সব বিচিই আলাদা। যত মত তত পথ ধর্মের ক্ষেত্রে বেশ চলে; কিন্তু একটা ভাষার শব্দগঠনের ক্ষেত্রে চালাতে গেলে বাইবেল-বর্ণিত বেবেলেরই সৃষ্টি হয়। ক্রিয়াপদগুলির যেন কোনও জাত নেই আর। যে কোন একটা ধাতু নিয়ে অবস্থাটা পরীক্ষা ক'রে দেখা চলে।

'বল্' ধাতুটা নেওয়া যাক,—এর থেকে 'বলিল' আছে, 'বোলিল' আছে, 'বোলিলো আছে, 'বোল্লো' আছে, 'বললে' আছে। এদের আবার প্রত্যেকের গাদাখানেক ক'রে ছেলেমেয়ে নাতি নাতকুড়। 'বল্' ধাতুর পঞ্চম সন্তান 'বললে' শব্দটিকে দেখুন, মাঝের লয়ে হসন্ত দেওয়া 'বল্‌লে' আছে, দুটো লয়ে গাঁটছাড়া বাঁধা 'বল্লে' আছে। তার পরের ধাপে আসেন 'বোললে', অর্থাৎ 'বললে' শব্দের বয়ে ওকার দেওয়া সন্তান, তারও নীচের ধাপে ওইরকম দুটি ক'রে ছাঁ-পোা। মাথা গুলিয়ে যায়, মনে হয়, তার চেয়ে আমাদের রাঢ়ীশ্রেণী কামদেব পণ্ডিতের সন্তানদের কুলুজি ভাঙা ঢের সহজ। এটা ক্রিয়াক্ষেত্রের একটা উদাহরণ দিলাম, শব্দের কালাপাহাড়েরা যে অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়—এমন ভাবা ভুল হবে। বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বহরটা দেখুন—উদাহরণ-স্বরূপ 'কেরানি' কথাটা ধরা যাক,—অর্থাৎ ক্লার্ক। শুধু অফিসে 'বস্'-এর হাতেই লাঞ্ছনা নয় এদের; সাহিত্যক্ষেত্রে লেখকদেরও হাতেও খাতির নেই,—দন্ত্যনয়ে হ্রস্বইকার আছে, মূর্ধণ্যণয়ে দীর্ঘঈকার আছে; এর সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে মূর্ধণ্যণয়ে হ্রস্বইকার আছে, দন্ত্যনয়ে দীর্ঘঈকার আছে; এখনও কয়ে য-ফলা দিয়ে লেখার মানুষ মাটি ফুঁড়ে বেরুতে বাকি। তিনটি অক্ষরের মধ্যে 'ন'কারের এই অবস্থা, বাকি থাকে ক আর র; কয়ের গায়ে হয়তো অক্ষয় কবচ আঁটা আছে, কিন্তু নিরীহ র সম্বন্ধে কি নিশ্চিন্ত হওয়া চলে? বঙ্গভঙ্গের আবার নূতন ক'রে কথা হচ্ছে, পদ্মার পারে গুটিয়ে-সুটিয়ে ব'সে ডয়ে বিন্দু 'ড়' কি মতলব ভাঁজছেন কে বলতে

পারে ? একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে উঠেই দেখতে হবে আমাদের চিরপরিচিত 'কেরানি' কর্পোরেশনের কাঁকর খেয়ে ফুলে ফেঁপে 'ক্যাড়ানি' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষণের ক্ষেত্রে 'নূতন' শব্দটা 'নূতন', 'নোতুন', 'নতুনে' চিরনূতন। ক্রিয়ার বিশেষণের 'অবশ্য' কথাটা দেখুন ; ইংরেজী প্রতিশব্দ must-এর মতই খাঁটসাঁট অতবড় দেখাকে খিদিটাবি শব্দ তো ?—ভেবে যেন মটমট করছেন, বাংলা লেখকের কলমের খোঁচায় তিনি এরই মধ্যে ভুবকেত্তাবকে 'অবশ্যি' হয়েছেন, 'অ'বিশ্যি' হয়েছেন, এর পর ওকার দিয়ে নরম তুলতুলে 'ওবিশ্যি' ক'রে দেবার কানাই কোন্ গোকুলে বাড়ছে কে জানে ? শুধু তাই নয়, এঁর কাঠামোর মধ্যে 'শ'-কারের উৎপাত আছে, এখন তালব্য'শ'ই চলছে বেশ, কিন্তু মূর্ধন্য'ষ'-পন্থী, দন্ত্য'স'-পন্থীদের এদিকে দৃষ্টি যেতেই বা কতক্ষণ ?

দু-একটা উদাহরণ দিয়ে কান্ত হলাম। বানানের ক্ষেত্রে এই অরাজকতা নিত্যই সবাই দেখছেন। এখনই পিঠোপিঠি ক'রে বামমার্গী আর দক্ষিণমার্গীদের দুখানা বই পড়লে মনে হয়, যেন দুটো ভিন্ন ভাষার বই পড়ছি। এই দুর্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তা যদি এই রেটে আরও কিছুদিন চলে তো বাংলা ভাষা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। স্বাধীনতা-প্রিয়তায় আমরাই সবচেয়ে অগ্রগণ্য জাতি নই, আরও ঢের আছে ; কিন্তু নকটা কলমের মত মরোয়া জিনিস ব'লেই এদিক দিয়ে কেউই আমাদের এগিয়ে যেতে পারে নি, তা ভিন্ন এইরকম এলোধাবাড়ি এগুবার বিপদটা সবাই বোঝে। বেশি দূরে না গিয়ে ইংরেজী ভাষার কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গতিশীল ভাষাদের অন্যতম এবং গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এর আকারেরও পরিবর্তন হয়েছে ; কিন্তু একটা সংযম আছে, স্পীডের যুগেও ওরা বোঝে যে, যে অতি উগ্র স্পীডে ছিটকে প'ড়ে ভেঙে খান খান হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, সে স্পীড এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাষার গঠনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইংরেজী-ভাষার মত অত আলগা ভাষা আর আছে কি না শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাবিদেরাই বলতে পারেন ; আমরা যেটুকু সংস্পর্শে এসেছি, তাতে তো পরিশ্রান্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। না উচ্চারণের ঠিক, না বানানের ঠিক, ব্যাকরণের মধ্যে নিয়মের চেয়ে ব্যতিক্রমের দাপটই বেশি। কিন্তু এ সব দিক দিয়ে সংস্কারের চেষ্টা চলতে থাকলেও খুব মাতামাতি হয় নি, তার কারণ আর যাই হোক, প্রধানটা এই যে,

ওরা বোঝে, এদিকে ভাঙচুর করতে গেলে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে, ভাষার চেহারা বড় উগ্রভাবে বদলাতে থাকবে, না বুঝে-সুঝে হাতুড়ি চালাতে গেলে শিব গড়তে বাঁদর হয়ে দাঁড়াবার ভয় আছে।

বৈমাত্র ভাই অ্যামেরিকা এই নিয়ে একচোট খুব লাফালাফি করেছিল—নূতন রক্ত; সুবুদ্ধি ইংরেজ দিনকতক হয়েছিল একটু বিব্রত, তারপর অ্যামেরিকানিজ্‌ম ব'লে মাঝামাঝি একটা দেয়াল তুলে দিলে।

তা না করলে চলে না। যে ভাষা যত প্রসার লাভ করছে, তার সম্বন্ধে ততই সাবধান হওয়া দরকার, বিশেষ ক'রে তার গঠন সম্বন্ধে। কথায় কথায় ভাঙলে ভাষার মরণ এগিয়ে আনাই হয়। আপনারা বোধ হয় একটু আশ্চর্য হলেন; কেন না, পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রতি শতকে দশ বার ক'রে, প্রতি যুগে যুগে যে ভাষা বদলাচ্ছে, তাকে জীবন্ত ভাষা কেমন ক'রে বলা চলে? মানুষের দিক দিয়েই দেখুন না,—সত্তর আশি একশো বছরের আগের বাঙালীর কথা ভাবুন, আর আজকের পিলেতে পেট-মোটা হাত নলনলে কিংবা বেরিবেরিতে হাত-ফোলা বাঙালীর কথা ভাবুন—বলতে হবে কি এরা অত্যন্ত প্রবলভাবে বেঁচে আছে? আমার এক মৌখিক বন্ধুর কাছ থেকে বেশ একটা খাবা খেয়েছিলাম একবার। তিনি পণ্ডিত এবং কতক কতক বাংলাও পড়া আছে। সংস্কৃতকে 'ডেড ল্যাংগোয়েজ' অর্থাৎ মৃত ভাষা বলায় তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বলেন কি মশায়! হাজার হাজার বৎসর আগে যেমন ছিল, গঠনের বলিষ্ঠতায় ঠিক সেইরকমটি থেকে নব নব ভাবসৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে যে ভাষা এখনও কোথাও প্রতাপে রয়েছে টেঁকে, সে হ'ল মৃত, আর জীবিত হ'ল হিন্দী—তুলসীদাস থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যার কতই রূপ! জীবিত রইল বাংলা—বেশিদূর না গিয়ে এই সেদিনের বঙ্কিমের ভাষাই যেখানে ম'রে ভূত হয়ে এল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার পাশে দাঁড় করালে সেই একই জিনিস ব'লে চেনাই যায় না!

কথাটার মধ্যে পণ্ডিতী আতিশয্য থাকতে পারে, তর্কও হয়তো খুব নিখুঁত নয়, কিন্তু তাতে সত্যের যে একটা অংশ আছেই, এটা অস্বীকার করা চলে না। বাক্‌রূপের মধ্যে একটা স্থায়িত্ব থাকা নিতান্ত দরকার। বলতে পারেন, শৈশবে-প্রৌঢ়ত্বে বা যৌবনে-বার্ধক্যে কতটুকুই বা সাদৃশ্য! কথাটা খুবই ঠিক, কিন্তু প্রকৃতির হাতে এই পরিবর্তনটা এমন সূক্ষ্ম কৌশলে হয়—

জটিলতার সৃষ্টি করে, সেইটেই সাহিত্যের উপজীব্য ব'লে জেনে এসেছি আমরা ; কেন না, তাতে মানুষের মনে নব নব রসচেতনার উন্মেষ হয়ে এসেছে। এখন দেশের মানুষ একেবারেই নূতনতর জটিলতার সামনে এসে পড়েছে—পেটে এক মুঠো ভাত, কোমরে এক খণ্ড বস্ত্র, ঘরে একটু আলো, এর জন্যে মুনাফা-রাক্ষসদের চোরাবাজার, এবং তার চেয়েও ভয়াবহ সদাশয় গবর্মেণ্টের পারমিট-কার্ডের সামনা-সামনি হয়ে জীবন সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধারণা একেবারেই ওলটপালট হয়ে গেছে। মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়, নগ্নতার লজ্জায় হন্যে হয়ে উঠেছে,—এ অবস্থায় নিজের পিঠ বাঁচিয়ে তাদের কাছে কি ধরনের রসের অবতারণা করা যায়, সে সম্বন্ধে আমার গবেষণা এখনও শেষ হয় নি। শেষ হবে কি না কখনও তাও বলতে পারি না, সব দেখে-শুনে থ হয়ে গেছি,—একটা চলতি বাংলা কথার অবতারণা ক'রে বলা চলে, গবেষণা করতে গিয়ে গবেট মেরে গেছি।

সাহিত্য বলতে তার রসের দিকটাই আগে মনে আসে। আমি কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে এদিকটা এড়িয়ে যেতে চাই। এড়িয়ে যাওয়ার আর একটা কারণ এই যে, নূতন 'পরিস্থিতি'র মধ্যে সাহিত্যের ধারা কোন্ দিকে বইবে বা বওয়া উচিত, শুধু তারই যে হদিস পাচ্ছি না এমন নয় ; সে ধারা আর কতদিন সচল থাকবে এবং থাকলে কিভাবে সচল থাকবে, সেইটেই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণটা একটু বিশদ ক'রে বলবার চেষ্টা করি :

ভাব আর ভাষা নিয়ে সাহিত্য। ভাবের বাহন ভাষা, এখন সেই ভাষা নিয়েই প'ড়ে গেছে দুর্ভাবনা। তার মধ্যে একটি—বাংলা লেখকদের মেজাজ এবং ব্যক্তিগত অভিরুচি নিয়ে, দ্বিতীয়টি—বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে, এবং তৃতীয়টি—ভারতের রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে। আমি সাধ্যমত এক একটি ক'রে তিনটির আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

বাঙালী-চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ, সে একনেতৃত্ব বরদাস্ত করতে পারে না। তাই না হয় একের জায়গায় একটা ম্যাজিকসই সংখ্যায় বহুনেতৃত্ব চলুক, তাও নয়, পাড়ায় পাড়ায় নেতৃত্ব গ'ড়ে দল পাকাতে পারলেই সে থাকে ভাল, এবং সেটাকেও ভেঙে যদি ঘরে ঘরে নেতা খাড়া করতে পারে কিংবা আরও একটু চারিয়ে দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, তো সে মনে করে, স্বাধীনতার একেবারে

জন হ'ল। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বাদ দিয়ে সাহিত্যে এই স্বাধীনতার অরাজকতা কি অনিষ্ট করছে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

প্রথমত বানানের কথা ধরা যাক ;—বানান আর সেই সঙ্গে উচ্চারণ। এর যে কত রকমফের আমাদের ভাষায়, তার হিসেব ক'রে ওঠা যায় না ; এ ছাড়া দিন দিনই নিত্য-নূতনের উদ্ভব হচ্ছে। তেঁতুলের অঙ্কুর যেমন নিজের বিচি মাথায় নিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়, বাংলা লেখকেও তেমনই নিজের নিজের বানান কলমের ডগায় নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে দেন দেখা ; তফাৎ এই যে, সব বিচিই আলাদা। যত মত তত পথ ধর্মের ক্ষেত্রে বেশ চলে ; কিন্তু একটা ভাষার শব্দগঠনের ক্ষেত্রে চালাতে গেলে বাইবেল-বর্ণিত বেবেলেরই সৃষ্টি হয়। ক্রিয়াপদগুলির যেন কোনও জাত নেই আর। যে কোন একটা ধাতু নিয়ে অবস্থাটা পরীক্ষা ক'রে দেখা চলে।

'বল্' ধাতুটা নেওয়া যাক,—এর থেকে 'বলিল' আছে, 'বোলিল' আছে, 'বোলিলো' আছে, 'বোল্লো' আছে, 'বললে' আছে। এদের আবার প্রত্যেকের গাদাখানেক ক'রে ছেলেমেয়ে নাতি নাতকুড়। 'বল্' ধাতুর পঞ্চম সন্তান 'বললে' শব্দটিকে দেখুন, মাঝের লয়ে হসন্ত দেওয়া 'বল্‌লে' আছে, ছুটো লয়ে গাঁটছাড়া বাঁধা 'বল্লে' আছে। তার পরের ধাপে আসেন 'বোললে', অর্থাৎ 'বললে' শব্দের বয়ে ওকার দেওয়া সন্তান, তারও নীচের ধাপে ওইরকম ছুটি ক'রে ছা-পো। মাথা গুলিয়ে যায়, মনে হয়, তার চেয়ে আমাদের রাঢ়ীশ্রেণী কায়স্থের পণ্ডিতের সন্তানদের কুলুজি ভাঙা ঢের সহজ। এটা ক্রিয়াক্ষেত্রের একটা উদাহরণ দিলাম, শব্দের কালাপাহাড়েরা যে অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়—এমন ভাবা ভুল হবে। বিশেষ্যের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের বহরটা দেখুন—উদাহরণ-স্বরূপ 'কেরানি' কথাটা ধরা যাক,—অর্থাৎ ক্লার্ক। শুধু অফিসে 'বস্'-এর হাতেই লাঞ্ছনা নয় এদের ; সাহিত্যক্ষেত্রে লেখকদেরও হাতেও খাতির নেই,—দন্ত্যনয়ে হ্রস্বইকার আছে, মূর্ধন্যণয়ে দীর্ঘঈকার আছে ; এর সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে মূর্ধন্যণয়ে হ্রস্বইকার আছে, দন্ত্যনয়ে দীর্ঘঈকার আছে ; এখনও কয়ে য-ফলা দিয়ে লেখার ম্যামথ মাটি ফুঁড়ে বেরুতে বাকি। তিনটি অক্ষরের মধ্যে 'ন'কারের এই অবস্থা, বাকি থাকে ক আর র ; কয়ের গায়ে হয়তো অক্ষয় কবচ আঁটা আছে, কিন্তু নিরীহ র সম্বন্ধে কি নিশ্চিন্ত হওয়া চলে? বঙ্গজদের আবার নূতন ক'রে কথা হচ্ছে, পুরার পায়ে গুটিয়ে-সুটিয়ে ব'সে ভয়ে বিন্দু 'ড়' কি মতলব আঁজছেন কে বলতে

পারে? একদিন হয়তো ঘুম ভেঙে উঠেই দেখতে হবে আমাদের চিরপরিচিত 'কেরানি' কণ্ট্রোলের কাঁকর খেয়ে ফুলে ফেঁপে 'ক্যাড়ানি' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষণের ক্ষেত্রে 'নূতন' শব্দটা 'নূতন', 'নোতুন', 'নতুনে' চিরনূতন। ক্রিয়ার বিশেষণের 'অবশ্য' কথাটা দেখুন; ইংরেজী প্রতিশব্দ must-এর মতই ছাঁটসাঁট অতবড় দেমাকে মিলিটারি শব্দ তো?—তেজে যেন মটমট করছেন, বাংলা লেখকের কলমের খোঁচায় তিনি এরই মধ্যে তুবড়েতাবড়ে 'অবশ্যি' হয়েছেন, 'অবিশ্যি' হয়েছেন, এর পর ওকার দিয়ে নরম তুলতুলে 'ওবিশ্যি' ক'রে দেবার কানাই কোন্ গোকুলে বাড়ছে কে জানে? শুধু তাই নয়, এঁর কাঠামোর মধ্যে 'শ'-কারের উৎপাত আছে, এখন তালব্য'শ'ই চলছে বেশ, কিন্তু মূর্ধন্য'ষ'-পন্থী, দন্ত্য'স'-পন্থীদের এদিকে দৃষ্টি যেতেই বা কতক্ষণ?

দু-একটা উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হলাম। বানানের ক্ষেত্রে এই অরাজকতা নিত্যই সবাই দেখছেন। এখনই পিঠোপিঠি ক'রে বামমার্গী আর দক্ষিণমার্গীদের দুখানা বই পড়লে মনে হয়, যেন দুটো ভিন্ন ভাষার বই পড়ছি। এই দুর্দান্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তা যদি এই রেটে আরও কিছুদিন চলে তো বাংলা ভাষা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। স্বাধীনতা-প্রিয়তায় আমরাই সবচেয়ে অগ্রগণ্য জাতি নয়, আরও ঢের আছে; কিন্তু অন্যটা কলমের মত ঘরোয়া জিনিস ব'লেই এদিক দিয়ে কেউই আমাদের এগিয়ে যেতে পারে নি, তা ভিন্ন এইরকম এলোথাবাড়ি এগুবার বিপদটা সবাই বোঝে। বেশি দূরে না গিয়ে ইংরেজী ভাষার কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গতিশীল ভাষাদের অন্যতম এবং গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এর আকারেরও পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু একটা সংযম আছে, স্পীডের যুগেও ওরা বোঝে যে, যে অতি উগ্র স্পীডে ছিটকে প'ড়ে ভেঙে খান খান হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, সে-স্পীড এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাষার গঠনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইংরেজী-ভাষার মত অত আলগা ভাষা আর আছে কি না শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাবিদেরাই বলতে পারেন; আমরা যেটুকু সংস্পর্শে এসেছি, তাতে তো পরিশ্রান্ত বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। না উচ্চারণের ঠিক, না বানানের ঠিক, ব্যাকরণের মধ্যে নিয়মের চেয়ে ব্যতিক্রমের দাপটই বেশি। কিন্তু এ সব দিক দিয়ে সংস্কারের চেষ্টা চলতে থাকলেও খুব মাতামাতি হয় নি, তার কারণ আর যাই হোক, প্রধানটা এই যে,

ওরা বোঝে, এদিকে তড়িঘড়ি করতে গেলে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে, ভাষার চেহারা বড় উগ্রভাবে বদলাতে থাকবে, না বুঝে-সুঝে হাতুড়ি চালাতে গেলে শিব গড়তে বাঁদর হয়ে দাঁড়াবার ভয় আছে।

বৈমাত্রভাই অ্যামেরিকা এই নিয়ে একচোট খুব লাফালাফি করেছিল—নূতন রক্ত; বুবুদ্ধি ইংরেজে দিনকতক হয়েছিল একটু বিব্রত, তারপর অ্যামেরিকানিজ্‌ম ব'লে মাঝামাঝি একটা দেয়াল তুলে দিলে।

তা না করলে হয় না। যে ভাষা যত প্রসার লাভ করছে, তার সম্বন্ধে ততই সাবধান হওয়া দরকার, বিশেষ ক'রে তার গঠন সম্বন্ধে। কথায় কথায় ভাঙলে ভাষার মরণ এগিয়ে আনাই হয়। আপনারা বোধ হয় একটু আশ্চর্য হলেন; কেন না, পরিবর্তনই তো জীবনের লক্ষণ। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্রতি শতকে দশ বার ক'রে, প্রতি ঘরে ঘরে যে ভাষা বদলাচ্ছে, তাকে জীবন্ত ভাষা কেমন ক'রে বলা চলে? মানুষের দিক দিয়েই দেখুন না,—সত্তর আশি একশো বছরের আগের বাঙালীর কথা ভাবুন, আর আজকের পিলেতে পেট-মোটা হাত নলনলে কিংবা বেরিবেরিতে হাত-ফোলা বাঙালীর কথা ভাবুন—বলতে হবে কি এরা অত্যন্ত প্রবলভাবে বেঁচে আছে? আমার এক মৌথিল বন্ধুর কাছ থেকে বেশ একটা থাবা খেয়েছিলাম একবার। তিনি পণ্ডিত এবং কতক কতক বাংলাও পড়া আছে। সংস্কৃতকে 'ডেড ল্যাংগোয়েজ' অর্থাৎ মৃত ভাষা বলায় তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, বলেন কি মশায়! হাজার হাজার বৎসর আগে যেমন ছিল, গঠনের বলিষ্ঠতায় ঠিক সেইরকমটি থেকে নব নব ভাবসৃষ্টির অফুরন্ত ক্ষমতা নিয়ে যে ভাষা এখনও দোর্দণ্ড প্রতাপে রয়েছে টেঁকে, সে হ'ল মৃত, আর জীবিত হ'ল হিন্দী—তুলসীদাস থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যার কতই রূপ! জীবিত রইল বাংলা—বেশিদূর না গিয়ে এই সেদিনের বঙ্কিমের ভাষাই যেখানে ম'রে ভূত হয়ে এল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার পাশে দাঁড় করালে সেই একই জিনিস ব'লে চেনাই যায় না!

কথাটায় মধ্যে পণ্ডিতী আতিশয্য থাকতে পারে, তর্কও হয়তো খুব নিখুঁত নয়, কিন্তু তাতে সত্যের যে একটা অংশ আছেই, এটা অস্বীকার করা চলে না। বাহ্যরূপের মধ্যে একটা স্থায়িত্ব থাকা নিতান্ত দরকার। বলতে পারেন, শৈশবে-প্রৌঢ়ত্বে বা যৌবনে-বার্ধক্যে কতটুকুই বা সাদৃশ্য! কথাটা খুবই ঠিক, কিন্তু প্রকৃতির হাতে এই পরিবর্তনটা এমন সূক্ষ্ম কৌশলে হয়—

আগের দিনটির সঙ্গে পরের দিনের, আগের বছরটির সঙ্গে পরের বছরের এমন একটা সুসঙ্গত মিল থাকে যে, সেই শিশুই যে প্রৌঢ় হয়ে উঠেছে, সেই যুবাই যে বার্ধক্যে পরিবর্তিত হয়ে এল, সেটা উপলব্ধি করতে একটুও আটকায় না। কিন্তু যদি দেখা যায়, আজকের শিশু কালকে হঠাৎ একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে হুঁকো হাতে মুরুব্বিয়ানা লাগিয়েছে, কিংবা কালকের যুবা আজকে হঠাৎ একমাথা পাকা চুল নিয়ে শীর্ণ কম্পিত আঙুলে মালা জপছে তো সেটাকে কি অপঘাতই বলব না?

মনে হতে পারে, আমি ভাষার দিক দিয়ে কঠোর রক্ষণশীল। তা আদৌ নয়। পরিবর্তন হবে—আমি চাই বা না চাই, তবে চাটগাঁ থেকে নিয়ে ছোট নাগপুরের প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত এই যে বঙ্গ-বরেন্দ্র-রাঢ়ভূমির সমন্বয়ে বিরাট বাংলা দেশ, এর ভাষার—সাহিত্যিক ভাষার একটা স্ট্যাণ্ডার্ড থাকা দরকার, এবং সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে সেই স্ট্যাণ্ডার্ড যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে যাওয়া সব লেখকেরই একটা বড় দায়িত্ব। এইখানে অরাজকতা ঢুকেছে। পরিবর্তন হবেই, সব জিনিসেরই মধ্যে পরিবর্তনের মসলা দেওয়া আছে, ভাষারও আছে, জাতির উন্নতির সঙ্গে সে ঠিক আপন ধর্মানুসারেই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হবেই। কিন্তু আমার তর সইছে না ব'লে, কিংবা শুধু ভাষা বেঁকিয়েই আমি একটা কেষ্টবিষ্টু হতে চাই ব'লে যদি জবরদস্তি করতে যাই তো সেটাও হবে পরিবর্তন, কিন্তু সেটা 'গ্রোথ' নয়, বৃদ্ধির সুসমঞ্জস পরিবর্তন নয়, সেটা শুধু দরকোচা-মারা তালগোল-পাকানো একটা বিকৃতি। সে পরিবর্তন আর্টিস্টের নয়, সেরকম পরিবর্তন একবার ভীমের হাতে কীচকের হয়েছিল, একবার হনুমানের হাতে হয়েছিল কালনেমির।

এ গেল শব্দগুলোর বানান-উচ্চারণের দিক; আর একটা আছে—সেটা আরও মারাত্মক, সেটা হচ্ছে নূতন শব্দ তথা শব্দসমষ্টি গঠনের দিক। এ রাজ্যে আবার কি অরাজকতা সে খবর সাক্ষাৎ পাওয়ার অদৃষ্ট বা দুরদৃষ্ট না হ'লে একবার 'শনিবারের চিঠি'র শেষের পাতাগুলোর দিকে নজর দিলে টের পাবেন—সে অংশে ওঁরা বিকৃত সাহিত্যের নমুনা তুলে তুলে ভাষার প্রগতির অবস্থাটা দেখিয়ে দিয়ে যান মাঝে মাঝে। এ এক নূতন ধরনের মুক্তনব, যা শুধু বাঙালীর মাথা থেকেই বের হতে পারে। ভাবের দিক দিয়ে এঁরা যা বলতে চান, সেটা বুঝতে না দেওয়াই এঁদের উদ্দেশ্য থাকে। তাতে আমার কোন অনুযোগ নেই,

ওঁদের নিজের জিনিস নিজের কাছে থাকে, তাতে বলবারই বা কি আছে? তবে ভাষাটা সাধারণের সম্পত্তি, সেটার উপর ঘা দিতে গেলে চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে।

ভাষার এই বিপদের কথা আমিই প্রথম বলছি না। জাতির সংস্কৃতির একেবারে মূলাধার ব'লে বহু মনীষী এ নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও এ সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে অবহিত হতে হয়েছে, এবং তাঁদের উদ্যোগে ভাষার মোটামুটি একটা স্ট্যাণ্ডার্ড দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে। তাতে খানিকটা ফল হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় ফল হয় নি। না হবার কারণ, সবার তো আর পাস করবার দায় নেই, তাই অনেকেই নিজের নিজের ঝাণ্ডা নামাতে নারাজ। যুগটা জিন্দাবাদের যুগ। নানা দিক দিয়ে তা ভালই, কিন্তু তার মধ্যে দেশ ভুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি সৃষ্টি জিন্দাবাদ করবার যেমন মানুষ আছে, ভাষার অখণ্ডতা ভুলে ভাষার মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডি জিন্দাবাদ করবার মানুষও ঠিক তেমনই আছে। সেইখানেই বিপদ।

ভাষার দ্বিতীয় বিপদ বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা থেকে। এটা যে কি গুরুতর, তা আমরা সকলেই প্রতিদিন নিত্যনূতন সমস্যার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করছি। বাঙালী জাতির গঠনই ভারতবর্ষের মধ্যে একটু পৃথক ধরনের। ভারতের সব প্রদেশই হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রদেশ, কিন্তু আর সর্বত্রই আনুপাতিক সংখ্যায় যথেষ্ট তারতম্য; তা ভিন্ন যতদূর জানা আছে, আর সব প্রদেশেই হিন্দু আর মুসলমানের চলিত ভাষা যাই হোক, সাহিত্যিক ভাষা আলাদা আলাদা। অন্তত আর্যাবর্তের প্রদেশগুলার তো বটেই। বাংলায় অবস্থা অন্য রকম, এখানে আনুপাতিক সংখ্যা ঠিক আধা-আধি (অবশ্য আমি বর্তমান সেন্সাসে বিশ্বাসী নই; আশা করি কোন বাঙালী হিন্দুই এই ধাপ্পাবাজিতে বিশ্বাস করেন না), আর দ্বিতীয় কথা, এখানে হিন্দু-মুসলমানের চলতি এবং সাহিত্যিক ভাষা এক। এজন্যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ব'লে মনে হয়েছিল, যদিও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে মুসলমানেরা বাংলার বাহিরের দিকেই অতিরিক্ত নজর রেখে উর্দু-ফারসী-আরবীর মোহে প'ড়ে খুব তাড়াতাড়ি ভাষাটার চেহারা বদলে ফেলবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন। লেগে রয়েছেন বলাও চলে, কিন্তু একটা আশা ছিলই যে, এ মনোভাবটা শীঘ্রই যাবে কেটে, প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে এ বিষয়ে গা-জুরির বিপদটা বুঝতে

পারলেই তাঁরা আবার যথাস্থানে ফিরে এসে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ভাষাকে নির্বিবাদে হয়ে পুষ্ট করতে থাকবেন। রাজনৈতিক ভাষা বা নীচের দিকের পাঠ্য পুস্তকের ভাষা যাই হোক, অনেক মুসলমান লেখকের ভাষা প'ড়ে আমার এই আশা আস্তে আস্তে বদ্ধমূল হয়ে আসছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকে নূতন। ভাষা নিয়ে মাথা ঘামান এমন এক-আধজন চিন্তাশীল মুসলমানের সঙ্গে আলোচনাও হয় আমার এবং তাতে আমার আশাকে পুষ্টই করে। এই বোঝাপড়ার সন্ধিক্ষণে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, এই সম্মিলিত জাতির অর্ধেক অংশের রাজনৈতিক অবলুপ্তি হবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং এটা সেই অংশ, যে কার্যত বাংলা ভাষাটাকে এতদিন ধ'রে গ'ড়ে এসেছে এবং বাংলাকে ভারতে তথা ভারতের বাইরে পরিচিত ক'রে এসেছে। এখন হিন্দু-বাঙালীর বেঁচে থাকাটাই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে এইজন্যে যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও বেশি একটানা লড়াই ক'রে ক'রে স্বভাবতই শক্তিহীন বাঙালী একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছে, এই লড়াই আলাদা আলাদা ক'রে, আবার এককালীনও প্রবল রাজশক্তির সঙ্গে আবার কতকটা ভিন্নপ্রদেশীয়দের সঙ্গে—পরেরটা নিতান্ত একটু সুবিচারের জন্যে। এর ওপর, যখন আর সবাই মূলত তারই লড়াইয়ের জোরে স্বাধীনতা পর্যন্ত পেতে বসেছে, তখন—ইংরেজের একটু কলমের খোঁচায় এবং অন্যপ্রদেশীয়দের কতকটা ঔদাসীন্যে নিজের প্রদেশেই নিজেকে পরাধীন, অসহায় দেখে সে হতচৈতন্য হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায়, যদি সে থাকেই বেঁচে তো কি ভাবে থাকবে, এমন কি কোথায় থাকবে, সেইটাই হয়ে পড়েছে চিন্তার বিষয়। সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়েছে এইজন্যে যে, এই যে আধাআধি হিন্দু-মুসলমান দেশের লোক, এরা—বেশ চারিয়ে ছড়ানো নেই, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের অনুপাত যেমন শতকরা সত্তর-আশি, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ঠিক সেইরকম, এতে যেমন খানিকটা অসুবিধা আছে, তেমনই আবার খানিকটা আছে সুবিধা। সেই সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে অনেক চিন্তাশীল হিন্দু নেতা বলছেন, দুটি বাংলাকে ভেঙে আবার দুই ক'রে দেওয়া হোক। অর্থাৎ বাঙালীর যা উপলব্ধ ক'রে এই শতাব্দীর রাজনৈতিক জাগৃতি, তারই বিরুদ্ধাচরণ করতে বসেছে সে। পলিটিক্স আমার এলাকা নয়, খুব বেশি দূর পর্যন্ত ভাবি না, ভাবতেও পারি না। আবার বঙ্গভঙ্গ! সেন্টিমেন্টে ঘা লাগে। তবুও উত্তরোত্তর লীগমন্ত্রীদের

গা-জুরি দেখলে, ইংরেজের তামাশা দেখার ভাব দেখলে এবং কংগ্রেসের ঔদাসীন্য দেখলে এক-একবার হয়ই মনে, বাঙালী বলতে এখনও যা কিছু আছে, তা বাঁচাতে হ'লে বোধ হয় নান্যঃ পন্থা বিভক্তে। আমি আগে এর বিরুদ্ধেই ছিলাম, কাগজেও সেইমতই আলোচনা করি একটু-আধটু, কিন্তু সম্প্রতি বিহারী মুসলমানদের উপর মন্ত্রীমণ্ডলের দরদের বহর দেখে, পশ্চিমবঙ্গটাকেও রাতারাতি পাকিস্থানে পরিণত করবার মতলব দেখে, সত্যিই মন দোটানায় প'ড়ে গেছে। ধ'রে নেওয়া যাক, যদি এই ব্যবস্থাই হিন্দু বাঙালী কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করে এবং কৃতকার্য হয় তো ভাষার গতি কি হবে? সমস্ত হিন্দুকে পশ্চিমে আনা যাবে না, এক যদি মন্ত্রীমণ্ডল সমস্ত পূর্ববঙ্গকে নোয়াখালিতে পরিণত না করেন। কিন্তু সেটা না হবার জন্তেই—অর্থাৎ একটা ব্যালেন্স রক্ষা করবার জন্তেই হিন্দুরা এই বঙ্গবিভাগের জন্তে সচেষ্ট হয়েছেন; যাতে পাশে একটা হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ উপপ্রদেশ থাকলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের একটা রক্ষাকবচের মত কিছু থাকে।...কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই যে হিন্দুরা ওদিকে থাকবেন, তাদের অবস্থা কি হবে? পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'লে মুসলমানেরা ওদিককার বাংলাটাকে মনের সুখে নিজের মনের মতন ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করবেই, মুষ্টিমেয় হিন্দুর পক্ষে সে প্রভাব কাটিয়ে এদিককার বাংলার সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। মুসলমানরা এখন অপরের পিঠ-চাপড়ানিতে আত্মবিস্মৃত হয়ে এসব কথা ভাবছেন না। মন্ত্রীমণ্ডল সাহিত্যিক নয়, ভাষা জাহান্নমে যাক, তাঁদের শক্তি বজায় থাকলেই হ'ল। কিন্তু মুসলমান অনেক চিন্তাশীল লেখক আছেন, তাঁদেরও তো এ বিপদের কথা ভাবতে দেখি না। বর্তমান 'পরিস্থিতি'তে ভাষার দিক দিয়ে এই ঘোর সমস্যার বিষয় চলেছে। যদি এক-বাংলা থাকে তো হিন্দুর রাজনৈতিক বিনাশ, ভাষারও সমূহ বিপদ কেন না, রাজশক্তি বলতে যা বোঝায় তা বিরোধী; যদি এক ভেঙে দুই হয় তো হিন্দু বাঙালী বাঁচে, কিন্তু তার এক-চতুর্থাংশ এবং বিশিষ্টরূপে শক্তিমান অংশকে হারাতে হয়। আপনারা এতটা বোধ হয় নৈরাশ্যবাদী নন, কিন্তু আলাদা হ'লে এটা হবেই; ইউনিভার্সিটির দৌলতে আজ-কাল ভাষা গড়বার ক্ষমতা ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ছে শাসকদের হাতে। যদিও বাংলা আলাদা হয়, তা হ'লে সুবিবেচক বাঙালী মুসলমানদের চেষ্টা সত্ত্বেও

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী বাংলা গ'ড়ে উঠবেই, এবং তার হাত থেকে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা জীবনের সাধারণ নিয়মেই পরিত্রাণ পাবেন না।

এ বিষয়ে খুব বেশি খুঁটিয়ে বলবার দরকার নেই এখানে, আপনাদের অবগতি এবং চিন্তার জন্যে রাজনীতিগত অবস্থায় ভাষার কি বিপদ দাঁড়াতে যাচ্ছে, তার একটা ইঙ্গিত দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এর পরে সমগ্র ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিকায় ওদিকে অবস্থা কি দাঁড়াবে, তার একটা আভাস দিই।

হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হয়ে গ'ড়ে উঠছে। বর্তমান রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীকে সে ঠেলা দিতে আরম্ভ করেছে—এখন আস্তে আস্তে ভদ্রভাবে, তারপর ১৯৪৮ সালের জুনের পর ইংরেজ সত্যিই যদি পাততাড়ি গুটোয় তো তার ভাষাকেও এক রাম-ঠেলা দিয়ে নিজে আসর দখল করবে। হিন্দুস্থানী রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, কি বাংলা—সে প্রশ্ন আর ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুস্থানীর এ মর্যাদা আমি ঈর্ষার চক্ষে দেখি না; হাজার বাকবিতণ্ডার মধ্যেও আমার বিশ্বাস ছিলই, এ আসন হিন্দুস্থানীরই। আসল কথা—একটু অদ্ভুত শোনালেও, বঙ্কিম-মাইকেল শরৎ-রবীন্দ্রের প্রতিভা-মাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার পদবি দিতে পারে না—সে পদবি দিয়েছে পশ্চিম-ভারতের নিম্নশ্রেণীর লোক যারা চাকর-ঠাকুর কুলি-মজুর ছোট দোকানদার গাড়িওয়ালা রিকশাওয়ালার বেশে উত্তর-ভারতের সমস্ত অংশটা বিজয় ক'রে নিয়েছে, যাদের জন্যে কলিকাতা আর তার চারিদিকের বিরাট কর্মকেন্দ্র বাংলা হয়েও আর আর বাংলা নয়। বাঙালীর প্রতিভার সঙ্গে তার নিম্নশ্রেণীর লোকেদের যদি এ ছড়িয়ে পড়বার প্রচুর প্রাণ-শক্তি থাকত তো রাষ্ট্রভাষার গৌরব থেকে বোধ হয় বাংলাকে বঞ্চিত করা যেত না। কিন্তু সে আপসোস ক'রে ফল নেই, তার জায়গাও এ নয়।...কিন্তু হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষারূপে অভিনন্দিত ক'রে নিচ্ছি বটে, তবে বাংলা ভাষার যে তাতে খানিকটা বিপদ আছেই, সেটাও ভুলতে পারছি না; কিন্তু তার বোধ হয় উপায়ও নেই। বিপদটা এক দিক দিয়ে এই যে, বাঙালী হিন্দুর একটা মোটা অংশ বাইরে আছে ছড়িয়ে, বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতে এবং মধ্য-ভারতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভারতে; বাংলার লীগের অত্যাচারে আরও কিছু ছড়াবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। যারা আছে ছড়িয়ে, তারা ভাষার দিক দিয়ে আধমরা হয়েই আছে, আরও মরবে। হিন্দী তাদের প্রধান ভাষা হয়ে দাঁড়াবে, নিতান্ত রুটো অন্নের জন্যেই মেনে নিতে হবে তাদের, অথচ এদিকে বাংলার সঙ্গেও

তাদের থাকবে একটা যোগ। এই আকণ্ঠ হিন্দুস্থানীভরা বাঙালী বাংলা ভাষাকে কতটা প্রভাবিত করবে, সেটাও ভেবে দেখবার কথা। ঘরের লোকেদেরই যখন ভাষার ওপর মায়া নেই, নিজের নিজের পছন্দমত শব্দ ভাঙছে গড়ছে, তখন বাইরের যারা একটা অন্য প্রভাবে প'ড়ে গেছে তারা কি মাথা ঠিক রাখতে পারবে? একটা ছোট উদাহরণই দিই। আপনারা জানেন বহু হিন্দুস্থানী শব্দ বাংলায় ঢুকে প'ড়ে একটা অপভ্রষ্ট রূপ নিয়ে বাংলায় চালু রয়েছে, শুদ্ধ হিন্দী বা হিন্দুস্থানী-শিক্ষিত বাঙালী যদি সেই মূলকেই সংস্কার করবার ঝোঁক করে তো সেটাই তো সামান্য হ'লেও একটা কম গোলমেলে ব্যাপার হবে না। তারপর স্টাইল আছে, ইডিয়মের প্রয়োগ আছে। শব্দপ্রয়োগেও আছে বিভিন্নতা। 'বিকাল' কথাটা হিন্দী; আমরা ব্যবহার করি 'অপরাহ্ণ' অর্থে, ওরা ব্যবহার করে একটা 'খারাপ দিন, মেঘলা দিন' এই অর্থে। 'ধার্মিক' শব্দটা আমরা ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবহার করি, ওরা করে বস্তু সম্বন্ধে। 'অন্তিম' কথাটা আমরা মৃত্যুগত অর্থে একেবারে শেষ দশা ভেবে ব্যবহার করি, ওরা করে ক্রমিক পর্যায়ে শেষ অর্থাৎ ইংরেজীতে বলতে গেলে—লাস্ট ইন অর্ডার, এই অর্থে। হিন্দুস্থানীতে তালিম-পাওয়া বাঙালীর ছেলে যদি বাংলায় তার ভাই বা কোন আত্মীয়কে লেখে, বাবা ধার্মিক গ্রন্থ পড়তে পড়তে গীতাটা হাতে তুলে বললেন, নিজেকে শোধরাবার এই আমার অন্তিম চেষ্টা, তো সে চিঠি প'ড়ে বাড়িতে কান্নাকাটি প'ড়ে যাবারই কথা। একটা গতিশীল সর্বভারতীয় ভাষার সংগ্রহে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও বড় কম নয়, কিন্তু সে লেনদেনের ব্যাপারটা ধীরেসুস্থে সুবিবেচনার সঙ্গে করলে। কিন্তু ভয় তো ওইখানেই।

সর্বসাকুল্যে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে, এক দিকে হিন্দু বাংলা, অন্য দিকে পাকিস্তানী বাংলা, আবার এক দিকে হিন্দুস্থানী বাংলা,—ভাষা-জননী যদি এই রকম ছিন্নমস্তা রূপ নিয়ে ত্রিধারায় নিজের রক্ত পান করেন তো অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াবে মাথায় ঢুকছে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হোলি

রক্তের বিলাস মনে নাই, হায়, বাহিরে কালের ঝড় যে ওড়ে,
আমরা সবাই হাসি কাঁদি যেন দিবাদুপুরের নিদ্রাঘোরে;
সেই হবে দেড়া আবমরাদের চেতনা যে খুন আনাবে ফিরে,
বঁধুয়া শ্মশানে চিতা সারি সারি জ্বলিবে বক্তেক শবেরে ঘিরে।

ভদ্রলোক

শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জগামী এক বাসে উঠেছি এবং ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষের ভাগ্যফলে বসবার জায়গাও পেয়েছি। আরাম ক'রে একটিপ নস্যি নিচ্ছি, এমন সময় উঠল আমার পুরনো বন্ধু ক্যাবলা। বহুদিন তার দেখা পাই নি; তাই কুশল-জিজ্ঞাসাটা আগে সারতে হ'ল। ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে, এত সকালে চলেছিস কোথায়? তাকে জানালুম, যাচ্ছি এক ভদ্দরলোকের সঙ্গে দেখা করতে শ্রীধাম বালিগঞ্জে। সে অবাক হয়ে বললে, ভদ্দরলোকের সঙ্গে দেখা করতে চলেছিস তুই বালিগঞ্জে? সেখানে কি ভদ্দরলোক থাকে নাকি?

ক্যাবলার পালটা প্রশ্নে আমি নিজেই ক্যাবলাকান্ত ব'নে গেলুম; প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলুম। সে বললে, হাঁ ক'রে রইলি যে? বালিগঞ্জে ভদ্দরলোক থাকে না; শুধু বালিগঞ্জে কেন, শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার দুধারে যত বাড়ি দেখছিস, তার প্রায় বেশীরভাগই ছোটলোকালয়। ভদ্দরলোক কি আজকাল বাড়িতে পাওয়া যায়? ভদ্দরলোক পাওয়া যায় বাজারে।

ভদ্দরলোক যে আজকাল বাজারের পণ্য হয়ে উঠেছে, এটা আমার কাছে রীতিমত বিস্ময়কর ঠেকল। কথা কইতে কইতে বাসখানা এসে থামল হাতিবাগানের মোড়ে। হাত ধ'রে ক্যাবলা আমায় টেনে তুলে বললে, ভদ্দরলোক দেখতে চাস তো আমার সঙ্গে আয়। অগত্যা তার সঙ্গেই আমায় নামতে হ'ল। আমায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সে ঢুকল হাতিবাগানের বাজারে। সে বললে, তোরা এটাকে বলিস—বাজার, আমি কিন্তু বলি—ভদ্র-সম্মিলনী। পানওয়ালা শাকওয়ালা থেকে শুরু ক'রে মাছওয়ালী পর্যন্ত সকলেই এক-একটা খাঁটি ভদ্দরলোক, সকলেই কেমন গ্যাঁট হয়ে ব'সে শ্রীশ্রী৺ কালীমাতার শ্রীচরণপ্রসাদে নিজের নিজের কারবার করছে। আর এই যে দেখছিস অসংখ্য ক্রেতার দল, এর শতকরা নিরেনব্বইজন ছোটলোক।

ক্যাবলা কি শেষে পাগলা হ'ল নাকি? ময়লা জামা কাপড় পরা এই সব অশিক্ষিত আনাজওয়ালারা ভদ্দরলোক? আর ফরসা জামা কাপড় পরা এই বাবুরা, যারা অফিসের দেরি হয়ে যাবার ভয়ে খুব তাড়াতাড়ি বাজার সারছে, এরা সব ছোটলোক? মেছুনীকেও সে ভদ্দরলোক ব'লে ফেললে? আমি তো কেবল অবাক হয়ে নির্বাক রইলুম।

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়তে নাড়তে গম্ভীরভাবে ক্যাবলা ব'লে চলল, এই কলকাতা শহরে আগে ভদ্রলোকরা লোকালয়ে বাস করত ; তারপর তারা জহরলাল পান্নালাল, কমলালয় প্রভৃতি বড় বড় দোকানেই আশ্রয় নিলে। ভদ্রলোকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে ; তাই আজ দেখতে পাবি কলকাতার যত বাজার ভ'রে গেছে ভদ্রলোকে।

হঠাৎ আমার দিব্য চোখ খুলে গেল। এক কথা বলাই তো ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় পরিচয় ; কথার যে নড়চড় করে, তাকে আমরা ছোটলোকই ব'লে থাকি। চার আনার কপিটা পনরো পয়সায় কেনবার জন্যে কপিওয়ালাকে 'কর্তা' 'দাদা' 'ভাই' প্রভৃতি অষ্টোত্তরশতনামে সম্ভাষণ ক'রে থাকি ; এত চেষ্টার পরেও কপিটা কিন্তু চার আনাতেই কিনতে হয়। মাসী বলা সত্ত্বেও মেছুনী এক টাকার মাছ পনরো আনায় দেয় না ; গায়ে আঁশজল ছিটিয়ে দেবার ভয়ে মধুরতর বা মধুরতম সম্ভাষণ প্রয়োগ করতেও সাহস হয় না।

এই যে আমরা পবিত্র গেরস্থর দল বাজারে গিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করি জিনিসগুলো এক-আধ পয়সা সস্তায় কিনতে, আমরাই তো খাঁটি ছোটলোক। আর যারা এক কথার ওপর ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখান, তারা শাকওয়ালাই হোক আর মাছওয়ালীই হোক' প্রচলিত সংজ্ঞা-অনুযায়ী তারাই তো ভদ্রলোক।

সাবাস ক্যাবলা! বালিগঞ্জের বাসভাড়াটা আমার বাঁচিয়ে দিলে।

শ্রীপ্রবোধকুমার চক্রবর্তী

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

১

দেখি—ধ্বংসের স্তূপে
নিরবচ্ছেদ জীবনের ধারা
বহি চলে চুপে চুপে।
বিনাশ তো তবে নহে শেষ কথা,
তা হতে অনেক বড়
আছে আছে এই বিধির রাজ্যে
বিধান মহত্তর।

সেই বিধানের সন্ধান যদি পাই,
বেঁচে থাকাটার অর্থ মেলে যে তাই!
সেই সন্ধানে জীবনের প্রতি-
দিবস আমার যাপি,
যে করে বিরোধ ভালবেসে তারে
বক্ষে ধরি যে চাপি।
এই মোটা পথে মিলেছে বন্ধু,
সংবাদ শুভশংসী—
বিনাশের অসি হতে গরীয়সী—
প্রেমের মোহন বংশী।

২

সেই বংশীরই অশ্রুত আহ্বানে
বন্ধুর পথে বিশ্বমানব
চলে ঊর্ধ্বগতিযানে।
হিংসাবহুল অসিসঙ্কুল
মানুষের ইতিহাস,—
কত মহামার,—তবু তো তাহার
আজিও হ'ল না নাশ!
তাই বুঝিয়াছি মনে,
প্রেমের পরমামৃত পান সে যে
করিছে সংগোপনে।

৩

সর্বমানবে পরমাত্মীয়জ্ঞানে
মিলিব মিলাব কায়মনোবাক্‌প্রাণে,—
ধর্ম যে মোর তাই;
কর্মের সাথে ধর্মের আমি
প্রভেদ জানি না ভাই!
ধর্ম কর্ম অর্থ সমাজ
রাজ্য রাষ্ট্রনীতি,

সব মিলে উঠে মহামানবের—
মিলিত ঐক্যগীতি।
মানব-জীবন নয় খোপে ভরা
পায়রার পাঠশালা ;
সে যে নীলাকাশে মানসযাত্রী
কলহংসের মালা।

৪

বাহুবলভীত প্রতি আত্মায়
সর্ববিজয়ী যে-প্রেম ঘুমায়
বুকে বুকে আমি সে মহাশক্তি
পারিতাম যদি জাগাতে,
হে মোর ভারত, জানি আমি জানি—
গড়িতাম তব যে প্রতিমাখানি
স্তম্ভিত হ'ত শস্ত্রপাণিরা
নিখিল বিশ্বজগতে।
তবু, অনাগত সে দিনের লাগি,
হে মোর চিত্ত, রহ একা জাগি
দুঃখহরণ দুঃখবরণ
জীবন-পাত্রে ভরি,
তুলি কালাকাল, দ্বার হতে দ্বার
বিলাও মন্ত্র দুখ বরিবার,
সকল কর্মে অতুলন সেই
প্রেমের মন্ত্র স্মরি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বিপরীত

ধরায় তেপান্তরের মাঝে আলোর আলেয়াই,
অজ্ঞজনে বারে বারেই ভুলিয়ে যে দেয় পথ ;
বিশ্বজোড়া হিংসা মাঝে প্রেমিকজনে তাই
বুঝতে নারি আমরা কেহ, কেজোই রাখে কর।

পদচিহ্ন

একুশ

সাত বৎসর পরে।

স্বর্ণবাবু মাথা নীচু ক'রে ভাবছিলেন। পাঁচ বৎসরেই তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখের কোণে কালির ছাপ পড়েছে, শরীরও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তক্তাপোশের এক দিকে কলকাতার একজন ভদ্রলোক, ডবলব্রেস্ট শার্টের উপর ওপেনব্রেস্ট কোট, পরনে দেশী ধুতি, পায়ে ফিতে-বাঁধা জুতো, মুখে চুরুট ; ভদ্রলোকটি বললেন, পাঁচ হাজার টাকা দেব আপনাকে, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। সাক্ষী দেবেন, মিথ্যে কথা বলতে হবে না আপনাকে। সত্যি কথা বলবেন। আর যারা কে. ব্যানার্জিদের ফরে (for-এ) সাক্ষী দেবে, তাদের জেরা করবার পয়েণ্ট ব'লে দেবেন। ওরা যা জবাব দিয়েছে, সেই জবাব দেখে তার গলদগুলো দেখিয়ে দেবেন। ফাইভ থাউজ্যাণ্ড রুপীজ।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিতে লাগলেন, অন্য হাতে টিকি পাকাতে শুরু করলেন।

ভদ্রলোকটি আবার বললেন, কি বলছেন মিঃ ব্যানার্জি ?

স্বর্ণবাবু বললেন, বিশ্রাম করুন, খাওয়া-দাওয়া করুন। আমি ভেবে দেখি।

হেসে ভদ্রলোক বললেন, ভয় হচ্ছে ?

ভয় ? স্বর্ণবাবু মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন, তারপর একটু হাসলেন। তাচ্ছিল্যভরেই বললেন, না।

কয়েক বৎসরে বহু পরিবর্তন ঘ'টে গিয়েছে। নবগ্রামের জীবন-নাট্যে একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গিয়েছে সুনিশ্চিতরূপে। চাটুজ্জে-পাড়ার কৃষ্ণ চাটুজ্জের মৃত্যু অভিলাষে কাশীযাত্রার মধ্যে একটা কালের সমাপ্তির ইঙ্গিত জানিয়েছিলেন ; সেদিনই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে গোপীচন্দ্রকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত ক'রে পরবর্তী অঙ্কের বা কালের ঘটনাসংস্থানের সূচনা ক'রে দিয়েছিলেন। গোপীচন্দ্র ইস্কুল-বোর্ডিং, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারি প্রতিষ্ঠা ক'রে, নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল ক'রে তাকে নূতন রূপে সাজিয়ে মারা গিয়েছেন। রাধাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন, একটা খণ্ডকালের মহেশ্বরের মতই গোপীচন্দ্র চ'লে গেলেন। কথাটা ভাল বটে, শুনতেও বেশ লাগে, কিন্তু স্বর্ণবাবুর মনে লাগে নাই কথাটা। বলেওছিলেন, কিন্তু মহেশ্বরের ছেলে

মহেশ্বর হওয়ার কথা তো পুরাণে নাই রাধাকান্ত। নইলে কথাটা তোমায় লিখে রাখতাম। গোপীচন্দ্র মহেশ্বর গেলেন, তাঁর জায়গায় এসে জেঁকে বসল তার ছেলে কীর্তিচন্দ্র মহেশ্বর। বড় কুটিল চক্রী মহেশ্বর, পুরাণে মহেশ্বরের যে সব গুণ নাই, সেই সব গুণে গুণান্বিত। একটু সাবধানে থেকো, এ বড় কঠিন মহেশ্বর! রাধাকান্ত ভাগ্যবান, তিনি সাবধান হওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। সেই যে শয্যাশায়ী হলেন তাঁর শালা রবির গ্রেপ্তারের আকস্মিক সংবাদে অচেতন হয়ে, আর সেরে উঠতে পারেন নি। গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন, মাস পাঁচেক বোধ হয়, পরেই মারা গিয়েছেন। গোপীচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে স্বর্ণবাবু দুঃখিত হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছিলেন; কিন্তু সংবাদটা পেয়েই তিনি বিশেষ ব্যগ্র হয়ে রাধাকান্তের ওখানে গিয়েছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। রাধাকান্ত নবগ্রামের সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করুন এই সময়ে, তিনি নিজে চেষ্টা করবেন, সরকার-বাহাদুরের ঘরে নিজে প্রভাব বিস্তার ক'রে সরকারের সকল অনুগ্রহ আয়ত্ত করবেন। পুরানো জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট গোপীচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক মুসলমান আই.সি. এস.টি বদলি হয়েছেন, তাঁর স্থলে এসেছেন এক বাঙালী আই.সি.এস.—মুখার্জি সাহেব। এই সময়। সাহেবটির বয়স অল্প। এখনও ঘড়ি-চেনের সঙ্গে রুপোর ডিশখানাও আত্মসাৎ করতে শেখেন নাই। প্রবাদ, ডিস্পেন্সারির ঘর নিয়ে কমিশনার সাহেব অসন্তুষ্ট হ'লে, রুপোর থালায় খান-তিরিশেক মোহর নজর দিতে গিয়েছিলেন গোপীচন্দ্র। কমিশনার সাহেব টেবিলটাকে পিছনে রেখে উঠে চ'লে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যাখান করেছিলেন। পুরানো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব টেবিল থেকে ডিশখানা তুলে রুমালে উজাড় ক'রে মোহর কখানি ঢেলে নিয়ে প্যাণ্টালুনের পকেটে অনায়াসে পুরে নিয়ে গোপীচন্দ্রকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, ডরো মৎ গোপীবাবু, ময় বিলকুল সব ঠিক কর্ দুঙ্গা। এই সাহেবটি বদলি হয়ে গেলে স্বর্ণবাবু দেবতার পূজা দিয়েছিলেন এবং চেষ্টাও করেছিলেন নূতন সাহেবটির অনুগ্রহ অর্জনের। কিন্তু নিজের অদৃষ্টচক্রে মন্দগ্রহের বক্র দৃষ্টি এবং কালচক্রের দেবতার রূপ ম্লেচ্ছ—হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোন কারণ তিনি খুঁজে পান না, এই দুই কারণেই তিনি অনুগ্রহ অর্জনে সক্ষম হন নাই। নূতন সাহেবটি মুখুজ্জে-বাড়ির ছেলে, কিন্তু পুরানো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটির চেয়েও বেশি সাহেব। সে সাহেব বড়-ঘরনা মুসলমান-

ঘরের ছেলে, সাহেব হ'লেও কানে আতর-মাখা তুলো গুঁজতেন, বাংলা বলতে পারতেন না, কিন্তু হিন্দী বা উর্দু যা বলতেন তা পরিষ্কার ক'রেই বলতেন। এ সাহেবটি মাথায় তেল মাখেন না, খসখসে চুলে ন্যাভেণ্ডার মাখেন, কড়া চুরুট খান, বাংলা তো বলেনই না, হিন্দী বলতে গিয়েও 'ট'-কে বলেন 'ঠ', 'প'-কে বলেন 'ফ'। স্বর্ণবাবু সেলাম দিতে গেলে প্রশ্ন করেছিলেন, টুমারা গর কাঁহা? ঠিক এই কারণেই তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ যুগের কালচক্রের দেবতা ম্লেচ্ছ রূপ ধারণ করেছেন। সভয়ে স্বর্ণবাবু সেলাম-আদি সেরে ঘরে এসে বসেছেন সেদিন থেকে। ওদিকে গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে কীর্তিচন্দ্রদের তরফ থেকে অমরচন্দ্র সাহেবটির সম্মুখীন হয়েছেন। গোপীচন্দ্র ব্যক্তিটির মর্যাদা বুঝেছিলেন, অমরচন্দ্রকে অধ্যাপনা ছাড়িয়ে নিজের কারবারে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন, কিছু অংশও দিয়েছিলেন, ফলে অমরচন্দ্র আত্মীয়তার খাতিরেই শুধু নয়, কৃতজ্ঞতাবশেও রাজদরবারে কীর্তিচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অটুট রাখতে চোস্ত ইংরেজীতে সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেন, যা বোঝাতে চেষ্টা করেন তাই বোঝাতে পারেন এবং সাহেবও তাই বুঝে থাকেন।

অতীত কথা মনে করতে গিয়ে স্বর্ণবাবু অকস্মাৎ অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। রাধাকান্ত বেঁচে নাই, তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন, অল্প দুর্ভাগ্য ভোগ ক'রেই তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন। অল্পের মধ্যেই তিনি আস্বাদন ক'রে গিয়েছেন এ দুর্ভাগ্যের তিক্ততার তীব্রতার নিষ্ঠুরতা। সে কথা মনে করলে জ্বালা ধ'রে যায় সর্বাঙ্গে। নতুন সাহেব জেলায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তিচন্দ্র হাই-ইস্কুলে সাহেবকে সম্বর্ধিত করবার জন্ম পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন করলেন। অমরচন্দ্রেরই পরিকল্পনা। সেই পুরস্কার-বিতরণী সভায় স্বর্ণবাবু শ্যামাকান্তবাবু এবং রাধাকান্ত নিমন্ত্রিত হয়েও যান নাই। ইস্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত কতকগুলি ব্যাপারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাঁদের এই অনুপস্থিতির কথা অমরচন্দ্র সাহেবকে জানিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই অনুপস্থিতি অবাধ্যতারই নিদর্শন এবং এই অনুপস্থিতির দ্বারা যদি কারও অপমান হয়ে থাকে তো সে অপমান হয়েছে এই সভার সভাপতির। ফলে এর কয়েকদিন পরেই স্থানীয় দারোগার কাছে সাহেবের এক নির্দেশ এল। স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্তবাবু এবং রাধাকান্তবাবু সভায় অনুপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি

র অপমান দেখিয়েছেন, তার জন্ত তাঁদের অনুতপ্ত হতে হবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে; তাঁর কাছে নয়, সভার উদ্যোক্তা কীর্তিচন্দ্রের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, অকপটভাবে অনুতাপ প্রকাশ করতে হবে। না করলে কি হবে, সে কথায় উল্লেখ অবশ্য ছিল না। সে কথা সাহেব ভাবেনই নাই। তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ কথাটা বলতেই শ্যামাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বসলেন। রাধাকান্ত বাক্‌পটু ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, দাদাই যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন আমারও ক্ষমা চাওয়া হয়েছে, আমিও ক্ষমা চাইছি। র্ণবাবু সবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর অনুতাপপ্রদর্শনও হয়েছিল অকপট; চোখ থেকে জল ঝ'রে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা। আরও অনেক কয়েক ফোঁটা জল ঝরবে চোখ থেকে। সে তিনি জানেন। তাই তাঁর মনে হয়, রাধাকান্ত মারা গিয়েছেন, নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রাধাকান্ত বলেছিলেন তাঁকেই, মরতে আক্ষেপ নাই পূর্ণ। মরেছি অনেকদিন আগেই। দেহটারই অবসান হবে শুধু। তারপর হেসে বলেছিলেন, ডিস্‌পেন্সারি প্রতিষ্ঠার দিন মাখন কবিরাজ আমাকে বলেছিলেন, আমরাই বিগত হলাম রাধাকান্তবাবু। বড় দামী কথা বলেছিলেন। কালকে জয় করবার জন্তে যোগীরা গুহায় ব'সে তপস্যা করে, কাল তাদের কাছে পরাজয়-স্বীকারের ছল করে, মারাত্মক রকমের রসিকতা করে। যোগ থেকে যেদিন ওঠে, সেদিন দেখে, কালের সঙ্গে পৃথিবী পাল্টে গেছে। কাল জয় ক'রেও কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর মধ্যে তার স্থান নাই। আমাদের হয়েছে তাই। খাপছাড়া জিনিসের সাজানো ঘরে ঠাঁই কোথায় বল? ভাঙাচুরো বাতিল জিনিসের সামিল হয়ে প'ড়ে থাকার চেয়ে পুনর্জন্ম অনেক ভাল।

সত্য কথা। শুধু গোপীচন্দ্রের বংশের প্রতিষ্ঠাই তাঁকে নিষ্প্রভ করে নাই, এ কালও তাঁকে উপেক্ষা করেছে, বাতিল করেছে। নতুন কাল, নতুন মানুষ, নতুন ভাষা, নতুন ভাব। কিছুদিন আগে কিশোর এখানে এক "দরিদ্রনারায়ণ সেবাসঙ্ঘ" ব'লে একটি সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলেছে। নামটা পর্যন্ত নতুন ঠেকেছে তাঁদের কাছে। দরিদ্র হ'ল নারায়ণ! হায় রে, লক্ষ্মী যাঁর চরণাশ্রিতা, সেই নারায়ণ নাকি দরিদ্রের মধ্যে থাকেন? সঙ্ঘ শব্দটা পর্যন্ত কানে ঠেকেছে। এদের কাজ হ'ল, মুঠি সংগ্রহ ক'রে দরিদ্রের সেবা করা। ভিক্ষা দেওয়া

বুঝতে পারেন তিনি, কিন্তু সেবা করবে কি? গরিব হীনবর্ণের সেবা কি ক'রে মহৎ কর্ম হতে পারে, সে তিনি বুঝতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ছেলেরা শোভাযাত্রা ক'রে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একটা মোটা কাগজ বাঁখারিতে এঁটে সেইটেকে ধ্বজাপতাকার মত তুলে ধ'রে রাখে সামনে। সেটাতে লেখা আছে—মুচী মেথর চণ্ডাল আমার ভাই। নারায়ণ! নারায়ণ!

রাধাকান্ত সত্যই নিষ্কৃতি পেয়েছেন। রাধাকান্তের ছেলে গৌরীকান্তের বয়স এখন বছর তেরো-চোদ্দ হবে। এই ধ্বজাটি অধিকাংশ দিন গৌরীকান্তই ধ'রে নিয়ে বেড়ায়। এ হিসাবে তিনি তাঁর ছেলেকে অনেক সংযত রেখেছেন।

স্বর্ণবাবুর নায়েব এসে দাঁড়ালেন। নায়েবদের রীতিই এই—কিছু বক্তব্য থাকলে এসে সামনে নীরবে দাঁড়ান, মনিব কথা না বললে কথা বলেন না; বড় জোর অকারণে গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা ক'রে একটা শব্দ তুলে মনিবের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, কি?

মাথা চুলকে নায়েব বললেন, একবার বাড়ির মধ্যে—

বাড়ির মধ্যে? কেন?

অপ্রিয়ভাষিণী শ্রীতিলেশহীনা অভয়ার কথা মনে হতেই সমস্ত অন্তর তাঁর বিষিয়ে উঠল। নায়েব বললেন, ও-বাড়ির গিন্নীমা এসেছেন।

কে? চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু।

ও-বাড়ির গিন্নীমা। নায়েব তীর্যক দৃষ্টিতে কলকাতার ভদ্রলোকটির দিকে চাইলেন একবার।

ও-বাড়ির গিন্নীমা অর্থে গোপীচন্দ্রের পত্নী। গোপীচন্দ্রের পত্নী স্বর্ণবাবুর বাড়িতে এসেছেন! স্বর্ণবাবুও একবার কলকাতার ভদ্রলোকটির দিকে চাইলেন। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে নায়েবকে ডাকলেন, শোন।

নায়েব আসতেই বললেন, জেলে ডাকিয়ে একটা বড় মাছ ধরাও দেখি। বেশ বড় মাছ—বুঝলে, বড় রুইমাছ।

অন্দর-মহল এবং সদর-বাড়ির মাঝখানে স্বর্ণবাবুদের নিজস্ব ঠাকুরবাড়ি। পৈতৃক এজমালি ঠাকুরবাড়ি রাধাকান্তের বাড়ির পাশে। কুলদেবতা সেখানে।

পরিকল্পের মধ্যে নিজের অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর স্বর্ণবাবুর বাবা যতন্ত্রভাবে বাড়ি তৈরি যখন করেন, তখন সেকালের অভিজাত-সম্প্রদায়ের কায়দাকানুন অনুযায়ী সদর ও অন্দরের মধ্যে দেবগৃহ এবং নাটমন্দির তৈরি করারও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কুলদেবতার পূর্ণ অধিকার যথারীতি বজায় রেখে ইষ্ট-দেবীর পূজার পত্তন করেছিলেন। বৎসরে একবার পূজা, মূর্তি গঠন ক'রে পূজা হয়, পূজা উপলক্ষ্যে এ-বাড়ির উপযুক্ত সমারোহে ব্রাহ্মণশূদ্র-ভোজন নৃত্যগীত হয়, দেবী অবশ্যই প্রসন্না হন, লোকজনে গুণগান করে। স্বর্ণবাবু মন্দিরের সামনে আবার দাঁড়ালেন। প্রণাম করলেন। মন্দিরটির শ্রী ম্লান হয়ে এসেছে। নাটমন্দিরটির কয়েকটি খিলানে সরু সুতোর মত ফাট দেখা দিয়েছে। "সুতো কাছি হতে কতক্ষণ?"—কথাটা তিনি শুনেছেন, এখানকার থিয়েটারের কি একটা পালায়। নতুন কালে নবগ্রামে নতুন প্রমোদ দেখা দিয়েছে। গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছে। উঃ, কি প্রচণ্ড ভিড়ই হয়। বৈঠকী গানের মজলিস আজকাল জমছেই না। কীর্তন-গানের আসরে কয়েকটি পাকাচুলবিশিষ্ট মাথা ছাড়া আর কাউকে দেখাই যায় না। খেমটা-নাচে লোক হয় না এমন নয়, কিন্তু খেমটা-গান আজকাল রুচিবিরুদ্ধ হয়েছে। স্বর্ণবাবুই রোষ ক'রে মধ্যে মধ্যে বলেন, ফ্যাশান নাই। যাক ও কথা। স্বর্ণবাবু ফিরে এলেন নাটমন্দিরের ফাটলের সূত্র ধ'রে। ক্রমে ফাটল বেড়ে কাছির মত মোটা ফাটলে পরিণত হবে। অন্দর-মহলের বাড়িটি এখন অটুট আছে। মালিন্য ধরেছে বটে মার্জনা অভাবে, অনেকদিন মেরামত ও রঙ ফেরানো হয় নাই; কিন্তু জীর্ণতার এতটুকু ছাপ পড়ে নাই। পাঁচ হাজার টাকা অনেক। কষাকষি করলে পরিমাণ আরও বাড়বে, তাতে তাঁর সন্দেহ নাই। ভাবলেন, তিনি গোপীচন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন না। ফিরে সদরে গিয়েই ভদ্র-লোকটির সঙ্গে কথা পাকা ক'রে ফেলবেন। কিন্তু সেও তিনি পারলেন না। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী তাঁর কাছে নত হয়ে অনুরোধ করতে এসেছেন। সম্ভ্রমভরেই তিনি বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী এ অঞ্চলে বর্তমানে গিন্নীমা নামে বিখ্যাত। লোকে বলে, তাঁর নিজের যত ওজন, তাঁর সিন্দুকে মজুত স্বর্ণের ওজন তার চেয়ে অনেক বেশি। তারও চেয়ে অনেক—অনেক—অনেক বেশি তাঁর দম্ভ। সে দম্ভের প্রকাশ তাঁর আচরণে তেমন খোলে না, যেমন খোলে তাঁর বাক্যে। তিনি

এখনও খুঁটে দিয়ে থাকেন বাড়ির ভিতরে পাকা দেওয়ালের গায়ে। একবার এক চাষীর মেয়ে দেখতে এসেছিল সেই গিন্নীমাকে, যাঁর নাকি স্বর্ণের ওজন তালবৃক্ষের তালের কাঁদিতেই সীমাবদ্ধ নয়, ফলপল্লবসমেত গোটা একটা তালবৃক্ষ প্রস্তুত হতে পারে সে ওজনের স্বর্ণের পরিমাণ থেকে। বাড়ির ভিতর ঢুকেই সে কুয়াতলার এলাকায় ঘুঁটে-প্রস্তুতরত গিন্নীমাকে দেখে ভেবেছিল, বাড়ির ঝি। তাঁকে সে উপেক্ষা ক'রেই বাড়ির আরও ভিতর-মহলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। গিন্নীমা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কে লা তুই?

সে উত্তর দিয়েছিল, আমি বাছা, গিন্নীমাকে পেনাম করতে এসেছি, দেখতে এসেছি।

অ। তা হনহন ক'রে ভেতরে যাচ্ছিস কেন? নে, ওইখান থেকে পেনাম কর্।

ভুরু কুঁচকে সে মেয়ে বলেছিল, মরণ! বড়লোকের বাড়ির ঝি-চাকরের ঢ্যাকারই আলাদা। তোকে পেনাম করব কি দুঃখে? নিজেকে গিন্নীমা বলতে তোর লজ্জা করল না? দাঁড়া, গিন্নীমাকে ব'লে দেব আমি।

গিন্নীমা হা-হা ক'রে হেসেছিলেন, সে হাসি শুনে মেয়েটা কিন্তু ভয় পেয়েছিল, বলেছিল, এমন ক'রে হাসছ কেনে গো তুমি? ও কি হাসি?

গিন্নীমা বলেছিলেন, তুই যেন এ কথা গিন্নীমাকে বলিস না, আমি তোকে গিন্নীমা দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ব'লে তিনি চীৎকার ক'রে দরোয়ানকে ডেকেছিলেন, মহাবীর, এ মহাবীর! মহাবীর সিং এসে সসম্ভ্রমে অভিবাদন ক'রে দাঁড়াতেই বলেছিলেন, এই মেয়েটার ঘাড়টা ধ'রে আমার পায়ে ঠুকে দাও তো, হারামজাদীকে গিন্নীমা চিনিয়ে দাও। ও চিনতে পারছে না। আমাকে বলছে—ঝি।

সেই গিন্নীমা স্বয়ং এসেছেন স্বর্ণবাবুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে মেয়েরা সসম্মানেই তাঁকে বসতে দিয়েছিলেন। এ বাড়ির মর্যাদার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব অন্দর-মহলেও চ'লে আসছে। অন্দর-মহল কেন, ও দ্বন্দ্ব এ-বাড়ির ঘোড়া এবং ও-বাড়ির ঘোড়ার মধ্যেও একদা বিদ্যমান ছিল। গতিবেগে যে বাড়ির ঘোড়াই পরাস্ত হ'ত, তার হ'ত চাবুকের ঘায়ে চরমতম লাঞ্ছনা। আজ ও-বাড়ির গৃহিণী যেখানে নত হয়ে স্বয়ং এসেছেন এ-বাড়িতে, সেখানে এ-বাড়ি তাঁকে দেখিয়েছে রাজজনোচিত সম্মান;

এ-বাড়ির সর্বোত্তম আসনখানি পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে, পান-জর্দা দেওয়া হয়েছে, রূঢ়ভাষার পারদর্শিনী অভয়া মিষ্টতম কথায় আলাপ করছেন। স্বর্ণবাবুর বোনেরা তাঁকে ঘিরে ব'সে তাঁর ভাগ্যের যে প্রশংসাবাদ করছেন, তার তুলনা এদেশে সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় লিখিত রাজা বা নবাবকে লেখা রাজা-বাদশাহের চিঠিতেই পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় ও সম্বন্ধে উপদেশ আছে—বলে, দুশমনকে উঁচু পিঁড়ি দিতে হয়। দুশমনকে উঁচু পিঁড়ি দিলে দুশমন সন্তুষ্ট হতেও পারে, নাও পারে; কিন্তু দুশমনের কাছে উঁচু পিঁড়ির মালিকানির পরিচয় দিয়ে আনন্দ আছে।

স্বর্ণবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, কি ভাগ্যি আমার, আপনি এসেছেন। কিন্তু কষ্ট ক'রে আসবার কি দরকার ছিল আপনার? আমি ছোট দেওর, আমাকে হুকুম করলেই যেতাম আপনার কাছে।

অভয়া মাথার ঘোমটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে উঠে স'রে দাঁড়ালেন। গোপী-চন্দ্রের স্ত্রী অভয়ার পরিত্যক্ত আসনে হাত দিয়ে বললেন, ব'স। তোমার সঙ্গে একটু গোপন কথা আছে আমার।

অভয়া ননদদের দিকে চেয়ে একটু মুচুকে হাসলেন। ননদরাও হাসলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁরাও জানেন। এবং তাঁরা যে জানেন, সে কথা গোপীচন্দ্রের স্ত্রী যে জানেন না, এমন কখনই হতে পারে না; বেশই জানেন। তবু তাঁদের সামনে কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছেন গোপীচন্দ্রের স্ত্রী, দম্ভে বাধছে। হাসলেন তাঁরা সেইজন্য। স্বর্ণবাবু মুখ তুলে সকলের দিকে তাকালেন। তাঁর হাসি মুখে ছিল না, চোখের চাউনিতে ছিল এবং তার মধ্যে কথাও ছিল। সাধারণ লোকের চোখে ভাব আছে, কথা নাই। অভিজাত-সম্প্রদায়ের চোখ কথা কয়। সাধারণ লোকে বলে, বাবুদের ছেলেরা চোখের টিপুনিতে বুঝে নেয়, কি বলছে গুরুলোকে, কি করতে হবে। মেয়েরা স্বর্ণবাবুর দৃষ্টি দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, তুমি নাকি আমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে?

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, সেই অনুরোধ নিয়ে কলকাতা থেকে মাড়োয়ারীদের লোক এসেছে। বলছে, মিথ্যে সাক্ষী দিতে হবে না, সত্য কথা কয়েকটা বলতে হবে।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। যে বিচিত্র আসনখানিতে

তিনি ব'সে ছিলেন, সেই আসনখানির কারুকার্যের দাগে আঙুল বুলোতে লাগলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুনলাম, তারা নাকি কত হাজার—

হ্যাঁ। পাঁচ হাজার টাকা দেবে বলছে।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী আবার একটু নীরব থেকে বললেন, মামলা-মকদ্দমা তোমার সঙ্গে তাঁর অনেক হয়েছে। কিন্তু খুড়শ্বশুর তাঁকে ছেলের মতই দেখতেন। তিনিও ভাবতেন, তিনি তাঁর নিজের খুড়ো, বাপের সমান ভক্তি করতেন। প্রথম যখন চাকরি করতেন তোমার দাদা, তখন টাকাকড়ি সবই তিনি খুড়শ্বশুরের নামে পাঠাতেন। খুড়শ্বশুর অর্থে স্বর্ণবাবুর বাপ। তিনি অর্থে গোপীচন্দ্র।

স্বর্ণবাবুর মুখে তীব্র হাসি দেখা দিল। কথাটা গোপীচন্দ্রের স্ত্রী মিথ্যা বলেন নাই। গোপীচন্দ্রের অর্থেই অবশ্য, স্বর্ণবাবুর বাপ গোপীচন্দ্রের স্থানীয় সম্পত্তির ভিত্তি স্থাপন ক'রে দিয়েছিলেন। ওই ইস্কুলের জায়গা তিনিই কিনে দিয়েছিলেন। সেখানে নিজের নামে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা ক'রে গোপীচন্দ্র বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন স্বর্ণবাবুর বাপের নামে প্রতিষ্ঠিত কীর্তি—মাইনর ইস্কুলটি। অবশ্য কালের কথাই বলে লোকে। কালে এন্ট্রান্স ইস্কুল হ'ল যখন, তখন মাইনর ইস্কুল উঠে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্বর্ণবাবু তো ভুলতে পারেন না তাঁর পিতার নামাঙ্কিত কীর্তিটি বিলুপ্ত হওয়ার লজ্জা এবং বেদনা। তাঁর মুখের কাছে এগিয়ে এল সেই কথা। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন তিনি। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী নতমুখে যে কথাটি বলতে চাইছেন অথচ বলতে পারছেন না, তার ফলে যে বেদনা তিনি অনুভব করছেন এবং ওই নতমুখে ব'সে থাকার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ লজ্জার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, তার আনন্দই তাঁকে সাহায্য করলে আত্মসম্বরণ করতে।

ব্যাপারটা ঘটেছে অপ্রত্যাশিতভাবে না হ'লেও আকস্মিকভাবে।

নবগ্রামের জীবন-নাট্যে নাটকীয়ভাবে ঘটনাটি ঘটেছে। এই সাত বৎসরের মধ্যে গোপীচন্দ্রের বংশ মহাসমারোহে এখানকার নাট্যের নায়কত্ব অর্জন করলেন একচ্ছত্রত্বের প্রতাপে। গোপীচন্দ্র যে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে গিয়েছিলেন কীর্তি স্থাপনা ক'রে, তারই উপর তাঁরা প্রতাপের সিংহাসন

পেয়েছেন। বহু সম্পত্তি আয়ত্ত করেছেন। বহুজনকে ঋণদানে উপকৃত এবং আবদ্ধ করেছেন। এখানকার বহু প্রাচীন বংশের সন্তানদের কলকাতার আপিসে চাকরি দিয়ে তাদের চাকর না হোক, কর্মচারী করেছেন; মাত্র আর কয়েকটি ঘর বাকি আছে। তিনটি ঘর—স্বর্ণবাবুর বাড়ি, শ্যামাকান্তের বাড়ি ও রাধাকান্তের বাড়ি। রাধাকান্ত গোপীচন্দ্রকে বলেছিলেন, নবগ্রামের খণ্ডকালের মহেশ্বর। এরা হয়েছে নবগ্রামের মহেন্দ্র। শুধু নবগ্রামেরই নয়। সমগ্র ভারতবর্ষে নাকি গোপীচন্দ্রের কয়লার ব্যবসায়—সর্বপ্রধান কয়লার ব্যবসায় ও শ্রেষ্ঠ কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গভর্মেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছিলেন গোপীচন্দ্রের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁর দিকে। সে মুখে লালিত্য-শোভা দিন দিন বেড়ে উঠছে। ইস্কুলডাঙা এখন সমৃদ্ধ শহরের একটি অংশের মত ঝলমল করে। জমিদার-পাড়ার হাস্যরোলগম্ভীর কণ্ঠস্বর এখন স্তব্ধ। চণ্ডীতলার আরতির ধ্বনি আজকাল আর শোনা যায় না, সে ধ্বনি ঢাকা প'ড়ে যায় গোপীচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ির ঘণ্টা শাঁখ খোল করতাল এবং স্থানীয় বাদ্যকরদের সানাই ও নহবতের চর্মবাদ্যের ধ্বনির অন্তরালে। গ্রামের তরুণেরা ব্যবসায় করবার দিকে ঝুঁকেছে, এবং সেজন্য কীর্তিচন্দ্রের প্রসাদ না হোক, সাহায্য প্রত্যাশা করে। বংশলোচনের বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্রের বন্ধু, তাকে গোপীচন্দ্রই চাকরি দিয়েছিলেন, সে এখন স্বাধীনভাবে কয়লার ব্যবসা করছে। বংশলোচনের ম্যানেজারি অবশ্য অনেকদিন আগেই গিয়েছে, গোপীচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই গিন্নীমার অসন্তোষের ফলেই গিয়েছে। ওদিকে নবগ্রাম-সমাজে প্রতিষ্ঠার উপর প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহায্যেরও আর কোন মূল্য ছিল না। কাজেই কীর্তিচন্দ্রও মায়ের কথাকে শিরোধার্য করার ভঙ্গী দেখিয়ে সুকৌশলেই বংশলোচনের মুখের ভাষণ শোনার পীড়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। স্বর্ণবাবু হতমান হতশ্রী হৃতকীর্তি হয়ে প্রৌঢ় বয়সেই জ্রুত বার্ধক্যের পথে চলেছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন মৃত্যুর। এমন সময় আকস্মিকভাবে শোনা গেল, কীর্তিচন্দ্রের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বহু বহু লক্ষ টাকা ঋণের ভারে কাল-সমুদ্রে নিমজ্জমান হতে চলেছে। মনে মনে বহুকাল থেকেই গোপীচন্দ্রের বিরুদ্ধপক্ষ তাঁর পতন কামনায় যারা প্রত্যাশা ক'রে এসেছেন, তাই ব্যাপারটাকে ঠিক অপ্রত্যাশিত বলা চলে না। তবে নিতান্তই আকস্মিক এবং হিসাবের বাইরে, তাতে সন্দেহ নাই।

এই দায়ে বহু নালিশ হয়েছে। এই সকল নালিশের দায় থেকে সম্পত্তি রক্ষার জন্ত কীর্তিচন্দ্র আইনের এক সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথে প্রবেশ ক'রে অপর পারে উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছেন। তিনি কয়েক বৎসর আগের তারিখ দিয়ে তাঁর ছোট ভাই পবিত্রের সঙ্গে এক সম্পত্তি-বণ্টনের দলিল ক'রে দেখাতে চাচ্ছেন যে, ব্যবসায় নিয়েছিলেন একক তিনি, ভূ-সম্পত্তি নিয়েছিল পবিত্র। ব্যবসায়ের ঋণের দায় তাঁর একক। তাঁর ঋণের দায়ে পবিত্রের ভূ-সম্পত্তি স্পর্শ করা যায় না। এবং নিজে ঋণদায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ত ইন্‌সল্‌ভেন্সি পাবার প্রার্থনা করেছেন মহামান্ত হাইকোর্টে, যেখানে নাকি সূক্ষ্ম ন্তায়বিচারের প্রতীকস্বরূপ একটি পবিত্র মানদণ্ড অর্থাৎ নিত্য ব্র্যাসো বা মেটালপলিশ ঘর্ষণে চকচকে একটি নিক্তি শোভমান থাকে। জমিদারের ছেলে এবং নিজে বিশেষভাবে মামলাপ্রিয় স্বর্ণবাবু ভারতীয় কৃষি-সংক্রান্ত আইন থেকে আরম্ভ ক'রে উত্তরাধিকার, স্বত্ব আইনের জটিল তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ; এসব আইনে জট পাকাতে পারেন যেমন, জটের মধ্যবর্তী আলগা ফাঁস খুলে বেরিয়ে আসতেও পারেন তেমনই স্বচ্ছন্দে; কিন্তু এই ইন্‌সল্‌ভেন্সি আইনটা তাঁর কাছে আশ্চর্য ঠেকছে। সে কথা থাক্। এখন মাড়োয়ারী পাওনাদার তাঁর কাছে এই বাবুটিকে পাঠিয়েছেন স্বর্ণবাবুর সাহায্য ক্রয়ের জন্ত। অন্তায় বা মিথ্যাচরণের দ্বারা সাহায্য করতে হবে না, ধর্মপথে থেকে সত্য কথা ব'লে তাঁদের সাহায্য করবেন এবং নিজের শত্রু অপরের দ্বারা নিপাত ক'রে নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। স্বর্ণবাবুকে স্বমুখে শুধু বলতে হবে এই সত্য কথাটি যে, কীর্তিচন্দ্র এবং পবিত্রচন্দ্র একান্নবর্তী, তাঁদের মধ্যে কোন সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টন হয় নাই, বাড়িতে উনান চার-পাঁচটা থাকলেও রান্না ও ভাণ্ডার এক। এ ছাড়া তথ্যাদিও কিছু সংগ্রহ ক'রে দিতে হবে তাও সত্য; মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন সাহায্যের জন্ত তাঁদের অনুরোধ নাই। এর জন্ত পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক বলুন, উপহার বলুন; যাই বলুন, দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা। স্বর্ণবাবুও এই কারণে ঠাকুরবাড়িতে দাঁড়িয়ে নাটমন্দিরের ফাটল দেখে ভাবছিলেন যেরামতের কথা। গোপীচন্দ্রের স্ত্রীও এসেছেন এই কারণেই, সকল দম্ভকে সঙ্কুচিত ক'রে স্বর্ণ-ঠাকুরপোর বাড়ি, সম্ভবত কোন অনুরোধ জানাতে। কিন্তু কিছুতেই সে কথাটা বলতে পারছেন না। স্বর্ণবাবুও স্থির করতে পারছেন না, তিনি কি করবেন! পাঁচ হাজার টাকা এবং গোপীচন্দ্রের বংশধরদের পতনের অবস্ত কম

দুঃখ নয়, কিন্তু গোপীচন্দ্রের স্ত্রী মুখ দিয়ে যে কথাটি কিছুতেই বার করতে পারছেন না, সে কথাটি শোনবার জন্য তাঁর সমগ্র অন্তর উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, তোমার সঙ্গে বিবাদ মামলা-মকদ্দমা তিনি ক'রে গিয়েছেন। অর্থাৎ গোপীচন্দ্র। একটু থেমে আবার বললেন, ছেলেরা আমার—। স্বর্ণবাবু হাসছিলেন, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে গোপীচন্দ্রের স্ত্রী থেমে গেলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, তারা বাধ্য হয়ে জের টেনে চলছে।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তবু তিনি বললেন, তাদের তুমি খুড়ো, তোমার সঙ্গে তাদের মামলা-মকদ্দমা বিবাদ করা উচিত নয়, আমি বলব তাদের। আবার তিনি থেমে গেলেন। ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে। আর তাঁর কথা বলবার শক্তি ছিল না।

তাঁর ওই ঠোঁট কাঁপার ভঙ্গী দেখে স্বর্ণবাবু অকস্মাৎ কেমন হয়ে গেলেন। একের পর এক তাঁর অনেকগুলি সন্তান মারা গিয়েছে। অন্নদা শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ ক'রে কেঁদেছেন। কিন্তু সে কান্না দেখে তিনি কখনও এত বিচলিত হন নাই। এমন ধারায় বিচলিত তিনি আর একদিন হয়েছিলেন। রাধাকান্ত যেদিন মারা যান, সেদিন কাশীর বউ উপুড় হয়ে নিঃশব্দে মাটির প্রতিমার মত প'ড়ে ছিলেন বিছানার উপর। যে সূক্ষ্ম কম্পন আজ তিনি গোপীচন্দ্রের স্ত্রীর ঠোঁটে দেখলেন, তাও ছিল না কাশীর বউয়ের সারা অঙ্গের মধ্যে কোনখানে। দেখে মনে হয়েছিল, মেয়েটি বুঝি পাথর হয়ে গিয়েছে। আজ গোপীচন্দ্রের স্ত্রীর মুখে ওই কম্পন দেখে মনে হ'ল, তিনি যেন ফেটে যাচ্ছেন, পাথরের প্রতিমায় কোন অসহনীয় উত্তাপে ফাট ধরছে, এ সূক্ষ্ম কম্পন তারই অভিব্যক্তি।

স্বর্ণবাবুর সকল নিষ্ঠুরতা বিলুপ্ত হয়ে গেল মুহূর্তে। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অকপটভাবে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান বউঠান, আমি ও-কাজ কখনও করব না। বিদেশীরা এসে গোপীচন্দ্রদাদার ছেলেদের সম্পত্তি ক্রোক ক'রে ঢোল দেবে, তাদের ধ্বংস করবে, তাতে আমি কখনও সাহায্য করব না। টাকা আসে যায়, থাকে না। অনেক পাঁচ হাজার রোজগার করেছি, নষ্ট করেছি। অবশ্য পাঁচ হাজার আমার পক্ষে এখন অনেক। কিন্তু এই ভাবে

ওই টাকা উপার্জন, ছি ছি, তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। এ ভাবে যদি আমি গোপীচন্দ্রদাদার ছেলেদের নষ্ট করতে যাই, তবে তাদের চেয়েও বেশি নষ্ট হব আমি। সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী এতক্ষণে মুখ তুলে বললেন, তোমার দিন দিন উন্নতি হোক ভাই, আমি আশীর্বাদ করছি—

তাঁকে বাধা দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, তাঁর আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, বললেন, কৌরব-পাণ্ডবের ঝগড়ায় ভারতে মহাভারতের সৃষ্টি হয়েছে বউঠান; সে ঝগড়া কখনও মেটে নি, কিন্তু কৌরবকে যখন গন্ধর্বে নাকাল করলে, তখন অর্জুন গিয়ে তাদের মুক্ত করলে, কৌরব-পাণ্ডব এক হ'ল। আবার দণ্ডীরাজাকে নিয়ে যেদিন পাণ্ডবে যাদবে ঝগড়া হ'ল, দেবলোক যোগ দিলে যাদবের সঙ্গে, সেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম এদের বিপক্ষেও কৌরব এসে দাঁড়াল পাণ্ডবের পক্ষে। নবগ্রামের অষ্টাদশপর্বে আমরাই হলাম কৌরব-পাণ্ডব। বাইরের কেউ কারু বিপক্ষে লাগলে আমরা এক দিক।

স্বর্ণবাবু পরিতৃপ্ত হলেন কথাগুলি ব'লে। এই কথাগুলি না বললে যেন তাঁর ক্ষোভ যাচ্ছিল না, তিনি যেন কোন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছিলেন না। পুরাণকাহিনীর আদর্শবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি মহৎ কর্মের অনুপ্রেরণা লাভ করলেন, লাভ-লোকসানের সকল হিসাবের ঊর্ধ্বে কোন এক হিসাবের সন্ধান পেলেন। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, কীর্তি আসবে তোমার কাছে। ঝগড়া-বিবাদ মামলা-মকদ্দমা যা আছে—

না। স্বর্ণবাবু মাথা নাড়লেন। সে করতে হবে না বউঠান। সেসব যেমন চলছে, চলুক। হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, কুরুক্ষেত্র শেষ না হ'লে নবগ্রামের অষ্টাদশপর্ব সম্পূর্ণ হবে কি ক'রে? আর বেঁচে থাকব কি নিয়ে? না না, তার দরকার নাই। সেসব চলুক।

আজ মনে পড়ছে রাধাকান্তকে। রাধাকান্ত থাকলে এই সব কথাই আর ভাল ক'রে বলতে পারতেন। কথাগুলো অনেকটা রাধাকান্তের মতই হয়েছে বাক, তা হ'লে কিন্তু চলবে না। গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি বেরিয়ে এলে বাড়ি থেকে। ওই ভদ্রলোকটিকে কিন্তু প্রচুর আয়োজন ক'রে খাওয়াতে হবে। কলকাতার লোক প্রাচীন ঘরের খাওয়ানো দেখে যান; তা ছাড়া আজ ওঁর আগমনের কল্যাণে তিনি যা পেলেন, তা কখনও কল্পনাও করে

পারেন নাই তিনি। গোপীচন্দ্রের স্ত্রী আজ 'রক্ষা কর' এই আবেদনই একরকম জানাতে এসেছিলেন। তাঁর জীবনের সাধ একরকম পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আজ। বাস্, আর তাঁর ক্ষোভ নাই। কীর্তিচন্দ্র, পবিত্রচন্দ্র, তোমরা মহেন্দ্র হয়েই রাজত্ব কর নবগ্রামে। তবে পাতালবাসী দৈত্যরাজের মত তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই ক'রে যাবেনই।

হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কে যেন যাচ্ছে! কে মেয়েটি? সঙ্গের ছেলেটি তো গৌরীকান্ত। অনেক বড় হয়ে উঠেছে রাধাকান্তের ছেলে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসাফিরের ডায়েরি

পথের সঞ্চয়

বহুদিন আঁধার ঘরে বন্দীবন্ধরূপে থাকার পর হঠাৎ-খুলে-যাওয়া দরজার এক ঝলক আলো যেমন ধাঁধিয়ে দেয়, তেমনই আমার পুঁথিগত-পথচারী শহুরে মন এই বিধ্বস্ত এলাকায় এসে যেন হারিয়ে গেছে। সমাজ সম্বন্ধে নতুন দিক চোখে পড়ছে, গোগ্রাসে সব সংগ্রহ করছি, ক্রমশ অবকাশমত রোমন্থন করার আশা আছে। নানা ঘোরাঘুরির মধ্যে মন বললে, একবার গান্ধীজীর কাছে চল। তথাস্তু। কেন জানি না, গত দু মাস যাবৎ কেবল মনে হচ্ছে, কি জানি পাওয়ার ছিল—কি বীজমন্ত্র যেন পেলুম না। আমি গুরুবাদ মানি। মনটা ম্লান হয়ে রয়েছে; ভয় হয়, পথ চলতে যখন থামব, যখন রাত্রি নামবে, আসবে সমস্যার দুর্যোগ, তখন কি সম্বল হবে, পথের সঞ্চয় কই?

প্রভাতে একা চললুম। পানিয়ালার পথে—মাথায় বিছানার বোঝা। গিয়ে শুনলুম, আজ পার্শ্ববর্তী গ্রাম কেতুড়ীতে গান্ধীজী থাকবেন। একটু নিরাশ লাগল, ক্ষণিকের জন্য। বিছানাপত্র রেখে কংগ্রেস ক্যাম্পে জিরোলুম। কি সাদর স্বাগত এরা জানাল! এই বাড়িতে তিনজন যুবক নিহত হয়েছে। গান্ধীজী আসবেন, যেন নবোৎসাহে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে—কত আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা! খাওয়ার পর ভাবলুম, কেতুড়ী ঘুরে আসি, রওনা দিলুম, ঝোলা-কম্বল রইল, আবার রাতে আসছি তো। বাড়ির মেয়েদের কাছে কথা দিলুম, এখন যাই, রাতে গল্প হবে। কিন্তু সে গল্প আর হয় নি।

প্রথম রোদ, এগিয়ে চলেছি। দেখলুম পথটা বেশ সমান ও পরিচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে উঁচু সাঁকোর পাশ দিয়ে নতুন তৈরি ভিজে মাটির পথ রোজকের মত পুরোনো ধারাকে মিশিয়ে দিয়েছে। শুনলুম, গান্ধীজী আসবেন, তাই এ ব্যবস্থা গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবক ও সরকারী চেষ্টায় ঘটেছে। দুরন্ত ছেলেরা চেয়েছিল, চিরন্তনী গ্রাম যেমন, গান্ধীজী তাই দেখে যান; কিন্তু নানা বাধায় তা হয় নি। কয়েক লাখ টাকা মঞ্জুর হয়েছে দূরভবিষ্যতে চলার পথ সুগম করার জন্য, পথের চলায় ছন্দপতন বন্ধ করার জন্য। একজন মানুষের একক সাধনা কি করতে পারে তাই ভাবছিলুম। একের তপশ্চর্যা কতবার বহুর কল্যাণ এনেছে। অবতারবাদের দেশ আমাদের—আমাদের এ সংস্কার মজ্জায় ঘুণ ধরায়, পরমুখাপেক্ষী করে, অদৃষ্টবাদে সকল দায় থেকে মুক্তি খোঁজে—এ সব মতবাদ হয়তো মিথ্যা নয়, তবু মনটা বলে, হে মহাত্মা, তোমাকে নতি জানাই। এই নাঙ্গা ফকিরের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করি। রাষ্ট্রজগতে এমন সর্বত্যাগী কোন্ মানুষ এত প্রেম এত সম্মান পেয়েছে! সন্তানহারা মা ভাবছেন—মহ পাপে আমার বুকের ধন দস্যুতে ছিনিয়ে নিয়েছে, আবার বহু পুণ্যে আজ গান্ধীজী আমার কুটিরে আসছেন। এই বিনিময়ের মূল্য যাচাই করতে করতে আমি আনমনা হয়ে চলেছি।

কেতুড়ীতে এসে গেলুম। দু-একটি পরিচিত মুখ দেখে ঘরে ঢুকে কথা শুরু করলুম। একটু পরে মনু বললে, বাপুজী ডাকছেন তোমাকে। প্রস্তুত ছিলুম না— ভেবেছিলুম, দেখা হয়তো হবে না, খবর না দিয়ে এসেছি, আগেই যদি কোনও এনগেজমেন্ট থাকে! গেলুম। বললুম, এ পুনর্বসতির কাজে জোর পাচ্ছি না, তোমার মত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম নেই, কেবল দ্বিধাদ্বন্দ্ব—লোকে আমার কথায় সাহস পাবে কেন? চিরাচরিত হাসি হেসে বললেন, তুমি ঠিক আগের মতই আছ। তোমার নিজের বিশ্বাস আছে? তা যদি থাকে যথেষ্ট, কাজ ক'রে যাও। দু-চার কথার পর অতৃপ্ত মন নিয়ে উঠে আসছি—নির্মলা বললেন, কখন এলেন? আবার ডাক পড়ল। মুসলিমদের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনা হবে, তাতে উপস্থিত থাকার সুযোগ মিলল।

মুসলমানদের বাঁকা বাঁকা কথা, অযথা দাবি, অন্যায় সুযোগ নেওয়া দেখে সহ্যের সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। মনটা ভেতরে ভেতরে উদ্ধতভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে বলছিল, এ অসম্ভব—দুরূহ সাধনা, ওরা মিলবে না। গান্ধীজী

স্মিত হাসি, প্রসন্ন দৃষ্টি, হাতে চরখা চলছে আর Sayings of the Prophet থেকে দু-চারটে শ্লোক শোনাচ্ছেন, কোনও উষ্মা নেই, নৈরাশ্য নেই, উপস্থিত সমস্যা সমাধানের জন্ম আপাত-তুষ্টির মনোভাব নেই। এ শক্ত সুরকির গাঁথনি, ওপরের পালিশ নয়। ওঁর ওই স্নিগ্ধ শান্তি আমার মনকে ছুঁয়ে গেল, ছেয়ে গেল। ভাবলুম, এই তো পেলুম, সফর তো ঘটল আচম্বিতে। সকল আর্তি-অতৃপ্তিকে ছাপিয়ে শুভের সাধনা, ভালবাসার জোয়ার যেন মনের সকল মালিন্ত সকল তটভূমি সিক্ত ধৌত ক'রে দেয়। যেন এমন আন্তর-বিশ্বাসের অংশী হতে পারি—ওঁর ধৈর্য, সত্য বাক্য ও মানুষের মহত্বে বিশ্বাসকে নতি জানালুম।

আর এক অধ্যায় রচিত হ'ল। প্রার্থনাসভায় যাত্রাকালে পিছিয়ে ছিলুম ইচ্ছা ক'রে। নির্মলদা এগিয়ে চলার ডাক পাঠালেন। অনুভব করলুম, আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন গান্ধীজীর কাছে যাবার। উনি এতদিনে বুঝে নিয়েছেন, মেয়েদের কাছে এটা ব্রহ্মাস্ত্রবিশেষ। সন্ধ্যায় ফেরা হ'ল। নানান পাওয়ার মধ্যে হঠাৎ পেলুম নির্মলদাকে—এমন অপ্রত্যাশিত, অথচ এমন পরিপূর্ণ এ পাওয়া। সাধনদাও কত যত্ন করলেন, এসব অক্ষয় হয়ে মনের কোঠায় কোঠায় জমা রইল। একান্ত পরিচিতের মত পীড়াপীড়ি ক'রে ডাব কমলালেবু খাওয়ালেন, কাজ করার ছলে হালকা কাজে আটক রেখে রান্নাঘর থেকে সরিয়ে আনলেন। নিজে ইচ্ছেমত দিয়ে তৃপ্ত হওয়ার চেয়ে অপরকে ইচ্ছামত কাজ করতে দিয়ে তৃপ্তি দেওয়ার মত সহজবোধ আছে। বড় ভাল লাগল, এই তীক্ষ্ণধী দরদী মনটিকে।

বিছানা আনি নি, সংকোচ করছি, আর মনু, সাধনদা, অমৃতদা, নির্মলদা সবাই বলে, কম্বল দেব। হাসি এল। তৃপ্তিতে খুশিতে মনটা নত হয়ে পড়ল। এরা তো যাত্রী, নিজেরাই নিত্য নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলেছে। আমার মত রবাহূত তো কত আসে রোজ! আমিও তো বেশ কিছুদিন মুসাফিরি করছি। আমার জন্যে—আমার খাওয়া-শোওয়ার জন্যে কেউ যত্ন নেবে এ যেন দুঃস্বপ্ন। এত পাওয়া যেন অনভ্যাস হয়ে গেছে। কত যত্নে কত মমতায় আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হ'ল, আমার মাথার বালিশরূপে কাপড়ের পুঁটলি, গায়ে পশমী চাদর, মাথায় স্নেহস্পর্শ এসে পড়ল; কত মত ও পথের আলোচনার আলো দেখা দিল। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে পড়ল।

চারিদিকে দেখছিলুম তিক্ত সম্পর্ক, সন্দেহ, ভীরুতা ও মিথ্যাচরণ—অভাব, আত্মাবমাননা। মানুষ কত ইতর হয়েছে, কত ছোট হয়েছে। তার অবিরাম সংস্পর্শ মলিন ক'রে তুলেছিল। এখানে আবার মহৎ ছবি দেখলুম—দেখলুম অন্যের জন্য কল্পনা ও পেলুম অযাচিত প্রীতি। এ পাথেয়, এ স্মৃতি নিত্য জাগরূক ও অক্ষয় হয়ে থাক্‌, দুর্গম পথের সঞ্চয় হোক—এই কামনা ক'রে পরদিন ভোরে পানিয়ালা যাত্রা করলুম এই তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে

স্মৃতি-উৎস

বাড়িটার বাইরের কাঠামো ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ভিতরের কলমুখরতার কিছু সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছিলুম না। নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত গ্রাম পানিয়ালার একটি বাড়ি,—বাড়ি না ব'লে বাস্তুভিটা বলাই সমীচীন, কারণ মাটির পোতাগুলি, আশপাশের আধপোড়া খুঁটিগুলি আর রঙচটা দোমড়ানো টিনগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এখানে একদা বহুসংখ্যক ঘর ছিল। এমন ঘর ছিল, যেখানে মানুষ বংশপরম্পরায় বাস করেছে—সংসার পেতেছে, সঞ্চয় করেছে, নানা যত্ন দিয়ে ছোটখাট বস্তু দিয়ে ঘর সাজিয়েছে, মনের শখ মিটিয়েছে। এ সব ঘর ঘিরে কি মমতা, কি শান্তিময় আবহাওয়া ছিল! কোনও ঘরে পূজা-অর্চনা উৎসব-আয়োজন হয়েছে, কোনও ঘরে বাসর হয়েছে, কোনও ঘরে প্রসূতি নিবিড় স্নেহে সন্তানকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থেকেছে, কোনও ঘরে বৃদ্ধা পরম স্বস্তির সঙ্গে নিজ ভিটায় অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছে। এমনই নানা স্মৃতিজড়িত যে ঘর, তা আজ শ্মশানভূমি হয়ে গেছে।

পোড়া কাঠের টুকরো, পোড়া চালের চাক, সুপারির কয়লা, শিশিবোতলের দলাবাঁধা কাচ প্রভৃতি এখনও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিছুদিন আগে এসে দেখে গেছি, সবই অগোছালো, রিক্ত রুক্ষ অবহেলিত। সামনে নতুন বাঁধা এক চালার মধ্যে কংগ্রেস-কর্মীর আস্তানা। সারা বাড়িটা যেন চাপা কান্নার সুরে ভরা, থমথম করছে চতুর্দিক, আসন্ন ঝড়ের আগে প্রকৃতির মত নিস্তব্ধতার জমাট বিরাজমান। বাড়ির লোকেদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা কইতে সঙ্কোচ হয়, কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না, দুনিয়ার গতি সম্বন্ধে উদাসীন, নীরব কয়েকটি বিধবা একান্ত লক্ষ্যহীন অশ্রুহীন পাথরের মূর্তির মত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন—নির্বাক নিস্পৃহ। তাঁরা যেন এ জগতের কেউ না,

জগৎও যেন তাঁদের কাছে অপরিচিত অর্থহীন। একজনের চেহারা আমার মনে ছাপ ফেলল, যেন সর্বংসহা বিষাদপ্রতিমা—রূপ নেই, কিন্তু মহিমা আছে। তিনি যে শোকার্ত এর কিছু বাহ্য প্রকাশ নেই, পরিচ্ছন্ন বেশ, সংযত কেশ। অনুসন্ধানে জানলুম, এঁর একটি অতি সুপুরুষ সুস্বাস্থ্য সন্তানকে কেটে ফেলেছে, সত্তোবিধবা পুত্রবধূ ওঁরই পাশে দাঁড়িয়ে। অপর বয়স্কা বিধবাটির দুটি ছেলেকেই বলি হতে হয়েছে এই নারকীয় গোষ্ঠীপ্রেমের ব্যাপক অনুষ্ঠানে। সে কি মৃত্যু! একান্ত আপনার জনের মত যে পড়শী, সে ওদের ডেকেছিল। ওরা ভরা দুপুরে ভাত খাচ্ছে, তখন শান্তিসমিতি গঠনের আহ্বান এল। ওরা গ্রামের শক্তিমান যুবক, ওরা গ্রামকে বাঁচাতে ব্যগ্র ছিল, তাই আধ-খাওয়া ভাতের থালা ফেলে উঠল, বাড়ির সামনে পুকুরপাড়ে যে বহু শতাব্দীর পুরোনো প'ড়ো মন্দির আছে তেমাথা-পথে, সেদিকে ছুটল শুভার্থী মুসলমান বন্ধুর ডাকে। কদিনের হাঙ্গামায় ও উৎপীড়নে বাড়ির আবালবৃদ্ধবনিতা সশঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে আছে, তারা ধীরে কথা কয়, সভয়ে পা ফেলে। তবু অতর্কিতে মা আকুলভাবে উচ্চগ্রামে ব'লে উঠলেন, অবনি, কদিন খাওয়ার অব্যবস্থা চলছে, পাতের সাজানো ভাত ফেলে উঠিস নি, খেয়ে যা। ছেলে বললে, খাওয়া তো রইলই, আছেই, দেখি না এ নরককাণ্ডের যদি অবসান হয়, শান্তির পথ যদি মেলে।

কয়েক পা এগিয়েছিল ওরা, তারপর বিশ্বাসঘাতকের চকিত তরবারির আক্রমণে চিরশান্তির পথে লুটিয়ে পড়ল। ঘরে সেই অর্ধভুক্ত অন্নপাত্র সামনে নিয়ে তার মা কেমন ক'রে এ সংবাদ শুনেছিলেন, আমি জানি না। প্রতি দিন প্রতি গ্রাস অন্ন মুখে তুলতে তাঁর প্রাণ কত আকুল হয়, তারও পরিমাপ করতে পারি না। আমি ঠিক অবস্থাটা কল্পনা করতে পারছিলুম না, নিজের ক্ষেত্রে কি করতুম ভাবতে পারলুম না। কিছু সান্ত্বনা দিই নি। তখন আমার কান্না পায় নি। মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ জাগে নি, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই নি।

অবনির অনুজ পরিচয় করিয়ে জানালে যে, আমি বহুদূর-পথ হেঁটে এসেছি ব্রাহ্মমুহূর্তে, এখনও অভুক্ত, কিছু শ্রান্তও, তখন তিনি আমাকে ভিতরের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটা পিঁড়িতে বসালেন। কে যে কোথা থেকে কি করলে, দেখি, সামনে এক বাটি গরম দুধ, কমলালেবু, কলা, মুড়ি। কচিৎ শোনা যাচ্ছিল বুকফাটা একটা আক্ষেপ 'ওহো' আর গভীর দীর্ঘশ্বাস।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে জিজ্ঞেস করলুম, যে আপনার নিরপরাধ সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন, তার প্রতি প্রতিহিংসা অভিশাপ নেই আপনার?

বললেন, কি জানি মা, কিচ্ছু বুঝতে পারি না, ওসব কিচ্ছু মনে আসে না, যেন কোনও অনুভূতি নেই, আমার সোনার সংসার সোনার জীবন সব গেল। তখনও আমরা দুজনে অশ্রুহীন চোখে মুখোমুখি ব'সে আছি।

বললুম, এ সব শুনতে আপনার ভাল লাগবে না জানি, আপনার একান্ত প্রিয়জনের শোক আপনার নিজস্ব, সেখানে আমার মত নিঃসন্তান পথচারী মুসাফির মেয়ের পদক্ষেপ আপনার সইবে না, তবু গুরুর কাছে মন্ত্র পেয়েছি তাই বলি, যে বেদনায় আপনার ভাষা নেই, আপনার কাছে রঙে রসে ভরা পৃথিবী নিরর্থক হয়ে গেছে, আপনার মনপ্রাণ আছড়ে মরছে, সে দুঃখ আর কেউ পাক—এমন কামনা করবেন না। আপনার দাহ, আপনার শোক আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে, নিরানন্দ ক'রে দিয়েছে জগৎকে।

উঠে আসছিলুম, হাতে ধ'রে বললেন, আমার যা হবার হয়েছে, বুক বেঁধে মনে বুঝ দিয়ে চলেছি, তুমি না খেয়ে যেও না। বড্ড বেলায় তোমার শিবিরে পৌঁছবে যে। চকিতে বাড়ি-ঘর মা-বাবা স্নেহমায়া সব মনে প'ড়ে গেল, এঁর আতিথেয়তা কোথায় অন্তস্তলে নাড়া দিলে, চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল। কিছু মুখে দিতে পারলুম না, বললুম, মাপ করবেন, আজ যাই, আবার আসব, তখন খাব।

তুমি কেন খাবে না মা, আমি যে খাই। তুমি কেন কাঁদছ?—ব'লে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি একটাও স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করলুম না, চ'লে এলুম।

আজ আবার এসেছি। কর্মব্যস্ত বাড়ি। ছোট ছেলেমেয়ে, বউঝি, যুবকরা সবাই ব্যস্ত। ধনী পরিবার। সামনে এক নতুন চালা উঠেছে, আশপাশে কয়েকটা ঘর পুরোনো মালমসলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। মস্ত উঠোনে চাঁদোয়া টাঙানো। ঘরের ভিটি মেজে ছাঁচের বেড়া মেয়েরা লেপছে, মিস্ত্রি মজুর খাটছে। সেই নতুন ঘরে জানলায় নতুন পর্দা, ছাদের নীচে কাপড়ের আস্তরণ, মেটে মেঝেতে আলপনা, দুয়ারে মঙ্গলঘট, কলাগাছ।

চালবিহীন পোড়া ভিটায় স্তূপ-করা কুটনো, এক পাশে রান্নার আয়োজন, কি যেন এক উৎসবের সমারোহ, এদের যেন নেশায় পেয়েছে। অনেকদিনের

নিরুদ্ধ শক্তি যেন মুক্তি পেয়েছে, গুমরে-থাকা মন খুশির সুর শুনেছে। গান্ধীজী আসছেন একদিনের আতিথিরূপে। সঙ্গে দল আছে, প্রেস আছে, আর অনাহুত আছে আমার মত। ধন্য এ দেশের অতিথিপরায়ণতা!

কত লোক আসছে যাচ্ছে, কত স্বেচ্ছাসেবক খাটছে খাচ্ছে, কি কোলাহল ও ব্যস্ততা! শোকার্তা মা গান্ধীজীকে বরণ ক'রে তিলক দিতে রাজি হয়েছেন। ফুলে পাতায়, শাঁখে উলুতে, গানে সঙ্কীর্তনে জনারণ্যে মুখরিত সেই ঘরপোড়া, সন্তানহারা গৃহ। মনে পড়ল, 'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ'।

গান্ধীজী এখানে এসে রাজনীতি বা সমাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কি করেছেন, জানি না। শুধু জানি, যে মানুষ ঘরে উপুড় হয়ে কাঁদত, সে আজ মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়িয়েছে। যে গৃহ শোকে দাহে ম্রিয়মাণ ছিল, আজ সেখানে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে, সেখানে আলো, গান, প্রীতি, তৃপ্তি, তীর্থযানের লোকারণ্য ও শ্রদ্ধানতি। শ্বাসরোধী আবহাওয়া স'রে গিয়ে নতুন উৎসাহের চাঞ্চল্যের বিকাশ, অবিশ্বাস, হিংসা ও শঙ্কার পরিবর্তে হৃদয়ের আদানপ্রদান। ঝিমিয়ে-পড়া মুহ্যমান গ্রামে আজ প্রকাণ্ড হিন্দু-মুসলিম জনতা, আবার ঘরের বউ ঘোমটা টেনে পথঘাটমাঠে চলছে। ক্ষণিকের জন্য প্রাণপ্রতিষ্ঠার আয়োজন ও অনুষ্ঠান। মুক্তিমন্ত্র শক্তিমন্ত্র আবার উচ্চারিত হচ্ছে। "কেটে যায় মেঘ নির্মল নভে হেরি চির অমলিন মুক্তির রূপখানি।"

আমিও ঘোরাফেরা করছি, একটি ক্ষীণ দুঃখের রেশ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে জড়িয়েই রইল।

হয়তো দল বেঁধে কলরব করতে করতে স্নান ক'রে ফিরছি বা খাচ্ছি, হয়তো কোনও রসিকতায় হাসির রোল তুলছি, অমনই মনে হয়, পুত্রহারা মায়ের কানে এ সব বেসুরো ঠেকছে নাকি? এই আলো মালা ফুল গান হাসি ভোজ—এই উৎসব? তাঁর প্রাণটা হাহাকার করছে নাকি? বড্ড বেশি দাম দিয়ে এই দিনটি তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে আজ যুগের তাপস ঘরে অতিথি, তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কাহিনী শুনছেন ও ভাগ নিচ্ছেন। যাকে ঘিরে এ সমারোহ সে আজ কোথায় কোন্ লোকে? তার কি কোনও নালিশ নেই? সে কি বাতাসে এ খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে না, ওগো, আমার অকাল মরণকে উপলক্ষ্য ক'রে তোমরা আজ মত্তমুখর, কিন্তু আমি

যে তার কিছু ভোগ করতে পেলুম না—আমার স্মরণে আজ তোমরা অর্ঘ্য দিচ্ছ অপরকে, আমি জীবনে-মরণে সর্বক্ষেত্রেই বঞ্চিত হলুম।

আমি যেন স্পষ্ট এ নালিশ শুনতে পেলুম, ভাবলুম, মার প্রাণ এ সব সইছে কেমন ক'রে! কে বড়—গান্ধীজী, না সন্তান? পুত্রের প্রাণ, না শোচনীয় মৃত্যু-বিনিময়ে এই মহাপুরুষসান্নিধ্য, কোন্‌টা কাম্য?

"মুসাফির"

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদার ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি কোথায় আছেন বা কেমন আছেন—এই প্রশ্নের জবাব আমরা কাহাকেও দিতে পারিব না। তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন। তবে বন্ধুজনের অবগতির জন্য এটুকু আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি ছাতে ইটকখণ্ড দূরের কথা, ছাতার বাঁটটি পর্যন্ত ঘরে রাখেন না; খাঁটি কান্‌ট্রি-মেড বোমা বা বন্দুক কখনও স্পর্শ করেন নাই; অ্যাসিড যেটুকু তাঁহার উদরে আছে তাহার অধিক কখনও সংগ্রহ করেন নাই; ছোরা ভোজালি বা কাটারি তো নয়ই, পেন-নাইফটি পর্যন্ত অহিংসা-মন্ত্রবশে বর্জন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ইত্যাদি কারণে গা-ঢাকা দেন নাই। যাহা হউক, গোপালদার রোজনামচাটি সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।—

১৯৪৭, ২৩ মার্চ। আবার বাধিল বুঝি ওই রে,
কান পেতে শুনি রাতে ফিস ফিস ছাতে ছাতে,
দূরে কোথা ওঠে হৈ-হৈ রে।
চোখ চেয়ে দেখি আরও বাঁধা ঘর পোড়ে কারও
দুম্ দাম্ ফোটে বম্ কত রে,
কাহার কপাল পোড়ে বেঁচে গেল কারা ম'রে—
খবরেতে—ছুটি হতাহত যে।
আবার লাগিল বুঝি ওই রে,
প্রধান মন্ত্রীবর, কোথায় তোমার দাদা,
লম্বা বচন সব কই রে!

কি তোমার মনে আছে শেষ-মেষ জানি না,
আমরা নিরীহ বড় দল বাঁধা জানি না,
শুধু ভাগ্যের পাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে
প'ড়ে প'ড়ে যত মার সই রে।

২৭ মার্চ। শূন্য আকাশে জলে ও স্থলে প্রেমের হয়েছে মরণ হেথা
হিংসার বিষ ছড়িয়ে পড়ে, লোভ বাড়িয়াছে সর্বনাশা,
ভীরু নর ভাসে নয়নজলে প্রগতির যুগে আদিম কেতা,
পিশাচ মানুষ অস্ত্র ধরে। ওরে কবি, কোথা বাঁধবি বাসা?

২৮ মার্চ। এক সাথে করি বাস সহস্র বৎসর,
লালন করেছে দুইয়ে এক জল-মাটি,
পরস্পরেতে ছিল একান্ত নির্ভর,
আজ করি পরস্পর গলা-কাটাকাটি।
প্রেম-ভালবাসা আর সভ্যতা-সংস্কার
এক ফুঁয়ে হ'ল লোপ, স্বার্থের নিশ্বাসে;
ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব—কি যে মর্ম তার
আজ ঠেকিয়াছে এসে শুধু বহির্বাসে।
ভারতের পুণ্যমাটি—হিন্দু ও ইসলাম,
ধুতি-লুঙ্গি-ভেদে এক মৃত্যু পরিণাম।

২৯ মার্চ। মানুষে করিয়া বন্দী আপন কোটরে
কর্তৃপক্ষ ছুটিতেছে মোটরে মোটরে।
পুলিস বন্দুক হাতে খাড়া মোড়ে মোড়ে,
যারা মরিবার যায় শ্মশানে বা গোরে।
রক্ষক ভক্ষক যেথা দস্যু দ্বারপাল,
আইন-শৃঙ্খলা সেথা নিরীহের কাল!

১ এপ্রিল। শান্তির দেবতা জাগো, জাগো খ্রীষ্ট, জাগো শাক্যমুনি,
জাগো, মহাবীর, জাগো হিংসার এ বীভৎস আহবে;
মানুষের জনপদে শ্বাপদের আস্ফালন শুনি
প্রচারিলে যা তোমরা অকস্মাৎ ভুলেছে তা সবে।
তোমাদের মহাবাণী ভারতে কি হ'ল অর্থহীন,
মিথ্যা হ'ল তোমাদের সর্বত্যাগী মহৎ জীবন?

সংশয় জাগিছে মনে শোণিতাক্ত যত যায় দিন,
তোমাদের স্মরণে তো ভয়হীন হয় নাকো মন।

১২ এপ্রিল। হায় হায় হায়, হ'ল কি এ স্বখ্যিমামার বুক জুড়ে,
দাগ পড়েছে কলঙ্কেরি পষ্ট দেখি রোদ্দুরে।
ফাঁস হয়েছে জারিজুরি কেলেঙ্কারির অন্ত নেই,
তর্ক বেধে শেষাশেষি হাত পা কারো দন্ত নেই।
কেউ বলছে, সূর্যে ওটা উড়ছে কেতন কংগ্রেসী,
চোপ রহ উহ্ লীগ ঝাণ্ডা, সেই জেতে যার দম বেশি।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তারো সূর্য হ'ল কারণ তো,
হঠাৎ দেখি পোড়া দেশের ময়দা চিনি বাড়ন্ত।

১লা এপ্রিলের সংশয় কিন্তু ১লা বৈশাখে কাটিয়া গিয়াছে, কারণ দেখিতেছি—

১৫ এপ্রিল (১ বৈশাখ)। নব বরষের কি গান গাহিবে কবি ?
রক্ত আখরে যে গান হতেছে লিখা,
হিংসার রঙে আঁকা যে হতেছে ছবি,
জানি একদিন মিলাবে সে মরীচিকা,
তবু আজ তাই ধরিছে কণ্ঠ চেপে
শোণিত-প্রবাহ উথলে নয়ন ব্যেপে
স্তম্ভিত মনে যে বাণী উঠিছে কেঁপে
মহাকাল-বুকে সে তো নহে দীপশিখা।

ধর্মের নামে স্বার্থেরে করি বড়
ভক্ত মানুষে পশু করিয়াছে যারা,
তারা খুঁজে পাবে সত্য বৃহত্তর,
তারা চিরদিন রবে না পাগলপারা।
শুধু অকারণ নর-প্রাণ হয় বলি,
অন্ধ জনেরে ভুটে যেতেছে ছলি
জনপদ হ'ল ভীষণ বনস্থলী
থাহু নদীজলে মিলিছে রক্তধারা!

কত ভাগাভাগি হয়েছে এ ধরণীতে
কত রেষারেষি দলে ও সম্প্রদায়ে,
কেহ বেঁচে নাই সেই পরিচয় দিতে ;
কত সীমান্ত ভেঙেছে কালের ঘায়ে !
পাগল মানুষ পড়ে নাকো ইতিহাস
তাই সে জাগাতে চাহে ক্ষণিকের ত্রাস,
অমর আত্মা নহে কারো ক্রীতদাস
ধর্ম তাহার টলে না ডাহিনে-বাঁয়ে।
সে তো জানিয়াছে, খণ্ডকালের পারে
উদার দৃষ্টি আজ যাহাদের পড়ে,
তারা ভীত নয় ভ্রান্তের হুঙ্কারে,
নীলাকাশে তারা ভোলে না বোশেখী ঝড়ে।
কত মেঘ এল কত মেঘ গেল কেটে,
স্বার্থ এবং দম্ভ পড়িল ফেটে ;
পঙ্কজ কত মিলিল পঙ্ক ঘেঁটে
তারা আজ শুধু তাহারি হিসাব করে।
জগৎ জুড়িয়া চলিতেছে হানাহানি
আমরা শুধুই রাখি তার সন্ধান,
মৃত্যুর মাঝে কত অমৃতের বাণী
উঠিছে নিত্য শুনি না পাতিয়া কান।
ভীষণের ভয়ে সুন্দরে যাই ভুলে
অশোক-মন্ত্র পশে না কর্ণমূলে
কাঁটার আঘাতে দেখিতে পাই না ফুলে
আর্ত্ত নিনাদ ঢাকে যে প্রেমের গান
ওরে কবি, তুই বৃথা পেয়েছিস ভয়,
ঝড়ের ঊর্ধ্বে গেয়ে যা আপন সুর,
পিছে চেয়ে দেখ, ঘুচে যাবে সংশয়,
কে রহিল আর কাহারা হইল দূর !
ধর্মের নামে যারা অমূল্য প্রাণ
দেয় ভ্রান্তের নির্দেশে বলিদান

তাহাদের কানে শোনা মিলনের গান,
বিশ্বভুবন প্রেমে হোক পরিপূর।

* * *

১৮ এপ্রিল তারিখের পাতায় দেখিতেছি, গোপালদা কৌশলে এ দিনের সর্বাপেক্ষা জলন্ত প্রশ্ন" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।—

১৮ এপ্রিল। বালির উপরে ঘর বেঁধেছিনু আমরা সবে,
সে বালিয়া আজ জোট বেঁধে গেছে বিষম ভেতে
বালির সঙ্গে গরম হইয়া ল'ড়ে কি হবে?
সাবধানীদের বুদ্ধি বলিছে সরিয়া যেতে।
এ বালুবেলায় বহুদিন ছিল মোদের ঘর,
ছেড়ে যেতে তাই প্রাণে বিঁধিতেছে কঠিন শর।

—

বাংলা দেশের ভয়াবহ ও লজ্জাকর দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তজ্জনিত আমাদের বিবিধ তমোময় দুর্গতির মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁহার 'কাব্যালোক' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য কাব্যদর্শন ও কাব্যতত্ত্বে সমন্বয়সাধনের প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছেন, সমগ্র ও ব্যাপক ভাবে এই বিষয়ের সকল দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; ইতিহাস ও সংজ্ঞা, তত্ত্ববিচার ও মূল্যবিশ্লেষণ, রস ও ভাব, ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি, বস্তু ও বিভাব, শব্দ ও অর্থ—সব কিছু লইয়াই বিশদ বিচার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের বিরাট প্রথম খণ্ডে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের রূপ ও শক্তি সম্পর্কীয় আলোচনার দ্বারা তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইবে। তিনি পূর্ব-সূরিগণের মতামত বিনাবিচারে গ্রহণ করেন নাই। প্রয়োজনস্থলে নূতন সংজ্ঞা ও তাৎপর্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারা কাব্যজগতে নূতন আলোকপাত করিবে।

* * *

ডক্টর দাশগুপ্তের একটি উক্তি আমাদের বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সমাধানে সহায়ক হইবে। তিনি বলিতেছেন, "কঃ পন্থা—প্রশ্ন হইলে উত্তর হইবে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজন শব্দের অর্থ মহান্ জন বা মহাপুরুষ নহে, বহুজন বা অনেক পুরুষ। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ কালক্রমাগত প্রাচীন ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, 'বহুজনসম্মত এব মার্গমনুসরেৎ'—বহুজনসম্মত পথই অনুসরণ করিবে। নৈকো ধর্মিষ্ঠ

মতং ন ভিন্নং'—একটি ঋষিও নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে, এই উক্তি পূর্বে থাকায় প্রসঙ্গবলেই মহাজন অর্থ মহান্ জন বা ঋষিজন হইতে পারে না। মহাজন অর্থাৎ বহুজন বা বহুতর জন যে পথে চলেন, তাহাই অনুসরণীয় পন্থা।"
গত সংখ্যায় আমরা বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে ধীরে ধীরে যুক্তি গজাইবার কথা লিখিয়াছিলাম। গুচ্ছেক যুক্তির প্রয়োজন নাই, এই একটি যুক্তিই মোক্ষম—মহাজনের যুক্তি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' "গেলাপ পোলে"র আশ্রয়ে এই মহাজনকেই অনুসরণ করিতেছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হঠাৎ মত-পরিবর্তনের দ্বারা মহাজনেরই দ্বারস্থ হইয়াছেন, সুতরাং আমরাও হইতেছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, আই.এন.এ.সি., প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এবং বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ ও ভারতের বাহিরের অসংখ্য সভাসমিতি মহাজনবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন; 'মডার্ন রিভিউ', 'প্রবাসী, 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', সাপ্তাহিক 'দেশ', দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'যুগান্তর', 'ভারত', 'ঈস্টার্ন এক্সপ্রেস', 'কৃষক', 'ন্যাশনালিস্ট', 'অ্যাডভান্স' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য যাবতীয় পত্রিকা বিবিধ সুযুক্তি ও কুযুক্তির সাহায্যে বঙ্গভঙ্গকে একটা অনিবার্য ঘটনায় পরিণত করিতে চলিয়াছেন। মহাজন-বন্যায় মহাপুরুষরাও ইন্দ্রের ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইতেছেন, ভাসিয়া যাইতেছেন শরৎচন্দ্র বসু, অখিলচন্দ্র দত্ত, হসন্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ('সোনার বাংলা', ১৩৫৩ ২১, ২৪ ও ২৭ সংখ্যা), সত্যেন্দ্র মজুমদার ('অরণি', ষষ্ঠ বর্ষ, ৩১সংখ্যা), 'স্বরাজ' প্রভৃতি। তাঁহাদের যুক্তি হয়তো আছে এবং ভাল ভাল যুক্তিই আছে। তবু মহাজনকে মানিতে হইবে বইকি। যুগে যুগে এই মহাজনী-মনোবৃত্তি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং এবারেও সম্ভবত করিবে।

* * *

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমরা ইহা চাহি নাই, পরাজয়ের লজ্জা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জাই পাইয়াছিলাম। আমরা আশা করিয়াছিলাম, অখণ্ড বাংলার প্রেমে পড়িয়া বাংলার লীগনায়কেরা তাঁহাদের সামরিক কৌশল পরিবর্তন করিবেন, তাঁহারা অন্তত রহিয়া-সহিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে তিলে তিলে আমাদিগকে হজম করিবেন এবং আমরাও তাঁহাদের সলিল আকর্ষণে জড়ভরতের মত হইয়া গিয়া ধীরে ধীরে নিঃসাড়ে আত্মসমর্পণ করিব। কিন্তু তাঁহাদের তর সহিল না। অকস্মাৎ ক্ষমতা পাইয়া প্রথমেই নির্লজ্জ রাক্ষসে রূপ প্রকট করিয়া বসিল, ফলে শিকার সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং অরণ্যভূমিতে

দেওয়াল তুলিতে চাহিতেছে। দেওয়াল তোলার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি আছে, তাহার কয়েকটি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মুজঃফরপুর হইতে একটি পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহার চিঠিটি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"পুনরায় বঙ্গবিভাগ লইয়া যে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে, ফাল্গুনের সংখ্যায় আপনি জানাইয়াছেন যে, আগামী বারে ঐ বিষয় লইয়া বিস্তৃততর আলোচনা করিবেন। এই আন্দোলনটির কি নাম দিবেন, ইহা লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছেন। আমি রহস্য করিয়া বলিতে চাই, ইহার নাম দেওয়া উচিত 'চাচা আপন বাঁচা'।

আমি বহুকাল, প্রায় ৪৩ বৎসর, বিহারে প্রবাসী; কিন্তু আমার নিবাস পূর্ববঙ্গে—বরিশালে। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনের আমি পক্ষপাতী নহি। আপনি যখন বিষয়টি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিবেন, তখন আমার কয়েকটি কথা দয়া করিয়া বিবেচনা করিলে অনুগৃহীত হইব।

একটা কথা আছে 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। এই বাক্য অনুসরণ করিয়াই বোধ করি পশ্চিমবঙ্গের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন লোক পুনরায় বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী হইয়াছেন। সম্প্রতি মুসলিম লীগের শাসনাধীনে সমগ্র বাংলার হিন্দুদিগের যারপরনাই অসুবিধা হইতেছে এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও সুবিধা ছাড়াও বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি ও প্রসারেও বাধা প্রদান করা হইতেছে। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলনের আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু বাংলাকে আবার দু-ভাগ করিয়া এক ভাগে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই কি সমগ্র বাঙালীর কল্যাণ সাধিত হইবে? বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১২টি জিলা লইয়া একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু সেই প্রদেশেও প্রায় ৮০ লক্ষ মুসলমান রহিয়া যাইবে এবং তাহারা দুষ্টলোকের উস্কানিতে বহুকাল ধরিয়া উৎপাত করিতে থাকিবে। আবার উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে প্রায় এক কোটি হিন্দু থাকিয়া যাইবে, ইহার মধ্যে অনুমানিক ৯০ লক্ষ থাকে পল্লী অঞ্চলে। ইহাদের অতলে তলাইয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুরা নূতন বাংলা গঠন করিয়া কি সুখী হইবেন? পূর্ববঙ্গের এই পল্লী অঞ্চল-বাসী হিন্দুদের বলপ্রয়োগে মুসলমান করিতে আরম্ভ করিলে পশ্চিমবঙ্গের গভর্মেন্ট তাহার কি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন? তাঁহারা তো পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ৮০ লক্ষ মুসলমানকে 'হিন্দু' করিয়া লইয়া প্রতিশোধ লইতে

পারিবেন না। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের রক্ষা করিবার আর কি উপায় আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কোন নেতাই স্পষ্ট করিয়া সে বিষয়ে কিছু বলেন নাই।

আপনি যদি পূর্ববঙ্গবিভাগ সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার আর একটি প্রস্তাবও শুনিয়া রাখুন। জনসংখ্যা-বিনিময় করিয়া একটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ গঠন সম্ভব হইতে পারে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড' বইখানি হইতে আমি জনসংখ্যার অঙ্ক উদ্ধৃত করিলাম। যদি বাংলাকে দুই ভাগ করিতেই হয়, তাহা হইলে উভয় অংশের মধ্যবর্তী সীমারেখাও এমন হওয়া উচিত, যাহা দ্বারা উভয় অংশ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। যদি গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার জলস্রোতের মধ্যরেখা সীমান্ত করা হয়, তাহা হইলে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১২টি জিলার সঙ্গে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলাও নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গেও ১৪টি জিলা ও পূর্ববঙ্গেও ১৪টি জিলা থাকিতে পারে। কিন্তু প্রদেশ দুইটির বিস্তৃতি কম-বেশি হইবে। ঐ সীমারেখা মানিয়া লইলে পশ্চিমবঙ্গে থাকিবে ৩৭,১৪১ বর্গমাইল স্থান, আর জনসংখ্যা হইবে—হিন্দু ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭০ হাজার ২৬৯, মুসলমান ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ২১৭। আর পূর্ববঙ্গে থাকিবে ৪০,৬০১ বর্গমাইল স্থান, জনসংখ্যা হইবে—হিন্দু ৮০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৪৩, মুসলমান ২ কোটি ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ২১৭। এখন নব পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ১ কোটি ১৫ লক্ষ মুসলমান অধিবাসীদের পূর্ববঙ্গে পাঠাইয়া, নবগঠিত পূর্ববঙ্গ হইতে ৮০ লক্ষ ৮৬ হাজার হিন্দু অধিবাসীদের পশ্চিমবঙ্গে লইয়া আসিতে হইবে। এই বিপুল জনসংখ্যা-বিনিময় কষ্টসাধ্য হইলেও অসম্ভব নয়। কেন না, সম্প্রতি মধ্য-ইউরোপে এইরূপ জনসংখ্যা-বিনিময় দ্বারা দুই কোটি লোক লইয়া নাড়া-চাড়া করানো হইতেছে। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে জার্মান ও হাঙ্গেরীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ করা হইতেছে। ইহাদের জনসংখ্যা দুই কোটি হইবে। ফেব্রুয়ারি মাসের 'মর্ডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ১৬১ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এ জনসংখ্যা-বিনিময় বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিতে বহু লোকের দুঃখদুর্দশার সীমা থাকিবে না। তথাপি নিত্য কলহ, নিত্য আতঙ্কের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত এ দুঃখকে বরণ করিতে অনেকে স্বীকৃত হইতে

পারেন। বিচ্যুত মুসলমান অধিবাসীদের বাসস্থান ও কৃষিক্ষেত্রে নবাগত হিন্দু কৃষকদের স্থান হইতে পারে; কিন্তু ভূমিশূন্য যে সকল হিন্দু নিজ নিজ অঞ্চলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যবসায়াদি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত, তাহাদের অর্থোপার্জনের নূতন উপায় করিয়া দেওয়া কতদূর সম্ভব হইবে, নেতৃস্থানীয়গণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বঙ্গবিভাগের সমর্থনকারীগণ যদি এই জনসংখ্যা-বিনিময় করিয়া হিন্দু-বাংলা গঠন করিতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে এই আন্দোলনের নাম দেওয়া উচিত হইবে—'চাচা আপন বাঁচা'।

আর একটা কথা ভাবিবার আছে। কালক্রমে কোন দেশেই ধর্মগত বা ধনগত শ্রেণীবিভাগ থাকিবে না। সাম্যবাদের প্রসারতা বললাভ করিতেছে। যতদিন এই যুক্তিহীন শ্রেণীবিভাগ সমাজ হইতে নির্মূল হইয়া না যায়, ততদিন আমাদের বাঙালী হিন্দুদের কিছু কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে। বলিলে অন্যায় হইবে না যে, ইহা হইবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত। হিন্দুসমাজের যুক্তিহীন প্রথার ফলেই বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা হিন্দুরা এতদিন তাহাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করিয়া আসি নাই। সুতরাং যাহাদের অবজ্ঞা করিয়া দূরে রাখিতাম, তাহারা যদি আজ মারধোর করে, তাহা আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু মুসলমান ভাইদের অধিকাংশই শান্তিপ্রিয়। কুলোকের কুকথায় উত্তেজিত হইয়া অনেকে অত্যাচার অনাচার উৎপীড়ন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও তাহারা আজ শক্তিশালী, কিন্তু এই শক্তির পশ্চাতের পৃষ্ঠপোষকতা অপসারিত হইতেছে। হিন্দুরা যদি যথার্থ সংঘবদ্ধ হইয়া এই অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে পারেন, তাহা হইলে কুকর্মীদের দুচেষ্টা সংযত হইবে। অতীতে যে বাঙালীরা আন্দোলন করিয়া বঙ্গবিভাগের পাপ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা আবার কৃতসঙ্কল্প হইলে বর্তমান অত্যাচার ও অন্যায়েরও প্রতিবিধান করিতে পারিবে। পরাজয়-মনোভাব জাতির পক্ষে দুর্বলতা। আপনি এই বিষয়টি লইয়া লিখিতে থাকুন, দেশের লোকের মনে সাহস ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিবে।"

* * *

আমাদের বিপদের অন্ত নাই। স্থান ত্যাগের দ্বারা যাঁহাদিগকে আমরা এড়াইতে চাহিতেছি, তাঁহাদেরও কেহ কেহ আমাদের স্বরূপ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং আমরা শেষাশেষি যাঁহাদের আশ্রয় লইব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাঁহাদের

সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব অনাবিলভাবে মধুর নহে। অর্থাৎ আমরা যে পক্ষেই যাই, আমাদিগকে সযত্নে রাশ টানিয়া চলিতে হইবে। এ পক্ষের স্বরূপ বোঝার স্বরূপটা চৈত্রের 'মাসিক মোহাম্মদী' হইতে ধরিতে পারিতেছি। যে পক্ষে শেষাশেষি যাইব, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব বন্ধুবর "বেতালভট্ট" 'শনিবারের চিঠি'তে প্রেরিত একটি নিবন্ধে প্রকট করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে তাঁহার 'তোমরা ও আমরা' নিবন্ধটি "সংবাদ-সাহিত্যে"রই অন্তর্ভুক্ত করিলাম। আশা করি, যাঁহারা "বঙ্গভঙ্গ" অথবা "বঙ্গরক্ষা" অথবা "সুবঙ্গ-লবঙ্গ" অথবা "দ্বিবঙ্গ" অথবা "চাচা আপন বাঁচা" আন্দোলন করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা এই উভয় পক্ষেরই কথা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পেঁয়াজের গন্ধ বাঁচাইতে গিয়া আমরা না ছাতু হইয়া যাই!

ওরা ও আমরা

"ওরা ওরাই এবং আমরাও আমরা। ওরা ও আমরা মিলে এদেশের তা'রা হবো না। ওরাও ওরা থাকবে আমরাও আমরা থাকবো। ওদের থাকবে স্বতন্ত্র বাস-ভূমি, আমাদেরও থাকবে তাই। ওদের দৃষ্টি পরকালমুখী। তাই লড়তে জানেনি মার খেতে জেনেছে শুধু। এসেছে গ্রীকেরা। এলো শকহুন দল। সবাই ওদের মেরেছে আর জয় করেছে। ওদের উপর অধিকারও বিস্তার করেছে কিন্তু কালে কালে বাইরের আর সব ভুলেছে তাদের ধর্মস্বভাব ও জাতীয়তা। কিন্তু আমরা ওরা হোলাম না। হবো কি কোরে এবং কেনই বা? আমার যদি অভাব থাকে কিছুতে তাহোলেই তো সেই অভাব মোচন করবার জন্ত ছুট্‌বো সেদিকে। অভাবইতো ছিল না আমাদের। সর্বোপরি ছিল এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, বেশীতে নয়। কেননা বেশীকে সন্তুষ্ট করা যায় না। বেশীর ধারাতে চালিত হওয়াও মুস্কিল। আমার সামনে এমন পরিপূর্ণ আদর্শ থাকতে আমি আর ও হলাম না। আমরা আমরা রয়ে গেলাম। ভেবে দেখ ওরা আমরা মিলে এ ভারতভূমির এক তা'রা হবো কি কোরে? ওরা উপাসনা করে বহুকে আমরা করি একের। ওরা পূর্বদিকে আমরা পশ্চিমে। তা-ই নয়, ওদের সবদিকেই চলে আমাদের একদিকে। ওদের বহু দেবতা। চাঁদ-সুরুজ আর গ্রহতারা, জীবজন্তু আর পশু-পাখী, কীটপতঙ্গ

শিলা আর পাষাণে ওদের ভক্তি। অশ্বথ গাছ আর তুলসীতে ওদের মুক্তি। গরু ওরা পূজো করে আমরা খাই। গোবর ওদের পবিত্র ভক্ষ্য আমাদের কাছে বিষ্ঠা বলে ঘৃণার্হ। কায়েদে আজম আমাদের প্রিয় গণনেতা; অদ্ভুত তাঁর কর্মদক্ষতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধি, জ্ঞানগভীর তাঁর সুক্ষ্মদৃষ্টি। তার্কিক ও নৈয়ায়িক তিনি কিন্তু অবতার গান্ধী তিনি নন। তাঁকে শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি কিন্তু মহাত্মা বলে পূজা করি না। অদৃষ্টের পরিহাস ওরা ও আমরা একই দেশে বাস করি। শুধু দেশে নয় এপাড়া ও ওপাড়ায়। বাসভূমিতে তাও এ ব্যবধানটুকু যে সম্ভব হোল তাও তো সাম্প্রতিক, ওদের ও আমাদের নব-যজ্ঞের ফলে। নইলে এক পাড়া গড়ে' উঠেছে সেও ওকে আর আমাকে নিয়ে। আমার বাড়ির পাশে ও বাস করছে ওর পাশে আমি। আমার দরজা থেকে দেখছি ওর বাড়ির অলিন্দ। ওর বাড়ির ছাদে লেগেছে আমার বাড়ির হাওয়া। এমনি বাস কোরে আসছি যুগাতীত কাল থেকে। তবু মিশলাম না ওতে ও আমাতে। ওদের ও আমাদের কর্ত্তব্য হবে আপন বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রেখে এগিয়ে চলা। এতদিনের এ ব্যবধান পরস্পরের কাছে পরস্পরকে দিল পরিষ্কার কোরে ওতে আমাতে এক হওয়া অসম্ভব যেমন তেল আর পানি তেমনি ওরা ওরাই থাকুক যেখানে বেশী সেখানে আপন আবাসভূমি নানান দিক থেকে রচনা করার অধিকার নিয়ে আমরাও আমরা থাকতে চাই আমরা যেখানে বেশী সেই আবাসভূমিকে আপন প্রয়োজনে উপযোগী কোরে গড়ে' তুলে।"

তোমরা ও আমরা

"তোমরা ও আমরা বিভিন্ন; তোমরা তোমরা, আমরা আমরা।"

তোমাদের বাস উত্তর-ভারতে, আমাদের বাস পূর্ব-ভারতে। তোমরা ভারতের আর্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী, আমরা ভারতের অনার্য সভ্যতার পূর্বাধিকারী। তোমরা মনে প্রাণে হিন্দু, তোমাদের দেশ হচ্ছে হিন্দুস্থান; আমরা শুধু নামেই হিন্দু, তাই আমাদের দেশ হতে যাচ্ছে পাকিস্তান।

তোমরা মেড়ুয়াবাদী বা মেড়ো, তোমাদের স্বভাব হ'ল মেড়ার মত গোঁয়ার; আমরা ভেড়ুয়া-বাদী বা ভেড়ো, আমাদের স্বভাব হ'ল ভেড়ার মত নিরীহ। তোমরা জান শিং উচিয়ে গুঁতুতে, আমরা জানি গলা চড়িয়ে

চ্যাচাতে। তোমাদের ভাই-বেরাদরে গলাগলি, আমাদের ভায়ে ভায়ে দলাদলি। ভাবাবেগে তোমরা হও উন্মাদ, আমরা হই অজ্ঞান। তোমাদের ধরে নেশা, আমাদের ধরে দশা।

তোমরা দোহারা রুক্ষ-মূর্তি, আমরা একহারা সূক্ষ্ম-মূর্তি। তোমাদের মাথায় টুপি কিংবা পাগড়ি, আমাদের মাথায় টেরি কিংবা টাক। তোমরা খাও শুখা খৈনি, আমরা খাই ভাজা দোক্তা। তোমাদের মুখে দাঁতন, আমাদের মুখে ছাই (ঘুঁটের)। তোমরা আঁখে দাও সুর্মা, আমরা চোখে দিই কাজল। তোমাদের আঁট কোর্তা, আমাদের ঢিলে পাঞ্জাবি। তোমাদের কাছা খাটো, আমাদের কোঁচা লম্বা। তোমরা পর নাগরা, আমরা পরি চটি।

তোমরা গম পিষে রুটি বানাও, আমরা চাল কুটে পিঠে খাই। তোমরা খাও আলো-চাল, আমরা খাই সিদ্ধ-চাল (আমরা চালেই সিদ্ধ)। তোমরা ফেন মেরে ভাত খাও, আমরা ফেন ফেলে ভাত খাই। তোমরা অসুখ হ'লে খিচুড়ি খাও, আমরা ফুর্তি করি খিচুড়ি খেয়ে। তোমরা চাও লাল আটা, আমরা চাই সাদা ময়দা। তোমাদের রুচি ডাল-রুটিতে, আমাদের রুচি মাছ-ভাতে। মাছ খেলে তোমাদের নিয়ম ভঙ্গ হয়, আর মাছ খেয়ে আমরা নিয়ম রক্ষা করি। তোমাদের টাকনা হ'ল আচার, আমাদের টাকনা হ'ল অম্বল। তোমরা খাও পেঁড়া, আমরা খাই সন্দেশ। তোমাদের জলপান ছাতু আর লঙ্কা, আমাদের জলপান মুড়ি আর গুড়। রান্নায় তোমাদের চাই ভয়সা ঘি, আমাদের চাই সরষের তেল। তোমাদের নেশা ভাঙ, আমাদের নেশা চা।

তোমাদের মাটি কাঁকর, আমাদের মাটি কাদা। তোমাদের ভয় গ্রীষ্মকে, আমাদের ভয় বর্ষাকে। তোমাদের ধরে প্লেগ, আমাদের ধরে ম্যালেরিয়া। তোমাদের শত্রু মাছি, আমাদের শত্রু মশা।

ছুটির দিনে তোমরা মার পাখি, আমরা ধরি মাছ (না ছুঁই পানি)। তোমরা কর হরিণ-শিকার, আমরা দিই পাঁঠা-বলি।

তোমাদের দেওয়ালি, আমাদের দুর্গোৎসব। তোমরা বাজাও ঢোল, আমরা বাজাই (শ্রী)খোল। তোমাদের ভজন, আমাদের কীর্তন। তোমাদের গ্রুপদ খেয়াল, আমাদের ভাটিয়ালি রামপ্রসাদী। তোমাদের ঠুংরি, আমাদের টপ্পা। তোমাদের বাই-নাচ, আমাদের খেমটা-নাচ। তোমাদের দেবমন্দিরে পূজায় নটীর স্থান আছে, আমাদের শিক্ষামন্দিরে 'নটীর পূজা'র ব্যবস্থা আছে।

তোমরা প্রচার করেছ খদ্দর, আমরা প্রচার করেছি মসলিন। তোমরা

নক্সা তোল শালে, আমরা নক্সা তুলি কাঁথায়। রসিকতায় তোমাদের আদর্শ বীরবল, আমাদের আদর্শ গোপাল ভাঁড়।

সংস্কৃতে তোমরা লিখেছ মেঘদূত, আমরা লিখেছি গীতগোবিন্দ। তোমাদের বৈদর্ভী রীতি, আমাদের গৌড়ী রীতি। তোমরা পড় পাণিনি, আমরা পড়ি মুগ্ধবোধ। তোমাদের রচনা (বাল্মীকির) রামায়ণ, আমাদের রচনা (সন্ধ্যাকরের) রামচরিত।

তোমাদের ভাষায় আদিকবি ভক্ত তুলসীদাস, আমাদের ভাষায় আদিকবি প্রেমিক চণ্ডীদাস। তোমাদের দোহাবলী, আমাদের পদাবলী। তোমাদের চারণ, আমাদের বাউল। তোমাদের রাজস্থানী গাথা, আমাদের পূর্ববঙ্গ-গীতিকা। তোমাদের গ্রামাঞ্চলে গায় পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার গাথা, আমাদের গ্রামাঞ্চলে গায় গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গীত।

তোমাদের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; আমাদের মতে মানুষ সত্য, শাস্ত্র মিথ্যা। তোমরা মান জ্ঞানযোগী শিবাবতার শঙ্করকে, আমরা মানি প্রেমময় বিষ্ণু-অবতার চৈতন্যকে। শঙ্কর পুঁথি লিখেছেন, চৈতন্য পুঁথি ডুবিয়েছেন। তোমাদের ধর্মকর্মের ভিত্তি হ'ল বেদ, আমাদের ধর্মকর্মের ভিত্তি হ'ল তন্ত্র। তোমরা ধর্মে খুঁজেছ পূর্বমীমাংসা, আমরা ধর্মে খুঁজেছি উত্তর-মীমাংসা। তোমরা কাজ করেছ বেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে, আমরা তর্ক করেছি বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে। তোমাদের সাধুরা করেছেন প্রাচীন যোগশাস্ত্রের চর্চা, আমাদের পণ্ডিতেরা করেছেন নব্য ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা। তোমরা বিশ্বাসের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে চাও, আমরা তর্কের চোটে ঈশ্বরকে উড়িয়ে দিই।

তোমাদের সীতারাম, আমাদের রাধাকৃষ্ণ। তোমাদের মতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান, আমাদের মতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীরাধা। 'মহাবীরজী-কি জয়' ব'লে তোমরা ভয় দেখাও, আর 'জয় রাধে' ব'লে আমরা ভিক্ষা চাই। তোমাদের ভগবান বিতরণ করেন কৃপা, আমাদের ভগবান বিতরণ করেন প্রেম। তোমরা ভগবানকে পাও দাস্যে, আমরা ভগবানকে পাই মাধুর্যে। তোমাদের ভগবান গুহক চণ্ডালের মিতা, আমাদের ভগবান কুব্জার বন্ধু। শ্মশানযাত্রার সময় তোমাদের বুলি 'রাম নাম সত্য হ্যায়', আমাদের বুলি 'বল হরি, হরি বোল'।

তোমরা পূজা কর ভগবদ্গীতার কৃষ্ণকে, আমরা পূজা করি ভাগবতের কৃষ্ণকে। তোমাদের কৃষ্ণ চক্রধারী, আমাদের কৃষ্ণ বংশীধারী। তোমাদের

কৃষ্ণ পার্থসারথি, আমাদের কৃষ্ণ রাসবিহারী। কুরুক্ষেত্র তোমাদের তীর্থ, বৃন্দাবন আমাদের তীর্থ।

তোমাদের গুরু বশিষ্ট বিশ্বামিত্র, আমাদের গুরু মীননাথ গোরক্ষনাথ। তোমাদের মহর্ষিরা খুঁজেছেন মোক্ষ, আমাদের আচার্যেরা খুঁজেছেন সিদ্ধাই। তোমরা কঠোর "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি" চাও, আমরা সহজিয়া অনুরাগের সাধনায় আনন্দ চাই। তোমাদের আস্থা যাগযজ্ঞে, আমাদের আস্থা নামজপে। তোমাদের রাজসূয়, আমাদের হরির লুট। তোমাদের মন্ত্র 'কীর্তির্যস্ত স জীবতি', আমাদের মন্ত্র 'হরের্নামৈব কেবলং'। তোমরা রাখতে চাও কীর্তি, আমরা করতে চাই নাম।

তোমরা শৈব, কারণ তোমরা ভালমানুষ শিবের ভক্ত; আমরা শাক্ত, কারণ আমরা শক্তির অর্থাৎ কিনা শক্তের ভক্ত। তোমাদের যোদ্ধাদের রণনাদ 'হর, হর, মহাদেও', আমাদের ডাকাতদের চিৎকার 'জয় মা কালী'। তোমাদের দেবতা হ'ল বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, পশুপতিনাথ; আমাদের দেবতা হ'ল দুর্গা, কালী, শীতলা, মনসা। তোমাদের দেবতা হ'ল পুরুষ, আমাদের দেবতা হ'ল মেয়ে। পৌরুষের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা আছে, সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে।

তোমাদের মেয়েরাও মদ্দ, আমাদের পুরুষরাও মেয়েলি। তোমাদের আদর্শ সীতা সাবিত্রী, আমাদের আদর্শ বেহুলা খুল্লনা। তোমাদের সাবিত্রী যমরাজকে হারিয়েছিলেন তর্কে, আমাদের বেহুলা দেবরাজকে ভুলিয়েছিলেন নৃত্যে। তোমাদের নারী কাজে বীরাঙ্গনা, আমাদের নারী মনে ব্রজাঙ্গনা।

তোমাদের দেশে চাতুর্বর্ণের বাছ-বিচার, আমাদের দেশে ছত্রিশ জাতের একাকার। তোমাদের দেশ ধর্মক্ষেত্র, আমাদের দেশ শ্রীক্ষেত্র। তোমাদের দেশে গঙ্গোত্রী, আমাদের দেশে গঙ্গাসাগর। তোমাদের দেশে যুক্তবেণী, আমাদের দেশে মুক্তবেণী। তোমরা বৌদ্ধধর্মকে উচ্ছেদ করেছ, আমরা বৌদ্ধ-ধর্মকে গ্রাস করেছি। তোমাদের বুদ্ধ-গান্ধীর বাণী অহিংসার, আমাদের চৈতন্যদেব-রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রেমের। তোমাদের আছে নিষ্ঠা, আমাদের আছে উদারতা। তোমরা একনিষ্ঠ, আমরা ভূমানন্দ।

তোমাদের দেশে ছিল রামরাজ্য, আমাদের দেশে ছিল মাৎস্যন্যায়। তোমাদের দেশে রাজারা প্রজা শাসন করেছে, আমাদের দেশে প্রজারা রাজা নির্বাচন করেছে। তোমাদের দেশে ছিল চন্দ্রগুপ্তের মত রাজা, চাণক্যের মত

মন্ত্রী; আমাদের দেশে ছিল হবুচন্দ্রের মত রাজা, গবুচন্দ্রের মত মন্ত্রী। তোমাদের যুবরাজ শাক্যসিংহ রাজ্য ত্যাগ ক'রে অহিংসা প্রচার করেছিল; আমাদের যুবরাজ বিজয়সিংহ হিংসাচারের জন্ত রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। তোমাদের দেশ বিদেশীরা জয় করেছিল বলে, আমাদের দেশ বিদেশীরা জয় করেছিল ছলে। তোমাদের শেষ স্বাধীন রাজা যুদ্ধ ক'রে মরেছিল, আমাদের শেষ স্বাধীন রাজা পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিল।

তোমরা মান মিতাক্ষরা, আমরা মানি দায়ভাগ। তোমাদের বছর হ'ল সংবৎ, আমাদের বছর হ'ল সন। তোমাদের বর্ণমালা নাগরী, আমাদের বর্ণমালা বাংলা। তোমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, আমাদের বেঙ্গল টাইম।

তোমাদের নায়ক বাপু-জী, আমাদের নায়ক নেতা-জী। তোমরা গড়েছ কাটুনী সঙ্ঘ, আমরা গড়েছি ফর্‌ওয়ার্ড ব্লক। তোমাদের পণ্ডিতজী গড়েছেন বেনারসে হিন্দুদের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের গুরুদেব গড়েছেন বোলপুরে সকলের জন্ত বিশ্বভারতী। তোমরা গড়েছ আর্যসমাজ, আমরা গড়েছি ব্রাহ্মসমাজ। তোমাদের ঋষি দয়ানন্দ, আমাদের রাজা রামমোহন।

তোমাদের দেশে আমরা যাই ধর্ম সঞ্চয় করতে, আমাদের দেশে তোমরা আস অর্থ সঞ্চয় করতে। তোমাদের দেশে গেলে আমাদের পাপীরা উদ্ধার হয়, আমাদের দেশে এলে তোমাদের ধার্মিকেরা পতিত হন।

* * *

আমরা যুদ্ধ করেছি তোমাদের রাজর্ষি রঘুর বিপক্ষে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বিপক্ষে, মহানুভব হর্ষবর্ধনের বিপক্ষে। আমরা বার বার বিদ্রোহ করেছি তোমাদের শাসনের বিরুদ্ধে—বখ্‌রা খাঁ-র সময়, ইলিয়াস্‌ শাহের সময়, আলিবর্দির সময়। আবার তোমরা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সিপাহী-বিদ্রোহ করেছ, তখন আমরা ইংরেজের সহায়তা করেছি।

তোমাদের পাণ্ডবেরা এ দেশে পদার্পণ করে নাই, তোমাদের অশোক এ দেশে স্তম্ভ স্থাপন করে নাই, তোমাদের 'চার ধামে'র সীমানার মধ্যে এ দেশের জায়গা হয় নাই। তাই আজও রাষ্ট্র-সংগঠনে তোমাদের হিন্দুস্থানের মধ্যে আমাদের দেশের স্থান নাই।"

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫৷২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস : কলিকাতা-৪

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

মহাস্থবির জাতক

প্রথম পর্ব। 'পরিবারের চিঠিতে বর্তমানে প্রকাশিত "মহাস্থবিরে"র আগের কথা।
চার টাকা

স্বর্গের চাবি

'মহাস্থবির জাতকে'র মতই কৌতূহলোদ্দীপক সরস গল্প-সমষ্টি। তিন টাকা

"বনফুলে"র

বনফুলের কবিতা

হাসির কবিতা। আড়াই টাকা

দ্বৈরথ

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

অনুপম টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস।
তিন টাকা

কিছুক্ষণ

স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

প্রথম খণ্ড। উপন্যাস। চার টাকা

বৈতরণী-তীরে

শুধু ভূতের গল্প নহে, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও গল্প। দুই টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধাত্রী দেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। চার টাকা

জলসাঘর

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন-প্রশংসিত নাটক। সাত সিকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চিত্র।
আড়াই টাকা

সন্দীপন পাঠশালা

উপেক্ষিত শিক্ষক-জীবনের কাহিনী।
সাড়ে তিন টাকা

রসকলি

মনের উপর দুষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাতজনিত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

প্রেমিক বৈষ্ণবীর দুঃখময় প্রেম-কাহিনী
দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই টাকা

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমাবেশ।

শ্রীআর্যকুমার সেনের

অভিজনে

নূতন ধরনের গল্প-সংগ্রহ। নয় সিকা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

[illegible] রঙ্গালয়ে অভিনীত। বারো আনা

"বনফুল" রচিত

স্বপ্ন-সম্ভব

"দেশজোড়া এই যে বিক্ষোভ, তা লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ। কিন্তু রাম আজ আত্মবিস্মৃত। লক্ষ্মণের বুকে রাবণ আজ যে শক্তিশেল হেনেছে, তা যে হিন্দুবিদ্বেষ তা সে বুঝতে পারছে না। সেই বিদ্বেষের বিষে আজ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে সৌমিত্রি। তাকে বাঁচাতে হবে। 'শক্তিশেলে লক্ষ্মণ যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তখন রাম তো তার বুকে গুলি করতে যায় নি। তোমার হাতে তবে বন্দুক কেন?"

দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই উপন্যাসে সত্যকার মিলনের সন্ধান মিলবে। লোভে সবাই ছুটে গিয়েছিল, মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, প্রাণহীন পাথরে পরিণত হয়ে গেছে। মুক্তি-ঝরনার মুক্তা-গলা জল ছিটিয়ে তাদের বাঁচাবে—রূপকথার কিরণ-মালা। ভালবাসা-প্রেম দিয়েই মানুষ মানুষকে বাঁচাতে পারে।

একেবারে পুস্তকাকারে বাহির হইল। মূল্য তিন টাকা

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ঃ কলিকাতা-৪

সূচী

বৈশাখ ১৩৫৪

মাত্র দশ মিনিটে
10 Saridon
ANALGESIC TABLETS
সারিডন
সর্ব্বপ্রকার বেদনা নিরাময় করে

কুমারেশ
প্রতি ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের দেহকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্তে যে যন্ত্রটিকে সবচেয়ে পরিশ্রম করতে হয় সেটি হচ্ছে লিভার। আর এই লিভার শরীর রক্ষা ও পোষণের কাজে এতই প্রয়োজনীয় যে তার কাজ বন্ধ হওয়া ত দূরের কথা, সামান্তমাত্র শ্লথ হলেই মানবদেহের স্বাস্থ্যহানি হতে বাধ্য। তাই এই লিভারের কর্ম্মশক্তি যাতে সব সময়ে অটুট থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন— এবং লিভারের বিন্দুমাত্র অসুস্থতাকে ভবিষ্যতের বড় বিপদের ইঙ্গিত মনে ক'রে তখনই প্রতিকার করা উচিত।
লিভারের স্বাস্থ্যরক্ষায় কুমারেশ অপরিহার্য, কারণ লক্ষ লক্ষ রোগীর লিভার ও পেটের পীড়া নিরাময় করার ফলে কুমারেশ অ্যামিবাঘটিত আমাশয় ও অজীর্ণ, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, পুরাতন ও জটিল কোষ্ঠবদ্ধতা, সূতিকা, গর্ভাবস্থায় অজীর্ণ, শিশু-যকৃৎ, শিশুদের দন্তোদ্গমকালীন পেটের পীড়া প্রভৃতি লিভার ও পেটের যাবতীয় রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ ও প্রতিষেধক ব'লে স্বীকৃত হয়েছে।
QUMARE

স্নিগ্ধতায়...
কেশবর্দ্ধনে...
সংরক্ষণে...
প্রসাধনে...

তিমির বরণ… সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ব্যক্ত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

শনিবারের চিঠি
১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৪

ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ

বুদ্ধ ও চৈতন্যের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কালে এই দুই মহাপুরুষের প্রভাব দেশের জনগণের ওপর কেমন ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় পালি-সাহিত্যে এবং বাংলা-সাহিত্যে মেলে। দেখতে পাই, একটা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, আবেশ লেগেছিল ভক্তদের চিত্তে। দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সবই যে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সাধারণ ও অসাধারণ লোক দলে দলে ভিক্ষুশ্রমণ অথবা বৈরাগী-বৈষ্ণব হয়ে সংসারধর্ম পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে বহুবিধ বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন এঁরা।

কিন্তু এঁরা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রবর্তক; জাতির অতিশয় সঙ্কটকালে মুক্তির নূতন পন্থা নিয়ে এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, দেশ ও কাল—দুইই অনুকূল ছিল। এক জনের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে, অন্য জনের মধ্যযুগে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি তখনও পরিপুষ্টি লাভ করে নি, অলৌকিকের প্রতি মানুষের মোহ কাটে নি।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিজ্ঞানধর্মী আধুনিককালে, যুক্তির সাহায্যে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তির প্রয়াসের মধ্যে। কোনও সঙ্কটকালের পথনির্দেশক অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তকরূপেও তিনি আসেন নি। তিনি এসেছিলেন কবি হিসেবে, সাহিত্যশিল্পী হিসেবে, সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু এই কবি-কর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করেছিলেন যে, এই সংশয়শাসিত যুগেই তিনি অনুরূপ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছেন; ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শিক্ষা, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সমস্ত কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর সংস্পর্শে। ধর্মেতর ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এমনটি আর ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ পরম বিস্ময়ের মতই র'য়ে গেলেন। তিনি শুধু যুগপ্রবর্তক মাত্র রইলেন না, সমস্ত যুগটাই তাঁতে বিধৃত হয়ে রইল।

তাঁর সাহিত্য কাব্য বা সঙ্গীতের মহিমাকীর্তন স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। সে আলোচনা গাঢ় মনোযোগ ও দীর্ঘকালের সাধনার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্র-রচনার গভীর গহনের মধ্যে তার জন্যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই প্রবেশ

করতে হবে। শুধু 'সঞ্চয়িতা' 'গীতাঞ্জলি' 'শেষের কবিতা' 'বলাকা' 'মহুয়া' ও "নবজাতকে'র সঙ্গে স্পর্শ-গভীর পরিচয় থাকলেই চলবে না। অথচ এইটা করাই এরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না হ'লে আমাদের স্বাভাবিক পল্লবগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথকেও অপমান করতে থাকবে।

আজ এই স্মৃতি-পূজার উৎসবে আমি শুধু ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব, বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে নয়, কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথকেও নয়—যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অন্তরে ধ্যানের মত ধারণ করেছিলেন, তাঁকে। কারণ ভারতবর্ষের আজ বড় বিপদের দিন এসেছে। সে শুধু ভৌগোলিক আয়তনেই খণ্ডিত হতে যাচ্ছে না, তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাবার ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে।

আমাদেরই অব্যবহিত পূর্বকালে দু জন বাঙালী মহাপুরুষ ভারতবর্ষের বিপুল মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন, এক জন স্বামী বিবেকানন্দ, অন্য জন কবি রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের যথার্থ গৌরব তাঁরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগী হয়েও কর্মী ছিলেন, তাঁর সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে তিনি সাধ্যমত ঐক্যে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা আরও বড় ছিল, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের এখনও অনেক তপস্যার প্রয়োজন হবে। তাঁর প্রার্থনা এই—

"হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্য লাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ-পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অত দারুণ

দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্র নিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

"একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহু শতাব্দী হইতে নানা দুঃখ অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।"

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ তাঁর চিঠিপত্রে আরও পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলেছেন—

"যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো, য়ুরোপীয় বর্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিও।...তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।...তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইও না।...অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা, ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত।... ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারিবে।...ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো।...বলবীর্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য।...নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্মরক্ষা ও আত্মত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো—তোমার জীবন চরিতার্থ হউক—..."

ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তরুণকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; বাংলা দেশে অন্তত ক্ষাত্রধর্ম জাগ্রতও হয়েছিল, কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে প'ড়ে তা শেষ পর্যন্ত আত্মকলহে পর্যবসিত হ'ল। এ দুর্গতিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের জন্মোৎসবদিনে সভ্যতার সঙ্কটে ভীত হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—"সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়,

সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসন-যন্ত্রের ঊর্ধ্ব স্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত, তা হ'লে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না, যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই।...

"একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিবহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম, য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এই হচ্ছে কবির শেষ বাণী, শেষ আশা। ভারতবর্ষের প্রতি তিনি কখনও বিশ্বাস হারান নি। ভারতবর্ষের একাংশ আজ খণ্ডিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের সকল গৌরবকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, অস্বীকার করছে

ভারতীয় ঐতিহ্যকে, অস্বীকার করছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। আপাতত মাতৃভূমির মাঝখানে বিভেদের দেওয়াল তুলে দিয়ে এই অপমান ও দুর্গতি থেকে আমরা আত্মরক্ষা করবার কল্পনা করছি। কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। আমরা নিরুপায়। অহেতুক আত্মঘাত নিবারণের জন্যে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থে, এই মহামানবের সাগরতীরে সম্মিলিত হবার আগেই আমরা ঠাঁই ঠাঁই হয়ে পড়ছি। আমাদের মধ্যে আশাবাদী যাঁরা, তাঁরা এখনও এই দুর্যোগাবসানের স্বপ্ন দেখছেন, কল্পনা করছেন, পূর্ণ মঙ্গলঘট নিয়ে মায়ের অভিষেকে আমরা অচিরাৎ আবার মিলিত হব, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ জয়যুক্ত হবে। ভগবান করুন, তাই যেন হয়।*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

মুসাফিরের ডায়েরি

অনামিকা

আর পাঁচজনের মত আমিও 'খাদ্যাখাদ্য না করি বিচার' ঐশ্বর্যশালীদের গাল দিয়ে থাকি। তাদের পুঁজিবাদবৃত্তিই জগতে সব নৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিলতার সূত্র যুগিয়ে এসেছে ব'লে থাকি। বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতই অদ্ভুত কুৎসিত তাদের সৃষ্টি—এই মৃতপ্রায় গ্রাম, বস্তি-বিরাজিত নগর, দুর্ভিক্ষ, আরও কত কি! তাজমহলের শোভা, আকাশচুম্বী সৌধসৃষ্টির ছটা তাদের এ কালিমা ঘোচাতে পারল না। অভিজাতের উন্নাসিকতাকে আমরা অপাংক্তেয় প্রমাণ করেছি। কিন্তু তাদের আরও একটা দিক আছে, যা আমাকে প্রায়ই আকৃষ্ট করেছে।

কোনও একটি মহিলার দৃষ্টান্ত নিই। সাধারণত লক্ষ্মীর বরলাভের পর, ঝলমল হীরকদ্যুতি সংগ্রহের পর, ধনীকুলের আকাঙ্ক্ষা হয়, রূপে কার্তিকের বংশ ব'লে খ্যাত হবার। সেই হীরের মালিকের তখন চম্পকপ্রভ নবনীনিন্দিত ইত্যাদি হওয়ার তাগিদ আসে, শুরু হয় রূপমহলের নেশা। তাই দেখি, প্রায়শই রাজবধূ রাজবালারা শুভ্রা রূপসী। এমনই এক সুন্দরীকে দেখলুম। বিগতযৌবনা বটে, কিন্তু যৌবন যে এককালে ছিল, তার স্তিমিত ঢেউ দেহতটে লেগে আছে।

* গত ২৭ বৈশাখ নিখিল-ভারত-রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

ছিপছিপে তন্বী ছিলেন না, কিন্তু গজগামিনী নিঃসন্দেহ। একটা নেচে চলার সহজাত ছন্দ আজও অঙ্গভঙ্গীতে প্রকাশমান সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। আধুনিকা কলেজের সুন্দরীদের মধ্যে নৃত্যছন্দ দেখা যায়, কিন্তু সে যেন সুনিপুণ সচেতন চেষ্টার ফল, যেন হঠাৎ বাঁধন ছেঁড়া স্প্রিঙের মত নাচন। ইনি মাটিকে ডিঙিয়ে চলেন না। যথেষ্ট সুখবিলাসমগ্ন জীবন ছেড়ে সবার সঙ্গে এক হওয়ার চেষ্টায় দুঃখব্রতের পথ বেছে নিয়েছেন। আজও অম্লান রঙের আভা শরীরে, দেহের বাঁধনে ভাঙন লাগে নি। একদা যে এঁর সুললিত বাহুভঙ্গী মুগ্ধদৃষ্টির পূজা পেয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। কেশের আধিক্য নেই, আভিজাত্য আছে।

এঁরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে জীবনের নীতির মাপে দাগানো ভালমন্দের সাদা-কালো ছক-কাটা পথ বেয়ে অব্যর্থলক্ষ্য নৌবলের মত চ'লে এসেছেন, খামখেয়ালের তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় নাচতে হয় নি। এঁরা জানতেন, সেই আদর্শ ভাল মেয়ে, যে পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, রেশমের কারুকার্য জানে, গুরুজন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্বরে কথা কয়, নির্বিচারে গুরুআজ্ঞা পালন করে, ঈশ্বর-বিষয়ক গান জানে (এমন গান যার সুর কিছুতে অন্তর্নিহিত নীতিশিক্ষাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না), ভাল ভাল বাছাই করা দেশী বিলাতী কবিতা মুখস্থ রাখে, কিছু কিছু আঙ্গিক কারুশিল্পে হাত আছে, সর্বোপরি যার রন্ধনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অসীম। এঁদের জীবনের ছক আঁকা ছিল, শুধু রঙ ফলালেই চলত, আগাগোড়া ঢেলে সাজার বালাই ছিল না ; ভ্যালুস অফ লাইফ ধ্রুব ছিল, ফটকার বাজারের মত ওঠানামা করত না। এঁরা সিঁদুর-শাঁখা-আলতা-পরা, লক্ষ্মীশ্রী-মণ্ডিতা ; অথচ কার্যকালে ইংরেজী খানা রেঁধে স্বামীর ইংরেজ বন্ধুকে খাওয়াতে সিদ্ধহস্ত। এঁদের বহুমুখী প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানাই। এঁরা ঘরে রোগীর সেবা করেন, বাইরে নাচের জলসায় মুখপাত্র হন। এঁরা ইংরেজীতে কবিতা আবৃত্তি করেন, আবার সুন্দর আলপনা দেন, প্রয়োজনবোধে মান্য অতিথিকে অকুণ্ঠ নতি জানিয়ে পদধূলি নেন। আমার অনামিকা যে জন, তিনি একাধারে নৃত্য, গীত, চিত্র, সূচীকর্ম, আবৃত্তি, কবিতারচনা, বিবিধ কবরীছাঁদ, বিভিন্ন প্রান্তীয় পোশাকসজ্জা, কি যে না জানেন, জানি না। আমি বিস্মিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু ভালবাসতে পারি নি। এমন আত্মসম্পূর্ণ ভাব, এমন তেজ-দৃপ্ত ভঙ্গী, সবই অনন্যসাধারণ, বিশেষ এ যুগে। তবু কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়, মহা আপন মনে হয় না। মনে হয় না, এঁদের বোধ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সুর শুদ্ধ হয়। একাগ্রী

বৃত্তির রেশ থেকে যায় সর্বকালে। এ যেন সোনার জলের লেখাওলা মরক্কো-বাঁধানো মিল্টনের কাব্যগ্রন্থ, কোথাও শিথিলতা নেই, নেই অলস প্রশ্রয়। মালিন্যের অবকাশ কোথা? সহজাত প্রয়োজনের তাগিদে নয়, অন্তরের মরমী টানে নয়, ঐ দ্বিতীয় কোনও অচলায়তন আদর্শবোধের সংস্কৃত মার্জিত যুক্তি এঁদের এনেছে সবার মাঝে, যেখানে এঁদের প্রাণের যোগ নেই। এঁদের সৌজন্য বাধা জন্মায়, এঁদের অমায়িকতা বিমুখ করে, এঁদের স্নেহস্পর্শ সন্দেহ জাগায়। এখানে এঁরা কৃত্রিম, এঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মম্ভরিতার পার্থক্য প্রকট থাকে। যেন সবাইকে পিঠথাবড়ানি দিচ্ছে, অকারণ অবহেলার অবজ্ঞা প্রকাশমান। এঁরা যখন শাসন করেন মানায়, কিন্তু যখন বিনয় করেন সয় না। আপনার ঐশ্বর্য-রথচক্রতলে বহুকে পেষণ করাই এঁদের ধর্ম, দলিতের প্রতি করুণা যেন অশোভন। এঁদের সম্মান করা যায়, বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়, কিন্তু ব্যথায় ব্যথী ভেবে হাত বাড়িয়ে সাহায্য চাওয়া যায় না।

চৈতালী বর্ষণ

এ বছর আর বাদল নামে না। কৃষকেরা যতই অদৃষ্টকে দোষ দেয় আর ঠাকুরের কাছে কান্না জানায়, পাথরের ঠাকুর নিষ্পলক নিরম্বু হিম প্রাণহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে, তার মুখও ভাবলেশহীন, রাগবিরাগের কোনও অভিব্যক্তিরই প্রকাশ নেই।

এ অঞ্চলটা মানুষের কাছে আচম্বিতে মার খেয়ে সশঙ্কিত অর্ধমৃত হয়ে আছে, যেন মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। ঘর নেই, সঞ্চয় নেই, শক্তি নেই, আছে কেবল ভিক্ষা আর ক্রন্দন। কাপড় দাও, কম্বল দাও, দাও অন্ন। সেই পঞ্চাশ সনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যে ধান মাঠ থেকে লুঠতরাজ হয়ে গেছে, সে তো গেছেই, কিন্তু আগামী ফসলটা যাতে ওঠে, তার জন্য নিত্য আকুল কাকুতি উঠছে ঊর্ধ্বলোকে। সবার মুখে এক কথা—এত দুঃখ দিয়েও দেবতার কোপশান্তি হ'ল না, এখনও আমাদের দুর্গ্রহ খণ্ডন হ'ল না, একটু জল পড়ে না। রোজ কুয়া হচ্ছে—আর এই খরা, আমের বোলগুলো সব ঝ'রে যাবে—না ভুঁইয়ের, না গাছের ফল আমরা ভোগ করতে পারব।

ফাগুনের শেষ। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘেরা দল বাঁধে—আশার সঞ্চার করে, এমন ঘন কালো জমাট মেঘের জটলা—মনে হয়, জল ঝ'রে পড়ল বুঝি,

কিন্তু হায় রে, পোড়া দেশের লোকেদের পোড়া কপাল! সন্‌সন্‌ হাওয়া চলে, কোন্‌ সুভাগাদের দেশে ভেসে যায় সে মেঘ তার সঞ্জীবনী সুধা ঢালতে! এমনই চলছে ক'দিন।

সেদিন গ্রামে বৈঠক আছে। হাতে চরকা ঝুলিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদ্বয় চলেছে। পশ্চিম কোণে কালো পাহাড়ের ঢেউ দেখা যাচ্ছে, ঘনঘটা দেখে বোঝা যায় না আজ কি হবে, আজও কি ধরিত্রীর নির্জলা উপবাস? চষা মাঠের চাকা চাকা মাটির ঢেলাগুলো পাথরের টুকরোর মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, প্রতি পদক্ষেপে আঘাত হানছে। তৃষার্ত জমি শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে, গোপাটে ঘাসের চিহ্নও নেই। দুটো গ্রামের মাঝে লম্বা মাঠ। আধাপথ চলার পর ভিজে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল, বোঝা গেল, খুব জোর কদমে চললেও আগে পিছে কোনও গ্রামেরই আশ্রয় মিলবে না, মেঘের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসাধ্য। খুব দার্শনিক মন নিয়ে তারা এগিয়েই চলল। মেয়েটি সাথীকে বললে যে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভালই লাগবে। আরও এক প্রস্তাব করলে। বৃথা মাঠে ছুটোছুটি না ক'রে ওই সামনের দীঘিটার পাশে বসা যাক, তবু যে লোকে বলে—দাঁড়িয়ে ভেজা, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

দীঘিটার উত্তর পাড়ে এক জীর্ণ মন্দির, যথেষ্ট পুরোনো, কিন্তু কত পুরোনো তার নিশানা মেলে না, বিগ্রহ কার যেন নিগ্রহে স্থানচ্যুত। পাতলা বাংলা ইটের গাঁথুনি তিন খিলানের ঢঙে তৈরি, চূড়ায় চিরাচরিত পিতলের কলস ও ত্রিশূল। আশে পাশে ধুতরো-বন। দীঘির পাড়ে পাড়ে তাল, নারকেল, খেজুর ও সুপারির ঝোপ। একই জাতীয় গাছ। অনেক মানুষ যেমন বহুকাল নির্বাধভাবে কাটিয়ে শেষ-বয়সে সংসার বাঁধে, তেমনই এ গাছগুলো যেন সৃষ্টির সকল আকর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে ঋজু নিশপত্র নির্বর্ণ কাণ্ড নিয়ে স্পর্ধার সহিত ঊর্ধ্বে মাথা তুলছিল, সহসা কেমন গোল বেধে গেল, প্রৌঢ়সীমায় তাদের কামনা ছড়িয়ে পড়ল সবুজ পাতায়। তাদের ফল ফলানোর তাগিদে মাটি থেকে সংগ্রহ করতে হ'ল রস, সূর্য থেকে রঙ। নমনীয় সুপারি গাছগুলো বাতাসে হেলে পড়ে, মাথা নেড়ে ঝড়ের কাছে পরাভবের স্বীকৃতি জানায়। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘনসবুজ রূপসী আমগাছ, তাদের গায়ে বসন্তের রঙ লেগেছে—তামাটে রঙের রেশমী নরম ঝকঝকে নতুন পাতা—মুকুলের ঈষদম্ল সৌরভ। কিছু দূরে একটা মাদারগাছ; কোথাও ডালপালার

সবুজ চিহ্নমাত্র নেই। কাঁটাওলা পল্লবহীন রিক্ত ডাল, কিন্তু ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। টকটকে লাল ফুল, অমন লাল কমই দেখা যায়। সাথীটি ব'লে উঠল, এ দেখতে আমার বড় বিশ্রী লাগে, নেড়া গাছে কতকগুলো ঝলমলে ফুল। মেয়েটি বললে, কেন যেন আমার সুন্দর লাগে, ও নিয়মমাফিক সবুজ পাতার কোলে ফুল, যেন সাজানো বাটন-হোল ; এ বেশ নতুনতর।

ঘূর্ণি হাওয়ার পাকে পাকে শুকনো পাতাগুলো ঘুরে ঘুরে কোথায় কোন্ অজানায় উড়ে চলেছে। মাথার ওপর তালগাছে পাখির বাসাটা দুলছে, শব্দ হচ্ছে খস্—খস্—খস্। কুটি-কাটি উড়ে এসে মাথায় মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃষ্টি শুরু হ'ল। দীঘিটা একাধারে ঝড় ও জলের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, সেগুলো ধারে ধারে কচুরিপানা আর শেওলায় এসে ঠেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার বৃষ্টির ফোঁটার চাপে জলটা টোল খেয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য বুটিতোলা শাড়ির মত। একটা দলভ্রষ্ট বক। বেচারা পাখার ঝাপট হেনে যতবার ভারসাম্য বজায় রেখে দক্ষিণে যেতে চায়, ততবারই দমকা হাওয়ার ঠেলায় উল্টো পাক খেয়ে ঘুরে যায়। অনেকবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর স্থিতধী বিজ্ঞের মত মাদার-ডালে লাল ফুলের পাশে সাদা পাখা ঝাপটে বসল।

কিছুক্ষণ অবিরাম বর্ষণের পর ভিজে মাটির গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গেল—সদ্যস্নাত গাছ, চীনা ও কয়নার ক্ষেতগুলো শ্যামলতর লাগছিল। আতপ্ত দাহময় আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতার স্পর্শ লাগল। উভয়েরই চুল পোশাক ভিজে, জল গড়িয়ে পড়ছে, ঠাণ্ডা বাতাসে শিরশির করছে শরীর। কিছুই যেন ঘটে নি, এমনই ভাব নিয়ে মেয়েটি চেয়ে আছে গন্তব্য গ্রামের দিকে।

সে ভাবছিল, বহুবার আভাস ও আশ্বাস দানের পর আজ এল প্লাবন। ধরিত্রী যেন বাঁচল, কৃষকও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাল সকাল থেকে জমিতে বেগে কাজ চালু হবে, ব্যস্ততার সাড়া প'ড়ে যাবে। কর্মমুখর দিন এল, এল ফসল ফলাবার আহ্বান। প্রতিবার বর্ষায় তার পৃথিবীকে নতুন লাগে, বড় ভাল লাগে। মনে হয়, এমন আশ্চর্য মধুর দীপ্ত সজল দিন কখন কেমন ক'রে এল? এমন ঘনঘটার পরই ঝরঝর বারিধারা, তারপর হঠাৎ আলোর ঝলকানি। কালো মেঘ জল ঢেলে দেবার পর এক অপূর্ব আভায় দিঙ্মণ্ডল ছেয়ে যায়। আকাশের এক পাশ থেকে মেঘ-চাপা সূর্যের সন্ধানী রেখান্বিত আলোর ধারা ছড়িয়ে প'ড়ে সব কিছু অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায়, নতুন দেখায় নবজাত

গাছপালা, তৃষিত মাটির তৃপ্ত শ্বাস, ধোয়া আকাশ, ধূলিবিহীন আবহাওয়া। স্বভাবতই পাহাড়ের কথা মনে হয়, যেন চিরপরিচিত আবাসও বিদেশ।

সে ভাবছিল, এ কেমন ক'রে সম্ভব হয়? কোনও একদিন অকস্মাৎ জল নেমে আসে ঝরঝরিয়ে কিসের টানে? কতদিন তো খরতপ্ত পৃথিবীর এ আকুতি নিষ্ফল হয়। হয়তো দুদিক থেকে যখন ডাকাডাকির—ডাকের ও সাড়ার সামঞ্জস্য ঘটে, তখনই এই আদান-প্রদান সহজ সফল হয়, অবশ্যম্ভাবী হয়। এই যে শুকিয়ে-ওঠা ফাটা বন্ধুর হননধর্মী মাটি তৃষিত তাপিত হয়ে একান্ত নিষ্ঠায় জল চেয়েছিল, তার কামনা ও দাহ অদৃশ্য উষ্ণবাষ্প হয়ে আকর্ষণ পাঠিয়েছিল, তাই তো ওপর থেকে সঞ্চিত স্নিগ্ধতা ঝ'রে পড়ল। ওপরের মেঘ প্রাচুর্যের রস সঞ্চার ক'রে বিলিয়ে দিল, কিছুটা তার নিজের তাগিদেও বটে। কি করবে এত নিয়ে, যদি প্রার্থীকে না দেয় তো এ কৃপণের ধন কোন্ কাজে লাগবে লগ্ন ব'য়ে গেলে? এ ক্ষেত্রে অর্থীর দাক্ষিণ্যে আর প্রার্থীর আকিঞ্চনে সংঘর্ষ বাধে নি। একজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দিয়েছে, অপরজন তৃপ্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে নিয়েছে। গ্রাহক এ রিক্ততায়, এ দৈন্যে লজ্জা পায় নি, কিছু দৃষ্টিকটুও হয় নি। এই সহজ গ্রহণের পর সে আবার কত গুণ ফিরিয়ে দেয়, কত সৃষ্টি করে, ধারণ করে, পালন করে। তার নিজস্ব ধনকে সে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়।

বর্ষণের আগে প্রবল গর্জন ও অগ্নি উদ্গীরণ হয়েছিল। মেঘে মেঘে বেধেছিল সংঘাত। তারা উভয়েই সঞ্চয়ী, কেউ কারও কাছে আত্মনিবেদন করবে না—অথচ এই বিরোধ, এই অসহিষ্ণুতা, এই অগ্নি, এই শতঘ্নীর জয়। এমন সহজ লেনদেন কবে হবে? যবে হবে, তবেই দেশের ও দশের কাছে সুসঙ্গতি ঘটবে, নচেৎ সংঘর্ষ অনিবার্য।

তার কতবার মনে হ'ল, অহংবোধ নিয়ে দান করা কত সহজ, কিন্তু নম্রভাবে অক্ষতচিত্তে নেওয়া কি দুষ্কর!

অকুণ্ঠমনে দান গ্রহণ করা কি মহিমার, কি ঋদ্ধিশীলতার পরিচায়ক! যারা অনেক দিতে পারে, তারাই কি নির্বিকারচিত্তে নেয়? তাদের বোধ হয় দেনা-পাওনার আঁক কষতে হয় না। ডাকের মত ডাক পাঠিয়ে নেওয়ার মত নিতে পারলেই পরম পাওয়া হয়। কবে এমন মন হবে?

তার কানে বাজছিল "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়"।

"মুসাফির"

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

চলেছি পথ বেয়ে। দীর্ঘ পথ সর্পিল গতিতে এঁকে-বেঁকে চ'লে গিয়েছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। চোখের ওপর দিয়ে সেই পুরাতন ছবি একটার পর একটা ভেসে যাচ্ছে, মনের মধ্যে কিন্তু তোলপাড় চলেছে। অদৃষ্টের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, অতি ধীরে হ'লেও নিশ্চিতরূপে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই পুরাতন আবর্তের পানে। সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পরিতোষের সঙ্গে আলোচনাও হচ্ছে। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতায় যদি ফিরে যেতে হয়, আবার ইস্কুলে ঢুকবি তো?

অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সে বললে, নাঃ, আবার ইস্কুল!

বললুম, তোর বাবা কিছু বলবেন না?

সে বললে, না।

মনে হতে লাগল, ইস্কুল-যাওয়া সম্বন্ধে যদি তারই মতন বলতে পারতুম—নাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, একদিন সকাল-বেলা কি একটা কথা নিয়ে তর্কাতর্কি হতে হতে দাদা বাবাকে ব'লে ফেললে, লেখাপড়া আমার আর হবে না। ওসব ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি ক'রে সংসারে সাহায্য করবার দিকে মন দেব।

এই কথা শুনে বাবার মাথায় সেদিন কি রকম খুন চেপে গেল। তিনি সারাদিন ধ'রে অমানুষিকভাবে দাদাকে পিটতে আরম্ভ করলেন। একতলা দোতলা রক্তে রক্তারক্তি হয়ে গেল। পাড়ার মুরুব্বীরা এসে বাবাকে থামাতে না পেরে চ'লে গেলেন। আশপাশের বাড়ির গিন্নীরা চেঁচিয়ে মাকে ডেকে বাবার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, ছেলেটাকে মেরে ফেললে যে!

মা নির্বিকার হয়ে দু-হাতে বারান্দার রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে সেই বীভৎস কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

প্রহারের যন্ত্রণায় দাদা চীৎকার করতে লাগল, কে আছ আমায় বাঁচাও—আজ আমাকে যে বাঁচাবে, আমি চিরকাল তার কেনা হয়ে থাকব।

কিন্তু কেউ এল না। বাবার মুখে এক কথা, আজ তোমাকে মেরেই ফেলব।

এই রকম চলেছে। নির্জিত ও নির্যাতনকারী উভয়েই ক্লান্ত, তবুও মার চলেছে। শেষকালে কেউ যখন বাঁচাতে এল না, তখন দাদা নিজেকে সাহায্য করবার গুরুভার নিজের কাঁধেই তুলে নিলে।

এক হেঁচকায় বাবার হাত থেকে ছিটকে প'ড়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে ছুটে দাদা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবাও তার পেছনে পেছনে ছুটলেন। কিন্তু তাঁকে ঘরের মধ্যে আর ঢুকতে হ'ল না। দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই দাদা দরজার খিলটা এক হেঁচকায় উপড়ে ফেলে বাবার সম্মুখীন হয়ে বললে, আর একটি আঘাত যদি আমায় কর তো একটি ঘায়ে তোমায় শেষ ক'রে দেব।

দাদার সেই মূর্তি দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেখলুম, তাঁর প্রহারোদ্যত হাতখানা শিথিল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নীচে প'ড়ে গেল। দাদা চীৎকার করতে লাগল, আপনার অনেক অত্যাচার আমি শৈশব থেকে সহ্য ক'রে আসছি, আজ তার শেষ হয়ে যাক।

বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাদার সামনেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি আর অস্থির এতক্ষণ কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের কাছে কাছেই ওপর-নীচ করছিলুম। দাদার আর্তনাদের তালে তালে আমাদের কান্নার আওয়াজও উঠছিল পড়ছিল। হঠাৎ তাকে বৈষ্ণবভাব থেকে শাক্তভাবে পরিণত হতে দেখে আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

বোধ হয় ব্যাপারটা বিশেষ গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে মা এসে পড়লেন তাঁদের দুজনের মাঝখানে, তাঁর মুখখানা ঘিরে একটা অস্বাভাবিক কাঠিন্য, কিন্তু দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে।

মা বাবাকে সেখান থেকে চ'লে যেতে বলামাত্র তিনি চ'লে গেলেন। দাদাকে দেখলুম, তার চোখ দুটো লাল, মুখখানা একেবারে থেঁতো হয়ে গেছে, ধুতি শতছিন্ন, সেইভাবে হুড়কোখানা তখনও তুলে থরথর ক'রে কাঁপছে।

দাদার সেই অবস্থা দেখে মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেও মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

দাদা ম'রে গেল মনে ক'রে আমি আর অস্থির চীৎকার ক'রে উঠলুম। মা বললেন, জল নিয়ে আয়।

তখুনি বালতি ক'রে জল নিয়ে এসে দাদার মাথায় দিতে লাগলুম। মার

চীৎকার শুনে প্রতিবেশিনীরা, যাঁরা অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছুটে এলেন। চেঁচামেচি শুনে বাবা সেখানে এসে ব্যাপার দেখে ছুটলেন ডাক্তারের সন্ধানে। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাবা পাড়ার একজন ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার নানা রকম পরীক্ষা ক'রে দাদার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ ও তাপ্পি মেরে, দুটো তিনটে ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন ও বাবাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে তাঁর জন্যও একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখলেন। বাবা ছুটলেন ওষুধ আনতে, দাদা তখনও অজ্ঞান।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক বাদে দাদার জ্ঞান হ'ল। সে আচ্ছন্নের মতন আমাদের দেখতে দেখতে সেই অবস্থায় শুয়ে শুয়েই মাকে জড়িয়ে ধরল, মা পাশেই ব'সে ছিলেন।

আমরা তিন ভাইয়ে একটা বড় বিছানায় শুতুম। দাদার জন্যে তখন আলাদা বিছানা ক'রে দেওয়া হ'ল। মা তাকে নিয়ে রইলেন।

সেদিন আর আমাদের খাওয়া-দাওয়া নেই। বাবা একটা ঘরে শুয়ে আছেন, আমাদের ঘরে মা দাদাকে নিয়ে আছেন। তিনি কখনও তার পাশে শুয়ে পড়ছেন, কখনও বা উঠে বসছেন। ঘরের সামনেই একটা চওড়া ঢাকা বারান্দায় টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি পাতা, সেখানে ব'সে আমরা পড়াশোনা করতুম—আমি আর অস্থির সেখানে ব'সে। বাড়িতে আরও দু-তিনটি মেয়ে থাকতেন, তাঁরাই ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যের সময় মা দাদাকে ছেড়ে উঠে সারাদিন বাদে আমাদের খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। দাদার বিছানার অনতিদূরে বিছানা পেতে সেই সন্ধ্যে-রাত্তেই আমরা শুয়ে পড়লুম। মা-বাবা খেলেন কি না জানি না। আমরা শুয়ে পড়বার বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মা এসে দাদার মাথার কাছে বসলেন, দাদা তখন, ঘুমে কি না জানি না, একেবারে অচেতন।

অনেক রাত্রে দাদার কণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম, দাদা বলছে—তুমি আমায় মাসে পনেরোটা ক'রে টাকা দিও, তা হ'লেই আমার হবে।

সকালবেলা উঠে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরল রাত্রি প্রায় সাড়ে নটায়। জিজ্ঞাসা করলুম, সারাদিন কোথায় ছিলে দাদা?

দাদা কম্পিতকণ্ঠে বললে, এক বন্ধুর বাড়িতে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, এবার এখান থেকে সম্পর্ক উঠল রে!

আমি চ'লে যাচ্ছি বেলগেছের ভেটারিনারি কলেজে পড়তে। সেখান থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে চাকরি নিয়ে চ'লে যাব বিদেশে, এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল।

অভিমানে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। দাদার কথা শুনে আমি ও অস্থির কাঁদতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে সেইরকম ধরা-ধরা গলায় দাদা বললে, মা রইল, দেখিস।

এর পরের অংশটুকুর সঙ্গে যদিও বর্তমান কাহিনীর সম্পর্ক কম, তবুও সেটুকু এইখানেই শেষ ক'রে রাখি।

দাদা প্রতিদিনই বাবা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত্রে। বাবাও তার কোন খোঁজ করেন না, শুধু মা আসেন তার সঙ্গে কথা বলতে। মায়ে-ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় ব'সে কি সব কথাবার্তা হয় তা বুঝতে পারি না, দাদা ঘরে ফেরবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই কয়েকদিনের মধ্যে সে যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চ'লে গেল। মনের মধ্যে নিয়তই একটা খোঁচা বাজতে লাগল, দাদা চ'লে যাবে, দাদা পর হয়ে যাবে, সে আমাদের ভুলে যাবে।

এই রকম দিনকয়েক চলবার পর একদিন বাবা আপিসে বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই দাদা বাড়িতে এসে স্নান ক'রে খেয়ে একটা বাক্সতে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে মাকে প্রণাম ক'রে ভাড়াটে গাড়ি চ'ড়ে চ'লে গেল।

তারপরে তিন বছরের মধ্যে তিন মাস সে বাড়ি থাকে-নি। ওখান থেকে পাস ক'রে সে চ'লে গেল বিদেশে চাকরি নিয়ে। সেখানে না খেয়ে একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে সে বিলেতে চ'লে গেল। অবিশ্যি বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে বাবাই ছিলেন তার প্রধান সহায়। যা হোক, ইংলণ্ডে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমেরিকায় গিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে পড়াশোনা ক'রে মানুষের ডাক্তার হয়ে আজ সমারোহে সেখানে সে বাস করছে। সেই থেকে বাড়ির সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, আজও সে বাড়ি ফেরে-নি।

বাবা মনে করেছিলেন, ছেলেকে নিজের মনের মতন ক'রে তৈরি করবেন, অবিশ্যি বাবার পক্ষে সে কথা ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বাবার পেছনে আর একজন বড়বাবা অদৃষ্টে ব'সে সকল বাবারই যে জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন, শাসন করবার সময় অনেক বাবারই সে কথা স্মরণ থাকে না। তার ফলে বাবা হারালেন সন্তান, আর আমরা যা হারালুম, তা প্রকাশের নয়।

পথ চলতে চলতে বেলা যত প'ড়ে আসতে লাগল, মনের মধ্যে কেন জানি না, সেদিনকার সেই ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

চলেছি পথ বেয়ে। রাত্রিটুকু ছাড়া এই তিন দিন নিরন্তর পথ বেয়ে চলেছি। সেই সকাল থেকে এতক্ষণে বোধ হয় দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতো জোড়ার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সকালবেলাতেই পথের পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হ'ল। পায়ের তলা জ'লে যাচ্ছে, তবুও চলেছি, কোথায় সেই দীনের পালক, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, তাঁরই উদ্দেশে।

পথে লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করি, কোথায় তাঁর বাড়ি, আর কতদূরে?

সকলেই তাঁকে জানে, বলে, আরও কয়েক মাইল, আশায় নতুন ক'রে বুক বেঁধে আবার চলেছি। মাঝে মাঝে হাঁটু মুড়ে আসে, পথের ধারে ব'সে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চলেছি। ক্ষুধায় নাড়ীতে পাক দিচ্ছে, জীবদ্দশাতেই বায়ুভোজী হতে হয়েছে। শীতের দিনেও তৃষ্ণায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। সূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল ব'লে, তবুও চলেছি।

চলতে চলতে আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পড়লুম। পথের ধার দিয়েই রেল-লাইন চ'লে গিয়েছে। দু-একখানা বাড়ির গাড়িও দেখলুম আমাদের পেরিয়ে চ'লে গেল। এক জায়গায় মাঠে একদল ছেলেকে ক্রিকেট খেলতে দেখলুম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দু-চারখানা ইটের বড় বাড়িও চোখে পড়ল। লোকজনের চলন-ফেরন ও সাজ-পোশাকের মধ্যে একটু নাগরিক ভাবও লক্ষ্য করতে লাগলুম।

ক্রমেই রাস্তা জনবহুল হয়ে উঠতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমরা একটা ছোট শহরের মধ্যে অথবা কোন বড় শহরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। অজানা অপরিচিত হ'লেও শহরের মুখ দেখে আমাদের নাগরিক মন একটু খুশির দোলায় নেচে উঠল। ভাবলুম, আজ রাতে যদি একান্ত কোথাও আশ্রয় না-ই মেলে, তা হ'লে অন্তত ইস্টিশানে প'ড়ে থাকতে পারব।

পথের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি, নবাব সাহেবের বাড়ি কোথায়?

সকলেই প্রথমে অবাক হয়ে মুখের দিকে চায়। তারপরে বলে, এই সোজা চ'লে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরতে হবে, তারপরে ডাইনে—

সোজা গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে আবার ডাইনে ফিরে চলেছি। বোধ হয় আধ

মাইল যাবার পর আমরা একটা বাজারের মতন রাস্তায় এসে পৌঁছলুম, তার দু-দিকে সারি সারি দোকান-ঘর। দু-দিকের দুই সার গিয়ে মিলেছে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিংহদ্বারে।

সিংহদ্বারের ওপরেই একটা খোলা ছাদ, দূর থেকে মনে হ'ল, যেন সেই ছাদের ওপরে কারা ব'সে রয়েছে। তাদের পাশেই একটা উঁচু জায়গায় সোনালী রঙের কি একটা ছোট্ট জিনিস ঝকঝক করছে, অস্তরাগরঞ্জিত মন্দিরচূড়ার কনককুম্ভের মতন।

সিংহদুয়ারের কাছে এসে দেখলুম, সেখানে দু-তিনজন জঙ্গী উর্দিপরা বন্দুকধারী সিপাহী খটমট ক'রে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে, সামনেই একটা ভাঙা কামান সযত্নে সাজানো রয়েছে।

ভাবতে লাগলুম, এই প্রাসাদের মধ্যে কোথায় নবাব সাহেব আছেন, সেখানে আমাদের মতন অকিঞ্চন পৌঁছবে কি ক'রে! কাকেই বা তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করি! সেপাইদের সাজ-পোশাক ও যোয়ন-কেয়ন দেখলে তো বুকের রক্ত জল হয়ে যায়!

অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর বুক ঠুকে 'জয় বাবা বিশ্বনাথ' ব'লে এগিয়ে গিয়ে এক সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এটা কি অমুক নবাব সাহেবের দৌলতখানা?

ভেবেছিলুম, সিপাহীসুলভ ধমক ও তাড়া দিয়ে সে আমাদের দূর ক'রে দেবে, কিন্তু আমাদের অনুমান ব্যর্থ ক'রে অতি মিষ্টি সুরে সে বললে, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাও? কোথায় তোমাদের বাড়ি?

বাংলা দেশ।

সিপাহী বললে, ওই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চ'লে যাও, সেই ছাতে মালিক আর সৈয়দ সাহেব ব'সে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সৈয়দ সাহেব কে?

তিনি মালিকের হকিম। কোনও ভয় নেই, নির্ভয়ে উঠে যাও, কেউ কিছু বলবে না।

নির্ভয়েই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হওয়া গেল।

ওপরে উঠে দেখি, ভারতীয় চিত্রের আদর্শে একখানা উঁচু-নীচু ছাত, এখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে একটা ছাতে, ওখান থেকে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অন্য

ছাতে। ছাতের তিন দিক অর্থাৎ সামনে রাস্তার দিক ছাড়া, মানুষের চেয়ে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আর সেই দেওয়ালের মাঝে মাঝে চমৎকার সব বাহারে কুলুঙ্গি। খোলা ছাদের দেওয়ালে এমন সব সুদৃশ্য কুলুঙ্গি রাখবার মানে বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় সমতল দেওয়াল খারাপ দেখায় ব'লে বাহার করবার জন্যে সেগুলি করা হয়েছে।

সেখান থেকে কয়েক ধাপ ওপরে উঠে আর একটা ছাতে গিয়ে পৌঁছলুম। সামনেই দেখা গেল, একজন সঙিনধারী পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, ছবির মতন স্থির। অনতিদূরেই, ছাতের প্রায় সীমানায় রাস্তার দিকে মুখ ক'রে পাশাপাশি দুটো গদি-মোড়া চেয়ারে দুজন বৃদ্ধ ব'সে আছেন। অর্থাৎ আমরা মাত্র তাঁদের পিঠের দিকটাই দেখতে পেলুম। এক পাশে ঘড়াঞ্চের মতন উঁচু একটা কাঠের টেবিলের মতন জায়গায় একটা জরির টুপি, বুঝতে পারলুম এই টুপিটাই দূর থেকে মন্দিরচূড়ায় স্বর্ণকলসের মতন দেখাচ্ছিল, সূর্যাস্তের আভায় তখনও সেটা ঝকঝক করছিল।

আমাদের দেখে পাহারাদার জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই তোমাদের?

বললুম, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ওই তো মালিক সামনেই ব'সে আছেন।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম, দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি চোখ বুজে ব'সে আছেন। দুজনের মাথায়ই ধপধপে সাদা বাবরি-চুল ও মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। আন্দাজ করবার মতন বয়স তাঁদের পেরিয়ে গিয়েছে, তাই সেটা ঠিক অনুমান করতে পারলুম না। আমরা দুটো লোক যে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, পাশে কেন, প্রায় সামনে বললেও চলে, তা কেউ একবার ফিরেও দেখলেন না।

দুজনে একরকম নিশ্বাস বন্ধ ক'রে সেই ধ্যানী মূর্তিযুগলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁরা পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে ব'সেছিলেন, দেখতে দেখতে তাঁদের মুখের ওপর ছায়া ঘনিয়ে আসতে লাগল, জরির শিরস্ত্রাণ ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। একবার পাহারাদারের দিকে তাকালুম, দেখলুম, সেও নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তার করধৃত বন্দুকের মাথার কিরিচের ডগাটুকু চকচক করছে।

মনের মধ্যে কে যেন খোঁচা দিয়ে ধমকে উঠল, কল্পিনের এই দুরন্ত

পরিশ্রমের পর মন্দিরের দরজার কাছে এসে ফিরে যাবি? এখুনি ধরণী আঁধার হয়ে যাবে, তারপরে আবার সেই অন্ধকারে পথের ধারে শোওয়া—

অথচ এঁদের মধ্যে কে যে মালিক তা বুঝতে পারছি না, কাকে সম্বোধন করব! দুজনেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন।

আর দেরি নয়। এক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘাড় নীচু ক'রে কুর্নিশ ক'রে বেশ চেঁচিয়েই ব'লে ফেলা গেল, আদাব আর্‌জ্‌ মালিক!

দুই বৃদ্ধ একেবারে চমকে উঠে চোখ খুললেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মনে হয়েছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে তোমরা? কি চাও?

বললুম, মালিক, আমরা মুসাফির, বহুদূর দেশ থেকে আপনার নাম শুনে হাঁটতে হাঁটতে এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি, আমরা সারাদিন অভুক্ত ও পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, চারদিন অনবরত হেঁটেছি, আমরা দাঁড়াতে পারছি না এমন অবস্থা।

বৃদ্ধ অতি ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, এই—

অদূরেই যে শাস্ত্রী দাঁড়িয়েছিল, ডাক শুনে একরকম ছুটে এসে সে কুর্নিশ ক'রে সামনে দাঁড়াইতেই তিনি তাকে বিড়বিড় ক'রে কি যে বললেন, ধরতে পারলুম না।

কথাটা শুনেই লোকটা আবার সেই রকম দ্রুত পদক্ষেপে নীচে নেমে গেল। দু-তিন মিনিটের মধ্যে শাস্ত্রীর পেছনে একটা লোক দুটো মোড়া নিয়ে উপস্থিত হ'ল। বৃদ্ধ তাকে হুকুম করতেই সে মোড়া দুটো তাঁদের সামনে পাশাপাশি রেখে চ'লে গেল। তিনি আমাদের বললেন, ব'স এখানে।

আমরা দুজনে বসতেই তিনি জিজ্ঞাসা, করলেন তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতায়।

তা এই বয়সে তোমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ কেন? তোমাদের কি আপনার লোক কেউ নেই?

একবার মনে হ'ল, ব'লে ফেলি, হুজুর, দুনিয়ায় আপনার বলতে আমাদের কেউ নেই। কিন্তু কি জানি কেন, একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলতে বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল। বললুম, মালিক, আমাদের সবই আছে, কিন্তু আল্লা যার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তা তো ভোগ করতেই হবে।

বলা বাহুল্য, এই রকম সব বুকনি বিশুদার আড্ডায় হামেশাই লোকের মুখে শুনতুম, কিন্তু এত শিগগিরই যে সেগুলো কাজে লাগবে, তা তখন মনেই করতে পারি নি।

এবারে বৃদ্ধ আমাদের আর কিছু না ব'লে পাশে উপবিষ্ট অতিবৃদ্ধকে কি সব বলতে লাগিলেন। যে ভাষায় তিনি কথা বলতে লাগলেন, তা উর্দু নয়, নিশ্চয় ফারসী হবে। তবে কথার মধ্যে দু-তিনবার বাংগালী শব্দটির উল্লেখ করলেন।

তাঁর কথা শুনে অপর বৃদ্ধ উর্দুতে বললেন, ওদের মুসাফিরখানায় পাঠিয়ে দাও, ওরা খাবার ব্যবস্থা নিজে ক'রে নেবে 'খন।

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, আমরা যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলুম, তিনি আসল মালিক নন। যা হোক, মালিকের কথা শুনে তিনি বললেন, দেখ, আমাদের মালিকের মুসাফিরখানা আছে, সেখানে গিয়ে থাক। থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না। তবে তোমরা হিন্দু, আমাদের তৈরি খাবার তো তোমাদের চলবে না। আমাদের হিন্দু বাবুর্চিও নেই, সেইজন্যে আহারের ব্যবস্থা তোমাদের নিজে ক'রে নিতে হবে।

কথাটা শুনে দ'মে গেলেও মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আশাও উঁকি দিতে লাগল, যা হোক, থাকবার একটা জায়গা তো ভগবান ঠিক ক'রে দিয়েছেন, হয়তো আরও কিছু প্যাঁচ না ক'রে তিনি আহারের ব্যবস্থাটা করবেন না।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার মুখখানা ঘিরে একটা অপ্রসন্ন ভাব ফুটে উঠেছে। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হকিম সাহেবকে, অর্থাৎ যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁকে, কি একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় পরিতোষের আওয়াজ কানে এল। পরিতোষ চোস্ত উর্দুতে বললে, মালিক, একটা কথা আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই।

আসল মালিক যিনি এতক্ষণ চেয়ারে হেলান দিয়ে নির্জীবের মতন ব'সে ছিলেন, পরিতোষের কথা শুনে ধড়মড় ক'রে যতদূর সম্ভব সিধে হয়ে বললেন, বল বেটা, কি তোমার বক্তব্য শুনি।

পরিতোষ বললে, মালিক, আমরা যে ঘরের ছেলে সে ঘরে আমাদের বয়সী ছেলেকে একলা রাস্তায় বেরুতে দেওয়া হয় না, গাড়ি চাপা পড়বার ভয়ে। কিন্তু আমরা খোদার ভরসা ক'রে গৃহত্যাগ করেছি জীবনে উন্নতি করব ব'লে।

খোদার কৃপায় অনেক স্থানে আশ্রয়ও পেয়েছি, কিন্তু সব জায়গা থেকেই বিনা দোষে অপমানিত ও প্রহৃত হয়ে তাড়িত হয়েছি। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, কোথাও অন্নদাস হয়ে আর থাকব না। আপনি মালিক, বিশ্বসুদ্ধ লোক আপনার দয়ার গাথা গায়, সেই কথা শুনে তীর্থযাত্রীর মতন আপনার পায়ের কাছে এসে পৌঁছেছি। আপনার বিশাল রাজত্ব, এই রাজত্বের মধ্যে কোথাও যদি কোনও কাজ দয়া ক'রে দেন, তবেই আমরা থাকব, নইলে খোদার যা মরজি তাই হবে।

পরিতোষের কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে চন্‌মনিয়ে উঠলেন। হকিম সাহেব কিছুক্ষণ ধ'রে গড়গড় ক'রে ফারসীতে নবাব সাহেবকে কি সব বললেন, তার একটি বর্ণও বোধগম্য হ'ল না। তাঁর কথা শেষ হতে নবাব সাহেব আমাদের বললেন, কিন্তু তোমরা তো ছেলেমানুষ, এখনও খেলে বেড়ানোর বয়স পেরোয়-নি, তোমাদের ওপরে কি কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে?

এবারে আমি বললুম, হজুর, আপনার বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে যদি থাকে তো তাদের পড়াবার ভার আমাদের ওপর দিতে পারেন। ইংরিজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্রে আমরা এক-একটি দিগ্‌গজ। আমাদের বয়স দেখে আমাদের বিদ্যার মাপ করবেন না।

আমার কথা শুনে দুই বৃদ্ধ একেবারে অবাক! বোধ হয় পাছে নিজের বিদ্যা ধরে প'ড়ে যায়, সেইজন্য হকিম সাহেব এবার ফারসী ছেড়ে উর্দু ভাষাতেই নবাব সাহেবকে বললেন, বাংগালীর ছেলেরা খুবই তালিম-ইয়াফ্‌তা হয়। আমি কলকাতায় অনেকদিন বাস করেছি, আমি জানি।

দুই বৃদ্ধে পরামর্শ চলতে লাগল, কখনও ফারসীতে কখনও উর্দুতে। ওদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গেলেন, সামান্য একটু আলোতে তাঁদের মুখ দেখা যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলবার পর নবাব সাহেব আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, হ্যাঁ, আছে, বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে, আমার নাতি আছে। সে আমাদের লেখাপড়া কিছু কিছু জানে, কোরানশরিফ পড়তে পারে। তোমরা যদি তাকে বাংগালী, আংরেজী, সংস্কৃত, তারিখ ও আর যা যা বললে শেখাতে পার, তা হ'লে তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ তো থাকবই, তা ছাড়া তোমাদের আখেরে ভাল হবে।

মালিকের সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক। আমাদের যতখানি সাধ্য তার চেষ্টার ত্রুটি করব না, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।

আমাদের কথা শুনে কম্পিত করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে উঠলেন, আল্লাহ্!

আর্তনাদের মতন অস্বাভাবিক সেই কণ্ঠস্বর শুনে আমার বুকের ভেতরটা গুরগুর ক'রে উঠল। চেয়ে দেখলুম, তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, ধ্যানস্থ যোগীর মতন শীর্ণ শিথিল দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে উত্তোলিত—বার্ধক্যজনিত দুর্বলতায় কম্পমান। নিরন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুতে সেই অলৌকিক ছবিখানা ঝকঝক করতে লাগল, তারপরে সব অন্ধকার।

কিছুক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যানস্থ থেকে হাতখানা নামিয়ে নিয়ে নবাব সাহেব আমাদের বললেন, আল্লার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা কর বেটা, আমি কে! আমি তাঁর একজন অধম বান্দা মাত্র।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠতে দুজন লোক একটা তোলা চেয়ার ও একজন একটা বড় আলো নিয়ে উপস্থিত হ'ল। নবাব সাহেব আসন ছেড়ে সেই জরির টুপিখানা মাথায় দিয়ে তোলা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, চল আমার ঘরে। স্থবির হয়ে পড়েছি, ঠাণ্ডা লেগে গেলে আবার সবাই বিরক্ত হবেন। সেইখানে ব'সে ধীরে-সুস্থে তোমাদের কথা শোনা যাবে। চলুন সৈয়দ সাহেব।

আমরা সকলে একতলার একটা ঘরে এসে ঢুকলুম। চমৎকার ঘর, এর আগে এমন সুন্দর ঘর কখনও দেখি-নি। ঘরখানা নীচু, মাঝখানে একটা বড় ঝাড় ঝুলছে। আমরা এতদিন সাদা ঝাড়ই দেখেছি, এটা কিন্তু রঙিন ঝাড়, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশটা রঙ-বেরঙের গেলাসে মোমবাতি জ্বলছে। সিলিঙে কড়ি-বরগা কিছু নেই। সেখানে চমৎকার নক্‌শার মধ্যে লাল, নীল, হলদে, সবুজ, সোনালী চকচকে কাঁচ বসানো, তারই মধ্যে-মধ্যে গোল, চৌকো, ছকোণা আটকোণা, লম্বা আয়না বসানো। আগে কলকাতার সব শৌখিন পানওয়ালার দোকানের সামনে যেমন নানা রঙের ফাঁপা কাঁচের বল ঝোলানো থাকত, সেই রকম নানা রঙের অসংখ্য ছোট বড় গোলক সিলিং থেকে শিকল দিয়ে ঝোলানো রয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা রঙিন কাপড় মোড়া সুদৃশ্য পাখির খাঁচা ঝুলছে। ঘরের চারদিকের দেওয়ালেও সেইরকম সব রঙিন কাঁচ ও আয়না বসানো। মেঝেতে সুন্দর নরম কার্পেট পাতা, মনে হয় যেন

এইমাত্র কিনে এনে পাতা হয়েছে। এক কোণে একটা নেয়ারের খাটে সুন্দর বিছানা। খাটের এমন সুন্দর পায়া কখনও দেখি-নি, যেন চারটে যেঁটে মুগুর ও তাতে লাট্টুর মাথার মতন চকচকে রঙ করা। দেখে মনে হতে লাগল, আমরা যেন আরব্য উপন্যাসের একখানা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি।

ঘরের মেঝেতে পাতা সেই কার্পেটের ওপরেই সকলে বসলুম। একটু পরেই একজন চাকর এসে একটা লাঠির মাথায় বাঁকানো লোহা দিয়ে টপটপ ক'রে ঝাড়ের অর্ধেক বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

এই কদিনের অত্যাচারে শরীর ও মন এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, সেই ঠাণ্ডা আলো ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে ব'সে থাকতে থাকতে কেমন যেন একটা নেশায় দেহমন ভ'রে আসতে লাগল। নবাব সাহেব আমাদের নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন। বাড়িতে কে আছে, কেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—সেই সনাতন প্রশ্ন, তারপরে সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে হকিম সাহেব একবার হাই তুলে চোখ চেয়েই আমাদের বললেন, তোমাদের খুবই ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছে, অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?

বললুম, আমাদের শরীর ও মনের ওপর দিয়ে এ কদিন অমানুষিক অত্যাচার গিয়েছে, আমরা সত্যিই বড় ক্লান্ত।

হকিম সাহেব অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের দুজনের নাড়ী পরীক্ষা ক'রে মৃদুস্বরে নবাব সাহেবকে কি বলতেই তিনি চমকে উঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তো হিন্দু, আমাদের ঘরে খেলে তোমাদের তো জাত মারা যাবে। আজ না হয় বাজারের কোনও হিন্দুর দোকান থেকে খাবার আনবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, কিন্তু রোজ বাজারের পুরি-মিঠাই খেলে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

পরিতোষ এতক্ষণ দেওয়ালে হেলান দিয়ে একেবারে নিরঝুম হয়ে ব'সে ছিল, আহারের প্রসঙ্গ শুরু হতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে বললে, মালিক! যে হিন্দুর জাত মারা যায়, আমরা সে হিন্দু নই। আমরা আপনার এখানেই খাব, তবে আমাদের দেশের হিন্দুরা গরু শুয়োর খায় না, সেগুলো আর আমাদের দেবেন না।

পরিতোষের কথা শুনে হকিম সাহেব 'তোবা তোবা' ব'লে কানে হাত

দিয়ে বিড়বিড় ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে নবাব সাহেব অতি মিষ্টি সুরে পবিত্তোষকে বললেন, বেটা, তোমরা আমার ঘরে খাবে এ আমার সৌভাগ্য। নিশ্চিন্ত থাক, মোটা গোশ্ত্ আমাদের বাড়িতে ঢোকে না আর ওই যে জিনিসটির নাম করলে, ও জিনিসটি পৃথিবীর কোনও মুসলমানের ঘরেই স্থান পায় না, ও আমাদের হারাম।

এতক্ষণে হকিম সাহেব চোখ খুলে আমাদের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করলেন, অর্থাৎ কেমন হ'ল তো?

সেখানে খেতে রাজি হওয়ার দেখলুম, নবাব সাহেব আমাদের ওপর বেশ খুশিই হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা আমার বাচ্চার শিক্ষক হ'লে, তোমরা এ বাড়ির মাননীয় ব্যক্তি। আমি আর কদিন আছি! তোমরা ছাত্রকে সৎপরামর্শ দিও, আল্লা তোমাদের ভাল করবেন।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

দুইখানি প্রাচীন সাময়িক-পত্র

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ'।—"মাহ শ্রাবণ সন ১২৩৬ সাল"—ইংরেজী ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' নামে একখানি সাময়িক-"পুস্তকে"র "প্রথম খণ্ড" (পৃ. ৪৮) এবং পৌষ মাসে "২ সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। ইহার আর কোন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় না। কালাচাঁদ রায় 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়: "যাহার এই পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহুবাজারের গিরিধর বাবুর বাটীতে শ্রীকালাচাঁদ রায়ের নিকটে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ১ এক টাকা॥" ইহা "তিমিরনাশক যন্ত্রে প্রকাশিত ও মুদ্রাঙ্কিত" হইত।

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "অনুষ্ঠানপত্রে" এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

"আমরা সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার মানসে বিজ্ঞ জনক লোকের নিকটে জানাইতেছি যে তাহাতে নানাবিদেশীয় বৃত্তান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র ও আর২ বিষয়ের বিবরণ গৌড়দেশীয় সাধুভাষায় লিখিত হইবেক এবং এই দেশের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিশেষরূপে প্রকাশ

করা যাইবেক যাহাতে অন্য দেশীয় লোক অনায়াসে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়া যথার্থ ও অযথার্থ বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় লোকেরদের নীতি শিক্ষার্থে এবং জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থে অন্য২ দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরদিগের তর্কসিদ্ধান্ত এবং আমারদিগের শাস্ত্র হইতে তদনুযায়ি বিষয় সকল যাহা সংস্কৃত না জানিলে জ্ঞাত হইতে পারা যায় না তাহা ভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ করা যাইবেক…। তৃতীয় এই দেশীয় ব্যবহার ও চরিত্র এবং শাস্ত্র যাহা অন্য দেশীয় লোকেরা সবিশেষ না জানিয়া নানাপ্রকার দোষোল্লাস করিয়াছেন তাহা উদ্ধারণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রচলিত হইবার এবং তাহার তাৎপর্য্যতা জানাইয়া তাহারদিগকে নিষ্কলঙ্ক করিতে চেষ্টা করা যাইবেক পরন্তু গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহারদর্পণ সঙ্কেত করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্য দেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদাচার এবং সদ্ব্যবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক…।"

"অনুষ্ঠানপত্র" ও "ভূমিকা" ছাড়া 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা…'র ১ম খণ্ডে দুইটি প্রবন্ধ আছে:—১। Colonization কোলোনাইজেসিয়ান অর্থাৎ এতদ্দেশে ইংরাজ লোকের বসতি এবং জমীদারী প্রভৃতি কর্ম্ম করণ বিষয়; ২। পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনে ইংরাজী ভাষা আদালতে প্রচলিত হইবার বিষয়ে বিবেচনা। এই উভয় বিষয়েই 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'-কার ঘোর বিরোধী ছিলেন। "কোলোনাই-জেসিয়ান" ব্যবস্থায় যে-সকল অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার আলোচনা করিয়া উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন:—

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে কোলোনাইজেসিয়ান কোনক্রমে আবশ্যক হয় না। এবং এইক্ষণে যেরূপ নিয়মানুসারে সাহেব লোক ইউরোপ হইতে এখানে আসিতেছেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা বিনা অনুমতিতে যখন যেখানে যেচ্ছা তখন সেখানে আসিবেন ও বসতি করিবেন ইহা হইলে অধিক উৎপাত হইবেক। কোন২ স্থানে সাহেব লোক এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন যে তাহা বিবেচনা করিলে আমরা প্রার্থনা করি যে ঐ নিয়মের আরো প্রাবল্য হয় পরিবর্ত্তন কোন ক্রমে উচিত নহে।" (পৃ. ২৭-২৮)

আদালতে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী প্রচলন সম্বন্ধে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'-কারের বক্তব্য এইরূপ:—

"আমারদিগের সহস্র লোকের মধ্যে এক জন ইংরাজী জানেন তিনিও সাধারণ কর্ম্মোপযুক্ত কতকগুলিন কথামাত্র জানেন আদালতের কথার শব্দমাত্র শ্রুত আছেন। আমারদিগের পারস্য ভাষা লিখিবার এবং ইহাতে পারদর্শী হইবার অনেক উপায় আছে যেহেতুক প্রায় প্রতি গ্রামে ধনবান ও ভদ্র গৃহস্থ লোকের বাটীতে আখন আছে তাহারদিগের নিকটে অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে দ্বিতীয় ক্রোশ দুই ক্রোশের অন্তরে প্রায় সকল স্থানেই এ দেশের মধ্যে মোসলমান লোক বাস করিয়া আছে তাহারদিগের স্থানে অল্প ব্যয়ে অথবা বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন হইতে পারে কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করাতে অধিক ব্যয় অপেক্ষা করে এবং কলিকাতা ব্যতিরিক্ত প্রায় সর্ব্বত্র অধ্যয়ন হইতে পারে না এবং যদ্যপিস্যাৎ আমারদিগের মধ্যে কেহ ভালরূপে ইংরাজী শিখিতে পারেন তথাপি বিলাতীয় উকিল কৌন্সলির ন্যায় আদালতের কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন না ... ... কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা পারসিতে জবানবন্দি ও রুবকারি ও আর২ কাগজ পত্রাদি অনায়াসে উত্তম রূপে লিখিয়া আদালতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি অতএব পারস্য ভাষা রহিত হইয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিত হওয়াতে অনেক প্রকারে উৎপাত হইবেক এবং কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মিবেক ও কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা ভার হইবেক অতএব সুযোগ কিছুই দেখা যায় না... ।" (পৃ. ৪৩-৪৫)

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র অনুষ্ঠানপত্র এবং প্রবন্ধ দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উহা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিত।

'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা" প্রবন্ধে ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) কিঞ্চিৎ অসতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে রামমোহনের স্কুলের ছাত্রগণের একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সভা স্থাপন হইতে মনে হয় যে উভয়ের যোগ আছে।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা'র প্রকাশকাল— ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। কিন্তু রামমোহনের স্কুলের ছাত্র-সভা স্থাপিত হয় উহার এক বৎসরেরও কিছু দিন পরে—প্রভাতবাবু নিজেই বলিয়াছেন, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে। তাহা হইলে "একই বৎসর এই পত্রিকা ও ঐ একই মাসে...প্রতিষ্ঠিত সভা" কথাগুলি প্রভাতবাবু লিখিলেন কেমন করিয়া?

প্রভাতবাবুর মতে, "রামমোহন-ভক্তের দল সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন।...প্রথম খণ্ডে 'এতদ্দেশে গোরালোকের বসতি এবং জমিদারী বিষয়' ও 'পারস্ত ভাষা পরিবর্ত্তনে আদালতে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবার বিষয়' আলোচিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উহা রামমোহন-দলীয় সাময়িক পত্রিকা।" প্রভাতবাবু রামমোহন-ভক্তদের অযথা প্রাধান্য দিতে গিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। রামমোহন বা রামমোহন-ভক্তেরা কলোনাইজেশনের সমর্থনই করিয়াছিলেন, ইহা জানা কথা। কিন্তু 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' করিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত ; উহা "রামমোহন-দলীয় সাময়িক পত্রিকা" হইলে এরূপ সম্ভব হইত কি ? 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' যেমন রক্ষণশীল মতবাদী ছিল, তেমনি আবার উহার প্রকাশকও ছিল রক্ষণশীল-দলের একটি প্রতিষ্ঠান ; উহা "শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস দাসের" "তিমিরনাশক যন্ত্রে প্রকাশিত এবং মুদ্রাঙ্কিত" হইত। 'তিমিরনাশক' সংবাদপত্র সে-যুগে রক্ষণশীল-দলের সমর্থনকারী ছিল ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য)। 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' প্রগতিশীল রামমোহন-ভক্তদের সাময়িক পত্রিকা হইলে, রক্ষণশীল-দলীয় প্রতিষ্ঠান কখনও উহার প্রকাশক হইতে পারিত না।

'বীণা'।—১২৮৫ সালের বৈশাখ (১৮৭৮, এপ্রিল) মাস হইতে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় একখানি অভিনব মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ; উহা 'বীণা (নানাবিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী মাসিক পত্রিকা)'। কেবলমাত্র কবিতা-পরিপূর্ণ মাসিক পত্রিকা ইহাই প্রথম। 'বীণা' চারি বৎসর চলিয়াছিল। ইহার পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি ১ম বর্ষের সংখ্যাগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে।

'বীণা'র ১ম সংখ্যার সূচনায় সম্পাদকের রচিত একটি গীত মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা এইরূপ :—

গীত।

ঝিঝিটী—একতালা।

(আস্থায়ী)

বাজল বীণা, নাচল জল,
বিজলী চমকে জলদ-গায় ;

টুটল নিদ, ফুটল ফুল,
সচল ভেল অচল বায়।
(অন্তরা)
বাণী-বীণা বাজে ধীরি ধীরি,
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি ;
থেত্তা থিথি, তেত্তা তিতি
সঙ্গত ধীর মধুর তায়।
(সঞ্চারী)
ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
গুঁজরি' গুঁজরি' করত রঙ্গ,
তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ !
তুঁ ভি গা রে সুর মিলায় ;
(আভোগ)
নয়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ ;
নমহুঁ বীণাপাণি-পায়।

ক্রোড়পত্রী-রূপে গীতটির একটি স্বরলিপিও ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্তুতর সঙ্গীত-অধ্যাপক মদনমোহন বর্ম্মণ-কৃত। প্রথম বর্ষের 'বীণা'র ক্রোড়পত্রী-রূপে সর্ব্বসমেত ৮টি বাংলা গানের স্বরলিপি স্থান পাইয়াছে ; তন্মধ্যে ৩টি অধ্যাপক মদনমোহন বর্ম্মণ, ৩টি বৈকুণ্ঠনাথ বসু ও ২টি অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-কৃত। প্রথম বর্ষের 'বীণা'র সহিত পরিচয় থাকিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীকার শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিতেন না যে :—"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিক-পত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।" 'বীণা'র এক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী'র আবির্ভাব বটে, কিন্তু প্রথম তিন বৎসরের 'ভারতী'তে কোন স্বরলিপি মুদ্রিত হয় নাই, চতুর্থ বর্ষে "স্বর-রহস্য" প্রবন্ধে (মাঘ ১২৮৭, ইং ১৮৮১) একটি গীতের স্বরলিপি আছে। 'সাধনা' 'বীণা'র অনেক পরে প্রকাশিত। প্রকৃতপক্ষে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কথা ও সুর-সম্বলিত

স্বরলিপি প্রকাশের গৌরব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র। 'বীণা' প্রকাশের প্রায় ৯ বৎসর পূর্ব্বে—১৭৯১ শকের কার্ত্তিক (ইং ১৮৬৯, অক্টোবর) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী" ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। স্বরলিপি-কার সম্ভবতঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—"বাঙ্গালার প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। শৌরীন্দ্রমোহন [ঠাকুর] তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল।"—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ২০৪।

প্রথম বর্ষের 'বীণা'র অধিকাংশ রচনাই সম্পাদকের। অন্যান্য লেখকগণের মধ্যে বহরমপুরের রামদাস সেন, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জানেন ?

"জানেন ? আমরা সিংহ ছিলাম
মধ্য এশিয়া দেশে,
যদিও এখন ঝাঁদাড়ে পাঁদাড়ে
ঘুরিতেছি এই বেশে।
চক্ষে মোদের থাকিত আগুন,
মাথায় কেশর-তাজ,
নখরে জ্বলিত ছোরার দীপ্তি,
কণ্ঠে বাজিত বাজ।
লম্ফে লম্ফে হতাম আমরা
গিরি মরুভূমি পার,
থাবার আঘাতে মেরেছি কতই
হাতী ঘোড়া গণ্ডার।
জানি না মোদের পূর্বপুরুষ
কিসে যে ভুলিয়া গেলেন,

খাইবার পাস অতিক্রমিয়া
এ দেশে চলিয়া এলেন।
বহু শতাব্দী এই পোড়া দেশে
বাস করিবার পর
এই দশা হায় হয়েছে মোদের
কণ্ঠে ফোটে না স্বর।
ধোঁয়ার ভয়েতে পালাই, এখন,
পাখার বাতাসে ডরি,
আঁধারে আড়ালে লুকাইয়া থাকি,
শিশুর চাপড়ে মরি।
এই দুর্দশা হয়েছে জানেন
জল-বাতাসের গুণে—"
কর্ণকুহরে কহিল মশক।
অবাক হইনু শুনে।

"বনফুল"

কোন্ পথে

নরহরিবাবুর কলকাতার বাসায় আজ সকালে দেশ থেকে কানাই মণ্ডল আর শ্রীনাথ মণ্ডল এসে উপস্থিত। ওরকে ওরা কানু মোড়ল আর ছিনাথ মোড়ল। নরহরিবাবুর দেশের জমি ওরা ভাগে চাষ করে। নরহরিবাবু অর্থাৎ নরু বাঁড়ুজ্জে আদার-তহশীলে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিলেন ওদের কাছ থেকে। চাষীদের কলকাতা আসা বড় হয়ে ওঠে না; এ সময়ে আবার সাম্প্রদায়িক আতঙ্ক। তাই দিনে দিনেই এরা শহরে আসার কাজগুলো, যথা:—হাঁপানির জন্যে ইকাজোল ট্যাবলেট, দুই বউয়ের জন্যে দু জোড়া ঢাকাই শাঁখা, এক শিশি আলতা, আর একখানা যশোরের চিরুনি কেনা শেষ ক'রে, সন্ধ্যায় দুই ভাই নরুবাবুর খাস কামরায়, মানে বাইরের ঘরে, মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর ব'সে আছে। শীত পড়ি পড়ি করায় কানু মোড়লের হাঁপানির টানও উঠি উঠি করছে; তাই গায়ে তার একখানা গায়ের কাপড় জড়ানো। ছিনাথের গায়ে হাফ-শার্ট। নরুবাবু বনাত-মোড়া টেবিলের ধারে সাজানো

চেয়ার-শ্রেণীর একখানিতে নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে, সন্ধ্যা সাতটায়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে সস্তায়-কেনা একস্রোত বেতার মারফৎ ইংরেজীতে সংবাদ শুনছেন। ভদ্রলোক ওকালতি এবং শেয়ার-মার্কেট করেন। দুর্ভিক্ষ এবং সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ঊর্ধ্বে এঁর অবস্থান; তাই চোখে মুখে নাকে কানে অব্যাহত প্রশান্তি।

চাকর টেবিলে চা দিয়ে গেল, ধোঁয়ায় তার সুরভি গিয়ে ঢুকল ছিনাথ আর কাদুর নাকে। চায়ের যে এমন গন্ধ হতে পারে, তা এদের জানবার কোন সুযোগও হয় নি, অবকাশও মেলে নি। একবার কেশে নিয়ে কাদু বললে, খাসা খোসবু তো!

নরু বাঁড়ুজ্জে নীরবে আত্মস্ফীতির ক্ষীণ হাসি হাসলেন। বেতারে সংবাদটুকু পাছে ফসকে যায়, এইজন্যে উত্তর দিলেন না। মেয়ে চপলা ঘরে ঢুকে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে নেহাৎ ব্যবহারিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, বাবা, তুমি রাত্তে লুচি খাবে, না রুটি? বাবার উত্তরের জন্য কোনরকম উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রেই চপলা পাশের টিপয়ে রাখা 'বেতার-জগৎ'খানা তুলে নিয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব'লে উঠল, সময়মত একখানা নতুন 'বেতার-জগৎ' তুমি আর কিছুতেই কিনে উঠতে পারলে না বাবা। নরু বাঁড়ুজ্জে সে কথাতেও নির্বাক। চপলা চকিতে সেদিক থেকে মুখ ফেরাতেই চোখে প'ড়ে গেল চাষী দুজন—তার দিকে নিক্ষিপ্ত-দৃষ্টি। তাদের শ্রদ্ধাহীন বিস্ময়ের আঘাতে অপমানিত, অথচ আদৃত হয়ে সে কি করবে ভেবে ঠিক না করতে পেরে ঝপ ক'রে গিয়ে বেতারের প্লাগ খুলে দিলে; বললে, কী ওই একঘেয়ে দাঙ্গার খবর শুনছ? তার চেয়ে—

নরু একটু বিরক্ত মুখে বললে, এদের দুজনকে দু কাপ চা পাঠিয়ে দাও গে; আর আমি লুচিই খাব।

এখন আবার চা?

কাদুর বয়স বেশি। সে মূক বিস্ময় কাটিয়ে ভদ্রতার আবেগে ব'লে উঠল, না না, বাবু, আমাদের চা খাওয়ার—

নরু। হরিকে বল না, ক'রে দেবে।

আচ্ছা, মাকে বলি গে।—ব'লে বেতারের প্লাগ লাগিয়ে দিতেই গান বেজে উঠল, প্রিয় হে প্রিয়, ফিরাবে কি শূন্য হাতে…

চপলা স্থির হয়ে গেল চেয়ারে।

নক ডেকে উঠলেন, হরি! হরি আসতেই বললেন, দু কাপ চা ক'রে এনে দে এদের।

কানু। ছেড়ে দ্যান বাবু। চা তো আমাদের খাওয়া অব্যেস নেই।

অতি ভদ্র অথচ কঠিন আদেশের স্বরে নক বললেন, অভ্যাস না থাকলেও খেতে দোষ কি? তোমরা যে আজ আমার অতিথি।

ছিনাথ এতক্ষণে কথা কইল, তাইলে অতিথকে দুটো মুড়ি-গুড়ি দিতে বলুন ক্যানে বাবু? ও চা-পানিতে আমাদের ক্ষিদের কিছু হয় না।

নক বড় লজ্জিত হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের জল খেতে দেওয়া হয় নি?

চপলা গান শোনার এই বারম্বার ব্যাঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠে চ'লে গেল ঘর থেকে। ছিনাথের বয়েস কম, তাই মুখের বাঁধও কম; ব'লে ফেললে, আপনার এ মেয়েটি বড় বেয়াড়া বাবু।

কানু। এই ছিনাথ!

নক কথাটি শুনেও না শুনে ছিনাথকে বললেন, ওইটে একটু খুলে দাও তো হে।

বেতারে তখনও গান হচ্ছে—সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে··

ছিনাথ। ওসব কল-কব্জার ব্যাপার বাবু, ছুঁতে ডরাই। ও তো বলদের ল্যাজে মোচড় মারা নয়। ওটি পারব না।

তোর সব তাতেই ভয়!—ব'লে কানু উঠে প্লাগটায় এক টান মারতেই এদিকে তারে টান প'ড়ে ছোট্ট বেতার-যন্ত্রটি প্রথমে একটু হেলে তার পরেই দুম ক'রে নীচে প'ড়ে গেল। ব্যাপারটি ঘটল ক্ষণিকেই। নক বাঁড়ুজ্জে লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে। কানু একান্ত অপ্রস্তুত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে ভূলুণ্ঠিত বেতার-যন্ত্রটিকে আঁকড়ে ধরতে যেতেই তিনি ব'লে উঠলেন, রাখ রাখ, আর কেরামতি দেখাতে হবে না। তখনই জানতুম—। তারপর সম্ভবত-ভগ্ন যন্ত্রটা যথাস্থানে তুলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছিনাথ। বলছু, তা শোনা হ'ল না। ওসব বাবুদের জিনিস; হাত দিতে গিয়ে কেন বেকুব হওয়া?

ভেতর থেকে চপলার কণ্ঠ পাওয়া গেল, বাবা যত চাষাভুষো জুটিয়ে

আনবে! ভাঙবে না তো কি হবে? দেখ আবার, রাতে চুরি ক'রে পালায় কি না!

এ কথার কেউ প্রতিবাদ করলে না।

কানু রইল মাথা নীচু ক'রে আর ছিনাথ উঠল দাঁড়িয়ে; তার বয়েস কম, তাই চোখ দুটোয় ঘনাল হিংসা, রূপকে বলা চলে—জ্ব'লে উঠল। কাস্তে আর লাঙল-ধরা হাতে শক্ত হয়েই রইল মুঠো। একটু পরে ছিনাথ আপন মনেই বললে, দেখে লোব কেমন ক'রে ধান আদায় করে! গতর খাটিয়ে ফসল ফলাব আর বছরে একবার পদার্পন ক'রে ফসলের আদ্দেক নিয়ে আসবেন! তার ওপর আবার চোর! দেখে লোব এবার!

কানু। ক্যানে বকছিস ছিনাথ? এসব কতা কানে গেলে অন্ত ভাগীদারকে জমি বিলি ক'রে দেবে, তখন?

দেয় যেন তাই একবার। চোর, অ্যাঁ, চোর!

চোর না হ'লেও চাষা তো আমরা বটি।

যে চাষ করে, সেই চাষা। বলি চোরই যদি হব, তা হ'লে বাবুদের পেট চলছে কেমন ক'রে? ধান তো সব ইচ্ছে করলেই মেরে দিতে পারি। চাষা! চাষা না হ'লে তো চলে না!

ওরে, খেটে খেলেই লোকে হেনস্তা করে।

নরুবাবুর ছেলে একেন্দ্র, ডাক-নাম এঁদো, ঘরে ঢুকেই চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে এদের দিকে তাকিয়ে বললে, কানাই আর শ্রীনাথ, তোমাদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক মনোভাব কি রকম?

সাম্প্রদায়িক মনোভাব কথাটা এরা বোঝে না; অত বড় কথার প্রয়োজন এদের জীবনে কখনও হয় না।

এঁদো ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে ব'লে উঠল, আরে, তোমরা নীচে ব'সে কেন? এস এস, এই তো এতগুলো চেয়ার রয়েছে। কাছাকাছি না বসলে কথা বলার স্থবিধে হয় না।

একটু আগেই ঘনিষ্ঠ হতে যাবার ফলে যে অপমান সইতে হয়েছে, তার পরে আবার এই ঘনিষ্ঠতার বাবু-স্থলভ প্রচেষ্টায় এরা শঙ্কিত হয়ে উঠল; চেয়ারে এসে বসবার কোনও লক্ষণই দেখালে না কেউ।

তা হ'লে আমাকেই নীচে নেমে বসতে হয়।—ব'লে এঁদো নামতে যেতেই

ছিনাথ ব'লে উঠল, আমরা, বাবু, চাষাভুষো মানুষ। আপনাদের সঙ্গে একখানে বসি নাই কোনদিন। আমাদের নীচেই ভাল।

গম্ভীর স্বরে এঁদো বললে, সব মানুষই সমান শ্রীনাথ, কেউ ছোট বড় নয়। তোমরা নিজেদের ছোট মনে করছ, কিন্তু তোমরা চাষ না করলে আমরা খেতাম কি?

ছিনাথ চমকে উঠল, এ কেমন কথা! কানু উত্তর দিলে, তা হ'লেও বাবু, আপনারা আর আমরা কি সমান? আপনি ওইখানেই বসুন।

আমি নেমেই বসতাম, কিন্তু অভ্যাস নেই, গায়ে লাগবে, তাই বাধ্য হয়ে এইখানেই রইলাম। তবু জেনে রেখো কানু, এই উঁচু-নীচু, জাত-বেজাত, এই সবই দেশের যত অনিষ্টের গোড়া। এই যে আজ মুসলমান হিন্দুকে মারছে আর হিন্দুরাও সুবিধেমত প্রতিশোধ নিচ্ছে, এর মূলেও ওই ছোঁয়াছুঁয়ি, আর—

ছিনাথ। ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে তো আপনারাই বাবু বাড়াবাড়ি করেন। আমরা মুসলমানের সঙ্গে একসঙ্গে ভুঁয়ে ধান কাটি, কিন্তু আপনারা আমাদে[র] স্বজাত হ'লেও হাতে জল খান না, নমঃশূদ্দুর ব'লে এড়িয়ে চলেন।

তবেই বোঝ। ওই কথাই তো বলছি আমি। আমাদের স[ব] এক হয়ে যেতে হবে, কৃষক-মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কানু তাকিয়ে ছিল জানলা দিয়ে বাইরের দিকে; আস্তে আস্তে বললে দেবতা আবার বর্ষালেই তো হয়েছে!

এঁদো। হ্যাঁ, ধানের ক্ষতি হবে।

ছিনাথ হেসে উঠে বললে, ধান তো পেকে গিয়েছে, তার আর কি হবে নষ্ট হবে আলু।

এঁদো। কেন, নতুন আলু তো উঠে গিয়েছে।

কানু। একবার ফেললেই তো সারা সন চলে না। প্রথম ক্ষেপের ফস[ল] উঠে গেলে আবার তো রুইতে হয়েছে।

এঁদো। এই যে জমি তোমরা চাষ কর, এ জমির মালিক কারা জান?

ছিনাথ। আপনারা।

এঁদো। না, তোমরা। তোমাদের শ্রমে যে শস্য উৎপন্ন—

জগদা নীলাম্বরে ঘরে ঢুকেই ব'লে উঠল, এই যে, তুমি আবার এদের নি

পড়েছ! বাবা একবার রেডিও বোঝাতে গিয়ে সেটা ভাঙিয়েছে, আবার তুমি এদের কমিউনিস্ট ক'রে তোল।

কানু লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল, আর ছিনাথের মুঠো আবার হয়ে উঠল শক্ত।

এঁদো। কে ভাঙলে রেডিও?

চপলা। ওই ওরাই— তোমরা কৃষক-রাজারা।

এঁদো একান্ত বিরক্তিতে ব'লে উঠল, যত সব! আজকে মীরা সেনের গান ছিল স-আটটায়। তারপর চেয়ার থেকে উঠে বললে, যাই, আজকের এই অ্যাটেম্প্‌টুটার একটা স্টেট্‌মেণ্ট পার্টি-অফিসে পাঠিয়ে দিই গে। ওহে, তোমাদের পুরো নাম দুটো কি?

কানু। আজ্ঞে, শ্রীকানাইচরণ মণ্ডল আর শ্রীছিনাথ মণ্ডল।

এক টুকরো কাগজে নাম দুটো লিখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, গ্রাম, পোস্ট-অফিস, জেলা সব ব'লে যাও।

দুই ভাই-ই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল এঁদোর দিকে; ধান কেড়ে নেবার সময় সরকার বাহাদুরও ওই রকম নাম-ধাম আগে থাকতে লিখে নিয়েছিল কিনা। আজকালও আবার পুলিসের লোক এসে জোয়ান ছেলেদের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছিনাথের বয়েস এই মোটে পঁয়ত্রিশ, জেলে যাবার উপযুক্ত। স্বাস্থ্য ভাল হওয়া আজকাল দণ্ডনীয় অপরাধ কিনা।

তাই দুজনেই রইল চুপ ক'রে।

এঁদো কাগজে কি সব লিখছিল; এদের দীর্ঘ নীরবতায় মুখ তুলে তাকিয়ে, কিছু বিশেষ না বুঝে, প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে।

কানু। বড়বাবু তো সকলই জানেন; তেনাকেই শুধিয়ে লেবেন।

এঁদো। নিজেদের গ্রামের পোস্ট-অফিসের নামটাও জান না বুঝি! হুঁ!

বুকের মধ্যে থেকে উৎস-কলম বের ক'রে টেবিলে ব'সে কি একটা লিখছিল চপলা; হেসে উঠে বললে, তাই যদি জানবে, তা হ'লে ওদের এই অবস্থা হয়!

অবস্থা যে খারাপ তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে; কৃষক এবং শ্রমিক-কর্মীর তো তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে চলবে না। তাই এঁদো আবার কোমর বেঁধে লাগল, বলি, পোস্ট-কার্ড কেনো যে জায়গা থেকে, তার নামটা জান তো?

মেয়েটার এই নিকুণ্ঠ বেহায়াপনায় এবং এঁদোর সন্দেহজনক দরদে ছিনাথ বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠল, অত খবরে আপনার হবেটা কি বাবু? তারপর কানুর দিকে ফিরে বললে, চল দাদা, বেরিয়ে দোকান হতে কিছু খেয়ে আসা যাক। কথার শেষে সে উঠে দাঁড়াতেই কানুকেও উঠতে দেখে চপলা আর এঁদো একসঙ্গে ব'লে উঠল, আরে, যাচ্ছ কোথায়? সন্ধ্যা সাতটা থেকে কার্ফিউ; এখন বেরোলেই পুলিসে ধরবে।

ছিনাথ। পুলিসে ধরবে ক্যানে? আমরা কি চোর-ছ্যাচোড়?

এঁদো। আরে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হচ্ছে, তাই সাতটার পর রাস্তায় আর কারও বেরুনো নিষেধ।

কানু। আমরা ত বাবু দাঙ্গা করি নাই। আমাদের ধরবে কিসের লেগে?

এঁদোর ধৈর্য-চ্যুতি হ'ল; 'কিসের লেগে' ব'লে কানুকে প্রায় ভেঙিয়েই ব'লে উঠল, একেবারে অজ। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

চপলা ঘরে একা।

প্রিয়তম সেন হঠাৎ ঘরে ঢুকেই চপলাকে একমনে লিপি-লেখন-ব্যাপৃতা দেখে অতি সন্তর্পণে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে তার দুই চোখ চেপে ধরতেই সে 'ও মা' ব'লে তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়াল। প্রিয়তম হাত খুলে নিয়ে হাসতে লাগল। চপলা হেসে হেসে বলতে লাগল, দেখ তো, লেখাটা নষ্ট ক'রে দিলে।

ঘরের এক কোণে কানু আর ছিনাথ যে ব'সে আছে, তা যেন এদের শুধু লক্ষ্য নয়, চেতনারও বাইরে। কানু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় আকাশের অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করছে আর ছিনাথ ভাবছে, এরা স্বামী-স্ত্রী ব'লেও বোধ হয় না, আবার না হ'লেই বা এমন মাখামাখি রসিকতা করে কেমন ক'রে!

তারপর, আজ কোথায় কটা খুন হ'ল বল।—ব'লে চপলা প্রিয়তমকে হাত ধ'রে চেয়ারে বসাতে গিয়ে ঘরের কোণে এদের ওপর চোখ পড়ায় বললে, চল, ও ঘরে যাই; এখনই আবার বাবা এসে জমিদারির কথা পাড়বে।

প্রিয়। ও ঘরে মানে?

আর্টিজান, বহুপ্রবেশ-কেঁপে-ওঠা, ছটি দু মাসে চলা মধ্যবিত্ত-ঘরে বাড়তি বাইরের ঘর থাকে না, এ বাড়িতেও নেই। নরহরিবাবু চিরকালই গোঁফে

দই লাগিয়ে থাকেন। তাই এতদিন পরে অন্ত ঘরের কথায় প্রিয়তমের বিস্ময়। কিন্তু ব'লে ফেলে এবং ছিনাথের সরল সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সামনে আর দাঁড়ানো চলে না। তাই 'এস না' ব'লে তার হাত ধ'রে চপলা বেরিয়ে গেল। আবার অন্ত ঘরে ক্যানে?— ভাবলে ছিনাথ। কানু সেই বাইরের দিকেই তাকিয়ে ছিল; এইবার ফিরে তাকাল ভাইয়ের দিকে। দীর্ঘদিনের দাসবৃত্তিতে প্রকাশ-পরাঙ্মুখ তার মুখে চোখে যে কি ভাব ফুটে উঠেছিল, তা বলা শক্ত। সব-কিছু মেনে নিয়ে নিয়ে আজকে আর রাগ বা ব্যঙ্গ করবার জোরটুকু সে খুঁজে পায় না।

ছিনাথ ব'লে উঠল, আমরা যেন মনিস্যিই লই, অ্যাঁ!

রাগ জল ক'রে নরু বাঁড়ুজ্জে ঘরে এসে ঢুকলেন আবার। খামকা রাগ ক'রে তিনি শক্তি এবং কাজ নষ্ট করেন না। তিনি এসে বসতেই ছিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, বাবু, কাছে কোথাও দোকান-টোকান—

নরু মাঝখানেই বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, সেসব ঠিক হবে; তোমাদের ভাবতে হবে না। এখন বল দেখি, লঘু-ধান কেমন হ'ল?

কানু। যেমন হয় তেমনিই হয়েছে বাবু।

নরু। অর্থাৎ এবারেও কিছু দিতে চাও না?

ছিনাথ বারে বারে কারণে-অকারণে এই চুরির অপবাদ সইতে না পেরে একেবারে তেলে-বেগুনে জ'লে উঠল। ধান অবশ্য ভাগে নরুবাবুর যা ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য, তা তারা তাঁকে দিতে পারে না। সারা বছর গতর খাটিয়ে সোনার ধান কখনও আর একজনকে প্রাণে ধ'রে হাতে তুলে দেওয়া যায়! আর নিজে খাবেই বা কি সারা বছর? তাই দু-চার মণ কম দেয়। তাতে নরু বাঁড়ুজ্জের এমন কি আসে যায়? তিনি তো ধান বিক্রি ক'রে টাকা এনে ঘরে তোলেন। জমির ধান থেকে তাঁর খাওয়া-পরা যদি চলত, তা হ'লেও না হয় কথা ছিল। দু-দশটা টাকা কম পাওয়ায় তাদের চোর অপবাদ দেওয়া! তারা যদি জমি চাষ না করে, পারেন উনি নিজে চাষ ক'রে ফসল ফলাতে? ছেলে বেড়াচ্ছেন টেরি বাগিয়ে, মেয়ে বেড়াচ্ছেন চুল ফাঁপিয়ে— বলি, এসব হ'ত কোথা থেকে?

এতগুলো ভাবনা চকিতে খেলে গেল তার মনে। কানু প্রত্যুত্তর দেবার আগেই সে ব'লে বসল, অত যদি সন্দ, জমি ভাগ দিয়ে মনিরুদ্দির ছেলেদের। কত ধান পান তা একবার দেখে লোব।

নরু তার দিকে সোজা তাকিয়ে উত্তর দিলেন, তাই দিতে হবে দেখছি।... তা আমন কি রকম ফলন হ'ল এবার ?

কানু। নামো জমিটা তো বানে ডুবে—

নরু চ'টে উঠে বললেন, প্রত্যেক বারই বানে ডোবে, না ?

কানু। আজ্ঞে, সব বারেই কি আর—

ছিনাথ। আপনার একার তো ডোবে নাই, আরও অনেকের ডুবেছে। ওনাদের শুধোলেই তো পারবেন।

নরু। বলি, ছিনাথের এত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা হ'ল কবে থেকে রে ?

কানু তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টায় অনুতপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, ওর কথাই ওই রকম, কাকে কি বলতে হয় তা কোনদিন যদি শিখবে !

হুঁ।—ব'লে হরির নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে নরু বাঁড়ুজ্জে আবার বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই কানু ভাইয়ের অবিমৃষ্যকারিতায় আকুল হয়ে কি ক'রে বাবুকে সন্তুষ্ট করবে ভেবে না পেয়ে ব'লে ফেললে, বাবুর জামাইটি খাসা হয়েছে।

নরু। জামাই !

কানু বুঝতে না পেরে নিজের কথাটা আরও বুঝিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে দিদিমণির সঙ্গে আপনি আসার একটু আগেই ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন।

নরু একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কানু ব'সে রইল বিহ্বল হয়ে। ছিনাথ তখন বললে, ও জামাই ক্যানে হবে ? ও হ'ল দিদিমণির স্যাঙাৎ।

কানু। তুই থাম্ দিকি।

খিদেয় পেট জ্বলছে, এদিকে উনি বলছেন থামতে !—ব'লে ছিনাথ জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে বললে, বাড়ির বার হ'লেই আবার পুলিসে ধরবে। শালার যত ঝাটা !

সামনে দিয়েই প্রিয়তম বেরিয়ে গেল। ছিনাথ বললে, উনি যে গেলেন ? ওনাকে বুঝি ধরবে না ?

কানু। ওনারা বাবু লোক, ওনাদের ধরবে কিসের লেগে ?

ছিনাথ। দেখ দাদা, তোমার এই 'বাবু বাবু' আমার গায়ে যেন ঝাঁটা মারে।

কান্থ। তুই একটা মুখ্যু। যদি ভাগীদার বদলে দেয় ?

দিলেই হ'ল। দেখে লোব একবার।—ব'লে ছিনাথ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

ভেতর থেকে এঁটো বাসন নামানোর শব্দ এল। প্রলুব্ধ হয়ে উঠল ছিনাথ, কান্থ বসল দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে।

নারীকণ্ঠ এল, ওই ওরা যে খাবে, তা আজ কলাপাতা তো আনানো হয় নি।

তা হ'লে থালাতেই—

চাকরটি হয়েছেন ফুলবাবু। তিনি ওদের এঁটো বাসন মাজবেন না।

ছিনাথ। আমরা কি মানুষ নই, অ্যাঁ ?

কান্থ। আমরা নীচ জাত তো বটি।

ছিনাথ। ছোটবাবুটি যে আমাদের চেয়ারে বসাতে চেয়েছেন !

কান্থ। বাবুরা ও রকম ব'লে থ্যাকান ; তাই ব'লে কি আর সত্যিই আমরা বসিছি ?

ছিনাথ। দেখ দাদা, কতদিন তোমাকে বলিছি, চাষ-বাস ছেড়ে শহরে এসে চাকরি কর ; তা নইলে এই চাষা নাম ঘুচবে না। যেথায় যাও, যা কর, সমুচু লোকের মুখে ওই একই কথা—ওরা চাষা। করুক গিয়ে বাবুরা চাষ-আবাদ, যত পারে ধান ফলাক।

কান্থ। কত জলে কত মুসুরি ভেজে তা জানলে আর—

বাইরের দরজায় দমাদম ধাক্কার সঙ্গে বাইরে থেকে এল বহু লোকের আক্রমণাত্মক চীৎকার।

বাইরে প্রিয়তমের গলা—দরজা খোল, দরজা খোল শিগগির। তার আকুল কণ্ঠস্বরে চপলা ছুটে এসে দরজা খুলে দিতেই শুধু প্রিয়তম নয়, আরও অনেকে ঢুকে পড়ল ঘরে হুড়মুড় ক'রে। সর্বশেষ ব্যক্তিটি ঢুকে দরজা দিলে বন্ধ ক'রে। বাইরে গণ্ডগোল হয়েই চলেছে। নরু, তাঁর স্ত্রী, এঁদো প্রভৃতি সকলেই ঘরে জড়ো পাকিয়ে দাঁড়িয়ে। এদের এক পাশে একক দাঁড়িয়ে কান্থ আর ছিনাথ ; ছিনাথ মালকোঁচা মারছে, চোখের দৃষ্টি বিহ্বল। গায়ের কাপড়টা কোমরে বাঁধছে কান্থ।

এতক্ষণে নরুর কথা ফুটল, বললেন, কি, হ'ল কি ? কার্ফিউ সত্ত্বেও আবার বাধল ?

বাধল কি, বেধে তো রয়েইছে, আবার তাড়া করেছে মিলিটারিতে।—ব'লে প্রিয় ঝুপ ক'রে ব'সে পড়ল একটা চেয়ারে।

নরু। দল বেঁধে অ্যাটাক করলে নাকি?

চপলা। পাড়ার ছেলেরা যে বিপদের সময় শাঁখ বাজাতে বলেছিল!

নরু একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, বাজাতে বললেই বাজাতে হবে! শাঁক শুনে মিলিটারি ঢুকে পড়ুক আর কি! তারপর, যত সব—। ব'লে কিসে একটা হেলান দিতে সেটা ঢুম ক'রে পড়ল এঁদোর গায়ে। দেখা গেল, সেই ইতিমধ্যেই ভগ্ন বেতার-যন্ত্রটি আবার মাটিতে লোটাচ্ছে, ওপরকার কাঠে ধরেছে বড় রকমের ফাট। এঁদো চেঁচিয়ে উঠল, কি দুমদাম ক'রে সব ফেলছ? একটু ব'স না চুপ ক'রে। ফায়ার করছে দেখছ না। যেন গলির মধ্যেই হ'ল একটা গুলির শব্দ। চপলা গিয়ে চেপে ধরল প্রিয়তমের হাত, আর এঁদোর মা এঁদো আর নরুর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। খবরের কাগজে পড়া নোয়াখালির খবর শিরশিরিয়ে উঠল চপলার শিরায়। সমাগত ভয়ার্তেরা একেবারে দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। বাড়ির ছাদের ওপরে কাদের যেন হেঁটে চলার শব্দ। গুড়ুম। দুয়োরের কাছে যে লোকগুলো ছিল, তারা চকিতে স'রে আসতেই ঘাড়ে পড়ল ছিনাথ আর কানুর। তারা একটু হেলতেই পড়ল চপলার ঘাড়ে। রক্তহীন চপলার মুখে তবু দেখা গেল অপমানের রক্তিমা। টেবিল ধ'রে ফেলে সমস্ত ঝোঁকটা সামলে নিলে প্রিয়তম। নরু ছিনাথের এই ধৃষ্টতায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার চোখের দিকে নজর পড়ায় আর সাহস পেলেন না। সে চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ, কিন্তু ভীতিপ্রদ, উজ্জ্বল। পড়ায় টাল সামলাতে গিয়ে আলমারির কোণে কি একটা দেখে হাত বাড়িয়ে সেটা তখনই বার ক'রে নিয়ে এল ছিনাথ—মোটা লাঠি একগাছা।

খটাখট খটাখট—ভারী বুটের শব্দের সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা, সারা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। ছিনাথের হাতে লাঠি যেন কেঁপে ব'সে গেল। চরম অপমান আর সর্বনাশের শঙ্কায় চপলা এত জোরে চেপে ধরলে প্রিয়ের হাত যে, প্রিয়তম 'উঃ' ক'রে উঠল, তবু ব'সেই রইল চেয়ারে। এঁদোর মা কেঁদে ফেললেন, ওগো, কি হবে? আবার এক ধাক্কায় দরজায় বল্টু ছিটকে বেরিয়ে গেল; সকলে ছুটল বাড়ির ভিতর দিকে।

কোনও ভয় নেই, মিলিটারি।—ব'লেই এঁদো হঠাৎ কাঠের খিল ভাঙবার আগেই দুয়োর দিল খুলে। জনকয়েক সৈন্য উদগ্র বেয়নেট নিয়ে ঢুকে 'হে আর অল কংগ্রেস-মেন। ডাউন উইথ দেম' ব'লে জমাট ভয়ার্তদের দিকে এগিয়ে গেল সোজা।

এঁদো বুক ফুলিয়ে ব'লে উঠল, উই আর কম্যুনিস্ট্স, নো কংগ্রেস-মেন।

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই বন্দুকের কুঁদোর এক ধাক্কায় সে পড়ল নরুর কাঁধে। আর চেয়ার উলটে নরু গড়িয়ে গেলেন ছিনাথের পায়ের কাছে, যেন তাকেই মিনতি করছেন বাঁচাবার জন্যে। নরুর আড়াল স'রে যেতেই সৈন্যদলের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ল গিয়ে চপলার ওপর। হিয়ার'স এ পাক।—ব'লে জন দুই তার দিকে হাত বাড়াতেই এঁদোর মা 'ও মা!' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠে মেয়েকে গিয়ে ধরলেন জড়িয়ে। চপলার চোখ নিষ্পলক। নরু উঠে এসে 'হাউ ডেয়ার ইউ—' ব'লে আরম্ভ করতেই আবার আঘাতে প'ড়ে গেলেন। ধাক্কা মেরে চপলার মাকে ফেলে দিতেই ঘরের ভয়ার্তেরা খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালাল যে যেদিকে পারলে। এঁদোর মাথার রক্ত আর সৈন্যদের আলিঙ্গনব্যগ্র বাহু দেখে প্রিয়তমকে প্রাণপণ আলিঙ্গনে চেপে ধরলে চপলা। একজন সৈনিকের এক চড়ে প্রিয়তমের ঘোর কেটে যেতেই সে নিজেকে চপলার আকুল বাহুবেষ্টন থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় এলোপাথাড়ি হাত পা ছুঁড়তে লাগল। আর চপলার হাত ধ'রে দিলে টান রাজার সৈনিক। এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল ছিনাথ আর কানু। ছিনাথের হাতের মোটা লাঠি এসে পড়ল লোলুপ সৈনিকের ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ-রক্ষিত মাথার ওপর, আর কানুর ক্ষীণ মুঠির এক প্রহারে আর একজনও পড়ল ব'সে। ছুটল গুলি রিভলভারের। আর সইতে না পেরে নরু চেতনা হারালেন। ছিনাথের হাত ক্ষণেকেই রক্তে ভেসে গেল।

হি ইজ এ হিন্দু গুণ্ডা!—ব'লে সব সৈনিক তখন ছিনাথের আহত দেহখানাকে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার ক'রে। কানুকে পেছনে আসতে দেখে তাকেও তারা সাদরে সঙ্গে নিলে।

অনাহত চপলা আর ঈষদাহত প্রিয়তম। বাকি সকলের আঘাত গুরুতর। প্রিয়তম গিয়ে দরজায় লাগিয়ে দিয়ে এল খিল।

উঃ!—ব'লে চপলা নিজেকে ঝাড়া দিয়ে নিয়ে বাড়ির মধ্যে থেকে কুঁজো-ভরতি জল নিয়ে এসে সকলের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বৈদ্যুত পাখা

খুলে দিলে জোরে। প্রিয়তম যেমন তেমন ক'রে একটা ব্যাণ্ডেজ এঁদোর আঘাতে বেঁধে দিলে।

খানিক পরে নরুবাবু চেতনা ফিরে পেয়ে ব'লে উঠলেন, ওই বেটা ছিনাথ, ওই শালাই তো লাঠি মেরে দিলে ওদের চটিয়ে। এখন মেয়েটা—। শেষ করার আগেই চপলার মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ভূপতিত গিন্নীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হাতপাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে বসলেন। এঁদোর দিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললেন, একজন ডাক্তার—

প্রিয়তম বললে, কার্ফিউ যে!

চুপচাপ।

নরু খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা গেল কোথায়, অ্যাঁ?

চপলা। মিলিটারি অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গেছে।

নরু। যেমন কর্ম তেমনই ফল! বন্দুকের কাছে উনি গিয়েছেন লাঠি ঘোরাতে! এখন নে।

তারপর ভেবে বললেন, কিন্তু জড়াবে তো আমাকেও। মহা ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি।

গিন্নী শুয়ে শুয়েই মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন; তারপর উঠে বসলেন গিয়ে এঁদোর পাশে। তার মাথার পাশেই প'ড়ে-থাকা চাপ চাপ রক্তে মায়ের মুখ বেদনায়, শঙ্কায়, ক্ষোভে বিবর্ণ হয়ে গেল; বললেন, ফ্যাসাদের কথা পরে হবে, এখন ছেলেটাকে দেখ।

ওর হাতে লাঠি দেখেই মিলিটারিগুলোর সন্দেহ বেড়ে গেল। তা না হ'লে হয়তো বিশেষ কিছু বলত না। উঃ, চপলার আজ খুব ফাঁড়া উতরে গেল! তারপরে চপলার দিকে ফিরে প্রিয়তম বললে, তুমি যে আমার হাতখানা ছাড়লে না। তা না হ'লে একবার দেখতুম—

চপলার মা এ সব দিকে মোটেই কান দিচ্ছিলেন না। তিনি করুণ চোখে নরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওগো, এখনও যে রক্ত গড়াচ্ছে!

রক্তের কথায় নরু লাফিয়ে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, অ্যাঁ, এত রক্ত! একজন ডাক্তার—

চপলা। কার্ফিউ যে।

নক। কাকিউ ব'লে কি ছেলেটা ম'রে যাবে নাকি? আমিই যাচ্ছি হরি মণ্ডলকে ডাকতে।

চপলা। তুমি ডাকলেও ডাক্তার আসবে কেন?

নক নিরুপায় হয়ে ব'লে উঠলেন, ওই বেটা ছিনাথই মজালে!

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

পেরেক

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে পাঠকের নিশ্চয়ই সন্দেহ হবে যে, আমার মাথার পেরেকগুলো কিছু আলগা। সমালোচনার হাতুড়ি পড়লেও ঢিলে-পেরেক 'টাইট' হবে না; মনে আমার পেরেক ফুটেছে, তাই প্রবন্ধ লিখে আমায় মনের পেরেক তুলতেই হবে।

শক্ত জিনিসকে আয়ত্তে আনতে হ'লে শক্ততর জিনিসের দরকার—বোধ হয় এই জ্ঞান থেকেই হয়েছে পেরেকের উদ্ভাবন। ক্রম-বিবর্তনের ফলে বিংশ শতাব্দীতে যা 'পেরেক', খ্রীষ্টপূর্ব ছ হাজার বছর আগে সেটা নিশ্চয়ই এ রকম ছিল না। সভ্যতার শিশুকালে খোঁটা বা খুঁটি থেকে মানুষ অনেক উপকার পেয়েছে; কুঁড়েঘর, বেড়া, মাচা মানুষকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আরাম দিয়েছে। শক্ত খোঁটার জোরে মেড়াকে লড়ানো তাদের খুবই সহজ ছিল। নানা রকমে ঠেকে শিখে মানুষের জ্ঞানান্বেষী মন জেনেছিল, মাটির বুকে পুঁততে হ'লে চাই মাটির চেয়ে শক্ত কাঠ, কাঠের বুকে পুঁততে হ'লে চাই কাঠের চেয়ে শক্ত লোহা। এই কষ্টলব্ধ জ্ঞান মানুষ অসংখ্য কাজে লাগিয়েছে নিজের সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্যে।

সভ্যতার ক্রমোন্নতির পথে এসেছিল কেঠো-যুগ, যেমন এসেছিল iron age। সেই যুগে কাঠের উপকারিতাগুলি মানুষের চোখে ধরা পড়ে। ঘর, নৌকো, আসবাব প্রভৃতি নানা কাজে কাঠের ব্যবহার হয়। সেই যুগে কাঠ যে পেরেকের কাছে (জানি না, সে সময় পেরেকের কি নাম ছিল?) অনেক সাহায্য পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। হাতুড়ির সৃষ্টিও বোধ হয় সেই যুগেই হয়েছিল, কেন না হাতুড়ি-হীন পেরেক একেবারেই অর্থহীন।

ভেদ্য জিনিসের ঘনতা অনুযায়ী পেরেকের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হ'ল। কেউ বড়

কেউ মাঝারি, কেউবা ছোট। আঘাতের আধিক্যে অনেক সময় কাঠগুলো ফেটে যেতে লাগল। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্তে পেরেকের গায়ে খাঁজ কেটে তৈরি হ'ল স্ক্রুপ এবং হাতুড়ির কঠিন আঘাতের বদলে চালানো হ'ল স্ক্রু-ড্রাইভারের জুতসই চাপ। একই পেরেক বিভিন্ন অবস্থায় গোল, চেপটা, চৌকো, খাঁজকাটা প্রভৃতি নানা আকার নিয়েছে এবং তাদের মাথাগুলিও অবস্থাভেদে নানা রকম হয়েছে।

পেরেকের মধ্যে কত যে উপকারী জ্ঞান লুকিয়ে আছে, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। হাতুড়ি বা মুগুরের চাপে প'ড়ে পেরেকের পায়া রীতিমত ভারী হয়েছে। গরু-মোষগুলো যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের নাজেহাল করত, তাদের কাবু করা হ'ল মাত্র এক হাত লম্বা খোঁটায়; আর ভেড়া-ছাগলগুলো কায়দা হ'ল আধ হাত লম্বা খোটায়। চির-চঞ্চলা নারীকে যখন পুরুষ মাত্র ঠোঁটের শিষে বা চোখের ইশারায় কাবু করতে পারে নি, অবলা যখন সবলকে "নাকের-জলে চোখের-জলে" করেছিল, তখন মানুষ যে পেরেকটা আবিষ্কার করেছিল, তার নাম 'বিবাহ'; কেউ কেউ বা পেরেকটিকে বেশি মজবুত করবার জন্তে কিছু প্রেমের পান দিয়ে নিয়েছিল। ফলে চঞ্চলার চাঞ্চল্য রীতিমত ক'মে যায়। এই প্রেমের পান-দেওয়া পেরেক থেকে মানবসভ্যতা অশেষ উপকার পেয়েছে।

সভ্যতা যখন গুহা ছেড়ে ঘর-বাড়িতে প্রবেশ করলে, দরকার হ'ল পেরেকের; সে যখন জামা-কাপড়ে ঊর্ধ্বগমন শেষ ক'রে অধোগমন করলে জুতোয়, দরকার হ'ল পেরেকের। ভগবানের মত বুক ফুলিয়ে পেরেকও আজ গর্ব করতে পারে—যেখানে যেখানে সভ্যতার অস্তিত্ব, হে মানব! সেখানেই আমি আছি। অবস্থাবিশেষে নামের পরিবর্তন থাকলেও আমি আসলে পেরেকই।

পেরেক যে অন্তত দু হাজার বছর আগে ছিল, স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টই তার ধর্ম-সাক্ষী। এই পেরেকই একদিন যীশুর হাতে-পায়ে-বুকে বসেছিল। যীশুবধের ব্যাপারে কাঠের ক্রুশের চেয়ে ঢের বেশি সহায়ক ছিল লোহার পেরেক; তবুও যীশুভক্তদের দৌলতে ক্রুশ হয়ে গেল 'হোলি', আর লোহার পেরেক র'য়ে গেল খ্রীষ্টধর্মের উপেক্ষিত।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টপণ্ডী

নব-বর্ষ

মহাবিষুব সংক্রান্তি শেষ হইয়াছে। ভূজী সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করিয়াছেন। পুনরায় আমাদের নব-বর্ষ আরম্ভ হইল।

মনে হইতেছে, সূর্য যেন আজ পৃথিবীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, আমার অগ্নিবর্ষী কিরণজাল লইয়া তোমার সমীপবর্তী হইতেছি, তুমি প্রস্তুত আছ তো? তোমার শ্যামতনুর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, তোমার জলে স্থলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তোমার বৃক্ষে লতায় জড়ে জীবে সমুদ্রে পর্বতে, তোমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে জলন্ত তেজের যে প্রদীপ্ত বাণী অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য প্রস্তুত আছ তো তুমি? তোমার নদী তড়াগ বিশুষ্ক হইবে, তোমার শ্যামল প্রান্তরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিবে তৃষ্ণার হাহাকার, ছলনার জাল বিস্তার করিবে মায়াময়ী মরীচিকা, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে ছুটিয়া আসিবে উন্মাদিনী কালবৈশাখী, চতুর্দিকে চাহিয়া তোমার ব্যাকুল অন্তর দুঃসহ প্রদাহ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না—এই অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আছ তো কন্যা?

পৃথিবীর উত্তর শুনিতে পাইতেছি।

বৃক্ষে বৃক্ষে স্বর্ণশ্যাম কিশলয়ের সমারোহে, বহুবিধ ফলের সম্ভাবনায়, রজন করবী বেলা জবা যূথিকার বর্ণসৌরভসম্ভারে, দহিয়াল পাপিয়া টুনটুনি বুলবুলি কোকিল নীলকণ্ঠের সঙ্গীত-বৈচিত্র্যে, অঙ্কুরিত অসংখ্য বীজের ঊর্ধ্বমুখী প্রেরণায়, স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছতর জলধারায়, আকাশের নীলকান্ত প্রশান্তিতে পৃথিবীর সে উত্তর অদ্ভুত।

তাহার কোন শঙ্কা নাই। অফুরন্ত প্রাণ-সম্পদে সে নির্ভীক।

বিচিত্র ভাষায় মনোমোহিনী ভঙ্গীতে অনির্বাণ প্রাণের অনন্ত প্রকাশে সে যেন বলিতেছে, তাম্রবর্ণের অধিপতি হে রক্তশ্যাম ভাস্কর, স্বাগত। হে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তেজঃপুঞ্জ-প্রদীপ্ত আদিত্য, বহু কোটি বৎসর ধরিয়া বারবার তোমার অগ্নিস্রোতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়াছি, হে ধ্বান্তারি, এবারও তুমি সমীপবর্তী হইয়া প্রসন্ন মনে আমার সর্বাঙ্গে তোমার অগ্নিধারা-বর্ষণ কর, আমি প্রস্তুত আছি।...

ভাবিতেছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা, আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষাকালে আমরাও কি পৃথিবীর মত বলিতে পারিব—আমরা প্রস্তুত আছি?

"বনফুল"

বাইশ

নবগ্রামের জীবন-নাট্যে নূতন অঙ্ক আরম্ভ হয়েছে।

গোপীচন্দ্রের কীর্তিভূমি, গ্রামখানির ইতিহাসে বহু শতাব্দী ধ'রে পতিত প্রান্তর, ইস্কুলডাঙা আজ সমগ্র গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটির জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে।

বহু দিন পূর্বে একদা মধ্যরাত্রে গ্রামখানা ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল; সেই ধোঁয়া দেখে রাধাকান্ত স্বর্ণবাবু বিপদ আশঙ্কা ক'রে ছাদে উঠেছিলেন, দেখতে গিয়েছিলেন আশে-পাশে কোথাও কোন দিকে আগুন দেখা যায় কি না! ধোঁয়ার পিছনে আগুন ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সে আগুন কোন বসতিতে লাগে নাই। লেগেছিল গোপীচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ ইটের ভাটায়। সেই ইটে গ'ড়ে উঠেছে নবগ্রামের এই নূতন জীবনকেন্দ্র। রচিত হয়েছে নবগ্রামের গ্রাম-লক্ষ্মীর নবরত্নবেদী। সেদিন রাধাকান্ত তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "আমি স্পষ্ট যেন দেখলাম, মা আবার মুখ ফেরাচ্ছেন। এই কালের গতি—এই নিয়ম। ভারতবর্ষের লক্ষ্মীর রথ ঘুরেছে এই নিয়মে। অযোধ্যা থেকে হস্তিনাপুর, হস্তিনা থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হিন্দু-দিল্লী, তারপর পাঠান, তারপর মোগলের দিল্লী; এই পথে পথে চলেছিল লক্ষ্মীর রথ। সেখান থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সে রথ ইংরেজের সৈন্যবাহিনী এবং ধনসম্পদকে অনুসরণ ক'রে কলকাতায় এসে থেমেছে। দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্তনের আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্মী এখনও কলকাতা আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। নবগ্রামের পল্লীলক্ষ্মীরও রথ চলেছে। মানুষ বুঝতে পারে না, দেখতে পায় না। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এক-একবার বুঝতে পারা যায়। মা এবার ওই ইস্কুলের দিকে মুখ ফেরালেন।"

নবগ্রামের জীবন-নাট্যের পটভূমি এখন এই ইস্কুলডাঙা। নামে 'ডাঙা' অর্থাৎ প্রান্তর শব্দটা এখন বেঁচে থাকলেও ডাঙা আর নাই। আগেকার কাল হ'লে 'ইন্দ্রপুরী' শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারত; নূতন অঙ্কে পটভূমিই পরিবর্তিত হয় নি, নায়ক পাত্রপাত্রীরাও নূতন, তাদের চারিত্রিক বিকাশভঙ্গী নূতন, তাদের ভাষা নূতন। সবুজ শহরের একটা টুকরো তুলে যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে নবগ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বহুকালের পতিত প্রান্তরের উপর। রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া বড় বড় গোল থামওয়ালা বারান্দা ঘেরা পাকা ইস্কুল,

কমিশনর সাহেবের পাঠানো প্ল্যান অনুযায়ী ওই রাণীগঞ্জ-টাইলে ছাওয়া গোল থামওয়ালা সুবৃহৎ ডিস্পেন্সারি, বোর্ডিং-হাউস; তার পাশে নতুন থিয়েটারের স্টেজ, ঝকমকে কয়েকটি দোকান, গোপীচন্দ্রের তৈরি ক'রে দেওয়া একটি সুদৃশ্য একতলা পাকা বাড়িতে সব-রেজিস্ট্রি আপিস; গ্রামের দিকে ঘেঁষে ছোট একতলা বাড়িতে গার্লস-ইস্কুল, কয়েকটা বাগান, দীঘি, দীঘির বাঁধানো ঘাট, নিজেদের পাকা আস্তাবল, নিজেদের কাছারি-বাড়ি, এই সব নিয়ে নূতন যুগের রীতি ও রুচিসম্মত সমৃদ্ধ শহরের একটা টুকরো। বলতে পারা যায়, নবগ্রামের ডালহৌসি স্কোয়ার। গোপীচন্দ্রের গ্রামের ভিতরের পুরানো বাড়িটাকে বলা যেতে পারে বেলভেডিয়ার। নবগ্রামের নূতন কালের ভাবায় যে ধরন আমদানি হতে চলেছে, তাতে এই ধরনের উপমা বা ভঙ্গীর প্রাধান্য দেখা দিচ্ছে। গোপীচন্দ্র যে দীঘি কাটিয়েছেন এখানে, যে দীঘির ভিতর থেকে বেরিয়েছে বিষ্ণুমূর্তি, সেই দীঘির নাম তিনি দিয়েছিলেন কৃষ্ণসায়র, বর্তমান-কালের রসিক তরুণেরা ওর নাম দিয়েছে লালদীঘি। নবগ্রামের লালদীঘির পাড়ের উপরেই একটি পাকা দালানে পোস্ট-আপিসও উঠে এসেছে। শুধু নবগ্রামের লালবাজার অর্থাৎ থানাটি যথাস্থানে সেই পুরানো আমলের বাজারের মধ্যেই আছে।

স্বর্ণবাবু নবগ্রামের এ দিকটায় বড় হাঁটেন না। শুধু ওই দিকটা কেন, গ্রামের ভিতরে তাঁর নিজের পাড়ায় যে সীমানাটুকুর মধ্যে তাঁর জ্ঞাতিবর্গের বাস, সাজার ঠাকুরবাড়ি এবং তাঁরই সম-অবস্থাসম্পন্ন হৃতমান বা হতমান রাধাকান্ত ও শ্যামাকান্তের বাস, সেই সীমানাটুকুর বাইরে বড় যান না। বৈকালের দিকে আজকাল নিয়মিত গ্রামপ্রান্তের দেবীস্থান—মহাপীঠে যান, দেবীকে প্রণাম করেন; কামনাও করেন, কামনা করেন গুপ্তধনপ্রাপ্তির। মাটির তলায় প্রাচীনকালের পুঁতে রাখা রাশি রাশি ধনসম্পদ। "হে জগজ্জননী, স্বপ্নে তুমি স্থান নির্দেশ ক'রে দাও। সেই ধনসম্পদ নিয়ে স্বর্ণভূষণ আর একবার দেদীপ্যমান হয়ে উঠুক, গ্রহণমুক্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরের সূর্যের মত। তোমার এই স্থানটিকে অমরাবতী ক'রে তুলবে।"

মহাপীঠের চারিদিকেও এখন গোপীচন্দ্রের নাম খোদিত করা রয়েছে, এখানেও অনেক কীর্তি ক'রে গেছেন গোপীচন্দ্র। নতুন একতলা একখানি পাকা ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছেন, বারান্দায় মার্বেল দিয়েছেন, মার্বেলের

উপরে খোদিত করা আছে চরণাশ্রিত গোপীচন্দ্র। সামনে পাকা নাটমন্দির; তাতেও গোপীচন্দ্রের দানই প্রধান দান এবং তাঁরই চেষ্টায় কলকাতার বহু ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনেক টাকা সংগৃহীত হয়েছে। নাটমন্দিরের পর বেশ বড় একটি পুকুর; পুকুরের ঘাটের মাথায় দুটি শিবমন্দির, সেও গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। পুকুরের বাঁধানো ঘাট, এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণবাবু। সিমেন্টের উপরে তাঁর নাম খোদিত ক'রে দিতে তিনি ভোলেন নাই, কিন্তু যাত্রীর পায়ে পায়ে সিমেন্টের সঙ্গে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে সে নামের চিহ্নও নাই। রাধাকান্ত আবার তাঁর চেয়েও স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। এখানে তিনিও তাঁর সাধ্যমত দান ক'রে গেছেন। তার সংবাদও কেউ জানে না। জানাবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। দানগুলি অবশ্যই ছোটখাট, বিশিষ্ট দানের মধ্যে তিনি কয়েক শত টাকা খরচ ক'রে এই পুকুরটির পঙ্কোদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। তার সকল চিহ্নই ঢাকা পড়েছে পুকুরের জলে। জলে দাগ কাটে না, সেখানে নাম লেখার উপায় নাই।

বৈকালে স্বর্ণবাবু কলকাতার ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মহাপীঠে গেলেন। ভদ্রলোকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কর্মপ্রবণ স্বভাবের লোক, গোপীচন্দ্রের কীর্তিভূমি তিনি নিজেই ঘুরে ফিরে দেখে এসেছেন। ওই দেখার মধ্যে সম্পদের পরিমাণের একটা অঙ্কও ক'রে নিয়েছেন। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখাও করেছেন, কয়েকজনের নামও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। মহাপীঠ যাওয়ার সময় ক'রে উঠতে পারেন নাই, অথচ মহাপীঠে দেবীকে প্রণাম না ক'রে যেতেও পারেন না, সুতরাং স্বর্ণবাবুর সঙ্গে খুব আনন্দের সঙ্গেই গেলেন।

বললেন, কলকাতার যাঁরা বাসিন্দে, বুঝলেন না, তাঁদের দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি পাড়াগাঁর লোকদের চেয়ে অনেক বেশি। কোন বিজ্‌নেস আমরা কালীঘাটে পুজো না দিয়ে ক্লোজ করি নে। সায়েবী কেতায় সাজানো আপিসে গণেশের মূর্তিটি আমাদের দরজার মুখেই ব্র্যাকেটে সাজিয়ে রাখি। আপিসের কাপড়-চোপড় রাখবার জন্যে বাড়িতে আলাদা র‍্যাক থাকে আমাদের। লক্ষপতি কোটিপতিকেও আপনি কখনও কাপড় প'রে পৌঁচে যেতে দেখতে পাবেন না, আমরা গামছা প'রে পৌঁচে যাই। অবিশ্যি সায়েব হয়ে গেছে এমন লোকও আছে। তারা প্রায়ই ব্যারিস্টার, ডাক্তার, মানে বিলেত-ফেরতের দল।

স্বর্ণবাবু কোন উত্তর দিলেন না। অত্যন্ত অন্যমনস্কের মতই চলেছিলেন তিনি। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে তাঁর বাড়ি, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি মাঠে পড়লেন। এই মাঠের পথ ধ'রেই গ্রামকে পাশে রেখে, সাধারণত একাকীই তিনি মহাপীঠে গিয়ে থাকেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর সমবয়স্ক কোন অনুগত ব্যক্তি সঙ্গে থাকে, বর্তমান কালের বিচিত্র গতি ও মানুষের মতি নিয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন।

একটু এসেই বাউড়ীপাড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি নোটন বাউড়ীকে ডাকলেন। তাঁর চাপরাসীটি মুসলমান, নোটন বাউড়ী হ'লেও হিন্দু। নোটনকে তিনি ইঙ্গিত করলেন, সে ইঙ্গিত নোটন অবিলম্বে বুঝে নিয়ে, মাথায় একটা গামছা বেঁধে লাঠি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সাধারণত স্বর্ণবাবু চাপরাসী নিয়ে মহাপীঠ যান না। আজ কলকাতার ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সময় মনে হ'ল, এতে তাঁর বংশোচিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। নোটনকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি মুখে তাকে তিরস্কার ক'রে বললেন, তোর কি দিন দিন ভীমরতি হচ্ছে? সময়ে হাজির হ'স না কেন?

নোটন অবিলম্বে প্রণাম জানিয়ে অপরাধীর মতই জবাব দিলে, আজ্ঞে, পাড়াতে একটা গোল বেধেছে, তাই দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম, হুজুর তো এই পথেই যাবেন, পথেই সঙ্গ ধরব।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিতে দিতে অগ্রসর হলেন।

কলকাতার ভদ্রলোকটি স্বর্ণবাবুর নীরবতায় নোটনকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম মুরুব্বির? লাঠিখানি তো দেখি চমৎকার। লাঠি খেলতে পার?

নোটন হেসে বললে, তা আজ্ঞে, পারি বইকি খানিক-আধেক। এ বয়সেও পাঁচ-সাতজনের মোহড়া পারি নিতে।

তারপর দুজনের মধ্যে গল্প জ'মে উঠল। নোটন বক্তা, কলকাতার ভদ্রলোক শ্রোতা; নোটনের বক্তব্য সত্য অর্ধসত্য অতিরঞ্জিত রোমাঞ্চকর দাঙ্গার কাহিনী। তার এক পক্ষে মালিক স্বর্ণভূষণবাবু, অন্য পক্ষে গোপীচন্দ্রবাবু, তাঁর অবর্তমানে এখন কীর্তিচন্দ্রবাবু। কাহিনীর মধ্যে একই কথা, গোপীচন্দ্রের বাহিনী সংখ্যায় অধিক, তাদের অধিকাংশই গালপাট্টাধারী পশ্চিমদেশীয় জোয়ান, আর স্বর্ণবাবুর বাহিনীতে স্বল্প কয়েকজন দেশী লাঠিয়াল, তাদের মধ্যে নোটন অন্যতম। কাহিনীর শেষ, গোপীচন্দ্রের বাহিনীর পরাজয়, স্বর্ণবাবুর বাহিনীর জয়।

ভদ্রলোক চতুর, তিনি বিশ্বাস করছিলেন ব'লে মনে হয় না, তবে রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে ভালই লাগছিল, তিনি শুনে যাচ্ছিলেন। কলকাতার পল্লীগ্রামের এই রোমাঞ্চকর বাঙালী বীরত্বের কাহিনী রীতিমত বিস্ময়কর এবং উপাদেয় হয়ে উঠবে—এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না, তিনি সেগুলি সংগ্রহও করছিলেন।

* * *

নোটন বললে, ওই দেখেন কেনে, পাগড়ি-তকমার ঝকমকানি, গতরের বহর, গোঁফ-দাড়ির জাঁকজমক। লাঠির বহর দেখেন। অথচ লাঠির কিছুই জানে না বেটারা। তবে হ্যাঁ, গায়ে ক্ষ্যামতা আছে। কুস্তিতে পালোয়ান বটে।

জঙ্গলে ঘেরা দেবস্থলটির প্রবেশমুখেই দাঁড়িয়ে ছিল কীর্তিচন্দ্রের জুড়ি। সহিস-কোচম্যানের সঙ্গে দুজন তকমা-পাগড়িধারী হিন্দুস্থানী চাপরাসীও দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন স্বর্ণবাবুকে, স্বর্ণবাবু, এরা কি কীর্তি মুখুজ্জেদের বরকন্দাজ? নাম ধ'রে প্রশ্ন করায় স্বর্ণবাবু চকিত হয়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবার। তিনি কোন গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হয়েই পথ চলছিলেন। চিন্তা ঠিক নয়, সে একটা অপূর্ব মনোভাব। পরাজয় মেনে জয়লাভ ক'রে মন যে ভাবে আচ্ছন্ন হয়, সেই ভাবের মধ্যে তিনি যেন আচ্ছন্ন হয়েই চলেছিলেন। ভদ্রলোক তাঁর নাম ধ'রে প্রশ্নটা উত্থাপিত না করলে সম্ভবত তাঁর কানেই যেত না কথাগুলি। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ। কীর্তির পল্টনই বটে। রথও হাজির দেখছি। আপনার যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে নাকি? কীর্তি এসেছে মহাপীঠে।

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, সঙ্কোচ কিছু না। তবে—

তবে আর কিছু না। আসুন নির্ভয়ে।

ভাবছি, অপমান করবে না তো নিজেদের এলাকায়?

গতকাল হ'লেও স্বর্ণবাবু প্রচণ্ড একটা দম্ভোক্তি করতেন। আজ কিন্তু সে করতে তাঁর ইচ্ছে হ'ল না। তিনি মৃদুস্বরে মিষ্টভাবেই বললেন, না, আসুন।

কীর্তিচন্দ্র মহাপীঠে ইচ্ছে ক'রেই এসেছিলেন, অর্থাৎ কলকাতার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আকস্মিকভাবে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার অভিপ্রায়েই এসেছিলেন

মহাপীঠে। অন্যথায় মহাপীঠে বড় আসেন না তিনি। তবে তাঁর মা মহাপীঠের নিত্য-যাত্রী। গোপীচন্দ্র নিজে তাঁকে এ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। গোপীচন্দ্র নিজেও প্রায়ই এখানে আসতেন। তবে তাঁকে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাইরে যেতে হ'ত—কলকাতা রাণীগঞ্জ ঝরিয়া কাতরাসগড়। কখনও কখনও দিল্লী এলাহাবাদ আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে শাখা-আপিসগুলি দেখতেও যেতেন। নবগ্রামে যখন থাকতেন, তখন নিত্য-নিয়মিত যেতেন প্রথম প্রথম। তাঁর কালের বিশ্বাস এবং শিক্ষা অনুযায়ী দৈবশক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তার উপর অতি দরিদ্রের সন্তানের মাসিক চার টাকা বেতনে কর্মজীবন আরম্ভ ক'রে সুযোগের পর সুযোগ পেয়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়ার কৃতিত্বকে সেকালের সমাজও ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ব'লে মনে করে নাই, তিনি নিজেও সে কৃতিত্বকে তাঁর নিজস্ব ব'লে মনে করতে সাহস পান নাই, এমন কি বিশ্বাসও করতে পারেন নাই। পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজন্মের দেবানুগত্যের পুণ্যকেই সকল উন্নতির প্রত্যক্ষ কারণ ব'লে পরিতৃপ্ত চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রতি বার সফর থেকে ফিরে এসে মহাপীঠে ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন, নিত্য প্রণাম করতে যেতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যেতেন তাঁর স্ত্রী—গাড়ি থাকতেও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য এবং নীচ-জাতীয় সহিস কোচম্যান ও ঘোড়ার স্পর্শদোষের আশঙ্কায় হেঁটেই যেতেন। আজও যান কীর্তিচন্দ্রের মা। কীর্তিচন্দ্র বাপের মৃত্যুর পর অধিকাংশ সময়ই কলকাতায় বাস করেন ব্যবসা উপলক্ষ্যে, পনেরো দিন অন্তর শনিবার রাত্রে আসেন, রবিবার থাকেন, সোমবার কলকাতায় চ'লে যান। এর মধ্যে তিনি মহাপীঠে আসবার সময় পান না। এবং দৈবশক্তিতে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী হ'লেও তাঁর বিশ্বাস গোপীচন্দ্রের বিশ্বাসের মত নয়। কীর্তিচন্দ্র মাসিক পূজার ব্যবস্থা করেছেন, নিত্য চণ্ডীপাঠও হয়, মধ্যে মধ্যে দৈবজ্ঞের নির্দেশমত যাগযজ্ঞও হয়। মহাপীঠের কোন অভাব অভিযোগ কানে এলে তৎক্ষণাৎ সে অভাব মোচনের ব্যবস্থা করেন অকৃপণ হস্তে। নিজে আসেন পর্বে-পার্বণে অথবা কালে-কস্মিনে, মহাপীঠের বিষয় ও বন্দোবস্ত-ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটলে সংস্কার করবার প্রয়োজনে। কীর্তিচন্দ্র এখন এখানকার শুধু শ্রেষ্ঠ ধনীই নন, স্থানীয় জমিদারদের মধ্যেও তিনি সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছেন। নবগ্রামের জমিদারী বহু বহুজনের মধ্যে বিভক্ত অনেক দিন থেকেই। এক পয়সা, এমন কি, আড়াই

গণ্ডা বা আধ পয়সা রকমের জমিদারী স্বত্বে স্বত্ববান শরিকের অভাব ছিল না। আধ পয়সা, এক পয়সা, এক আনা ক'রে কিনে কীর্তিচন্দ্র এখন নবগ্রামের পাঁচ আনা পরিমাণ জমিদারী স্বত্বের মালিক। জমিদারেরাই মহাপীঠের সেবায়েত বা মালিক, সুতরাং সে দায়িত্ব পালনের জন্য কীর্তিচন্দ্রকে আসতেই হয়। কিন্তু আজকের আসাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। মহাপীঠে যারা নিত্যযাত্রী, তারা একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। কীর্তিচন্দ্র জানতেন যে, কলকাতার এই ব্যক্তিটি নিশ্চয় মহাপীঠে যাবেন। এই যাওয়ার সময় তিনি নিখুঁত হিসেব ক'রে স্থির করেছিলেন, হয় দ্বিপ্রহরের পূজার সময়, নয় সন্ধ্যায় আরতির সময়। কলকাতার এই ব্যবসায়ীদের তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। এঁদের হাতের পলা-পান্না, গোমেদ-বজ্র, লোহা-সীসের আংটিতে, নানাবিধ কবচে বিশ্বাস, দৈবশক্তিতে নির্ভরতা, ব্যবসায়ের মূলধনের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতার চেয়েও বেশি। সাহেবের প্রীতি এবং দেবতার দয়া—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি, সেটা সঠিক বলা না গেলেও কোনটাই কম নয়, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়। সুতরাং দুই সময়ের মধ্যে যে কোন এক সময়ে ভদ্রলোকটিকে এখানে পাবেন, এ তিনি জানতেন। দুপুরেও একবার তিনি এসেছিলেন। আবার সন্ধ্যার মুখে এসেছেন। এই কারণেই মহাপীঠে একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

ভদ্রলোক প্রণাম করছিলেন দেবীমন্দিরের সামনে। কীর্তিচন্দ্র মন্দিরের পিছন দিকে ছিলেন। সেখানে মহাপীঠের পূজক, গদিয়ান সাধুর সঙ্গে এখানকার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। পূজক এবং গদিয়ান সাধু নানা অভাব-অভিযোগের কথা জানাচ্ছিলেন তাঁকে।

প্রণাম সেরে মন্দিরপ্রদক্ষিণ-পথে কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ণবাবুর দেখা হয়ে গেল। স্বর্ণবাবুর পিছনে কলকাতার ভদ্রলোকটি। কীর্তিচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে স্বর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, ভাল আছেন কাকা? তারপরই গভীর বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ভদ্রলোকটিকে বললেন, আরে, এ কি ব্যাপার? রমণীবাবু যে? এখানে কোথায় মশায়?

রমণীবাবু ভক হাসি হেসে দাঁত মেলে বললেন, আরে বাপ রে! মশায়—মশায়—মশায়!

কীর্তিচন্দ্রের কান দুটি লাল হয়ে উঠেছিল, তাঁর অসহিষ্ণু চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত আকস্মিক এবং এই প্রকাশের পূর্বে তাঁর মুখ কান লাল হয়ে

ওঠে; স্বর্ণবাবু তা জানেন; তিনি গোঁফে তা দিয়ে হেসে বললেন, আমার এখানে উঠেছেন উনি। দেবদর্শন করতে এসেছেন।

কীর্তিচন্দ্র একটু দ'মে গেলেন, বুঝলেন স্বর্ণবাবুর ইঙ্গিত; রমণীবাবুকে আগলে দাঁড়াবেন তিনি, কোনক্রমেই পথ ছেড়ে দেবেন না। মুহূর্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে তিনি বললেন, সেই তো আশ্চর্য হচ্ছি। আমার সঙ্গে এত পরিচয়, কলকাতার আপিসে দিনে দুবারও আসেন তিনবারও আসেন, অথচ এখানে এসে আপনার ওখানে উঠলেন—

বাধা দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, উঠলেন তার কারণ আছে বইকি। সে কি তুমি শোন নি? বউঠাকরুণ, মানে—তোমার মা আজ আমার বাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন, সে জান তো? তিনি কিছু বলেন নি? ওঁর আসার কথা তিনি জানেন দেখলাম।

কীর্তিচন্দ্র ক্রোধে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রাণপণে অগ্ন্যুদগারের চেষ্টা করলেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পারলেন না। নিজেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনিই আজ নবগ্রামের জীবন-নাট্যের সর্বপ্রধান ব্যক্তি। গোপীচন্দ্র নিজে দরিদ্র ছিলেন, প্রথম জীবনের দারিদ্র্যের মধ্যে স্থানীয় মাননীয়দের অনেক উপকার অনেক স্নেহ পেয়েছিলেন, তার জন্ত কৃতজ্ঞতা ছিল, তার উপর ছিল তাঁর স্বভাবগত বিনয়, যার ফলে উত্তর-জীবনে বহু সম্পদের অধিকারী হয়েও কখনও রূঢ় হ'তে পারেন নি। কীর্তিচন্দ্র ধনীর সন্তান হয়েই জন্মেছেন, প্রকৃতির মধ্যে আছে অসাহষ্ণুতা এবং প্রচণ্ড রূঢ়তা। গোপীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাপথে যারা বাধা দিয়েছে, তাদের উপর আছে নিষ্ঠুর আক্রোশ। বাধা যারা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্ণভূষণই প্রধান। আক্রোশ তাঁরই উপর সর্বাপেক্ষা বেশি। সে আক্রোশ এত প্রবল যে, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে গোপন কল্পনায় যে সব কথা ভেবেছেন, দু-একজন অন্তরঙ্গের কাছে প্রকাশ করেছেন, সুস্থ মানসিকতায় প্রসন্ন অবসরে সে সব কথা শুনে তিনি নিজেই শিউরে উঠেন। সেই স্বর্ণভূষণ তাঁকে ইঙ্গিতে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তোমার মা আমার কাছে করুণাপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, তাঁর সে প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি; এই ভদ্রলোককে অপমান করবার পূর্বে সেই কথাগুলি স্মরণ কর। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, তবুও কীর্তিচন্দ্র স্বর্ণবাবুর এই কথার উত্তরে অগ্ন্যুদগার করতে পারলেন না।

কীর্তিচন্দ্রকে স্তব্ধ দেখে স্বর্ণবাবুই আবার বললেন, মায়ের সঙ্গে দেখা হয় নি বুঝি তোমার?

কীর্তিচন্দ্র এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছেন। বলেছেন, আপনার সঙ্গে যে সব মামলা-মকদ্দমা আছে সবই মিটিয়ে নিতে হবে; বললেন, স্বর্ণ-ঠাকুরপোকে আমি কথা দিয়ে এসেছি। আমি ব'লে দিয়েছি ম্যানেজারকে।

স্বর্ণভূষণ একটু হাসলেন, আশ্চর্যের কথা, তাঁর রাগ হ'ল না এতে। বলিলেন, কিন্তু আমি তো তাঁকে মামলা মিটমাটের কথায় 'না' বলেছি কীর্তি। না, না, না। মামলা মিটে গেলে বাঁচব কি নিয়ে হে? ভাবব কি দিন রাত্রি?

কীর্তিচন্দ্র বললেন, আমাকে মামলা তুলে নিতে হবে,—মায়ের হুকুম।

কিন্তু আমি তো তুলব না।

আমরা সেগুলোতে হারব।

স্বর্ণবাবু হেসেই জবাব দিলেন, হারবার বা হেরে হারাবার সঙ্গতি আছে তোমার; কিন্তু সে মতি নাই। সে তুমি পারবে না কীর্তি। যাক, এখন একটু পথ দাও, মাকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

স্বর্ণবাবু দ্বিতীয় বার প্রদক্ষিণপথে যখন কীর্তিচন্দ্রের কাছাকাছি এলেন তখন কীর্তিচন্দ্র বলছিলেন, যেন ঘোষণা করছিলেন, ওর মালিককে আমি ব'লে এসেছি, নবগ্রামে আমার সম্পত্তি ক্রোক করতে এলে তাকে মাথা নিয়ে ফিরতে হবে না। নবগ্রামের কেউ তোমাকে আঙুল তুলে সাহায্য করবে না। তারা জানে, করলে তারও মাথা থাকবে না।

স্বর্ণবাবু আবার থমকে দাঁড়ালেন, বললেন, রাগের মাথায় কথাটা বললে বটে কীর্তি, কিন্তু কথাটা সাজল না। সংসারে মাথা থাকতেও বেশির ভাগ লোকই কন্ধকাটা। যারা মাটিতে মাথা নামিয়েই আছে, তাদের কন্ধকাটাই বলি আমি। দু-চারজনের যাদের মাথা আছে, তাদের মাথা নিতে গেলে মাথা দিতেও তো হতে পারে। মাথা নিতে পারে তারাই, যারা নিজের মাথার পরোয়া করে না। তুমি কিন্তু তা পার না; মাথার ভয়ে তুমি অস্থির।

কীর্তিচন্দ্রের চোখ দুটি দু টুকরো জলন্ত আঙরার মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কিন্তু কথার জবাব তিনি দিতে পারলেন না। তাঁর মূর্তি দেখে আশপাশের লোকেরা ত্রস্ত হয়ে স'রে গেল। শুধু একটি কিশোর ছেলে দাঁড়িয়ে রইল,

সে স'রে গেল না। ছেলেটি গৌরীকান্ত। সেও এসেছিল দেবীকে প্রণাম করতে। কীর্তিচন্দ্রের উচ্চকণ্ঠের শাসনবাক্যগুলি শুনে এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলে সভয়ে স'রে গেলেও সে স'রে যাবার মত শঙ্কা অনুভব করে নাই। অবাক হয়ে সে শুনছিল কথাগুলি। কীর্তিচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ল তার দিকে, রূঢ়তম ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, কি দাঁড়িয়ে শুনছ তুমি এখানে, এতটুকু ছেলে?

স্বর্ণবাবু হেসে একটু ব্যঙ্গ ক'রেই এবং সে ব্যঙ্গ গৌরীকান্তের উপর নিক্ষেপ ক'রেই বললেন, শুনবে না? ও হ'ল আমাদের রাধাকান্তদার ছেলে—গৌরীকান্ত।

হ্যাঁ, এখানে তো মাতব্বরের পুত্রই মাতব্বর হয়ে থাকে। সেই তো বলছি। কিন্তু রাধাকান্তবাবুর ছেলের ভদ্রতাজ্ঞান থাকা তো উচিত।

নিজে গৌরীকান্তকে ব্যঙ্গ করলেও গৌরীকান্তের প্রতি কীর্তিচন্দ্রের কটূক্তি স্বর্ণবাবুর বোধ করি ভাল লাগল না, মধ্যপথে বাধা দিয়ে তিনি হেসে বললেন, আমরা অভদ্রের মত যেখানে সেখানে চীৎকার করলে, ওরা আর ভদ্রতা শিখবে কোথায়, বল?

না, আমি সে কথা বলি নি। আমি বলছি, নমস্কার করতে শেখা উচিত।

গৌরীকান্ত লজ্জিত হয়ে স্বর্ণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে কীর্তিচন্দ্রকে বললে, মা বলেন, আপনি আমার ভাইপো। আপনার মা আমার মাকে মামী বলেন। আপনাকে আমি কি ক'রে প্রণাম করব?

স্বর্ণবাবু হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

* * *

ওই গৌরীকান্তকে উপলক্ষ্য ক'রেই স্বর্ণবাবু এবং কীর্তিচন্দ্র মনোভাবের একটি ঐক্যমূলক মানসিকতার ক্ষেত্রে উপনীত হলেন। গৌরীকান্ত চ'লে যেতেই স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, রামায়ণে আছে মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ মায়ের পেট থেকে প'ড়েই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। রাধাকান্তদার ছেলেটি হয়েছে তাই! রবিবার দিন সকালে ধ্বজা-পতাকা ঘাড়ে ছেলের দল সঙ্গে নিয়ে বের হওয়া দেখ নি বোধ হয়? কিশোর দরিদ্র-ভাণ্ডার করেছিল, সেটা কিশোরের অভাবে উঠে গিয়েছিল, আবার সেটা ও চালাতে শুরু করেছে।

কীর্তিচন্দ্র যথেষ্ট জ্বালা অনুভব করেছিলেন গৌরীকান্তের কথায়। অবশ্য

গৌরীকান্ত প্রশ্নটি তুলেছিল একান্ত সরলভাবে সত্য-সত্যই সমস্যার দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে। নবগ্রামে গ্রামসম্পর্কে সকলেই সকলের সঙ্গে কোন-না-কোন সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ; সেই সম্বন্ধের নির্দেশেই এখানকার রীতি প্রথা এবং নীতি অনুযায়ী বয়স্ক ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠকে প্রণাম করে, ধনী দরিদ্রকে প্রণাম করে, প্রতিষ্ঠাবান নিতান্ত নামহীন জনকে প্রণাম করে। বর্তমানে সে প্রথা সচরাচর সময়ে অপ্রচলিত হয়ে এলেও বৎসরে অন্তত একদিন বিজয়া-দশমীর দিন সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এবং সচরাচর সময়ে এ প্রথা পালনের রেওয়াজ বিরল হ'লেও এর বিপরীত কিছু, অর্থাৎ সম্বন্ধে বড় হয়ে বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে, বা দরিদ্র ধনীকে, এমন কি নামহীন অভাজন প্রতিষ্ঠাবানকে প্রণাম করে না। কিন্তু কীর্তিচন্দ্রের দাবি স্বতন্ত্র। নবগ্রামে তিনি কারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ-সূত্রের বন্ধন স্বীকার করতে চান না। সে স্বর্ণবাবুর সঙ্গেও না। তিনি মনে মনে হিসাব ক'রে দেখেছেন, তাঁর সম্পদে এবং এখানকার লোকের সম্পদে অনেক পার্থক্য। তাঁর পৈতৃক কীর্তিতে এবং এখানকার লোকের কীর্তিতে সমুদ্র এবং গোষ্পদের মত প্রভেদ। গোষ্পদের সমুদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করার মতই হাস্যকর এখানকার লোকের তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার দাবি। এই কারণেই ওই ছেলেটির গ্রামসম্পর্কের গুরুজনত্ব দাবি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই অসহ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু দেশচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বলবার মত কিছু তিনি খুঁজেও পান নাই, এবং সে বলবার মত মনোবলও তাঁর ছিল না।

স্বর্ণবাবু গৌরীকান্তের নিন্দা করতেই কীর্তিচন্দ্র তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা অনুভব করলেন; বললেন, রাধাকান্তবাবুর আর কিছু না থাক্ লম্বা লম্বা কথা ছিল। গোটা গ্রামটাকে কথায় কথায় জর্জরিত ক'রে গেছেন।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, তত্ত্বকথার ফোড়ন দিয়ে রাধাকান্তদা কিন্তু কথা বলত ভাল। হ্যাঁ, বাক্যবীর যাকে বলে, তাই ছিল সে একজন। ছেলেটির নমুনা যা দেখছি, তাতে বাপকো বেটা ব'লেই মনে হচ্ছে। তার উপর রাধাকান্তদার স্ত্রীকে—কাশীর বউকে তো জান। সে তো এক অহল্যাবাঈ।

'বাঈ' শব্দটা প্রয়োগ করবার জন্যই তিনি অহল্যাবাঈয়ের নাম করলেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত 'বাঈ' শব্দটা প্রয়োগ ক'রে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি পেলেন তিনি। কীর্তিচন্দ্রও যথেষ্ট প্রীত হলেন। হাসতে লাগলেন তিনি।

স্বর্ণবাবুর 'বাজ' শব্দটাই বোধ হয় তাঁকে মনে করিয়ে দিলে ষোড়শীর কথা ;
হাসতে হাসতে হঠাৎ কথাটা মনে হতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, শুনেছি, গোয়াল-পাড়ার সেই চাষার মেয়েটি, মানে—যে বর্ধমানে গিয়ে ব্যবসা করছে, সে নাকি মধ্যে মধ্যে রাধাকান্তবাবুর স্ত্রীর কাছে আসে।

স্বর্ণবাবু বললেন, আসে। কিশোরদের মামলায় অনেক টাকা সে দিয়েছে।

মেয়েটা তা হ'লে রোজকার করে ভাল ?

হ্যাঁ, তা করে বইকি ! বয়স আছে, রূপ আছে।—স্বর্ণবাবু একটু হাসলেন।

কীর্তিচন্দ্রও হাসলেন। উভয়েই মনে মনে একটি প্রীতির সুর অনুভব করলেন এই আলোচনার মধ্যে। কীর্তিচন্দ্র বললেন, চলুন, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাড়িতেই যাই চলুন। আসুন রমণীবাবু, গরিবের ঘরে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন।

রমণীবাবু হেসে বললেন, নিশ্চয় যাব। আমাদের পেশা চাকরি, আপনি বন্ধুলোক এবং পেশায় চাকরিদাতা। আজ আপনি পায়ের ধুলো চাচ্ছেন, না দিলে কাল চাকরির দরকার হ'লে জুতো খুলে ধুলোহীন পায়ে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ মুখে ?

কীর্তিচন্দ্র রমণীবাবুকে দেখালেন নবগ্রামের সমৃদ্ধি এবং সভ্যতার পরিচয়। এই গার্লস-স্কুল—জগত্তারিণী-গার্লস-স্কুল—আমার মায়ের নামে আর কি ! এই আমাদের ঠাকুর-বাড়ি। এই টোল আমার পিতামহের নামে। ছেলেরা ঠাকুর-বাড়িতে খায়, বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এই আমাদের দীঘি, এই দীঘিতে উঠেছিল বাসুদেবমূর্তি। এই লাইব্রেরি, এই থিয়েটার স্টেজ, এই স্কুল, এই চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি।

ডিস্পেন্সারির বাড়িটি কমিশনার সাহেবের প্ল্যান অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, কমিশনার সাহেব হাসপাতালের পরিকল্পনা সম্মুখে রেখেই এই এই সুদৃশ্য বাড়িটির প্ল্যান পাঠিয়েছিলেন। এবং ডিস্পেন্সারির সেই ছোট ঘরের থায়োস্কোপচনের সে অপমানও বোধ করি তিনি ভুলতে পারেন নাই, সেই হেতু পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট সমারোহও ছিল। কিন্তু কীর্তিচন্দ্র ডিস্পেন্সারি-বিল্ডিঙের স্বল্প একটি অংশ দাতব্য-চিকিৎসালয়ের জন্ত দিয়ে বাকি বেশি অংশটা রেখেছেন নিজেদের ব্যবহারের জন্ত। প্রকাণ্ড বড় হলে,

ভেলভেটের গদি-মোড়া সোফা কৌচ শ্বেতপাথরের টেবিল পিয়ানো বিলাতী ছবি দিয়ে সাজিয়ে নিজেদের বিশ্রামাগার করেছেন।

রমণীবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, বাঃ, এ যে ইন্দ্রভুবন করেছেন মশায়! একেবারে কলকাতার টুকরো এনে বসিয়েছেন এখানে!

কীর্তিচন্দ্র অনর্গল ব'লে গেলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায় ছাড়া, জমিদারি বা চাষ এতে মানুষের দুঃখ মোচন হয় না ব'লেই মনে করেন। এখানকার অধিকাংশ ভদ্রসন্তানদের তিনি চাকরি দিয়েছেন। বিদেশে গেলে তবেই মানুষ বুঝতে পারে, পৃথিবী কত বড়। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সেই জ্ঞান অর্জন করবে নবগ্রামের লোক। হঠাৎ তিনি স্বর্ণবাবুকে বললেন, আপনার ছেলেকে আমার হাতে দেবেন কাকা? আমি তাকে পাকা ব্যবসাদার ক'রে দেব। কত বড় হ'ল সে?

হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, গৌরীকান্তেরই বয়সী।

কোন্ ক্লাসে পড়ছে?

পড়া-শুনাতে কাঁচা। শরীর খারাপ।

কিছু যায় আসে না তাতে। বিদেশে গেলেই শরীর ভাল হবে, আর ব্যবসা-ব্যাপারে লেখাপড়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। আমি কতদূর পড়েছি? —হাসতে লাগলেন কীর্তিচন্দ্র।

স্বর্ণবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, আমি উঠব এইবার।

উঠবেন?

হ্যাঁ। রমণীবাবু—

রমণীবাবু রাত্রে ট্রেন ধরবেন, তাঁকে আমিই পৌঁছে দেব গাড়ি ক'রে।

কি রমণীবাবু?

রমণীবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা মন্দ হবে না। সেই ভাল হবে।

স্বর্ণবাবু বিবাক্ত হাসি হাসলেন এবার। বললেন, আপনার মাথার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত কিন্তু।

কীর্তিচন্দ্র হেসে উঠলেন, বললেন, আপনার দায়িত্ব আমি নিয়েছি যখন, তখন সে চিন্তাই উনি করেন না কাকা।

স্বর্ণবাবুর জন্তে বাইরে কীর্তিচন্দ্রের জুড়ি অপেক্ষা করছিল। কিন্তু গাড়িতে

তিনি উঠলেন না, হেঁটেই চলতে আরম্ভ করলেন, বললেন, না, হেঁটেই যাব আমি।

কীর্তিচন্দ্র নিজে বেরিয়েও আসেন নাই তাঁকে বিদায় দিতে; সুতরাং সহিস কোচোয়ান স্বর্ণবাবুর প্রত্যাখানের পর আর দ্বিতীয় অনুরোধ করতে সাহস করলে না। স্বর্ণবাবু ফিরছিলেন অত্যন্ত অভিমানাহত মন নিয়ে। এই ভদ্রলোকটির লোভনীয় এবং লাভজনক অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে যে মানসিক তৃপ্তি এবং একটি সুপবিত্র বৈরাগ্য তিনি অনুভব করছিলেন অপরাহ্ণে, সে কখন যে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে, সে তিনি বুঝতে পারেন নাই। হিসেব করতে গিয়ে শুধু বার বার অকারণেই বোধ করি মনে পড়ছে গৌরীকান্তকে, মনে পড়ছে মৃত রাধাকান্তকে, মনে পড়ছে রাধাকান্তের স্ত্রীকে। যে জয়-গৌরব অনুভব করছিলেন, সেও আর অনুভব করতে পারছেন না, বরং ওই ভদ্রলোককে উপলক্ষ্য ক'রে কীর্তিচন্দ্রের দেখানো তার পৈতৃক কীর্তিকলাপ-গুলি তাঁকে যেন পরাজয়ের গ্লানিতে পীড়িত করছে। মনে পড়ছে তাঁর উঠে-যাওয়া স্কুলটির কথা। মনে পড়ল কীর্তিচন্দ্রের উক্তিগুলি। এখানকার ভদ্র-ছেলেদের চাকরি দিয়েছে সে। কথা সত্য। গোটা গ্রামটার ভদ্রসন্তানদের অধিকাংশই এখন তাঁর ওখানে চাকরি করে। প্রায় গোটা নবগ্রামই আজ কীর্তিচন্দ্রের চাকর। যারা চাকর নয়, তারা খাতক অথবা প্রজা। এক তাঁর বাড়ি, রাধাকান্তের বাড়ি আর শ্যামকান্তের বাড়ি আজও কীর্তিচন্দ্রের পদানত হয় নাই। অত্যন্ত তিক্ত হাসি হাসলেন তিনি। কীর্তি তাঁকে আজ অসংকোচে বললে, তাঁর ছেলেকেও সে চাকরি দেবে। অবশ্য তিনি তা হতে দেবেন না। কিন্তু সুদূরভবিষ্যতে তাঁর বংশের কেউ-না-কেউ পদানত হবে ওদের। গোটা নবগ্রামই হবে।

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। কেউ যেন সুর ক'রে বক্তৃতার ঢঙে কিছু পড়ছে। বড় ভাল লাগল তাঁর। রাধাকান্তের বৈঠকখানা। কে পড়ছে? গৌরীকান্ত নিশ্চয়।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে, তোমার চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার, ডুবাও চোখের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।

বড় ভাল লাগল তাঁর। এই অন্ধকার জনহীন পথে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, অপার সান্ত্বনা পেলেন তিনি। এ সুর অপরিচিত নয়, কিন্তু এর প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। সবটা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। তবু মন তাঁর জুড়িয়ে গেল। একবার ইচ্ছা হ'ল, গৌরীকান্তকে ডাকেন। কিন্তু লজ্জা অনুভব করলেন। মনে মনে সেইখান থেকে আশীর্বাদ ক'রেই চলতে আরম্ভ করলেন তিনি। ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দাবি

মকমক্ কিচিমিচি কিচিমক্ কিচিরমিচির—
শুনিয়া অদ্ভুত শব্দ তাড়াতাড়ি খুলিনু কপাট,
পরিচিত কেহ নহে, নহে কোন খাজা বা খিজির,
নহে নেতা উপনেতা, চেয়ারম্যান, মেয়র বা লাট ;
দেখিলাম, করি যেন মরি-বাঁচি প্রেরণা সম্বল
উড়িছে চামচিকা এক বিস্তারিয়া ডানা আর ঠ্যাঙ।
ভাবিতেছি কারে ডাকি— কুকুর অথবা দমকল ?
হেনকালে শুনিলাম— ভয় নাই, আমি কোলা ব্যাঙ,
দিতেছি অভয়। হে বাঙালী কবি, শুন মন দিয়া
পার্টিশন-সমস্যার আমরা করিব সমাধান।
মানবীয় ভাষাযোগে পার যদি তোলহ ছন্দিয়া
আমাদের ভাবরাশি, পার যদি গাহ নব-গান।
সবিস্ময়ে দেখিলাম, ভেকও এক চৌকাঠের ধারে
উচ্চক্ষু বসিয়া আছে। দৃষ্টি দিয়া গিলিছে আমারে।

চামচিকা কহিল, দেখ, করিয়াছি বহুকাল বাস
সেই গৃহ-পরলেতে, যেই গৃহে নেতাজী সুভাষ
থাকিতেন অহোরাত্র, করিতেন কত পড়ালিখা
কত না স্বদেশ-চিন্তা। নহি আমি সামান্য চামচিকা।
পার্টিশন-বিষয়েতে নেতা-সঙ্গী কথা বলিবার
আছে মোর সুতরাং আছে আছে আছে অধিকার।

ছুছুঁন্দরও কহিল হাসি, সাধুসঙ্গ ঘটেছে আমারও।
আমিও করেছি বাস বহুকাল পদপ্রান্তে তাঁর
খ্যাতি যাঁর বিশ্ব জুড়ে, নাম যাঁর সামান্ত চামারও
জানে আজকাল। সুতরাং একচ্ছত্র মোর অধিকার
মারে কেবা? শুনেছি বিবিধ গান বিচিত্র সুরের,
ছিনু টেবিলের নীচে—হেঁ হেঁ, খোদ রবি ঠাকুরের।

"বনফুল"

দি বক্স টানেল

(চার্লস রীড)

৭ই মে ১৮৪৭ সাল।

দশটা পনেরোর ট্রেনটা প্যাডিংটন স্টেশন থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাঁ দিককার একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চারজন যাত্রী, এদের মধ্যে দুজনের চেহারা বর্ণনার যোগ্য।

মহিলাটির ললাট শুভ্র, পেলব, মসৃণ ও কোমল; ভ্রূলেখা সুস্পষ্ট; চোখ দীর্ঘপল্লবচ্ছায়ায় রহস্তময়, ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ বদলায় যেন; আর সুকুমার ওষ্ঠরেখার ফাঁকে কুন্দধবল দাঁতের সারি সুবিন্যস্ত। তার ওই চোখ আর মুখটুকুর আকর্ষণে পুরুষের নজর তার নাকের উপর পড়ে না। তার নিজের জাত যারা, তারা অবশ্য এ নিয়ে তার সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলতে পারে, বলবেও। নিতান্ত সাদামাটা একটা ধূসর রঙের পোশাকও প'রে আছে, লজঞ্জুলের মত বোতামের সারিতে গলা পর্যন্ত আঁটা। গায়ে জড়ানো একটা স্কটিশ শাল, রঙটা চোখে বেশ মোলায়েম ঠেকে। একটি আঁটোসাঁটো-পালকে পালিশ পাতিহাঁস যেন, বেশ আরামে গুটিগুটি মেরে ব'সে আছে। হাতে একখানা বই,—ওই ধরার ভঙ্গীতেই ওর কব্জিটুকুর সুধু একটু ইশারা যেন নজরে পড়ে।

তার সামনের বেঞ্চে যে ব'সে আছে সে, আমি যাকে বলি "বিশিষ্ট," সেই ছাঁদের সুপুরুষ, এটা তার পক্ষে গৌরবের কথা; কেন না, সে যে গোষ্ঠীর মানুষ, সেখান থেকে যে সব মূর্তিমান জোয়ানমর্দের আমদানি হয়, তারা প্রায়ই কল্পনাতীত কিম্ভূত—মানে, ও একজন সোয়ারী অফিসার, বয়েস পঁচিশ। গোঁফ আছে; তবে বউ-খেদানো গোঁফ নয়—মানে, চুমুক দিতে গেলেই

যে সব গোঁফে ঝোপঝাড়ে শিশিরের ছিটের মত ঝোল থাকে লটকে, সে জাতীয় নয়; ছোট ঘন কয়লার মত কুচকুচে কালো গোঁফ। দাঁতগুলো এখনও তামাকের ধোঁয়ায় রসিয়ে ওঠে নি। ওর পোশাকটা ওর গায়ে সেঁটে বসে নি, আবার ঝুলঝুলও করছে না। মন-ভোলানো ওর হাসিটি। আর আমার ওকে যেজন্যে ভাল লাগছে, তা হচ্ছে ওর ওই গেরমানি ভাবটা, একেবারে বেপরোয়া; ঠিক জায়গাটিতে ভরপুর হয়ে আছে—মানে, ওর মনে, মুখে নয়। আমাকে আর অন্য অনেককে, যাদের মধ্যে ও বস্তু নেই, যেন ও দুই কনুই মেরে ঠেলে হটিয়ে দিয়ে চলেছে। এক কথায়, এমনটি কখনও কখনও শোনা যায় বটে, চোখে বড় একটা পড়ে না। তরুণ অভিজাত যাকে বলে।

উৎসাহে উত্তেজিত গুঞ্জনে ও কথা ক'য়ে চলেছে ওর সঙ্গীর কানে কানে, সেও ওর বন্ধু অফিসার। কথার বিষয় যা, তা নিয়ে আলোচনা না হওয়াই ভাল ছিল—মানে, নারী। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ আড়ি পেতে ওর কথা শোনে তা ও চায় না। কেন না, ক্ষণে ক্ষণে ও সম্মুখবর্তিনীর দিকে চোরা চাউনিতে চাইছে আর স্বর আরও খাটো ক'রে ফেলছে। মেয়েটি, মনে হয়, কেতাবের মধ্যে একেবারে ডুবে আছে, আর তাতেই ও একটু নিশ্চিন্ত হচ্ছে।

শেষে দুই জনাতে বাস্তবিকই একেবারে ফিসফিস ক'রে ফেললে কথার আওয়াজ। যে ছোকরা হ্লাউতে নেমে গেল আর ভবিষ্যতের ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে গেল, সে বাজি রাখলে (জিতলে দশ পাউণ্ড, হারলে তিন পাউণ্ড) যে, যে ছোকরা আমাদের সঙ্গে বাথের (এবং অমরত্বের) অভিমুখে চলেছে, পথে ইতিমধ্যে ওই দুটি মহিলার একজনকে চুম্বন করার তার হিম্মৎ হবে না।

রাজি, সই!

অবশ্য যার আমি এতক্ষণ এত গুণগান করলুম, সে যে চুপিচুপিও এমন একটা অকর্মে লিপ্ত হতে পারে, সেজন্যে সত্যিই আমার খারাপ লাগছে। কিন্তু সারাক্ষণই কেউ কিছু আর বিজ্ঞ হয়ে ব'সে থাকতে পারে না, জীবনের ঘড়িটাতে যখন পঁচিশটা বাজে, তখনও না। আর এ সবও ভেবে দেখ, তার পেশা, তার ওই চেহারা; আর তা ছাড়া প্রলোভনটাও—হয় দশ পাউণ্ড জিত, নয় তিন পাউণ্ড হার।

স্লাউয়ের পর দলটা এসে ঠেকল তিনজনে। টোয়াইফোর্ডে মহিলাদের একজনের রুমালটা প'ড়ে গেল; ক্যাপ্টেন ডলিনন নিরীহভাবে তার উপর গিয়ে পড়ল। এই সূত্রে গোটা দুই-তিন বাক্যবিনিময় হ'ল।

রেডিং স্টেশনে আমাদের এই কাহিনীর রাজপুত্র একটা নিরাপদ কারবারে টাকা খাটিয়ে বসল—মানে, একখানা 'টাইমস্' আর একখানা 'পাঞ্চ' কিনলে। শেষেরটার পাতায় পাতায় এচিং আর উড্‌কাটের ছবি। বিষয়—বীরদর্পী পুরুষ আর সুন্দরী ললনা কোনও একটা হামবড়া ব্যাপার কিংবা ওই রকম একটা আর কারুর দিকে কৃপাহাস্তে কৃপাকটাক্ষ হানছে। এখন এটা মানতেই হবে যে, একত্রে একবার হাসতে পারলে, পরস্পরের মনের মধ্যেকার বরফের চাপটা গ'লে যায়। অতএব সুইনডনে পৌছবার অনেক আগেই, 'কথায় কাটে কথার প্যাঁচ' শুরু হয়ে গেল। সুইন্‌ডনে পৌছবার পর দেখা গেল, ক্যাপ্টেন ডলিননের তুল্য অমন একটি সেবাপরায়ণ যুবক খুঁজে পাওয়াই ভার। হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে সব। এই সুপ এগিয়ে দিচ্ছে, এই মুরগীর রোস্ট এগিয়ে দিচ্ছে; এই একজনের সুপ, ব্রাণ্ডি আর কোচিনীল দিয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে, এই অন্যজনেরটা ব্রাণ্ডি আর চিনি মিশিয়ে মিঠে ক'রে দিচ্ছে।

গাড়িতে ফিরে এসে মহিলাদের মধ্যে একজন দরজার ওধারে ভিতর দিকে গেল আর একটি ভদ্রলোকের সীটের তদারক করতে।

পাঠক! তুমি কিংবা আমি হ'লে অবশিষ্ট সুন্দরীটি কি করতেন? নিশ্চয় স'রে পড়তেন সুড়সুড় ক'রে। আর সুন্দরী না হয়ে যদি মাঝারি হতেন, তা হ'লে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত সব, আমরা সুদ্ধু। হাতের মাখন-মাখানো রুটিটা হাত থেকে ছটকে গেলে সেটা যেমন মাখনের দিকটাতেই মুখ থুবড়ে কার্পেটের উপর পড়বেই, এ কথাটাকে তার চেয়েও সত্যি ব'লে মেনে নিও।

কিন্তু ইনি হলেন অ্যাডনিস—ফুলবাবু, তায় জঙ্গীসোয়ার, অতএব ভিনাস প্রেমলক্ষ্মী একত্রেই র'য়ে গেলেন তার সঙ্গে—একাকিনীই। অপরিচিত কুকুরীর সঙ্গে কোনও কুকুরের যখন ভেট হয়, তখন লক্ষ্য ক'রে দেখো, কি রকম ডগমগ, কি সুন্দর, কি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তার ভাবখানা! সুইন্‌ডনের পর থেকে ডলিনস ঠিক তেমনিটি হয়েছে। আর হতভাগাটার কথা যদি সত্যি ক'রে বলতে হয় তো বলব যে, তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। আর পুষিকে দেখেছ, সরের বাটি এগিয়ে আসতে দেখলে তার ভাবখানা কেমন হয়? ঠিক

তেমনই হয়েছে মিস হেথরনের ভাবখানা, উত্তরোত্তর সে স্থির গম্ভীর হয়ে উঠছে।

আমাদের ক্যাপ্টেন অল্প একটু পরেই একবার বাইরের দিকে চাইলে, তারপর হেসে উঠল হো-হো ক'রে। এই ব্যাপারটাতে মিস হেথরন ওর দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু হয়ে।

হোঃ হোঃ! আমরা বক্স টানেল থেকে আর মোটে এক মাইল। হো-হো!

বক্স টানেল থেকে ঠিক এক মাইল দূর থাকতে বরাবরই কি আপনি হেসে ওঠেন?

বরাবর।

হেতু?

সে—মানে, হুঁম্‌ম্, সে এক ভদ্রলোকের কেচ্ছা।

ক্যাপ্টেন ডলিনন মিস হেথরনকে তখন এই গল্পটা বললে, একজন মহিলা আর তার স্বামী পাশাপাশি ব'সে চলেছে ওই বক্স টানেলের ভেতর দিয়ে। আর একজন ভদ্রলোক ব'সে আছে ঠিক তাদের সামনের বেঞ্চে। ঘুরঘুটি অন্ধকার। গাড়ি টানেল থেকে বেরবার পর মেয়েটা বললে, আচ্ছা জর্জ, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড তোমার, টানেলের মধ্যে চলার সময় আমাকে চুমু খেলে!

ওসব কিছুই আমি করি নি।

কর নি?

না। কেন?

কেমন যেন মনে হ'ল, খেলে তুমি।

এইখানে ক্যাপ্টেন ডলিনন খুব হেসে উঠে সঙ্গিনীটিকে হাসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। উঁহু! কিছুতেই তা হবার নয়। ট্রেনটা গিয়ে ঢুকল টানেলে।

মিস্ হেথরন। এঃ!

ডলিনন। কি! কি, হ'ল কি?

মিস হেথরন। ভয় লাগছে।

ডলিনন। (পাশে এসে ব'সে) ভয় পাবেন না; ভয় কি? আমি তো কাছে আছি।

মিস হেথরন। আপনি কাছে আছেন—ক্যাপ্টেন ডলিনন, বড্ড বেশি কাছে।

ডলিনন। আপনি আমার নাম জানেন?

মিস হেথরন। আপনি বলছিলেন, তখন শুনেছি। উঃ, এই অন্ধকারটা থেকে বেরতে পারলে বাঁচি!

ডলিনন। খুশি হয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে কাটিয়ে দিতে পারি আপনাকে ভরসা দিতে দিতে, বুঝেছেন!

মিস হেথরন। হ্যাৎ!

ডলিনন। পুচ!

(গম্ভীর পাঠক, এর পরই যে সুন্দরীর সঙ্গে আপনার ভেট হবে, ঠোঁট দুটো তার দিকে যেন ধাওয়া না করে। তা হ'লেই কিন্তু ওই আওয়াজটার অর্থ জেনে ফেলবেন।)

মিস হেথরন। এঃ! এঃ!

মিস হেথরনের বন্ধু। কি! কি! হ'ল কি?

মিস হেথরন। খোল, খুলে দাও। দোর খুলে দাও।

[দ্রুত ফিস ফিস কথার আওয়াজ। দড়াম ক'রে দরজাটা এঁটে বন্ধ করার আর ঝড়াক্‌সে খড়খড়ি টেনে দেওয়ার শব্দ।] ওইরকম অস্পষ্ট সব আওয়াজ কথাবার্তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার জন্তে যদি কোন সমালোচক আমাকে তেড়ে আসে, তা হ'লে আমিও তাকে কলা দেখিয়ে জবাব দেব যে, বাপু হে, ঠ্যাঙাঠেঙি করতে হয়তো যে তোমার সমান, তার সঙ্গে লাগ; তার চেয়ে বড় যারা—সোফোক্লিস, ইউরিপাইডিস, অ্যারিস্টোফেনিস তারাই এই পথ দেখিয়েছে; নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি তাদের পদানুসরণ করেছি।

মিস হেথরনের চিৎকারটা মাঠেই মারা গেল; কেন না, ঠিক সেই মুহূর্তেই বেয়াড়া এঞ্জিনটা এমন চিকরিয়ে 'সিটি' মেরে উঠল, যেন চল্লিশ হাজার খুন হয়ে যাচ্ছে ওর চোখের ওপর। আর কৃত্রিম শোক নিজেকে যেমন জাহির করতে পারে, আসলটি তা পারে না—এ তো জানা কথা।

টানেল থেকে বাথে পৌঁছবার মধ্যে আমাদের বন্ধুবর যথেষ্ট সময় পেল তার ব্যবহারটা ঠিক সুকুমারভদ্রজনোচিত হয়েছে কি না, এ প্রশ্ন নিজেকে করবার।

অতি অনুতপ্ত গম্ভীর বদনে (সত্যি কি মিথ্যে তা জানি নে বাপু) সে দরজাটা মেলে ধরলে। তার সাম্প্রতিক বন্ধুরা ওকে পাশ কাটিয়ে ওপাশে

যাবার চেষ্টা করলে। অসম্ভব! তারই ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে হবে। যাকে সে অপমান (চুম্বনের সংস্কৃত পর্যায়) করেছে, সেই মেয়েটি ওর পায়ের কাছাকাছি কোথাও চোখ নামিয়ে ফেললে, চোখে তার মৃদু ভর্ৎসনা, মুখ লজ্জায় রাঙা। আর অন্যটি, যাকে আর কি ওরকম অপমান করে নি, সে কটমটিয়ে চেয়ে যেন ছোরা হানলে, আগুন ঠিকরে পড়ল তার চোখে। তারপর তারা চ'লে গেল।

ডলিননের নিতান্ত ভাগ্যি যে, তাদেরই রেজিমেণ্টের মেজর হস্‌কিন্স তার সুহৃদ। রাগী লোক; ছোকরারা তাকে ঠাট্টা করে, কেন না, বিলিয়ার্ডের গোলা আর সিগারের আগুন ওসব ওর কাছে অতি তুচ্ছ, ওগুলোকে ও নেহাৎ তাচ্ছিল্যই করে। লোকটা জীবনে ঢের কামানের গোলা আর কামান-ধরানো মশাল নিয়ে কারবার করেছে, তা ছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মেসের ছোকরাদের ওসব খোঁচা ও ঢের গলাধঃকরণ করেছে, তাতে ক'রে, আর যাই হোক, ওর পক্ষে কোনও অভদ্র কাজ করা বা কথা বলা অসম্ভব হয়েছে।

ক্যাপ্টেন ডলিনন ভদ্রলোককে গল্পটা খুব ফুর্তি ক'রেই বললে। কিন্তু মেজর হস্‌কিন্স ওর উত্তেজনা গায়ে না মেখে, নির্বিকার মুখে বললে যে, সে একজনের কথা জানে, ঠিক ওই কারণেই যে মারা পড়েছে। বললে, ও এমন কিছু না। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, হতভাগার মরাই উচিত।

এতে ছোকরার মুখটা লাল হয়ে উঠল। দেখে মেজর বললে, মানে, লোকটা পঁয়ত্রিশ বছরের ঢেঁকি। আর তোমার বোধ হয়, এই একুশ।

পঁচিশ।

তা ও একই কথা। আমার একটা উপদেশ নেবে?

বলি দেন।

কাউকে এ কথা ব'লো না। আর দেখ, হোয়াইটকে বাজিহারার তিনটে পাউণ্ড পাঠিয়ে দাও, যাতে সে বোঝে যে তোমার হার হয়েছে।

তা করা শক্ত,—বাঃ! জিতেছি যে!

তবু যা বলছি, তাই কর হে।

মানুষের একান্ত সাধুতায় অবিশ্বাসীরা জানুক যে, এই জন্দী-লোমার অপরাধে লজ্জা পায়। কি আর করে, এই সৎকাজটা করতেই হ'ল তাকে, যদিও নিতান্ত অনিচ্ছায়। আর এইটে হ'ল তার প্রথম ধাক্কা, যুবকে যাওয়ায়।

এক হপ্তা পরে একটা নাচের মজলিসে গেছে সে। মনটা একটা খুঁৎখুঁতে ভাবে ভরা, সাধারণত ভদ্র ইংরেজের যেমনটাই হয়ে থাকে আর কি, কিছুই যেন মনের মতন চলছে না। অর্জ ডলিননের রূপগুণ সম্বন্ধে মনে মনে তার নিজের যে মাপকাঠি তারই যোগ্য কোন মেয়ের দেখা পায় কি না—মিছেই সেই খোঁজে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এমন সময় পাশ দিয়ে চ'লে গেল একটা মধুময় স্বপ্ন, না মায়া! মেয়েটি তার রূপের ছন্দ আর ছন্দের সুষমায় এক লহমায় ওকে তাক লাগিয়ে দিলে। চেয়ে দেখলে আবার, হতেই পারে না; হ্যাঁ, এই তো! মিস হেথরন। (এ নয় যে, নামটা সে জানত) কিন্তু এ কি অভিনব পরিণতি রূপের! যে ছিল যেন পাতিহাঁসটি, সে আজ হয়েছে যেন ময়ূরী, একেবারে ঝকমক ঝলমল করছে। ওকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাচ্ছে; আর যেন আয়তনের দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একবার হারিয়ে গেল মেয়েটি। আবার খুঁজে পেল তাকে। মেয়েটি এত রূপবতী যে, তার রূপও স্নায়ুকে পীড়িত ক'রে তুলছে। আর ওই কিনা একমাত্র মানুষ, যে মেয়েটির সঙ্গে একটু নাচতেও পাবে না, আলাপও করতে পাবে না! যদি মামুলী ভাবে পরিচয় শুরু হয় ও খুশি হতে পারত, তবে হয়তো ওই একটা চুম্বনেই তার অবসান ঘটত; এখন সবই ভণ্ডুল হ'ল।

মেয়েটি নাচছে, আর রূপের ফুলকি ঠিকরে পড়ছে তার চতুর্দিকে, সুধু ওকেই বাদ দিয়ে,—সে ওকে চেয়ে দেখেই নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ওর দিকে সে চাইবেও না। একটা লোক দেখা যাচ্ছে একেবারে নাছোড়বান্দা। মেয়েটা তার এই আঁটুলিপনাতে খুশির হাসিই হাসছে তার দিকে চেয়ে। লোকটা কুচ্ছিত, কিন্তু মেয়েটা ওকে হেসে কৃতার্থ করছে। ডলিনন, লোকটার কুতিত্বে তার কুরুচিতে তার কুরূপে তার আস্পর্দ্ধায় অবাক হচ্ছে। শেষে ডলিনন নিজেকে যেন অপমানিতই বোধ করতে লাগল। কে হে লোকটা? আর ওর অধিকারই বা কি এসব এমনিতর ক'রে চালাবার! ও ব্যাটার ওকে চুমু খাবার কোনদিন হিম্মৎ হয় নি নিশ্চয়। ডলিনন আপন মনে গজরায়। ও কথা ডলিনন প্রমাণ করতে পারে না বটে; কিন্তু যেমন ক'রেই হোক, ওর সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে যেন এমনই ধারার ভাব ডলিননের।

সে বাড়ি ফিরে গেল, মিস হেথরনকে স্বপ্নে দেখলে, আর যত কদাকার কুৎসিত লোকদের উপর হাড়ে চ'টে রইল। একপক্ষকাল ধ'রে সুন্দরীটি কে,

তাই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলে। কিছুতেই আর নাগাল পায় না তার। শেষে যে ভাবে তার খবরটা পেলে, তা বলছি।

একদিন এক উকিলের মুহুরী ওর সঙ্গে এসে দেখা করলে অল্পক্ষণের জন্যে আর ওর বিরুদ্ধে মিস হেথরনের পক্ষে রেলগাড়িতে অপমানের দরুন এক মকদ্দমা রুজু করলে।

ছোকরা তো একেবারে ঘাবড়ে গেল, মুহুরীটিকে ভেজাবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু সে যন্ত্রটি এমন যে, ওর শর্তের, ওর কথার অর্থ সে ধরতেই পারল না। যাই হোক, এই দুর্ঘটনায় প'ড়ে মহিলাটির নামটা জানা গেল। আর নাম থেকে ধাম জানা একটা ছোট ধাপ বইত নয়। সেইদিন এবং পরে পরে আরও অনেকদিন, আমাদের ভগ্নচূড় মহাবীর মেয়েটার দরজায় ওত পেতে ধন্না দিয়ে প'ড়ে থাকতে লাগল, ফল কিছুই হ'ল না।

কিন্তু একদা এক মনোরম অপরাহ্ণে মেয়েটি নিতান্ত মামুলীভাবেই যেন বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, রোজই যেন ওইটেই তার অভ্যাস। আর সাধারণের হাওয়া-খাওয়ার পথটা, সেখানে গিয়ে হন হন ক'রে হেঁটে বেড়াতে লাগল। অতএব ডলিননকেও তাই করতে হ'ল। পথে বার বার ওদের দেখা হ'ল, বার বার পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে হ'ল; আর মেয়েটির চোখে করুণার আভাস কিছুমাত্র ফোটে কি না, বেচারা তারই তল্লাস করতে লাগল। কিন্তু হায়, সে না চোখ ফিরিয়ে চাইলে, না তার মুখে ওকে যে চেনে তার আভাসটুকুও পাওয়া গেল। যাই হোক, মেয়েটা বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই, বেড়াচ্ছে তো বেড়াচ্ছেই। ইতিমধ্যে আর সব হাওয়া-খোরদের দল শ্রান্ত হয়ে চ'লে গেল। তখন ওই অপরাধী লোকটা বুকে বল সংগ্রহ ক'রে মাথার টুপিটা নামিয়ে কাঁপা গলায় (জীবনে এই প্রথম তার গলা কাঁপছে কথা কইতে) মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইলে।

মেয়েটি দাঁড়াল, মুখ তার রাঙা হয়ে উঠল; আর তার ভাবে, সে তাকে যে চেনে তা না স্বীকার করলে, না অস্বীকার করলে। এরও মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ভাঙা ভাঙা বাধো বাধো ভাষায় ব'লে চলল, সে যে কী লজ্জায় ম্রিয়মাণ, শাস্তিই যে তার উচিত প্রাপ্য, হৃদয়ে কি শাস্তিই না সে বহন করছে; মেয়েটি কি ক'রে জানবে যে সে কী দুর্বিহ জীবন যাপন করছে, এবং উপসংহারে সে মিনতি ক'রে জানালে যে, ওর পরিচয়ে বঞ্চিত হয়ে এমনিতেই সে মর্মাহত,

এমন হতভাগ্যকে জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে যেন আর অপদস্থ করা না হয়।

মেয়েটি কৈফিয়ৎ দাবি করলে। ছোকরা বললে মকদ্দমার কথা, মেয়েটির নাম দিয়ে যা রুজু হয়েছে। মেয়েটা তার কাঁধ দুটোকে একটু 'কে জানে বাবা'-গোছ দোলা দিয়ে বললে, উঃ, এগুলো কি হাঁদা! এই উক্তিতে একটু ভরসা পেয়ে ছোকরা অনুনয় ক'রে জানতে চাইলে যে, দূর থেকে ভালবাসব, তোমায় জানতে-দেব-না-গোছের অকপট আত্মদানে বহু বৎসরান্তেও তার এই উন্মত্ততার, তার এই অপরাধের স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে যাবে কি না!

ও তা বলতে পারে না।

এখন অবশ্য তাকে বিদায় নিতে হচ্ছে, যেহেতু তাকে গিয়ে আবার ক্রেসেণ্টে একটা নাচের আয়োজন করতে হবে, সব্বাই যাবে।

বিদায় নিলে তারা। আর ডলিনন ওই নাচে, যেখানে সব্বাই যাবে, সেখানে যাবেই এই প্রতিজ্ঞা করলে।

উপস্থিত হ'ল সেখানে গিয়ে। গিয়ে মিস হেথরনের সঙ্গে দস্তুরমত যোগাড় ক'রে পরিচয় করলে। নাচলেও তার সঙ্গে। মেয়েটির ব্যবহার অমায়িক। আর মেয়েদের স্বাভাবিক চতুরতায়, সে' বাইরে এমন ব্যবহার দেখালে যেন ওই সন্ধ্যেবেলাই তাদের এই প্রথম আলাপ।

সেদিন রাত্রে, সেই প্রথম, ডলিনন প্রেমে পড়ল। অবশ্য পাঠকদের আমি রেহাই দেব প্রেমিককুলের চিরন্তন সেই কলা-কৌশলের মারপ্যাঁচ থেকে, যাতে ক'রে ছোকরা যেখানেই মেয়েটা থাক্, যে নাচে মেয়েটা নাচুক, যে পথেই মেয়েটা ঘোড়া দাবড়ে যাক, দৈবাৎ সেখানে ও গিয়ে পড়বেই। তার আত্মরক্তি মেয়েটার পেছনে তাকে চার্চে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে, যেখানে নাকি এই জঙ্গী সওয়ার এই একটা জ্ঞান লাভ করলে যে এমন জগৎ আছে যেখানে এলে মানুষ পোল্কাও নাচে না, চুরুটও ফোঁকে না,—ওই জগতের এ দুটো এক নম্বর পাপ।

ছোকরা মেয়েটির খুড়োর সঙ্গে আলাপ করলে, তিনি ওকে পছন্দ করলেন। শেষে সে লক্ষ্য করলে যে, মেয়েটি ওকে অন্যমনস্ক দেখলেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বক্স টানেলের তিন মাস পরে ক্যাপ্টেন ডলিনন একদা রয়্যাল নেভির ক্যাপ্টেন হেথরনের সঙ্গে দেখা করলে, জীবনে দুবার মাত্র এঁর

সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। অথচ মনযোগে প্রাণপণে তার একটা খালকাটা অভিযানের গল্প গলাধঃকরণ করার পর সামান্ত একটু নরম ক'রে আনতে পারল তাঁকে। তারপর ওঁর সঙ্গে একদিন দেখা ক'রে ওঁর কন্তার সঙ্গে পূর্বরাগ যাপন করবার অনুমতি চাইলে। তৎক্ষণাৎ সেই সুযোগ্য নাবিকবর একেবারে নাবিক-অফিসারের মূর্তি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় অন্তরাল থেকে তাঁর ডাক এল, একটা খুব রহস্তময় ডাক। ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের সুর একটু বদলে গেল। বললেন, ঠিক হ্যায়। আর জানালেন যে, তাঁর দর্শনপ্রার্থী ইচ্ছা করলেই এখন তার গন্তব্যের দিকে ছুটতে পারে।

পাঠক, ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন! নাবিক কম্যাণ্ডারটি, তাঁর কন্তা অর্থাৎ আমাদের নায়িকাটির মতে একমত এবং খুশি হয়েই রাজী।

তিনি বিদায় নিয়ে যেতে না যেতে ক্যাপ্টেন ডলিনন দেখলে যে, তার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী সুড়ুৎ ক'রে হাজির বসবার ঘরটিতে। সে ওর কাছে এগিয়ে যেতে দেখলে, ওর মিষ্টি মুখে একটা দিশাহারা-গোছ ভাব ঘনিয়ে উঠেছে। মেয়েটি একবার হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেললে আর তারপরই আবার কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললে। এর পর দোরগোড়ায় এসে হস্তচুম্বন ক'রে বিদায় নিতে নিতেই ক্যাপ্টেন অমুক আর মিস অমুকীর বদলে তারা জর্জ আর ম্যারিয়ান হয়ে উঠল।

একটা ভদ্রোচিত যুক্তিসঙ্গত সময় অতিবাহিত হতে দেওয়া গেল (কেন না, আমার গল্পটার দয়ামায়া আছে আর নিতান্ত কষ্টকর প্রতীক্ষার দিনগুলো সে ডিঙিয়ে চ'লে থাকে)। তারপর এরা দুজনে খুবই খুশি। আর একবার সেই রেলপথে তারা বার হ'ল মধুচন্দ্রযাপনে, একেবারে ওরাই শুধু। ম্যারিয়ান-ডলিননের পোশাক হুবহু সেই সেবারকার পোশাক; সেই পাতিহাঁসের মত তুষ্ট পুষ্ট আর মনোরম। এবারে জর্জ আর তার সামনের বেঞ্চে নয়, একেবারে তার পাশেই, আর ম্যারিয়ান তার দীর্ঘপল্লবের আড়াল থেকে ওকে পান করছে প্রশান্ত মনে।

ম্যারিয়ান, বিবাহিত দম্পতির উচিত পরস্পরের কাছে সব খুলে বলা। যদি সব খুলে বলি, তবে কি কোনদিন তুমি আমাকে মাপ করতে পারবে? না—

নিশ্চয়। বল।

আচ্ছা বেশ, তা হ'লে তোমার বক্স টানেলের কথা মনে পড়ে তো! (এই প্রথম, সে ভরসা ক'রে ও কথা তুললে) খুব লজ্জিত হয়েই জানাচ্ছি যে, হোয়াইটের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম যে তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন মেয়েকে চুমু খাব। জিতলে দশ পাউণ্ড, হারলে তিন পাউণ্ড।—এই ব'লে জর্জ মুখটা খুব করুণ ক'রে মনে মনে একচোট হেসে নিলে।

গম্ভীর মুখে উত্তর হ'ল, ও কথা আমি জানি জর্জ। আমি তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছিলাম।

ও! সত্যি শুনেছিলে? অসম্ভব।

আমার সঙ্গিনীর কানে ফিস ফিস করতে শোন নি আমাকে? ওর সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম।

বাজি ধরেছিলে? কি আশ্চর্য! বাজিটা কি?

এক জোড়া দস্তানা, আর কিছু না।

তা তো জানি; কিন্তু কি নিয়ে?

যে, তুমি যদি ওকাজ কর তবে তুমিই আমাকে বিয়ে করবে প্রিয়তম।

ও! কিন্তু দাঁড়াও, তা হ'লে তুমি আমার উপর এত চটতে পারতে না মণি। আর তা ছাড়া, আমার বিরুদ্ধে সেই মকদ্দমাও তো রুজু করেছিলে না?

শ্রীমতী ডলিনন চোখ নিচু করলে।

আমার ভয় হয়েছিল যে, তুমি আমায় ভুলতে শুরু করেছ। জর্জ, তুমি কি কখনও আমাকে মাপ করতে পারবে!

মণি আমার! এই তো বক্স টানেল।

পাঠক! আর না। তেমন কিছুটি আর নয়। বারে বারেই অন্ধকার জায়গা এলেই ওই সব ব্যাপার ঘটাতে আস্কারা দিতে হবে এমনটি আশা করতে পার না। আর তা ছাড়া বিবেচনা ক'রে দেখো, ব্যাপারটা ঠিক নয়। মনে রেখো যে, দুটি বুদ্ধিমান বিবাহিত নরনারী এরা। আমি নিশ্চয় বলছি, ওসব কোনও অঘটন ঘটে নি। এঞ্জিনের সঙ্গে হতাশ চিৎকারে পাল্লা দেওয়াও চলে নি এবার।

শ্রীজীবনময় রায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আমরা তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি এবং অগিল্‌ভি হস্টেলে থাকি। হস্টেলের হইয়া শান্তিনিকেতন-টীমের সঙ্গে ফুটবল খেলিতে গিয়াছিলাম। খেলার শেষে সকলে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিতে গেলাম, তিনি তখন "উত্তরায়ণে"র একটি ছোট ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে বড় রকমের একটি ট্রেন দুর্ঘটনা হইয়াছিল। কথায় কথায় সেই প্রসঙ্গ উঠিল। কে যেন বলিল, মৃতের সংখ্যা কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে আসলে তাহা অপেক্ষা মরিয়াছে অনেক বেশি। ক্ষতিপূরণ এড়াইবার জন্ত রেল-কর্তৃপক্ষ আধমরাদের পিটাইয়া মারিয়া রাতারাতি লাশ সরাইয়া ফেলিয়াছে। বক্তার নজির ছিল এই যে, এইরূপ বরাবরই হইয়া আসিতেছে। কথাগুলি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, এই ঘৃণ্য আত্মাবমাননা তোমরা কেমন ক'রে স্বীকার কর বুঝতে পারি না। এই স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের দেশ ও জাতকে যে তোমরা কতখানি নামিয়ে দাও, তা বোঝবার মত শক্তিও তোমরা হারিয়েছ। ভেবে দেখ, তোমরা যা বলছ তা যদি সত্যিই হয়, অর্থের খাতিরে মানুষ এত নীচেও নামতে পারে; এই নৃশংস নীচতা করে কারা? কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা শুধু নয়। আমাদের দেশের অনেকে নিশ্চয়ই এতে লিপ্ত থাকে। যাদের নিয়োগ করা হয় অথবা যারা এসব জানে, তাদের মধ্যে কি একজনও এমন নেই, যে এই পৈশাচিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে, শাস্তির ভয় না ক'রে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে যে, এই পাপ সে সমর্থন করে না! যদি বরাবরই এরূপ ঘ'টে থাকে, কই, কখনও তো কাউকে প্রতিবাদ করতে শুনি নি! এরা সবাই কি পিশাচ হয়ে গেছে?

জবাব দিতে না পারিয়া আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তেজিত কবি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, আর এসব যদি মিথ্যাই হয়, আমরা সারা দেশ জুড়ে এমন মিথ্যার প্রশ্রয় দিই কি ক'রে? মানুষের এতখানি অবনতি যে সম্ভব, মানুষ হয়ে আমরা তা মেনে নিই কেন? কেন জোর গলায় বলতে পারি না—এ হতে পারে না, এ মিথ্যা?

আমরা কেহই কথা বলিতে পারি নাই। লজ্জায় সকলে অধোবদন ছিলাম।

* * *

বিগত আগস্ট মাস হইতে বাংলা দেশ যে ভয়াবহ আত্মকলহে লিপ্ত হইয়াছে এবং যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক হইতে বসিয়াছে, আশা করিয়াছিলাম, উভয় সম্প্রদায়ের জ্ঞানী গুণী ও সহৃদয় ব্যক্তিরা পরস্পর দোষারোপ না করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভুল ও অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইবেন ও তাহার প্রতিকার-চেষ্টা করিবেন। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উপর আমাদের অনেকখানি ভরসা ছিল। দুঃখের সহিত দেখিলাম, আমাদের ভরসা নিষ্ফল হইল। রাজনৈতিক মতলববাজ কয়েকজন লোক ছাড়া বিরোধ-অবসানে কেহই অগ্রসর হইয়া আসিলেন না, সংবাদপত্রে আত্মপ্রচার-মূলক বিবৃতি প্রকাশ ছাড়া সত্যকার কাজ কিছু হইল না। শুধু হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সকলকে লজ্জা দিয়া অশীতিপর একজন অবাঙালী বৃদ্ধ দুর্বৃত্তদের হৃদয় জয় করিতে আসিলেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়কেই আহ্বান করিলেন পাপ স্বীকার করিতে। সাময়িক উত্তেজনার বশে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করিলেন, লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং অপহৃতা নারীদের যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিতে। ইহাও দেখিলাম, তিনি প্রায় বিফল হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বিহারের দুর্বৃত্তেরা, হাজারে হাজারে না হউক, অনেকে স্বেচ্ছায় আইন ও শৃঙ্খলার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মনুষ্যত্বের প্রতি যে বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম, তাহার কিছুটা ফিরিয়া পাইলাম।

* * *

রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছিলেন তখন আমাদের বয়স কম ছিল, জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ মনুষ্যত্বের দুর্গতির সেই পুরাতন প্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকে বলিতে পারিতাম, ধর্মসংক্রান্ত বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বশে একটা জাতকে জাত পশু হইয়া যাইতে পারে, স্বার্থের বশে তো পারেই। ইহার প্রমাণ নারীহরণ ও লাঞ্ছনার কোনও প্রতিবাদ বাংলা দেশের কুত্রাপি উত্থিত হইতে দেখিলাম না সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, দুর্বৃত্তরা যে সম্প্রদায়ের গৌরব হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় মার্কেটবলের বলের মত হতভাগিনীরা নীত হইতেছে, মাঝপথে কেহই দাঁড়াইয়া বলিতেছে না—ইহা পাপ, ইহা অন্যায়। আজ বুঝিতে পারিতেছি, মানুষের বুদ্ধি ও রুচি বিকৃত হইলে কোনও অন্যায়কেই সে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করে না, একা করে না, দশজনে করে না, একটা গোটা সম্প্রদায়গতভাবেও করে না।

* * *

বাংলা দেশে সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় একদিন একান্ত কাছাকাছি আসিয়াছিলাম। হিন্দু রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান নজরুল ইসলামকে লইয়া দুই দলেই মাতামাতি করিয়াছিলাম। আজ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহা হয়তো আমরা উভয় পক্ষই সমর্থন করি না; কিন্তু ফল দাঁড়াইল এই যে, আমরা পরস্পর বিমুখ হইয়া পড়িলাম। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছেদ পড়িয়া গেল। ভাষার ক্ষেত্রে আগে দুধে জল মিশাইবার প্রয়াস দেখিতাম, রাতারাতি এমনই বদল হইয়া গেল যে এখন জলে দুধ মিশাইয়া চালু করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। অথচ অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার ধুয়াও উঠিয়াছে! বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষায় যাহার চাইতে বড় নাই, সেই রবীন্দ্রনাথের গান, সাহিত্য ও ছবি লইয়া শিক্ষায়তনে ও সভায় কলহ হইতে দেখিলাম, অথচ সাহিত্যিকদের তরফ হইতে কোথায়ও কোনও প্রতিবাদ হইল না। বিহার-দুর্বৃত্তদের মত নজরুল ইসলামকে লইয়া আমরা খানিকটা অনুতাপ করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতেই কি চিঁড়া ভিজিল! বাহিরে অর্থাৎ উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের মধ্যে যে কলহ হইয়াছিল, তাহাতে অর্থ ও সম্পত্তি নাশ ঘটিয়াছিল, কয়েক সহস্র হতভাগ্যের মৃত্যু ও কয়েক শত হতভাগিনীর লাঞ্ছনা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু এ সকল ভুলিয়া আবার কাছাকাছি আসা কঠিন হইত না, যদি দেখিতাম, মনে অর্থাৎ উভয় পক্ষের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে এখনও অন্যায়ের প্রতিবাদ-স্পৃহা বজায় আছে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাহা নাই। থাকিলে স্ব স্ব সমাজ বা সম্প্রদায়ের সকল গুণ্ডামিকে উপেক্ষা করিয়া গল্পে কবিতায় উপন্যাসে প্রবন্ধে বক্তৃতায় চিরন্তন মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এই কুৎসিত অভিযানের, প্রবল বা সমবেত না হউক, ক্ষীণ ও একক প্রতিবাদ শুনিতে পাইতাম। নির্ভীক সত্যসন্ধী অন্তত একজনকেও বলিতে শুনিতাম, অসহায় নারীকে ধরিয়া আনিয়া এজমালি বলাৎকার কোনও ধর্মেই সমর্থন করে না। গত নয় মাস ধরিয়া এরূপ একটি ঘোষণার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা ভয় যাহাতেই আটকাক, সে ঘোষণা আজিও হইল না।

* * *

সুতরাং পৃথক হইয়া যাওয়াই ভাল, যে সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ রাখে না সে সংস্কৃতির ধুয়া তুলিয়া দুই মনে-পৃথককে বাহিরে এক করিয়া লাভ কি?

মানুষ পাপ না করিলে কষ্ট পায় না—সাধারণের এই ধারণা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, আমাদের দুঃখ-ভোগের অনুপাতে পাপের পরিমাণ নিশ্চয়ই প্রভূত। হিন্দু সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় পাপ—ছুঁৎমার্গ। স্বামী বিবেকানন্দ এই পাপের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইহাই ছিল চিরজীবনের আক্ষেপ—"মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।" এই পাপের ফলে বহু শতাব্দী কাল হইতে আমরা আত্মনাশের দ্বারা খণ্ডিত হইতে হইতে বর্ত্তমানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছি। এই কারণেই যে মাতা বনিতা ও দুহিতা সম্প্রদায় আমাদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতার জন্য লাঞ্ছিত হয়, তাহারাই অপর পক্ষের শক্তির উৎস হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার জন্যই আত্মঘাতী যোগেন্দ্র মণ্ডলদের সৃষ্টি হয়। আজ সময় আসিয়াছে এই পাপ সর্বপ্রকারে পরিহার করার। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন এই পাপ নিবারণের জন্য একটি চিন্তিত "ফরমুলা" আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ফরমুলা অনুযায়ী কাজ হইলে অদূরভবিষ্যতে আমাদের দুর্বলতার প্রধানতম কারণটি অপসৃত হইতে পারে। উপেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"কিছুদিন হইল ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুমহাসভা এখন জাতিভেদ উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচারকার্য করিবেন। এই সংবাদটি সত্য হইলে আশার কথা। হিন্দুমহাসভা এতদিন রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভের আশায় বহু বক্তৃতা বহু প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন। ওই কার্যটির ভার ষোলো আনাই কংগ্রেসের উপর ছাড়িয়া দিয়া হিন্দুমহাসভা যদি হিন্দু-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুদের যথার্থ উপকার হইত। যেদিন হিন্দুসমাজকে খণ্ডিত করিয়া সিডিউল্ড-কাস্ট বা তপসীলী সম্প্রদায় বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইল, অন্তত সেদিন হইতেও হিন্দুমহাসভার ওই কার্য আরম্ভ করা উচিত ছিল। করিলে এতদিনে হিন্দুরা বহু শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত। তাহা হয় নাই বলিয়া আজ এই নবগঠিত জাতি বর্ণহিন্দুদের বিরোধী। তাঁহারা এখন মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পা দিয়াছেন এবং সম্প্রতি মুসলমান নেতাগণের অনুগ্রহে কিছু রুটি ও মৎস্য তাঁহাদের ভাগে পড়িতেছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। মহাত্মাজী সেবারে যে 'হৈমালয়িক' ভুল করিলেন এবং যাহার ফলে হইল পুণা-প্যাক্ট, তাহাতে অন্তত বাংলা দেশে তপসীলী সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল। মহাত্মাজী তাহাদের 'হরিজন' বলিয়া আপ্যায়িত

করিয়া যে তাহাদের খুশি করিয়াছেন, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। এতদিনেও বুঝা গেল না, মহাত্মাজী কি বিবেচনা করিয়া হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার সম্মতি দান করিয়াছিলেন।

"মহাত্মাজী কেবল অস্পৃশ্যতা দূর করিবার মত একটি ন্যূনতম সংস্কারকার্যের জন্য প্রচার করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে কেবল মাত্র অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই হিন্দুরা এক হইবে না। জাতিভেদ সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নমঃশূদ্র হিন্দুবৃত্তের মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া জাতি বাঁচাইয়া চলিবে, তাহা আর চলিবে না। আমরা শুধু হিন্দু—ব্রাহ্মণও নয়, নমঃশূদ্রও নয়, এইটিই হওয়া উচিত আদর্শ। একদিনে এই পাপ দূর হইবে না, কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এখনই কি করিতে পারি, তাহার আলোচনা করিতেছি।

"(১) মহাত্মাজীকে অনুরোধ করা হউক, তিনি 'হরিজন' কথাটি আর ব্যবহার না করেন। যাহাদের 'হরিজন' বলা হয়, উহাতে তাহাদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তাহাদের সর্বক্ষণই স্মরণ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা "হরিজন" অর্থাৎ অস্পৃশ্য। তিনি ভাঙ্গী কলোনিতে থাকিতে চাহেন, থাকুন; কিন্তু তাহার জন্য ও-সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশি হইলেও তাহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে না।

"(২) গণ-পরিষদ যে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন, তাহাতে "সিডিউল্ড কাস্ট" বলিয়া হিন্দুদের শ্রেণীবিভাগ তুলিয়া দিবার আন্দোলন করিতে হইবে। খুব ভাল হয় দেশের সকল অধিবাসীরা শুধু মাত্র ভারতবাসী বা প্রদেশবাসীই থাকিবেন। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বলিয়া ধর্মগত কি জাতিগত কোন শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ নূতন শাসনতন্ত্রে থাকা উচিত নয়। অন্তত হিন্দুসমাজে শুধু মাত্র "হিন্দু" কথাটিই থাকিবে, কোনও জাতির উল্লেখ থাকিবে না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার-আইনে আমরা হিন্দুরা হিন্দুও ছিলাম না; ছিলাম "অ-মুসলমান" (non-muslims), যেন হিন্দুস্থান মুসলমানদেরই দেশ, সেখানে আশ্রয় পাইয়াছে কিছু অ-মুসলমান।

"(৩) ভবিষ্যতে লোকগণনা হইলে তাহাতে শুধুমাত্র "হিন্দু" কথাটি থাকিবে, জাতির উল্লেখ থাকিবে না। বিহারে অনেকদিন হইতে আদালতে সাক্ষীর উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহার "জাতি" জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"(৪) এখন হইতেই প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর নামের প্রান্তস্থিত জাতিজ্ঞাপক

কথাটি বর্জন করিতে পারিলে ভাল হয়। অর্থাৎ নাম পড়িয়া বা শুনিয়া যেন বুঝিতে পারা না যায়, লোকটি কোন্ জাতির অন্তর্গত। বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ নামে কায়স্থও আছেন, ব্রাহ্মণও হইতে পারেন। তেমনই বাংলায় যোগেন্দ্রনাথ নমঃশূদ্রও হইতে পারেন, ব্রাহ্মণও হইতে পারেন, যাহাই হউন, আমরা জানিব বলিব শুধুমাত্র যোগেন্দ্রনাথ বলিয়া। ছাত্রেরা এখনই এই প্রথা চালু করুন না। জাতিজ্ঞাপক পদবী ব্যবহার করিতে কোন কোন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের লজ্জা হয়। আমি জানি, আমার পরিচিত দুই-তিনটি বন্ধু জাতিতে নাপিত ছিলেন অর্থাৎ 'শীল' পদবী। তাঁহারা ঐ পদবী ত্যাগ করিয়া দত্ত বা দাস হইয়াছেন। চরিত্রে, শিক্ষায়, উপার্জন-ক্ষমতায়, আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহারা কোন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এমনই আমাদের সংস্কার, যেই পদবী শুনিব নাপিত, ধোপা বা নমঃশূদ্র, অমনই আমাদের নাসিকার চর্ম অজ্ঞাতসারে অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। একটা মানুষ সমাজে কৃতী হইলে তাহার জাতিবাচক পদবীটি ব্যবহার হয় না। শুধু সজনীকান্ত শুনিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে ইনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক আর সাহিত্যিক, তাঁহার নামের অন্তে "দাস" না থাকিলেও চলে। রাসবিহারী অ্যাভেনিউ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ উত্তম দৃষ্টান্ত, ঐরূপ শুধু সার্ আশুতোষ রোড সুরেন্দ্রনাথ স্ট্রীট হওয়া উচিত ছিল। শ্রীঅরবিন্দের নিকট হইতে আমি তাঁহার পুস্তকাবলী উপহারস্বরূপ পাইয়াছি, তাহাতে নিজে লিখিয়াছেন, To Upendranath with Blessings of Sri Aurobindo। আমার বা নিজের জাতিজ্ঞাপক পদবীটি বর্জন করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি অনুসরণযোগ্য।

"আমাদের বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে, অদ্ভুত অদ্ভুত জাতিজ্ঞাপক পদবী আছে, তাহার সকলগুলি যে সুশ্রাব্য বা সম্ভ্রম-আকর্ষণযোগ্য তাহা মনে হয় না। যথা অক্রূর, কর কুণ্ড কারফর্মা, খাস্তগীর, গুড়, গুঁই, গড়গড়ি, ঘটক, ঘোষাল, রক্ষিত, পালিত, পিপলাই, সিমলাই, সুর, হাতী, ঢোল, লস্কর, নস্কর, নাহা, রাহা নাথ, সোম সিদ্ধান্ত সাধুখাঁ বর্ধন বল্লভ বসাক বড়াল, মৌলিক মল্লিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পদবীর যাহারা অধিকারী, তাহারা এগুলা বর্জন করিলে হয়তো আনন্দিত হইবেন।

"আবার নবাবী আমলের কতকগুলি পদবী আমাদের নামের পশ্চাতে অনাবশ্যক আবর্জনার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যথা—রায়চৌধুরী মজুমদার তত্তিদার, হালদার সমাদ্দার খাসনবিস মহলানবিস, নিয়োগী ইত্যাদি।

মজা এই, এখনও বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ পাছে লোকে বৈদ্য কিনা বলিয়া সন্দেহ করেন, সেইজন্ত তাঁহারা জাতিজ্ঞাপক পদবীকে রিইন্‌ফোরস্‌ড করিয়া সেনেরা সেনগুপ্ত, দাসেরা দাসগুপ্ত লিখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার শর্মাও যোগ করিতেছেন, যেমন সেনশর্মা গুপ্তশর্মা। আবার অনেকে দাস এর দন্ত্য'স'র বদলে তালব্য'শ লিখিয়া নিজেদের অশূদ্রত্ব প্রচার করিতে চাহেন। জাতির অভিমান বা গর্ব এমনই হাস্তাস্পদ ও অশোভন হইয়া উঠিয়াছে।

"মেয়েদের নাম লইয়া কোনও অসুবিধা নাই। তাঁহারা হয় কুমারী, না হয় দেবী। অনেকে জাতিজ্ঞাপক পদবী না লিখিয়া শুধুমাত্র দেবী লেখেন, যদিও রবীন্দ্রনাথ ইহা অশোভন বলিয়া গিয়াছেন। নাম সংক্ষেপ হওয়া তো ভালই। কুমারী ললিতা বা শ্রীমতী কিরণবালা শুনিতে মন্দ কি? ললিতা গুঁই না লিখিয়া শুধু ললিতা লেখাই তো ভাল।

"আমরা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা জাতটা প্রচার করিতে ব্যগ্র আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা জাত প্রকাশ করিতে লজ্জিত। এ অবস্থায় পদবী বর্জন কল্যাণকর। তরুণ-তরুণীগণ এই কার্য এখনই আরম্ভ করিয়া দেখুন না।

"(৫) পান-ভোজনে অন্তত শহরে ভদ্রসমাজে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার শিথিল হইয়া আসিতেছে। অর্থনৈতিক কারণে অনেক ভদ্রলোক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-পাচক রাখিতে পারেন না। একটি ভৃত্য থাকে, যাহাকে বলা হয় 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড,' সেই রাঁধিয়াও দেয়, অন্ত কার্যও করে। এই কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড নির্বাচনের পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তথাকথিত "হরিজন" সম্প্রদায় হইতে এই শ্রেণীর লোক যত নিয়োগ করা যায়, ততই মঙ্গল।

"(৬) ভিন্ন জাতির বরকন্তার মধ্যে বিবাহের আইন আছে। অনেক যুবক যুবতী এই আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইতেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারতার সঙ্গে ভিন্ন জাতির মধ্যে আরও বিবাহ হইতে থাকিবে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে সকলেরই উৎসাহ ও সমর্থন দেখানো উচিত। বরকন্তা-নির্বাচনের ক্ষেত্র পরিধিতে যত বিস্তৃত হয়, ততই মঙ্গল। এই প্রকার বিবাহে পণের দাবিদাওয়া থাকে না। কালক্রমে এইরূপ বিবাহ দ্বারাই পণপ্রথার উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, জাতিভেদেরও বন্ধন শিথিল হইবে।

"একদিন একটা মন্দিরের দ্বার হরিজনদের জন্ত খুলিয়া দিয়া অথবা সভায় বসিয়া তাহাদের হাতে একটু শরবত বা মিষ্টি খাইলে যে তাহারা কতটা কৃতার্থ হইবে, বলিতে পারি না। আমরা এমন কিছু করিব, যাহাতে হরিজনদের

মনে আত্মসম্ভ্রম জাগ্রত হয়। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে, আমরা সকলেই একই হিন্দু, সমাজে একই অধিকারভোগী। ব্রাহ্মণেরা তাহাদের ক্রিয়াকর্মে পৌরোহিত্য করিবেন না, অথচ তাহারা মুসলমান হইয়া গেলে বিরক্ত হইবেন—এই অন্যায় আর চলিবে না।

"বিষয়টি লইয়া দেশের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকিলে ভাল হয়। আইনের বলে জাতিভেদ কাগজে-কলমে উচ্ছেদ হইলেও সংস্কার থাকিয়া যাইবে। আমরা নিজেরাই যদি জাতিভেদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে আইন করাও সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"

—

গোপালদা তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে নীচের রচনা দুইটি পাঠাইয়াছেন—

১। ওগো মা, মুক্তি যদি পাবেই তুমি
বক্ষে মোদের শক্তি জাগাও।
ঘুমের ঘোরে রইলে প'ড়ে
ব্যথা দিয়ে সে ঘুম ভাঙাও॥
আঁধার মাঝে যেজন রহে
হঠাৎ-আলো তার না সহে,
মাগো, নবীন ঊষার রাঙা রঙে
আশাহীনের মনকে রাঙাও॥
ওগো মা, ধর্মভেদে বর্ণভেদে ভেদ হয় না তোমার মাটির,
সব ভেদাভেদ দূর কর মা, পরশ দিয়ে সোনার কাঠির।
নিশীথ রাতের অন্ধকারে
পরাণ বলি দিলেম কারে?
যদি দিনের আলোয় মা হয়ে মা,
ভীরু ছেলের ভয় না ভাগাও॥

২। যে মাটিতে জন্ম নিলেম আমি
যে মাটিতে হলেম ক্রমে বড়।
সুখে দুখে কাটাই দিনযামি
মন্দ ভাল অনেক করি জড়ো॥
বুঝতে পারি সে মাটি মোর কি যে
মা রয়েছেন কোল পাতিয়া নিজে
পর-অধীনতার বিষম ফাঁসে
দেখ, চেয়ে দেখ সেই মা মরো-মরো॥

আপন-পরের বালাই নিয়ে তোরা
মরতে হ'লে মরিস যেন পিছে
রাতের পরে আলোক আকাশ-জোড়া
ভায়ে ভায়ে লড়লে হবে মিছে।
অনেক দুঃখ দিলেম মোরা মাকে
অন্ধ দলাদলির কঠিন পাকে
চেয়ে মায়ের ম্লান মুখের পানে
এবার সবাই মিলে প্রায়শ্চিত্ত করো॥

বিলম্বের জন্যে কোনও কৈফিয়ৎ নহে, ইহা বিজ্ঞপ্তি মাত্র। আমরা সময়মত কাগজ বাহির করিতে পারিতেছি না। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বৈশাখ বাহির হইল। আমরা নিজেরাই অত্যন্ত বিচলিত আছি। যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পত্রাঘাত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের নিরুপায়তা বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিবেন। জ্যৈষ্ঠের কাগজ আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বাহির করিতে চেষ্টা করিব।

দ্রষ্টব্য

এই সংখ্যায় মুদ্রিত "দুইখানি প্রাচীন সাময়িক পত্র" প্রবন্ধে (পৃ. ২৯) ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী" সহ ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপিগুলি যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত, এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। আমাদের অনুমান যে যথার্থ, ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বালকে' প্রকাশিত প্রতিভাসুন্দরী দেবীর "সহজে গান-শিক্ষা" প্রবন্ধের এই পংক্তিগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

"যে প্রণালীতে আমরা গানের সুর লিখিয়া পাঠকদের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করিব তাহা পোনেরো ষোল বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল।* * এখানে গীত লিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল,... (পৃ. ১৩)।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষাণ্মাসিক সূচি

কার্তিক—চৈত্র, ১৩৫৩

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সহজে পাবার উপায়

বিশ্বভারতী আপিসে (৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭) চিঠি লিখে স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। গ্রাহক হবার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না, চিঠি লিখে দিলেই চলে। এখন কেবল কাগজের মলাট সংস্করণেরই (প্রতি খণ্ড ৬৲) নূতন গ্রাহক করা সম্ভব, কারণ রেক্সিন ও বাঁধাইয়ের অন্যান্য সরঞ্জাম এখনো অত্যন্ত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য।

আপনি যদি ইতিপূর্বে কোনো খণ্ড কিনে থাকেন তা হলে চিঠিতে সে-কথা জানিয়ে দেবেন। কোন্ রকম বই কিনেছেন তাও জানাবেন—কাগজের মলাট (৬৲), কি পাতলা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই (৮৲), কি মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই (৯৲)। আগে যে-রকম বই কিনেছেন যথাযথই যাতে সেই রকম বই পান তার চেষ্টা করা হবে।

ভবিষ্যতে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হলে, বা আগেকার যে-সব খণ্ড এখন ছাপা নেই সেগুলি ছাপা হলে, গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়। আগেকার খণ্ডগুলি ক্রমশ পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে—সম্প্রতি প্রথম, চতুর্থ ও নবম খণ্ড আবার ছাপা হয়েছে। একবিংশ ও দ্বাবিংশ খণ্ডও সম্প্রতি ছাপা হয়েছে।

এক সঙ্গে সব খণ্ড কিনবার অপেক্ষায় থাকা সংগত হবে না, কারণ যেগুলি এখন ছাপা নেই সেগুলি যখন আবার ছাপা হবে, তখন, যেগুলি এখন পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি ফুরিয়ে যেতে পারে। কাগজ ও ছাপার সুবিধার অভাবে সবগুলি খণ্ড এক সঙ্গে ছাপানো সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

মহাস্থবির জাতক

প্রথম পর্ব। 'শনিবারের চিঠি'তে বর্তমানে প্রকাশিত "মহাস্থবিরে"র আগের কথা। চার টাকা

স্বর্গের চাবি

'মহাস্থবির জাতকে'র মতই কৌতূহলোদ্দীপক সরস গল্প-সমষ্টি। তিন টাকা

*

"বনফুল"-এর

বনফুলের কবিতা

হাসির কবিতা। আড়াই টাকা

দ্বৈরথ

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

অনুপম টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

কিছুক্ষণ

ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

জঙ্গম

প্রথম খণ্ড। উপন্যাস। চার টাকা

বৈতরণী-তীরে

অদ্ভুতের গল্প নহে, ভূত-প্রেত ও অলৌকিকতেরও গল্প। দুই টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধাত্রী দেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। সাড়ে চার টাকা

জলসাঘর

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

দুই পুরুষ

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন-প্রশংসিত নাটক। সাত সিকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চিত্র। আড়াই টাকা

সন্দীপন পাঠশালা

উপেক্ষিত শিক্ষক-জীবনের কাহিনী। সাড়ে তিন টাকা

রসকলি

মনের উপর দুষ্ট বস্তু ও ঘটনার আঘাতজনিত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

রাইকমল

প্রেমিক বৈষ্ণবীর দুঃখময় প্রেম-কাহিনী দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই টাকা

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমাবেশ।

শ্রীপার্থকুমার সেনের

অভিনেতা

নূতন ধরনের গল্প-সংগ্রহ। দশ সিকা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডিটেকটিভ

"[illegible] অভিনীত। বারো আনা

ষাণ্মাসিক সূচি

কার্তিক—চৈত্র, ১৩৫৩

বিশ্বভারতী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

মহাস্থবির জাতক

প্রথম পর্ব। 'শনিবারের চিঠি'তে বর্তমানে প্রকাশিত "মহাস্থবিরে"র আগের কথা। চার টাকা

স্বর্গের চাবি

'মহাস্থবির জাতকে'র মতই কৌতূহলোদ্দীপক সরস গল্প-সমষ্টি। তিন টাকা

*

"বনফুল"র

বনফুলের কবিতা

হাসির কবিতা। আড়াই টাকা

দ্বৈরথ

বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

রাত্রি

দুঃসাহসিক উপন্যাস। আড়াই টাকা

বিন্দু-বিসর্গ

ছোটগল্পের সমষ্টি। দুই টাকা

মৃগয়া

অপূর্ব টেকনিকে লেখা বিচিত্র উপন্যাস। তিন টাকা

কিছুক্ষণ

ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মের বিচিত্র মানুষের সমাবেশে এই উপন্যাসটি সমুজ্জ্বল। দেড় টাকা

তৃণখণ্ড

ডাক্তার ও রোগীর কাহিনী। দেড় টাকা

জঙ্গম

প্রথম খণ্ড। উপন্যাস। চার টাকা

বৈতরণী-তীরে

শুধু ভূতের গল্প নহে, মৃত্যু-রাজ্য ও [illegible] গল্প। দুই টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ধাত্রীদেবতা

জাতীয় জীবনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বাঙালী তরুণের কাহিনী। সাড়ে চার টাকা

জলসাঘর

বিখ্যাত গল্পের সংগ্রহ। তিন টাকা

দুই পুরুষ

সিনেমায় ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সর্বজন-প্রশংসিত নাটক। সাত সিকা

১৩৫০

মন্বন্তরের পটভূমিকায় বাংলা দেশের চিত্র। আড়াই টাকা

সন্দীপন পাঠশালা

উপেক্ষিত শিক্ষক-জীবনের কাহিনী। সাড়ে তিন টাকা

রসকলি

মনের উপর দুই বস্তু ও ঘটনার আঘাতজনিত স্পন্দনে স্পন্দিত গল্প। আড়াই টাকা

রাইকমল

প্রেমিক বৈষ্ণবীর মধুময় প্রেম-কাহিনী। দুই টাকা

*

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রাণুর প্রথম ভাগ

দুই টাকা

রাণুর দ্বিতীয় ভাগ

দুই টাকা

রাণুর তৃতীয় ভাগ

তিন টাকা

রাণুর কথামালা

তিন টাকা

রাণুর গল্পগুলি হাসি ও কান্নার অপূর্ব সমাবেশ

শ্রীআর্যকুমার সেনের

অভিনেতা

নূতন ধরনের গল্প-সংগ্রহ। নয় সিকা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ডিটেকটিভ

[illegible] অভিনীত। বারো আনা

মুসলিম লীগ কী চায়?

। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার শুধু জোরালো যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাই নয়, সমাধানের ইঙ্গিতও আছে এ পুস্তিকাতে। আট আনা।

জাগ্রত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

। শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী ।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রক্তাঙ্কিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আশ্চর্য্য শিল্পকুশলতার সঙ্গে। বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই।

আজাদ হিন্দের অঙ্কুর

। বিজয়রত্ন মজুমদার ।

পিসিয়েল ও বিমল রায়ের অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত নেতাজীর অমর কাহিনী। তিন টাকা।

মিত্তির-বাড়ী

। আশাপূর্ণা দেবী ।

নবতম উপন্যাস
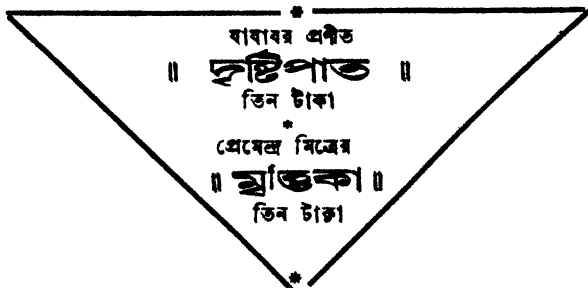
অনন্তকাল হ'তে যে সংঘর্ষ চলেছে প্রতি যুগে, প্রতিটি জীবনে, সে সংঘর্ষ নূতনে আর পুরাতনে—সেকাল আর একালে। এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব বিচিত্র চরিত্রে এবং বিস্তীর্ণ পরিবেশে জীবন্ত রূপ গ্রহণ করেছে। কলকাতার বোমাই আগষ্টের ঘটনা সংযোগে উপন্যাসের ব্যঞ্জনা আরো প্রখর হয়ে উঠেছে। তিন টাকা আট আনা।

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অধ্যাপক নির্মল বসুর

গান্ধীজী কি চান

গান্ধীবাদের প্রামাণ্য বিশ্লেষণ। বাংলা ভাষায় ইহার জুড়ি নাই। মূল্য দেড় টাকা।

অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরীর

বাংলার মনীষী

আটজন মনীষীর জীবনীর মধ্য দিয়া বাংলার জাতীয়তা বিকাশের ইতিহাস। মূল্য দেড় টাকা

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের

নেতাজী বসু

উড্ কাট টেকনিকে অংকিত তেইশখানি পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রসহ নেতাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য তিন টাকা।

শুভেন্দু ঘোষের

বিজ্ঞানবীর এডিসন

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর মনোরম জীবনকাহিনী। কিশোরদের জন্য লিখিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

'দরদী' প্রণীত

দুর্ভিক্ষের প্রতিকার

দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বাংলাভাষায় একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অর্থ-নীতির ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য। মূল্য চার টাকা।

শ্রীকানাই সামন্তের

গীতমঞ্জরী

কয়েকটি গীতিকবিতা। মূল্য এক টাকা।

চিত্রোৎপলা

কয়েকটি কথাকাব্য। মূল্য আড়াই টাকা।

মহারাজ নন্দকুমার

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম শহীদ—মহারাজ নন্দকুমারের বিচার-প্রহসন সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাস। মূল্য পাঁচ সিকা।

বাগেরহাটের খ্যাতনামা হাস্যরসিক ভূপেশ আইচের

আসছে ফাল্গুনে

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় এরূপ রসাল প্রহসন দেখা যায় নাই। এ যুগের অভিনব নাটিকা। মূল্য এক টাকা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের

খুলনার কথা

খুলনা জেলা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। মূল্য দশ আনা।

লেখন

(আধুনিক সাহিত্য-সংকলন। সচিত্র)
শুভেন্দু ঘোষ সম্পাদিত—প্রথম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করিয়াছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মূল্য তিন টাকা।

লা মিজেরাবল্

ভিক্টর হুগো লিখিত অমর কাহিনী। প্রবীণ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক কিশোরদের উপযোগী করিয়া সবিস্তারে বিবৃত। সচিত্র। মূল্য তিন টাকা।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের

পীরখাঁ জাহানআলি

পাঠান যুগের সাধু শাসকের চিত্তাকর্ষক কাহিনী। মূল্য এক টাকা।

নেতাজী বসুর ফটো

উড্ কাট টেকনিকে ১৫" x ১০" সাইজে কার্ডের বোর্ডে দু রং-এ ছাপা। দাম এক টাকা।

[illegible]